ভাদ্র, ১৩৩৩

প্রথম খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

রস-কীর্ত্তন

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

পাবনার কীর্ত্তন গোষ্ঠী সম্মিলনে আমাকে কীর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। ঐ সম্মিলনে যে সকল বিষয় আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহারও একটি ফর্দ্দ কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল সমস্যার মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না; আমি সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছা করি। সে বিষয়টি এই—বর্ত্তমানে কীর্ত্তনগানের অবনতি ঘটিয়াছে, তাহার উন্নতি সাধন করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, ইহা বিশেষ ভাবে সম্মিলনে আলোচিত হওয়া আবশ্যক মনে করি।

কীর্ত্তনে যে চৌষট্টি রসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সবগুলি এক্ষণে উদ্ধার করিতে পারা যায় কি না, ইহা ভাবিবার বিষয় হইলেও ইহা ঠিক যে ঐ রস হইতে গোটাকয়েক বাদ গেলেও তত বেশী ক্ষতিবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কীর্ত্তনই যে লোপ পাইতে চলিল; তাহার কি? কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, যে এক দিন যে কীর্ত্তনে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল, আজকাল তাহার গায়ক বিরল। যে সকল প্রসিদ্ধ গায়কের নাম বঙ্গে পল্লীতে পল্লীতে লোকমুখে ফিরিত, সে শ্রেণীর গায়ক নাই বলিলেও অন্যায় হইবে না। ঈশ্বরেচ্ছায় যাঁহারা এখনও স্বীয় প্রতিভায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা অঙ্গুলির দ্বারা গণনা করা যায়। শ্রীযুক্ত অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজি, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায়, গণেশ দাস, সুরেন আচার্য্য, ফটিক চৌধুরী, বিষ্ণুদাস, রাসবিহারী মিত্র ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজনের নামই শুনিতে পাওয়া যায়। আমি নিজের অজ্ঞতাবশতঃ যাঁহাদের নাম করিতে পারিলাম না, তাঁহারা কৃপাগুণে আমাকে ক্ষমা করিবেন। যাঁহাদের নাম করিলাম, তাঁহাদের অনেকেরই জীবনসূর্য্য অস্তাচলোন্মুখ। ইহাঁদের অবর্ত্তমানে কীর্ত্তনের গৌরব রক্ষা করিতে পারেন, এরূপ লোক ত দেখিতে পাই না। সম্মিলনে সুধীমণ্ডলী এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে চিন্তা করেন, ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা।

যে সকল ভাবুক, রসজ্ঞ, ভজনশীল ও সঙ্গীতে পারদর্শী মহাজনগণ সাধনার ফলে কীর্ত্তন সুরের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উত্তরাধিকার, কালক্রমে স্থান বিশেষে ও গায়ক বিশেষে বর্ত্তাইয়াছিল। ঐ সকল স্থানের সমৃদ্ধি-লোপ ও গায়কগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের গীতধারাও লোপ পাইয়াছে। অনেক সময়ে গায়কগণের অতিমাত্র রক্ষণ-(গোপন?)শীলতার জন্যও সুরগুলি অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পৌত্র (?) শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর যখন পদামৃত-সমুদ্র সংকলন করেন, তখনই পদাবলীর পদ-লোপ সুরু হইয়াছে। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদাবলী যে স্থলে সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সে স্থলে প্রভুপাদ রাধামোহন রচনা করিয়া পাদপূরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত গীত কর্ত্তৃণাং কদাচিৎ গান-পোষকং
ন লভ্যতে যত্র গীতং বিচিন্ত্য হৃদি তৎপদং ॥
দাস্যামি রচনং কৃত্বা তত্র তেষাং কৃপাবলৈঃ।

পদামৃত-সমুদ্র।

"দুর্ভাগ্য বশতঃ যেখানে কোনও একটি গীত, গীতার্দ্ধ বা এক পাদ না প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেখানে আমি রচনা করিয়া সে সকল যোজনা করিব (যোজয়িষ্যামি)। অদোষদর্শী শ্রোতৃবৃন্দ আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।" পঃ সঃ টীকা।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়—যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সার্দ্ধ-শতাধিক বর্ষ পরেই চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতির সমগ্র পদাবলী অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু রাধা-মোহন গোস্বামীপ্রভুর এক বিষয়ে সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে ভাল ভাল কীর্ত্তনীয়া ছিলেন এবং তাঁহাদের মুখে মুখে এই মহাজনের পদগুলি চলিত। গীতশাস্ত্র হইতে এবং কীর্ত্তনীয়াদিগের অনুসরণ করিয়া তিনি পদামৃত-সমুদ্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আলোক্যগীতশাস্ত্রাণি সদ্ভক্তানাং কৃতানিতু
সংগৃহ্যন্তে সুগীতানি কীর্ত্তনস্যানুসারতঃ ॥ পঃ সঃ

কীর্ত্তনের উৎকর্ষ সে সময়ে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা পদামৃত-সমুদ্রের সুর-তাল-বিন্যাস হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। আজকাল পদকল্পতরু বা আধুনিক পদ-সংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায়, গানের উপরিভাগে বড় বড় তাল, বড় বড় রাগিণীর উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য যে বর্ত্তমান কালে ঐ সমস্ত রাগ-রাগিণী বা তালের অধিকাংশেরই প্রচলন নাই। তথাপি গতানুগতিকতার বশবর্ত্তী হইয়া রাগ-রাগিণী ও তালের উল্লেখ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু পদামৃত-সমুদ্র রচনা কালে যে এরূপ ছিল না, তাহার প্রচুর প্রমাণ রাধামোহন ঠাকুরের স্বকৃত সংস্কৃত টীকায় পাওয়া যায়। কেদার, ভৈরব, মঙ্গল, গৌরী, বরাড়ী, বিভাস প্রভৃতি যে সকল রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে, তাহার রূপ ও ধ্যান বিশেষ যত্ন সহকারে গোস্বামীপাদেরকৃত 'মহানুভাবানুসারিনী' টীকায় প্রদত্ত হইয়াছে। এরূপ প্রণালী তখনই সম্ভবে, যখন সঙ্গীতের একটা জীবন্ত অভিব্যক্তি সমাজে বর্ত্তমান থাকে। সঙ্গীত যখন যন্ত্রবদ্ধ হইয়া, একটা অসাড় প্রণালী-মাত্রে দাঁড়ায়, তখন রাগরাগিণীর বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা কিছুরই প্রয়োজন হয় না।

সে কালে যে লুপ্ত পদের স্থলে কোনও কোনও মহাজন পদ-যোজনা করিয়া দিতেন, তাহার কারণ এই যে রস পরিপুষ্টির জন্য প্রাচীন পদের প্রয়োজন হইত। এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় একই পদসমূহ সকল কীর্ত্তনীয়া গান করেন। পূর্ব্বরাগ, অভিসার, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, গোষ্ঠবিহার, উত্তরগোষ্ঠ, নৌকাবিলাস, দান, রাস, ঝুলন, হোলি, বিরহ প্রভৃতি কয়েক পালা মাত্র সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়। ইহারও সকল পালা সকল গায়ক জানেন না। কেহ কলহান্তরিতা, কেহ গোষ্ঠ, কেহ বিরহ ভাল গায়িতে পারেন, অন্য পালা তাঁহার তেমন অভ্যস্ত নাই। এইরূপ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পালায় যে সকল গান প্রচলিত আছে, তাহার বাহিরে প্রায় কীর্ত্তনীয়া যাইতে চাহেন না। ঐ সকল গানের সংখ্যা বড় বেশী নহে; কিন্তু পূর্ব্বে যখন কীর্ত্তনের দেশব্যাপিনী প্রতিষ্ঠা ছিল, তখন নিশ্চয়ই এমনটি ছিল না। তাহা থাকিলে, এত নূতন নূতন পদ সৃষ্ট হইয়া বৈষ্ণব পদাবলী এমন বিরাট সাহিত্যে পরিণত হইত না; এত নূতন নূতন সুর ও তালের সৃষ্টি হইত না। প্রচলিত বৈঠকী রীতি হইতে পৃথক একটি নিজস্ব সত্ত্বা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য এমন মনোমুগ্ধকর একটি নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে কীর্ত্তনকে কি অসাধারণ পরিশ্রম ও প্রতিভার প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং

কীর্ত্তনের যখন অপ্রতিহত প্রভাব ছিল, যখন জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, নরোত্তমদাস প্রভৃতি সুললিত ছন্দে পদাবলী রচনা ও গান করিয়া দেশ মাতাইতেছিলেন, তখন রস-পোষণের জন্য নূতন নূতন পদের প্রয়োজন হইত। কীর্ত্তন তখন নানা ভাবোন্মেষে মূর্ত্তিমান, উজ্জ্বল, জীবন্ত হইয়া উঠিত। আমরা বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দের শ্রীপদ-কল্পতরুতে একটি বারমাস্যা অর্থাৎ শ্রীমতীর দ্বাদশমাসিক বিরহের পদ পাই; এই পদ সম্বন্ধে বৈষ্ণব দাস নিজে বলেন যে প্রথম চারিটি কলি বিদ্যাপতির, দ্বিতীয় কলিদ্বয় গোবিন্দ কবিরাজের ও শেষের ছয় কলি গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর কৃত। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

এ সকল প্রমাণের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে কীর্ত্তনের সেই সোণার যুগে যে জীবন-প্রবাহ বহিত, তাহা শুধু নূতন পদ সৃষ্টি করিয়াই সন্তুষ্ট হইত না; পুরাতন পদের নষ্টপাদ পূরণ করিয়া তাহাতেও জীবন সঞ্চার করিত। এই যুগেই কীর্ত্তনের প্রসিদ্ধ সুরগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল; এই যুগেই নূতন নূতন ছন্দে ভাবের অভিব্যক্তির প্রয়োজন হইতে নূতন নূতন তালের জন্ম হইয়াছিল। এই সকল ছন্দ ও তাল চিরদিন সঙ্গীতজ্ঞগণের বিস্ময় উৎপাদন করিবে। কারণ মহাজনগণ শুধু সঙ্গীতের বিকাশের দিকেই লক্ষ্য করেন নাই; সঙ্গীত যাহাতে ভজন-সাধনের অনুকূল হয়, আহ্নিকের মত যাহা নিত্য উচ্চারিত হইয়া ধ্যান ধারণার সাহায্য করে, তাহার জন্য তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে যে তাঁহাদের কাব্য-প্রতিভা বা সঙ্গীতকলা-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নহে; তাঁহাদের অদ্ভুত আধ্যাত্মিকতারও চরম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। গরাণহাটীই হউক, মনোহরসাহীই হউক, কীর্ত্তনের প্রধান অবলম্বন এই আধ্যাত্মিকতা। আজকাল কবি, রসিক বা ভাবগ্রাহী লোকের অভাব নাই; কিন্তু সে আধ্যাত্মিকতা এখন আর নাই। হরিস্মরণে মন সরস হয় না, শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলায় কৌতূহলই বা হয় কই? সুতরাং গান হিসাবেও কীর্ত্তনের আদর কমিয়া গিয়াছে। মহাপ্রভুর ভাষায় বলিতে গেলে

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥

ইহাই হইল কীর্ত্তনের উপজীব্য। গোবিন্দ-বিরহে যাহার মন ব্যাকুল হয়, কীর্ত্তন গায়িবার ও শুনিবার সেই অধিকারী। কিন্তু সে ভাব কোথায়? তাহার শতাংশের একাংশই বা কোথায়? তাই আজ কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিতে যুক্তিজালের অবতারণা করিতে হয়। আজকাল লোকের মন দুর্ব্বল, অন্নচিন্তা-চমৎকারে কাতর, সময় অত্যন্ত অল্প, সাধনার একান্ত অভাব; কাজেই কীর্ত্তনীয়া 'রঙ' গায়িয়া, আবৃত্তি করিয়া, রক্তৃতা ফলাইয়া, নাচিয়া কুন্দিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে বাধ্য হয়েন। কষ্ট করিয়া গান শুনিবার লোকের অভাব, কাজেই কষ্ট করিয়া গান শিখিবার লোকেরও অভাব। স্বর সাধনা করিয়া, রাগরাগিণীর স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া, ছন্দের আভিজাত্য রক্ষা করিয়া কত জন লোকে কীর্ত্তন শিখেন? কাজেই রস-কীর্ত্তন আর তেমন রস জোগাইতে পারে না; বুভুক্ষু আত্মার খোরাক সরবরাহ করিতে পারে না।

যে যুগে কীর্ত্তনের এই ক্ষমতা ছিল, সেই যুগেই সুরের 'চাল' অনুসারে দুইটি প্রসিদ্ধ শাখার জন্ম হয়। রাজসাহী জেলায় গড়েরহাট পরগণায় গরাণহাটীর জন্ম; রাঢ় অঞ্চলে মনোহরসাহী 'চালের' জন্ম। গরাণহাটী কীর্ত্তনের স্রষ্টা বোধ হয় শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তমদাস ঠাকুর। ঠাকুর মহাশয়কেই অনেকে এই প্রণালীর স্রষ্টা বলিয়া মনে করেন। স্তবামৃত লহরীতে আছে:

স্বসৃষ্টগানপ্রথিতায় তস্মৈ নমোনমঃ শ্রীল নরোত্তমায়।

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে নরোত্তম দাসই গড়ের হাটী বা গরাণহাটী প্রণালীর উদ্ভব-কর্ত্তা। মনোহরসাহীর উদ্ভব-কর্ত্তা কে তাহা বলা কঠিন। আমার মনে হয়, গোবিন্দ দাস জ্ঞান দাস নরহরি প্রভৃতি হইতে মনোহরসাহী গানের উদ্ভব। সে কালে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ডই মনোহরসাহী কীর্ত্তনের জন্মস্থান ছিল ইহাই আমি মনে করি। এই শ্রীখণ্ডেই নরহরি সরকার ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহার সম্বন্ধে নরোত্তম দাস বলিয়াছেন:

প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরি ॥

ইনি গৌরাঙ্গ লীলায় নিমগ্ন থাকিতেন। ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দন সরকার ঠাকুরও মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। জ্ঞানদাসও শ্রীখণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ গোবিন্দ দাস (কবিরাজ)ও শ্রীখণ্ডের সহিত সংসৃষ্ট। এই সকল কারণ হইতে মনে হয় যে, মনোহরসাহী গানের আকর-

স্থল সম্ভবতঃ শ্রীখণ্ড। পরে ময়নাডাল এই প্রণালীর কীর্ত্তনের জন্য বিখ্যাত হয়। এ সম্বন্ধে আমার মত যে অভ্রান্ত, তাহা মনে করিতে সাহস হয় না। সুধিগণ বিচার করিবেন।

গরাণহাটী ও মনোহরসাহী-কীর্ত্তনের এই উভয় রীতিই শ্রেষ্ঠ। উভয় সুরেই গাম্ভীর্য্য আছে। সুর-বিন্যাসে উভয় প্রণালীই তুল্য নিপুণতার দাবী করিতে পারে। শিল্প-প্রতিভায় ও কোনটি কম নহে। আমার মনে হয় গরাণহাটী রীতি সরলতা ও প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট; মনোহরসাহী সুরের কারিগরিও মাধুর্য্যবিশিষ্ট। গরাণহাটীতে যেরূপ বিলম্বিত ছন্দ আছে, তাহা মনোহরসাহীতেও সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে গরাণহাটী গানেই বিলম্বিত লয়ের ও দীর্ঘ ছন্দের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনোহর-সাহী অপেক্ষাকৃত লঘু গতিতে শ্রোতার মন মুগ্ধ করিতে সমর্থ। গরাণহাটী ও মনোহরসাহী গানের ছন্দ দুইটি বহু কাল পৃথক ভাবে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু উপযুক্ত সাধকের অভাবে এক্ষণে তাহাদের পৃথক সত্ত্বা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পূজনীয় পণ্ডিত অদ্বৈতদাস বাবাজি প্রভৃতি এক আধ জন ব্যতীত এ ঢঙের কীর্ত্তন আর কাহারও নিকটে শুনিতে পাওয়া যায় না। একবার পরলোকগত নাটোরাধিপ মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের ভবনে পণ্ডিত বাবাজির কীর্ত্তন শুনিয়াছিলাম। পণ্ডিত বাবাজি গানের পূর্ব্বে মহারাজকে বলিলেন "মহারাজ আমি জানি আপনি গুণগ্রাহী, আপনার সঙ্গীত-প্রতিভা সর্ব্বজন-বিদিত; এরূপ গুণীর সমাজে গান করিতে পারা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। যদি অনুমতি করেন দুই একটি উচ্চাঙ্গের কীর্ত্তন গাই। আমি কিছুই জানি না; যাহা জানি, তাহাও শুনাইবার লোক বিরল।" মহারাজ অনুমতি করিলে তিনি গান ধরিলেন। মহারাজ তাঁহাকে প্রতিশ্রুতির অধিক পুরস্কার দিয়া খুসী করিয়া দিলেন; কিন্তু আমাকে বলিলেন: "আমি ধ্রুপদ, খেয়াল ভাল ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি; সে গান ধরিতেও পারিয়াছি। কিন্তু বাবাজীর এ গান আমার মাথার উপর দিয়া গেল। এরূপ বিলম্বিত লয়ের ও আয়াস-লভ্য সুরের কীর্ত্তন পূর্ব্বে আমি কখনও শুনি নাই।" সঙ্গীতে দক্ষ, পাখওয়াজে সিদ্ধ-হস্ত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ যেখানে প্রবেশ করিতে অক্ষম, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা যে কত কঠিন ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

মনোহরসাহীর প্রচলন অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও, ইহাতেও যে ভেজাল মিশিয়া গিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পরবর্ত্তীকালে যে রেণেটী ও মন্দারিণী নামে দুইটি সুরের সৃষ্টি হয়, তাহা মনোহরসাহীর সহিত মিশিয়া সুরকে অত্যন্ত পাতলা করিয়া ফেলিয়াছে। কয়েকটি চপল, লঘু সুর সংযোজিত করিয়া কীর্ত্তনকে যে শ্রুতিমধুর করা যায়, ইহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঢপ কীর্ত্তনে যেমন মধুকান, ও গোবিন্দ অধিকারীর সুর মিশিয়া সমস্ত সঙ্গীতকে হালকা করিয়া ফেলিয়াছে, তেমনি রেণেটি ও মন্দারিণী বা মান্দারিণী সুরের মিশ্রণে মনোহরসাহী কীর্ত্তন হাল্‌কা হইয়া পড়িয়াছে। মনোহরসাহী হইতে এই সুর পৃথক করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। মনোহরসাহী প্রণালীর অধিকাংশ গায়ক আজকাল রেণেটি ও মন্দারিণীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই দুইটি সুরের ধারা একটু চেষ্টা করিলেই ধরা পড়িতে পারে। কীর্ত্তনগোষ্ঠী সম্মিলনে, আশা করি, এমন বিশেষজ্ঞ অনেকে উপস্থিত হইবেন, যাঁহারা রেণেটি মন্দারিণী হইতে মনোহরসাহীর ভেদ সুর যোগে বুঝাইয়া দিতে পারিবেন। সচরাচর যাহাকে রেণেটির সুর বলিয়া মনে করা হয়, তাহা যে অত্যন্ত তরল এবং সঙ্গীতের হিসাবে মনোহরসাহী অপেক্ষা নিম্নস্তরের, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া যে সেই সুরকে বর্জ্জন করিতে হইবে, আমি এমন কথা বলিতেছি না। আমার বক্তব্য এই যে সঙ্গীতের দিক দিয়া সব রকম সুরের ধারা ও স্বরূপ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে কোনও সুরেরই প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা ও মূল্য নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর হয় না। ঝিঁঝিট ও খাম্বাজ মিশাইয়া গান করা দোষের নহে, কিন্তু ঝিঁঝিট গায়িতে গিয়া অজ্ঞাতসারে খাম্বাজের বা খাম্বাজ গায়িতে গিয়া ঝিঁঝিটের পরদা লাগাইলে, তাহা সঙ্গত হয় না। বিশুদ্ধ মনোহরসাহী আজকাল শুনিতে পাওয়া কঠিন। রেণেটীও খাঁটি পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যাঁহারা বেণী দাসের গান শুনিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারিবেন যে খাঁটি রেণেটী সুর কেমন মিষ্ট ছিল। এখন যাহা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মনোহরসাহীর মধ্যে অনেকটা রেণেটীর ছাপ আসিয়া পড়িয়াছে। আমার বোধ হয়, মনোহরসাহীর তথা কীর্ত্তনের পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে এই সুরগুলির পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান একান্ত আবশ্যক।

এক দিকে গরাণহাটী ও মনোহরসাহী গানেরও যেমন দৈন্য দশা উপস্থিত, তেমনি বাজনারও দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তরল গানে তরল তাল বাজাইয়া বাহবা লইতে বেশীক্ষণ লাগে না। কিন্তু গরাণহাটী ও মনোহরসাহী গানেরও যেমন গাম্ভীর্য্য ও ছন্দ-বৈচিত্র্য, বাজনারও তেমনি তাল মাত্রা পৃথক ছিল। গীত অনুযায়ী বাদ্য। গীতের আশ্রয় ব্যতীত বাদ্য যেমন টিঁকিতে পারে না, বাদ্যের অভাব ঘটিলেও গীত খোলে না। গীতবাদ্যের পরস্পর সমঞ্জসীভূত শিল্প-চাতুর্য্যে রসের বা আনন্দের সৃষ্টি হয়। গায়কের অভাবে বাদকের অভাব ঘটিতে বাধ্য। আগে যে সকল প্রসিদ্ধ বাদকের নাম শুনা যাইত, সে শ্রেণীর বাদক আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় না। গোলকদাস, মহানন্দ, ভারতদাস, নিকুঞ্জ বাউতী, নিকুঞ্জ মিত্র, কুঞ্জদাস, রামকল্প, গৌরদাস ব্রজবাসী প্রভৃতির নাম এখনও ভক্তির সহিত উচ্চারিত হয়। ইহাঁদের অনেকেই গরাণহাটী, মনোহরসাহী, রেণেটী মন্দারিণী এই চারি ঘরের বাজনাই জানিতেন। খাঁটি গরাণহাটী ও খাঁটি মনোহরসাহী গানের ধারাবদ্ধ লয়বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন বাদ্য, যাহাতে আনন্দের তরঙ্গ উঠিত, আসর টলমল করিয়া উঠিত,—তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখনকার কীর্ত্তনে যে বাজনা সাধারণতঃ চলে, তাহা অনেক সময়ে ছন্দকে বর্জ্জন করিয়া মিষ্টত্বের দিকে ধাবিত হয়। ফলে এই হয় যে তাল মাত্রা বলিয়া যে বৈজ্ঞানিক জিনিষটি আছে, তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ হইয়া যায়। তাল মাত্রা যে গানে ঠিক নাই, তাহা সঙ্গীতের অভিনয় মাত্র; তাহাতে প্রকৃত সঙ্গীত অত্যন্ত কম। গরাণহাটী ও মনোহরসাহী গানের প্রণালী-ভেদে যে বাজনারও প্রণালীভেদ আছে, ইহা হয়ত অনেকেই জানেন না। কিন্তু আমি ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছি যে, সাধারণতঃ যাঁহারা বাদ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এমন বাদকও প্রণালী মত গান করিলে তাহার লয় করিতে পারেন না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, প্রত্যেক প্রণালীর অনুসারী বাজনা স্বতন্ত্র ভাবে নিরলস সাধনার দ্বারা শিক্ষা করিতে হয়। গরাণহাটী গানের শ্রেষ্ঠ (সম্ভবতঃ একমাত্র) গায়ক পণ্ডিত বাবাজি যখন নাটোর রাজবাড়ীতে গান করিলেন, তখন তাহার সঙ্গত শুনিলাম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসীর নিকট। যেমন গান, তেমনি বাজনা। উভয়ই অসামান্য সাধনার দ্বারা অর্জ্জিত। সে দিন যেরূপ 'সঙ্গত' শুনিয়াছি, পণ্ডিত বাবাজির গানের এরূপ লয় আর কখনও শুনি নাই। সে 'সঙ্গত' আর যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাও আমার এই মতের অনুমোদন করিবেন, আশা করি।

গায়কেরা স্বীকার করিবেন যে শ্রোতার গুণে গান। শ্রোতা যেমন চাহেন, গীতবাদ্য তাহার অনুরূপ হইতে বাধ্য। শ্রোতার রুচির আদর্শ উচ্চ না হইলে, গীতবাদ্যের উৎকর্ষ আশানুরূপ হওয়া সুদুষ্কর। কিন্তু আবার ইহাও ঠিক যে সঙ্গীত বা শিল্পের আদর্শ উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, শ্রোতাদিগের রুচিরও অবনতি ঘটে। কীর্ত্তনের অবস্থা বর্ত্তমানে যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা বাঙ্গালীর একটি জাতীয় দায়িত্ব বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। কারণ শিল্প, ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালী যদি জগৎকে বড় কিছু দান করিয়া থাকে, তবে তাহা এই কীর্ত্তন। এক্ষণে অধিকারী, অনধিকারী, অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ কিছুই ভাবিবার সময় নাই। মহাপ্রভু অন্তরঙ্গ লইয়া রস-আস্বাদন করিবার কথা বলিয়াছেন সত্য। এখনও আমরা দেখিতে পাই, অন্তরঙ্গ নহিলে কীর্ত্তন জমে না, সব ভাসিয়া যায়। রসের দানা বাঁধে না। সুতরাং অন্তরঙ্গ চাই। কিন্তু অন্তরঙ্গ বলিব কাহাকে? সে দিকে মহাপ্রভু দিগ্‌দর্শনও করেন নাই। আমি উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহা শুধু সঙ্গীতের হিসাবেই। ধর্ম্মতত্ত্বের দিক দিয়াও ইহাকে বিচার করিতে পারা যায় এবং সেখানে অন্তরঙ্গ নহিলে আর কোনও রূপেই চলে না। কীর্ত্তনের যাহা কাব্যসম্পদ্ তাহা ছাপাখানার প্রসাদে সকলেরই অধিগম্য। তাহার মধ্যে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ নিরাকরণের অবকাশই নাই। সঙ্গীত হিসাবে অন্তরঙ্গ বা অধিকারী তাঁহারাই, যাঁহারা কীর্ত্তনের গানে আনন্দ লাভ করেন। যাঁহারা তাহাতে আনন্দ পান না, রাগরাগিণীকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া জঙ্গলা করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া যাঁহারা কীর্ত্তনের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহারা বহিরঙ্গ। ইহাঁদের লইয়া আস্বাদন ভাল হয় না। ধর্ম্মের দিক দিয়া যাঁহারা যুগলের উজ্জ্বল রসে মোহিত না হন, তাঁহারা বহিরঙ্গ। তাঁহাদিগকে লইয়া লীলা আস্বাদন করা চলে না। তাঁহারা প্রার্থনা, নিবেদন, বা নাম কীর্ত্তন শুনিবার অধিকারী হয়ত হইতে পারেন। ইহাই মহাপ্রভুর বাক্যের অর্থ বলিয়া বোধ হয়। লীলারও

আবার বিভিন্ন রস-পর্য্যায় আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্তরের অধিকারী ভিন্ন ভিন্ন রসাস্বাদনের অধিকারী। কেহ সখ্য রসে ভরপুর, গোষ্ঠে তাঁহাদের বড় আনন্দ। কেহ বাৎসল্যে আনন্দ পান; কেহ বা রসশিরোমণি-মাধুর্য্যের পথিক। সকল রস সকল স্থানে গান করা বিধেয় নহে। এখানে সঙ্গীত ও কাব্যের অধিকার ব্যতীত, ভজনের অধিকারও গণনা করিতে হইবে। স্কুল কলেজের ছাত্র যেখানে বেশীর ভাগে শ্রোতা, সেখানে রসালস বা কুঞ্জভঙ্গ ইত্যাদি গান করা উচিত নহে। এ স্থলে তাহারা অন্তরঙ্গ নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে লীলাগানের ক্রম আছে এবং সাধারণ শ্রোতার নিকট গান করিতে হইলে অনেক বুঝিয়া সুঝিয়া, অবহিত হইয়া গান করা একান্ত আবশ্যক।

'অন্তরঙ্গ' শব্দের আমি যে ব্যাখ্যা দিলাম, তাহা সকলে গ্রহণ করিবেন কি না জানি না। আমি মনে করি যে মহাপ্রভুর উক্তিতে যে অন্তরঙ্গ লইয়া রস আস্বাদন করিবার কথা আছে, তাহা ধর্ম্মতত্ত্বের দিক দিয়াই বিশেষ ভাবে বুঝিতে হইবে। 'বংশী শিক্ষায়' প্রেমদাসও এই কথা বলিয়াছেন:—

অন্তরঙ্গ ভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে
রসরাজ-উপাসনা করিলা অর্পণে॥

অর্থাৎ মহাপ্রভু অধিকারী ভেদে দ্বিবিধ উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন। স্মরণ রাখিবেন, এখানে উপাসনার কথা হইতেছে। সাধারণ অধিকারীর পক্ষে নাম-কীর্ত্তন বা নামজপ। অন্তরঙ্গ, মরমী অধিকারীর জন্য রসরাজ উপাসনা।

ইহা ব্যতীত অধুনা যে কীর্ত্তন গান প্রচলিত আছে, তাহা যে কেবল দুই চারিজন ভক্ত লইয়া গোপনে (অর্থাৎ বহিরঙ্গের অগম্য স্থানে) উপভোগ করিতে হইবে, এমন কথা মহাপ্রভু বলেন নাই। এরূপ ব্যাখ্যা করিলে, কীর্ত্তন গানের যাহাও বা আছে তাহাকেও বধ করাহইবে।

শাস্ত্র বলেন:

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ক্রিয়তে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।

ইহা হইতে বুঝা যায় যে ভগবল্লীলা শুনিবার অধিকার সকলেরই আছে; কারণ ঐ লীলা শুনিয়াই মন শ্রীহরির পাদপদ্মে আকৃষ্ট হয়।

কীর্ত্তনে যে চৌষট্টি রসের উল্লেখ আছে, তাহার একটি তালিকা বহরমপুরের প্রকাশিত উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থের সঙ্গে দেওয়া আছে। তাহা এই: পূর্ব্বরাগে যথা সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, ভাট মুখে শ্রবণ, দূতী মুখে শ্রবণ, সখী মুখে শ্রবণ, গুণিজনের গানে শ্রবণ, বংশীধ্বনি শ্রবণ (৮); মান যথা: সখীমুখে শ্রবণ, শুকমুখে শ্রবণ, মুরলীধ্বনি শ্রবণ, বিপক্ষগাত্রে ভোগাঙ্ক দর্শন, প্রিয়গাত্রে ভোগচিহ্ন দর্শন, গোত্রস্খলন, স্বপ্নে দর্শন, অন্য নায়িকার সঙ্গে দর্শন (৮); প্রেম বৈচিত্ত্য যথা: শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, নিজপ্রতি ঐ, সখীর প্রতি ঐ; দূতীর প্রতি ঐ, মুরলীর প্রতি ঐ, বিধাতার প্রতি ঐ, কন্দর্প প্রতি ঐ, গুরুজন প্রতি ঐ (৮); প্রবাস যথা, ভাবী, মথুরাগমন, দ্বারকা গমন, কালীয় দমন, গোচারণ, নন্দমোক্ষণ, কার্য্যানুরোধ, রাসে অন্তর্ধান (৮); সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ যথা: বাল্যাবস্থায় মিলন, গোষ্ঠে গমন, গোদোহন, অকস্মাৎ চুম্বন, হস্তাকর্ষণ, বস্ত্রাকর্ষণ, বর্ম্মরোধন, রতিভোগ (৮); সংকীর্ণ সম্ভোগ যথা: মহারাস, জলক্রীড়া, কুঞ্জলীলা, দানলীলা, বংশীচুরি, নৌকাবিলাস, মধুপান, (৮); সম্পন্ন সম্ভোগ যথা: সুদূর দর্শন, ঝুলন, হোলী, প্রহেলিকা, পাশা খেলা, নর্ত্তক রাস, রসালস, কপট নিদ্রা (৮); সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ যথা: স্বপ্নে মিলন, কুরুক্ষেত্র, ভাবোল্লাস, ব্রজাগমন, বিপরীত সম্ভোগ, ভোজন কৌতুক, একত্রে নিদ্রাবস্থা, স্বাধীন ভর্ত্তৃকা (৮)

বৃন্দাবন হইতে শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত ক্ষণদাগীত চিন্তামণি গ্রন্থের সূচীপত্রে কোন্ রসের কোন্ পদ, তাহার একটি তালিকা দেওয়া আছে। কিন্তু তাহা হইতে চৌষট্টি রস কোন্ গুলি তাহা নির্ণয় করা কঠিন।

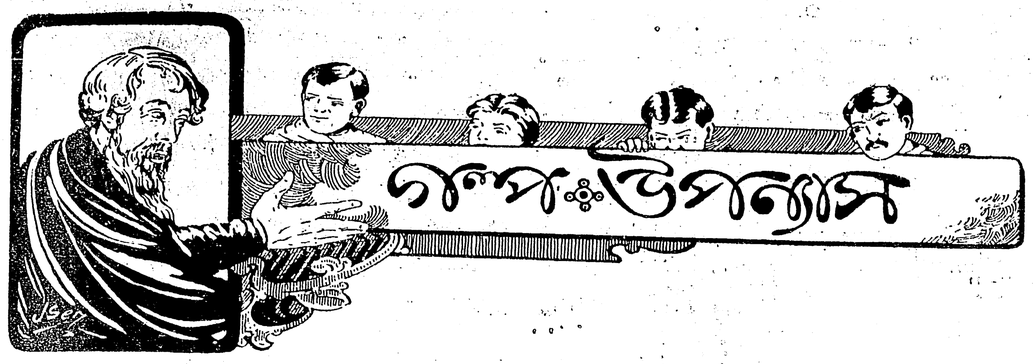

হাইফেন

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

মলয় পথে পথে খানিকক্ষণ ঘুরিয়া আপিসে যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলো। উপরে গিয়াই সে দেখিলো তাহার ঘরে বিলোপ বসিয়া আছে। বিলোপকে দেখিয়াই মলয় জিজ্ঞাসা করিলো—তুমি কখন এলে?

বিলোপ বলিলো—অনেকক্ষণ। আমি এসেই শুন্‌লাম তুমি তখনই বেরিয়ে গেলে।

তুমি তা হলে বরাবর ষ্টেসন থেকে এখানেই এসেছো?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, মৃদুল অতো ব্যস্ত হয়ে চলে' গেলো কেনো তার কি কিছু কারণ জান্‌তে পেরেছো?

কতক কতক জেনেছি। কোথাও কিছু একটা বোঝ্‌বার গণ্ডগোল ঘটেছে, এবং সেটা আমিও ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আমি যদি তোমাকে খুব ভালো রকম না জান্‌তাম তা হলে আমারও মনে মৃদুলা দেবীর মতন একটা খট্‌কা লাগ্‌তে পার্‌তো।

মলয় উৎকণ্ঠিত ও উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলো—আমার কিছু অপরাধ ঘটেছে বলে' মৃদুলা রাগ করে' চলে' গেছে? আমি তো জ্ঞানতঃ কোনো অন্যায় করি নি।

বিলোপ পকেট হইতে কতকগুলা কাগজপত্র বাহির করিতে করিতে বলিলো—ঐটে তো আমিও ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, এবং ঐটে বোঝ্‌বার জন্যেই তো আমি ছুটোছুটি তোমার কাছে এসেছি···এইগুলো পড়ে দেখো···

বিলোপ দুখানা পুরাতন চিঠি খামে-ভরা মলয়ের হাতে দিলো। মলয় দেখিলো খামের উপর তাহারই হাতে লেখা শ্রেয়সীর নাম ঠিকানা। ইহা দেখিয়াই মলয় আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলো—এ চিঠি তুমি কোথায় পেলে?

—মৃদুলা দেবী আমাকে দেখ্‌তে দিয়েছিলেন; আমি তোমাকে দেখিয়ে ব্যাপার কি জান্‌বো বলে' নিয়ে এসেছি।

মলয় বুঝিতে পারিলো যে অনন্ত এই চিঠি দুখানি ডাকে না দিয়া মৃদুলাকে দিয়াছিলো, এবং এই জন্যই শ্রেয়সী এই চিঠি দুখানি পায় নাই। মলয় বলিলো— এ ঐ···

মলয় বলিতে যাইতেছিলো পাজী অনন্ত, কিন্তু সে নিজেকেও উহারই তুল্য দুশ্চরিত্র মনে করিয়া পাজী বিশেষণটি উচ্চারণ করিতে পারিলো না, সে কেবল বলিলো এ ঐ অনন্তটার কাজ! মৃদুর মনে আমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ সঞ্চার করে' তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর্‌তে পার্‌বে মনে করেছিলো!

বিলোপ জিজ্ঞাসা করিলো—কিন্তু তুমি থিয়েটারের নর্ত্তকীকে প্রেমপত্র লিখেছিলে কেনো?

মলয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলো—প্রেমপত্র! শ্রেয়সী আমার বোন, নিবারণের স্ত্রী রমা। রমাকে নিবারণ আদর করে' নাম দিয়েছিলো শ্রেয়সী। সে নিবারণকে

ছেড়ে চলে' এলেও নিবারণ তাকে ভুলতে পারে নি ; তাকে ফিরে ঘরে আনবার জন্যে নিবারণ ব্যাকুল হয়ে আমাকে বলে রমাকে অনুরোধ করতে তাই আমি তাকে চিঠি লিখে নিবারণের কাছে ফিরে আসতে বলেছিলাম। সেই চিঠি হলো প্রেমপত্র !

মলয়ের কৌতূহল ও সন্দেহ হওয়াতে সে খাম হইতে পত্র বাহির করিয়া দেখিলো যে পত্রের সম্বোধন শ্রেয়সী স্থানে প্রেয়সী হইয়াছে, এবং মাঝে মাঝে দু-একটি শব্দ কালী দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেখিয়াই মলয় বলিয়া উঠিলো—দেখেছো কী শয়তান !

অতঃপর মলয় নিবারণ ও শ্রেয়সী-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার এবং অনন্ত কি উপায়ে পত্রগুলিকে হস্তগত করিয়া ও বিকৃত করিয়া মৃদুলার মন বিষাক্ত করিয়াছে তাহা বিলোপকে বিবৃত করিয়া বলিলো। এই-সমস্ত বলিতে বলিতে অনন্তর উপর ক্রোধে মলয়ের মন পূর্ণ হইয়া উঠিলো এবং উহাকে খুব করিয়া শাস্তি দিবার বাসনা তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিলো ; কিন্তু তখনই তাহার মনে হইলো যে সে উহাকে শাস্তি দিবার অধিকার হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছে। তাই সে সমস্ত বৃত্তান্ত বিলোপকে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলো—সেদিন তুমি ওটাকে বেশ করে' শিক্ষা দিয়ে দিয়েছিলে তো ?

বিলোপ বলিলো—ভদ্রলোকে অপর একজন ভদ্রমন্য লোককে যেমন শিক্ষা দিতে পারে তা আমি দিয়েছিলাম। ······এ ব্যাপারটার তো একটা মীমাংসা হয়ে গেলো। কিন্তু আর একটা গুরুতর জটিল সমস্যা আছে......

মলয় উৎসুক:ও উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে বিলোপের মুখের দিকে চাহিলো। বিলোপ বলিতে লাগিলো—মৃদুলা দেবী স্বচক্ষে নাকি দেখেছিলেন অনন্তর স্ত্রী······

মলয় ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াই বলিলো—হ্যাঁ। কিন্তু সেটাতেও আমার কোনো দোষ নেই··· সম্ভবতঃ আহুতি দেবীরও মনে তেমন কোনো দুষ্ট ভাব ছিলো না, আমি তাঁকে আমার একটা লেখা পড়ে' শোনাচ্ছিলাম, তিনি হঠাৎ আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। এ কাজটা তাঁর ঠিক উচিত হয় নি ; হয়তো তিনি বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা দেখাবার অথবা একটু ফ্লার্ট করবার জন্যে ওরূপ করে' থাকবেন। তাঁর চরিত্র যে কতো দৃঢ় তা আমি টের পেয়েছি···শিক্ষিতা মেয়েদের রঙ্গ রসিকতা লীলা পদ্মপত্রের জলের মতন, তাদের অধিকতর লোভন ও শোভন করে, কিন্তু তাদের অঙ্গ স্পর্শ করে না।

এই বলিয়া মলয় অকপটে নিজের অন্যায় অসঙ্গত আচরণের কথা বন্ধুকে বলিলো এবং শেষে বলিলো—এ কথা আমি নিজেই মৃদুলাকে বলবো। মৃদুলা আমার ক্ষণিক দুর্ব্বলতা ক্ষমা করতে পারবে এমন মনের উদার প্রসার তার আছে।

বিলোপ বলিলো—আঃ বাঁচলাম ! আমার বড়ো ভয় হয়েছিলো যে মৃদুলা দেবীর চাক্ষুষ সাক্ষীর অভিযোগের সমাধান হয়তো কিছু হবে না। আমি আজ আগে ফিরে যাই, গিয়ে তাঁর মনের সংশয় আর রোষ দূর করি। আমি টেলিগ্রাম করলে তুমি যেয়ো।

মলয় মৃদুলার রোষের সংবাদে চিন্তিত ও বিলোপ তাহার মনের ক্ষোভ দূর করিতে পারিবে এই আশায় আশ্বস্ত হইয়া বলিলো—তা তুমি যা ভালো বোঝো তাই করবো।

বিলোপ বাসায় চলিয়া গেলো ও মলয় আপিস যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলো।

মলয় বিকালে আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহার ভৃত্য বলিলো—ও-বাড়ীর মেম-সাহেব আপনার জলখাবার করতে বারণ করেছিলেন, তাঁর বাড়ী থেকেই আপনার জলখাবার পাঠিয়ে দেবেন।

আবার আহুতির চায়ের নিমন্ত্রণ! মলয়ের ইচ্ছা হইলো তখনই সে বাড়ী হইতে পলায়ন করে। কিন্তু আপিস থেকে আসিয়া স্নান করিতে না পাইলে তাহার অত্যন্ত ক্লেশ হয় বলিয়া সে স্থির করিলো স্নানটা সত্বর সারিয়া লইয়াই সে সরিয়া পড়িবে।

মলয় স্নান করিয়া আসিয়াই দেখিলো প্রফুল্লবদনা আহুতি অপেক্ষা করিতেছে। সে আর পলায়নের পথ পাইলো না। সে অপ্রস্তুত ভাবে আহুতিকে বলিলো—আপনি আবার আমার জন্য কষ্ট করে'······

আহুতি হাসিয়া বলিলো—এতে আর কষ্ট কি ! মৃদুল এখানে নেই, আপনাকে যত্ন করা তো আমার কর্ত্তব্য। আমি খানসামাকে বলে' এসেছি, সে চা আনলো বলে'······

বলিতে বলিতেই খানসামা চা ও জলখাবার লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলো।

মলয় নীরবে আহারে মনোনিবেশ করিলো। আহার করিতে করিতে ক্ষণকাল পরে সে মাথা নত করিয়া মৃদু অনুতপ্ত স্বরে বলিলো—আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন.....

আহুতি অত্যন্ত স্বচ্ছ লঘু হাসি হাসিয়া বলিলো—কী হয়েছে যে ক্ষমা করতে হবে ? লেখক লোকেরা অমন একটু সেন্টিমেণ্ট্যাল হয়েই থাকে ! মৃদুলের কোনো চিঠি-টিঠি পেলেন ? সে কবে আসবে ?

মলয় সঙ্কুচিত দৃষ্টিতে একবার আহুতির মুখ দেখিয়া লইয়া বলিলো—আমি দু-এক দিনের মধ্যেই তাঁকে আনতে যাবো।

আহুতি বলিলো—উনি এখানে থাকলে আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে পুরী বেড়িয়ে আসতে পারতাম।

আহুতির এই কথায় মলয়ের মনের সঙ্কোচ অনেকখানি কমিয়া গেলো। সে তথাপি অপ্রতিভ ভাবে কেবলমাত্র ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে বলিলো—তা হলে তো বেশ হতো।

তাহার কণ্ঠস্বরে কোনো রকম উৎসাহ বা আগ্রহ প্রকাশ পাইলো না।

ইহা বুঝিতে পারিয়া আহুতি জিজ্ঞাসা করিলো—এখন আপনি কোথায় যাবেন ?

—একবার বিলোপের কাছে যেতে হবে।

—তিনি তো পুরী গিয়েছিলেন ?

—আজ ফিরে এসেছেন ; আজই আবার যাবেন।

আহুতি একটু আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলো—আজকে এসেই আবার আজকেই যাবেন যে ?

মলয় অপ্রস্তুত ভাবে বলিলো—একটু বিশেষ দরকার আছে।

আহুতি আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিলো—ও! তা হলে আর আপনাকে ধরে' রাখবো না। আমি তা হলে যাই······

আহুতি এই কথা বলিতেই তাহাকে বিদায় দিবার জন্য মলয় চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলো।

আহুতিও চেয়ার হইতে উঠিয়া আস্তে আস্তে প্রস্থান করিলো।

মলয় বিলোপকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য বিলোপের নিকট রওনা হইলো।

*　　*　　*　　*

পরদিন বিকালবেলা মলয় বিলোপের টেলিগ্রাম্ পাইলো—ষ্টর্‌ম্ ওভার, কোস্‌ট্ ক্লিয়ার, ষ্টার্‌ট্ টু-ডে'জ্ এক্‌স্‌প্রেস্।

মলয় উৎফুল্ল হৃদয়ে পুরী যাত্রার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলো।

*　　*　　*　　*

পরদিন প্রভাতে মলয় পুরীতে গিয়া পৌঁছিলো। তাহাকে অভ্যর্থনা করিতে ষ্টেসনে আসিয়াছিলো মৃদুলা ও বিলোপ।

মলয় ও মৃদুলার দৃষ্টি সম্মিলিত হইতেই তাহাদের উভয়েরই মুখ লজ্জায় ও বিচ্ছেদের পর মিলনের আনন্দে আরক্তিম হইয়া উঠিলো ও চক্ষুর দৃষ্টি প্রেমাবেশে মদির হইয়া উঠিলো। গাড়ী একেবারে থামিবার পূর্ব্বেই মলয় হাসিমুখে লাফ দিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলো। মৃদুলা ও বিলোপ চলন্ত গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে মলয়ের কামরার সম্মুখে উপস্থিত থাকিবার চেষ্টায় চলিতেছিলো ; মলয় তাহাদের কিঞ্চিৎ অগ্রে অবতরণ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুলার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিলো, মৃদুলার মুখেও মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিলো।

বিলোপ তাহাদের ভাবাবেশ দেখিয়া মলয়কে বলিলো—তোমরা দুজনে সমুদ্রের ধার দিয়ে এগোও, আমি তোমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে মুটে করে' নিয়ে যাচ্ছি······

মলয় ও মৃদুলা উভয়েই বিলোপের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আবার লজ্জা পাইয়া লাল হইয়া উঠিলো ; এ যেন তাহাদের নূতন প্রেম-পরিচয় ঘটিতেছে ! তাহাদের উভয়েরই মনে পড়িলো বিলোপ এমনই করিয়া এই পুরীতে তাহাদের প্রথম মিলন ঘটাইয়াছিলো এবং এখন আবার পুনর্মিলন ঘটাইতেছে। উহারা উভয়ে কৃতজ্ঞতাভরা স্নিগ্ধ লজ্জিত দৃষ্টিতে বিলোপের দিকে একবার তাকাইয়া নীরবে ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া চলিল।

তাহদের অপস্রিয়মান যুগলমূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বিলোপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হাসিলো এবং আপনাকেই অস্পষ্ট উচ্চারণ করিয়া বলিলো—আমি কেবল দুজনের মিলনের হাইফেন হয়েই রইলাম !

সমুদ্রবেলায় উপনীত হইয়া মৃদুলা মলয়ের পাশে পাশে চলিতে চলিতে লজ্জাকুণ্ঠিত মৃদুস্বরে বলিলো—আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো। আমি তোমার প্রেম আর চরিত্রকে

সন্দেহ করে' অন্যায় করেছি·····তোমাকে আমার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিলো·····

মলয় সুখাবেশে অভিভূত হইয়া বলিলো—তুমিও আমাকে ক্ষমা কোরো, আমি তোমার কাছে অবিশ্বাসী হতে গিয়েছিলাম·····

মৃদুলা বলিলো—থাক ওসব কথা·····বিলোপ বাবু আমাকে সব বলেছেন.....মানুষের জীবন ভুল ভ্রান্তিতে ভরা · ···আমি ভুল করে' আহুতির কাছে অপরাধী হয়ে আছি, ফিরে গিয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে·····

মলয় নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া আবেগভরে মৃদুলার হাত চাপিয়া বলিলো—তা হলে তুমি সব শুনেছো! আমাকে ক্ষমা করেছো! তোমার প্রেমমন্দাকিনীতে স্নান করে' অশুচিতা থেকে মুক্ত হলাম!

মৃদুলা প্রণয়রসে আপ্লুতা হইয়া আপনার হাত ঈষৎ আকর্ষণ করিয়া হাসিয়া বলিলো—আমার হাত ছেড়ে দাও লোকে দেখ্‌ছে!

মলয় এবার উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলো—দেখুক গে! আমার আরো যা ইচ্ছে কর্‌ছে তা ওদের দেখিয়ে দেবো নাকি?

মৃদুলা সুখভরা স্মিত মুখে সুন্দর ভ্রূকুটি করিয়া বলিলো আঃ কী বলো যে তার ঠিক নেই।

মলয়ের মুখ পরিপূর্ণ মিলনের সুখের হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলো। জোয়ারে উচ্ছ্বসিত সাগরের একটা উদ্বেল তরঙ্গ ফুলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া সূর্য্যকরোদ্ভাসিত বালির উপর ফেনহাস্যে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলো। সমাপ্ত

অসি ও মসি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

অসি এবং মসি, দুই জনাতে বসি,
কে বড় তাই নিয়ে করে ঝগড়া দিবা যামি'
কেউ যে কোন মতে, চায়না ছোট হতে,
অসি বলে আমিই বড়,—মসি বলে আমি।
বলছে অসি ডাকি, শক্তি এত রাখি,
একটী দিনে শ্মশান করে দেশটা দিতে পারি।
আমার গায়ের জোরে, পৃথিবীটাই ঘোরে,
সেইটা পরের নিইনা যেটা ইচ্ছা করে কাড়ি।
এমনি আবার খোঁচা, শক্ত বড়ই মোছা,
অনল ছুটাই গিরি টুটাই রক্তে নদী ভরি।
দেশটা আমি শাসি, শত্রুগণে নাশি,
ভোগ যে আমি করছি ধরা গায়ের জোরে ধরি।
মসি বলেন বাহা, বীরত্ব কি আহা,
শত্রু তুমি নাশার চেয়ে বৃদ্ধি অনেক কর।
কেই বা তোমায় পুছে, নামটী যেত মুছে,
ঘাতক ঘরের শোভা তোমায় আমিই করি বড়।
আমি দেশের প্রাণ, করি আলোক দান,
বুকের ব্যথা যশের গাথা অমর করে রাখি।
আমার হাতের রেখা, বিধির দারুণ লেখা,
আমি যে দিই আবার দাগা উল্কী দিয়ে আঁকি।
আমি নিয়ম গড়ি, রাখি শোভন করি,
নইলে তোমার ছিল কেবল হত্যাগারে বাসা।
আমি দেশের আশা, ভক্তি ভালবাসা,
কার্য্য তোমার সাম্য এবং ভ্রাতৃভাবে নাশা।
ঝগড়া গুণে আসি, বলেন বিধি হাসি,
অসির চেয়ে সবাই জানে বড় বটেন কালী,
অসি কেবল ভয়, মসি বর অভয়,
অসি তোমার উচিত চলা মসির আদেশ পালি'।

প্রকৃতি-পরিচয়

অধ্যাপক শ্রীঅশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্য্য এম-এ

প্রকৃতি=প্র—কৃ+ক্তি। প্র=আরম্ভ বা আদি, এবং প্রকৃষ্ট; কৃতি=করণ বা কার্য্য বা সৃষ্টি অথবা কারণ; অর্থাৎ যাহা হইতে এই দৃশ্য জগতের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে তাহাই প্রকৃতি। এবং যাহা প্রকৃষ্টরূপে কৃত বা সঞ্জাত বা সমস্ত চরাচররূপে ব্যক্ত তাহাও প্রকৃতি। সুতরাং প্রকৃতি কার্য্য-কারণ-রূপা। কার্য্যরূপে সে ব্যক্ত এবং সর্ব্বসাধারণের অনুভবযোগ্য। আর কারণরূপে সে অব্যক্ত এবং বাক্য-মনের অগোচর, অথচ যোগিধেয় এবং স্বানুভবগম্য। এজন্য নারায়ণ বলিয়াছেন—

"প্রকৃতের্লক্ষণং বৎস কো বা বক্তুং ক্ষমো ভবেৎ।"

—হে বৎস, প্রকৃতির লক্ষণ বলিতে কেই বা সমর্থ? এই কারণরূপা প্রকৃতিকে মূলকারণ, স্বভাব, আত্মা, প্রধান, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয় প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। এই প্রকৃতি হইতে ক্রমে বিবিধ কৃতি (কার্য্য বা সৃষ্টি) সম্পন্ন হওয়ায় ঐ প্রকৃতি বিকৃতি (বি=বিবিধ+কৃতি=কার্য্য) আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দৃশ্য জগতের যাহা আদিকারণ তাহাকে আদ্যাশক্তি বলে। তাহাই প্রকৃতির পরম রূপ। ইহা বাহ্য বা অন্তরেন্দ্রিয়ের স্পষ্ট অনুভবযোগ্য নহে। তবে ইহার আভাস আমরা নিম্নোক্তরূপে লাভ করিতে পারি। আমি যখন দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, তখন বলি 'আমার হাঁটিবার বা কথা বলিবার শক্তি নাই।' আমি যখন বধির হই, তখন বলি 'শোনবার শক্তি নাই।' এইরূপ 'নড়বার শক্তি নাই, বোঝবার শক্তি নাই, ধর্‌বার শক্তি নাই' প্রভৃতি কথা প্রকাশ করি। অথচ ঐ শক্তি যে কি জিনিষ তাহার কোনই ধারণা হয় না। কাযেই উহা অব্যক্ত ও অনির্ব্বচনীয়! অবশ্য ইহার পূর্ব্বেও প্রকৃতির দুই অবস্থা আছে। এক সিসৃক্ষা বা সৃজন করিবার ইচ্ছা; দ্বিতীয় ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা। শ্রুতিতে আছে সোঽকাময়ত একোঽহং বহু স্যাম্"—সেই অপ্রত্যক্ষ অব্যক্ত পুরুষ কামনা করিলেন 'আমি এক আছি, বহু হইব।' এই ইচ্ছার উদ্রেকের পর প্রকৃতি নাম্নী শক্তির বিকাশ হয়। আমরাও দেখিতে পাই, কোন কাজ করিতে প্রথম ইচ্ছা জন্মে, তৎপর শক্তির জাগরণ ও প্রেরণা হয়। যাহা হউক, এই ইচ্ছাশক্তি কিঞ্চিৎ ঘনাকার ধারণ করিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তখন ত্রিগুণের ধর্ম্ম—সুখ প্রকাশ, কর্ম্ম, দুঃখ ও

মোহ এই ভাব সকলের সমন্বয়ে অর্থাৎ অপৃথক্‌রূপে প্রকৃতি এক অব্যক্তভাবে পরিণত হয়েন। তৎপর প্রকৃতি ত্রিগুণের বৈষম্যাবস্থায় পরিণত হয়েন। ইহা পূর্ব্বোক্ত পরম রূপ। ইহাকে মহান্ বলে। প্রকৃতির এই স্বরূপে, 'আনন্দানুভব করিতে হইবে' ও 'জানিতে হইবে', 'কর্ম্ম করিতে হইবে' এবং 'জানিতে না হইবে' ও 'দুঃখ অনুভব করিতে হইবে' এই তিন আকারে ক্রমান্বয়ে সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ গুণ পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ পায়। তদনন্তর প্রকৃতি 'অহং'ভাবে পরিণত হয়েন। তখনই তিনি কার্য্যোন্মুখী হয়েন। সিসৃক্ষা, ত্রিগুণসাম্যাবস্থা ও ত্রিগুণবৈষম্যাবস্থা এই তিন রূপে প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় ও অস্পষ্টভাবে থাকেন। 'অহং' ভাব ধারণ করিয়াই তিনি কার্য্যে উদ্যোগী হয়েন। আমরা ইহার স্পষ্টই অনুভব করিতে পারি। 'অহং'ভাব অর্থাৎ 'আমি করিব', 'আমি জানিব', ইত্যাদি যে কোন কার্য্যের পূর্ব্বে আমিত্ব ভাবের উদয় না হইলে চেষ্টা আরম্ভ হয় না। যে 'আমি করিব' এই ভাব গ্রহণ না করে, সে সাক্ষিরূপে নিষ্ক্রিয় থাকে। এই 'অহং' ভাবকে জীবমাত্রেই শ্বাসপ্রশ্বাসের ধ্বনিতে সূক্ষ্মরূপে অনুভব করিয়া থাকে। যাহা হউক, ত্রিগুণের বৈষম্যাবস্থায় সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, মোহ প্রভৃতি ক্রিয়ার কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তা ছিল না। তৎপর প্রকৃতি অহংকারে পরিণত হইয়া উক্ত ক্রিয়া সমূহের 'অহং' এই কর্ত্তা হইলেন। তদনন্তর বিচার হইল কিরূপে ঐ ক্রিয়াসমূহ সাধিত হইবে। তখন প্রকৃতি পঞ্চতন্মাত্রায় পরিণত হইলেন। এ পর্য্যন্ত প্রকৃতি ভাব বা গুণ মাত্র রূপে অবস্থিত ছিলেন, এখন তিনি দ্রব্যরূপে বিকাশ পাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ অবকাশ দিবার জন্য এবং ভাবী সৃষ্ট বস্তুসমূহের ধারণ করিবার জন্য প্রকৃতি আধাররূপে আকাশস্বরূপ (space) হইলেন। তৎপর পরস্পর ভাব-বিনিময়ের জন্য আকাশ শব্দময় হইল। তদনন্তর চলন চালন প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া সাধনের জন্য আকাশ বায়ুরূপে পরিণত হইল। ভাবী সমস্ত বস্তু প্রকাশের জন্য বায়ু তেজোরূপে প্রকটিত হইল। আবার অপ্রকাশ ও আবরণের জন্য তেজঃ জল ও ক্ষিতির আকার ধারণ করিল। প্রকৃতির আকাশাদি পঞ্চস্তরে পরিণতি অতীব সূক্ষ্ম হইতে অতীব স্থূল পর্য্যন্ত ক্রমসাধিত। ইহার প্রথম স্তরকে পঞ্চতন্মাত্র বলে। ইহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। (তন্মাত্র =লক্ষণ। তৎমীয়তে জ্ঞায়তে অনেন ইতি। যেমন, শব্দতন্মাত্র=শব্দ লক্ষণ অর্থাৎ শব্দ দ্বারাই যাহার স্বরূপ জানা যায়।) ইহারা এত সূক্ষ্ম যে ইহাদিগকে গুণস্বরূপ বলা যায়। প্রকৃতির এই পঞ্চ রূপ সাধারণের অবোধ্য। অব্যক্ত নাদ, অব্যক্ত স্পর্শ, অব্যক্ত রূপ, অব্যক্ত রস, অব্যক্ত গন্ধ, অব্যক্ত আনন্দ ও প্রকাশ, অব্যক্ত প্রাণক্রিয়া এবং অব্যক্ত দুঃখ ও মোহরূপে ইহারা বিশিষ্টমনাঃ ব্যক্তি ও সিদ্ধ যোগীর দ্বারা অনুভূত হয়। পূর্ব্বোক্ত অহংভাব ও এই পঞ্চতন্মাত্র রূপকে প্রকৃতির সূক্ষ্মতম রূপ বলা যায়। এই পঞ্চতন্মাত্র তদনন্তর পরস্পর সংমিশ্রিত হইয়া কিঞ্চিৎ ঘনাকারে পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতে পরিণত হয়। ইহাই সমস্ত দৃশ্য বস্তুর মুখ্য উপাদান। এই পঞ্চমহাভূত প্রকৃতির সূক্ষ্ম রূপ। সিদ্ধি দ্বারা উপনীত যোগী অন্তরে নানাবিধ নাদ, জ্যোতিঃ প্রভৃতি রূপে ইহাদের অনুভব করে, এবং সূক্ষ্মদর্শী বৈজ্ঞানিক দৃশ্য বস্তুর সূক্ষ্মতম বিশ্লেষণ দ্বারা ইহাদের স্বীয় স্বীয় অণুতে উপস্থিত হইয়া ইহাদের মর্ম্ম অবগত হয়। তৎপর সর্ব্বসাধারণের পরিদৃশ্যমান পঞ্চভূত ও তদ্‌বিকার যাবতীয় দৃশ্য বস্তু অর্থাৎ প্রপঞ্চ (প্র+পঞ্চ। প্র=প্রকৃষ্ট= স্থূল ; পঞ্চ=পঞ্চভূত) প্রকৃতির স্থূলরূপ।

অতএব দেখা যাইতেছে, সিসৃক্ষা, ত্রিগুণসাম্যাবস্থা, ত্রিগুণবৈষম্যাবস্থা, অহংভাব, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত ও প্রপঞ্চ এই কয়েকটী প্রকৃতির স্বরূপ। তন্মধ্যে সিসৃক্ষা হইতে অহংভাব পর্য্যন্ত অবস্থা চতুষ্টয়ে প্রকৃতি ভাবাত্মিকা বা গুণস্বরূপা। এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত প্রকৃতি দ্রব্যাত্মিকা।

আমরা আরও জানি, জীবের স্বভাবকে প্রকৃতি বলে। যার যেরূপ প্রকৃতি তার কার্য্যাবলীও তদনুরূপ হয়। জীবের এই স্বভাব প্রকৃতির সূক্ষ্ম রূপের দ্বারা সংঘটিত। জীবের সেই প্রকৃতিই সূক্ষ্ম রূপে তাহার স্থূল শরীরকে চালায়। এইরূপ এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের ঘটনাবলীও এক সূক্ষ্ম শক্তি দ্বারা নিয়মিত হইতেছে বুঝিতে পারা যায়।

সুতরাং যে অব্যক্ত শক্তি এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ উৎপন্ন করে এবং তৎস্বরূপ হয় তাহাকেই প্রকৃতি বলে।

প্রকৃতি ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, সিসৃক্ষা হইতে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত প্রকৃতির

যে ক্রমিক বিকার সম্পন্ন হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের প্রত্যেক অংশ অবিকৃত ও কতক অংশ বিকৃত হইয়াছে। প্রত্যেকে সর্ব্বাংশেই বিকৃত হয় নাই। কারণ অবিকৃত অংশেরও পৃথক্ অনুভব হইয়া থাকে।

যাহা হউক, আমরা এখন প্রকৃতিকে দ্রব্যময়ত্ব ও গুণময়ত্ব (Concrete and abstract) রূপে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া ইহার সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে চেষ্টা করিব। বস্তুতঃ কোন বস্তুর সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই দুইটী বিষয়ের সম্যক্ অবগতি হওয়া প্রয়োজন। যেমন, একটী উজ্জ্বল আলো দেখিলাম। প্রথমতঃ উহার উজ্জ্বলতা গুণ দেখিয়া উহার প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। তৎপরে বিশেষ অনুসন্ধানে জানিলাম 'গ্যাস্' এই দ্রব্যে উহা প্রদীপ্ত। আবার, দূর হইতে দেখিলাম ক্যারার মত কি একটা প্রকাণ্ড জিনিষ দাঁড়াইয়া আছে। নিকটে যাইয়া শুনিলাম উহাকে ট্রেণ বলে। যখন উহা চলিতে লাগিল, তখন বুঝিলাম, উহার বহু লোক বহন করিবার ও দ্রুত চলিবার গুণ আছে। এইরূপ কখন গুণ দেখিয়া দ্রব্য বুঝি, কখন বা দ্রব্য দেখিয়া গুণ বুঝি। এই দুইটীই বস্তুর তত্ত্বোপলব্ধির হেতু, অর্থাৎ কোন বস্তুর তত্ত্ব জানিতে হইলে তাহার গুণ ও উপাদান জানা আবশ্যক।

দ্রব্যময়ী প্রকৃতি

কোন অনুসন্ধিৎসু পুরুষ প্রথমে দেখিতে পায়, উপরে ও চতুর্দ্দিকে এক বিশাল অবকাশ বর্ত্তমান, এবং এই অবকাশের মধ্য দিয়া একের শব্দ অন্যের শ্রুতিগোচর হয়। ইহা দ্বারা ক্রমে তাহার আকাশের ধারণা হয়। তৎপরে দেখিতে পায়, আকাশে মেঘসমূহ সঞ্চালিত হইতেছে, গাছের পাতা সকল নড়িতেছে, ধূলিকণা সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, সুখস্পর্শ অদৃশ্য এক চঞ্চল বস্তু তাহার গাত্র স্পর্শ করিয়া সন্তপ্ত শরীরকে শীতল করিতেছে। এই সকলের দ্বারা ক্রমে তাহার বায়ুর জ্ঞান জন্মে। তদনন্তর রাত্রির অবসানে দেখিতে পায়, পূর্ব্বাকাশে এক বিশাল জ্যোতিষ্ক পদার্থ উদিত হইয়া ক্রমে সমস্ত অন্ধকার দূরীভূত করতঃ সকল প্রকাশ করিতেছে এবং তাহার উষ্ণতা দ্বারা সকলকে সন্তপ্ত করিতেছে। রাত্রে পাষাণের বা দীপ শলাকার ঘর্ষণে এক উজ্জ্বল উষ্ণ পদার্থ উৎপাদন করিয়া সে তাহার শৈত্য নিবারণ এবং নিকটবর্ত্তী বস্তু প্রকাশ করিতে পারে; হাতে হাতে ঘর্ষণ করিলে হাত গরম হয়; এইরূপে ক্রমে তাহার অগ্নি বা তেজের বোধ জন্মে। তৎপর নদী, খাল, সমুদ্র প্রভৃতিতে এক দ্রব পদার্থ দেখিতে পায়, উহাতে স্নান করিয়া বা উহাকে পান করিয়া সে শীতল হয়। আকাশ হইতে এক তরল পদার্থের ধারা পতিত হইয়া সকলকে সিক্ত ও শীতল করে; বৃক্ষাদির পত্র প্রভৃতি পেষণ করিলে এক দ্রব পদার্থ নির্গত হয়; এইরূপে ক্রমশঃ তাহার জলের ধারণা হয়। তদনন্তর সে দেখে যে, পাষাণ, মৃত্তিকা, বৃক্ষ প্রভৃতি অনেক-বিধ কঠিন পদার্থ চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান রহিয়াছে, কোনটী গন্ধ দিতেছে, কোনটী অন্য কোনটীকে ধারণ করিতেছে, কোনটী বা ভারী বোধ হইতেছে; এই ভাবে ক্রমে ক্রমে তাহার ক্ষিতি জ্ঞান জন্মে। এবম্বিধ ক্রমিক অনুসন্ধানের ফলে তাহার একটা মোটামুটি এই ধারণা হয় যে, যাহা কিছু দেখিতেছি বা অনুভব করিতেছি, তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু অবকাশ ও শব্দবত্তা, শীতোষ্ণাদি স্পর্শ ও চঞ্চলতা, উষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা, শৈত্য ও দ্রবতা এবং কাঠিন্য ও গন্ধবত্তা বিদ্যমান; অর্থাৎ সকলই পাঁচ প্রকার পদার্থে নির্ম্মিত।

তৎপরে যখন দেখে যে, অধিকাংশ গ্রাম্য বা বন্য এবং ফলপ্রসূ পুষ্পেরই পাঁচ পাপড়ী, মনুষ্যাদি কোন কোন জীবের হাতে বা পায়ে পঞ্চ অঙ্গুলি এবং তাহাদের দুই হাত, দুই পা ও মুখ্য দেহ-ভাগ এই পাঁচ অংশে দেহ নির্ম্মিত, চক্ষু, কর্ণ, প্রভৃতি পাঁচটী ইন্দ্রিয় সমস্ত পদার্থের জ্ঞান-সাধক, এবং দেহেও পূর্ব্বোক্ত কাঠিন্য, শৈত্য, উষ্ণাদি বিদ্যমান, তখন তাহার আরও কৌতূহল জন্মে, 'তবে কি ইহারা পূর্ব্বাবধারিত পঞ্চ পদার্থেরই পরিচয় প্রদান করিতেছে?'

ইহার পর সে যখন নিজের ধারণা স্থির ও দৃঢ় করিবার জন্য আপ্ত-বাক্যের অনুসন্ধানার্থ প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তখন দেখিতে পায়, "পাঙ্‌ক্তমিদং সর্ব্বম্।"—সমস্তই পাঁচে তৈয়ারী। "পঞ্চভূতাত্মকং সর্ব্বম্"—সমস্তই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত। এ জন্যই দৃশ্য জগৎকে প্রপঞ্চ (প্র+পঞ্চ) বলে। এই পঞ্চভূতের নাম হইল ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্‌-ব্যোম।

তদনন্তর সে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, এই ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের লক্ষণ কি? যাহারা এই দৃশ্য জগতের মূল

উপাদান, তাহাদের সংজ্ঞা ও লক্ষণ জানিয়া তৎপর বিশেষ বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানে অগ্রসর হইতে হইবে। পূর্ব্বে মুনি-ঋষিরা নিজ নিজ দেহ-যন্ত্রটী যোগ সাহায্যে সুগঠিত ও পরিস্কৃত করিয়া বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতেন। কখনও বা স্থূলদর্শীকে বুঝাইতে বাহ্যযন্ত্রেরও আবিষ্কার করিতেন। কিন্তু ইহাতে সংশয়াক্লিষ্ট দ্রষ্টা সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারিতেন না। উদ্ভিদাদি স্থাবর জীবের প্রাণ ও অন্তঃসংজ্ঞা আছে, ইহা বহু প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে। এ যাবৎ যাহাদের চিত্ত ও দেহ নির্ম্মল ছিল, কেবল তাহারাই ইহার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিত। কিন্তু সার্ জগদীশ অধুনা ক্রেস্‌কোগ্রাফ্ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া এই তত্ত্ব সাধারণকে বুঝাইতেছেন সত্য, তথাপি দুই একজনে দেখিয়াও দেখিতেছে না। এইরূপ যদি কেহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া উক্ত পঞ্চভূতের বিশ্লেষণে যত্নপর হয়, তবে অনায়াসেই ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত যে সমস্ত বস্তুর মূল উপাদান তাহা বোধগম্য হইবে। যন্ত্রের অভাবে শাস্ত্রবচনের লক্ষণ ও সংজ্ঞা মাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা স্থূলাংশ বিচারে মাত্র প্রবৃত্ত হইতে পারি। অতএব শাস্ত্র যাহাদিগকে পঞ্চভূত আখ্যায় অভিহিত করিয়াছে, তাহাদের সংজ্ঞা ও লক্ষণ লইয়া আমরা দেখিব যে, এই পঞ্চভূতই মূল উপাদান। এতদ্‌ভিন্ন অন্য কিছু উপাদান হইতে পারে না।

পঞ্চভূতের সংজ্ঞা ও লক্ষণ

গর্ভ-পৈঙ্গলাদি উপনিষদে, মহাভারতে ও ভাগবতাদি অনেক পুরাণে পঞ্চভূতের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং স্বকীয় গবেষণায় যে সমস্ত উপলব্ধি হইয়াছে, তদবলম্বনে পঞ্চভূতের লক্ষণ নির্দ্ধারিত হইল।

১। শব্দতন্মাত্র=আকাশ; গুণ—অবকাশ ও শব্দবত্তা (=শব্দোৎপাদন-ক্ষমতা)।

২। স্পর্শতন্মাত্র=বায়ু; গুণ—চঞ্চলত্ব ও স্পর্শবত্তা (=স্পর্শজ্ঞান জন্মানর ক্ষমতা)।

৩। রূপতন্মাত্র=তেজঃ; গুণ—উষ্ণতা ও রূপবত্তা (=আকার-প্রদান-ক্ষমতা)।

৪। রসতন্মাত্র=জল; গুণ—শৈত্য ও দ্রবতা (=তরলতা ও রসোৎপাদন-ক্ষমতা)।

৫। গন্ধতন্মাত্র=ক্ষিতি; গুণ—কাঠিন্য ও গন্ধবত্তা (=গন্ধোৎপাদন-ক্ষমতা)।

এই পঞ্চতন্মাত্র প্রথমতঃ পরস্পর অবিমিশ্রিত ছিল। তৎপর পঞ্চীকৃত বা পরস্পর মিশ্রিত হইল। এই মিশ্রণে যে ভূতের ভাগ যাহাতে অধিক, তাহার গুণই ইহাতে প্রবল হইল। তথাপি অন্যের গুণসমূহ অল্প পরিমাণে রহিল। ইহার অণুসমূহকেই স্থিরচিত্ত যোগীরা অনুভব করিয়া থাকেন এবং ইহাদের দ্বারাই স্থূল দৃশ্য-প্রপঞ্চের সৃষ্টি। অতএব তখন এই পঞ্চীকৃত মহাভূতের বিষয়ই আলোচ্য। এই পঞ্চীকৃত মহাভূতকেই মূল উপাদান বলে।

প্রথমতঃ যত পরিমাণ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি পঞ্চতন্মাত্রায় সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককে অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক করা হইল। প্রত্যেকের অর্দ্ধাংশ পৃথক্ রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশকে সমান চারি ভাগে ভাগ করা হইল। সুতরাং এই চারি ভাগের এক এক ভাগ প্রত্যেক ভূতের অষ্টমাংশ হইল। এখন প্রত্যেকের অর্দ্ধাংশের সহিত অপরাপর চারি ভূত হইতে প্রত্যেকের অষ্টমাংশ গ্রহণ করিয়া মিশ্রিত করা হইল। ইহাতেই পঞ্চতন্মাত্রের পঞ্চীকৃত অবস্থা হইল। যথা—

[নিম্নোক্ত সাংকেতিক চিহ্ন—প.=পঞ্চীকৃত। ত.=তন্মাত্র।]

১। প. আকাশ=ত. আকাশ ½+ত. বায়ু ⅛+ত. তেজ ⅛+ত. জল ⅛+ত. ক্ষিতি ⅛=১প. আকাশ।

অতএব দেখা যাইতেছে, এই মিশ্রণে আকাশের ভাগ অধিক থাকায় সমষ্টি পঞ্চীকৃত আকাশে শব্দ এবং অবকাশ এই দুই গুণই প্রধান। বায়ু, তেজ, জল এবং ক্ষিতির গুণও অল্প পরিমাণে ইহাতে আছে।

২। প. বায়ু=ত. বায়ু ½+ত. আকাশ ⅛+ত. তেজ ⅛+ত. জল ⅛+ত. ক্ষিতি ⅛=১প. বায়ু।

এই মিশ্রণে বায়ুর ভাগ অধিক থাকায় সমষ্টি পঞ্চীকৃত বায়ুতে চঞ্চলত্ব ও স্পর্শগুণ প্রধান, আকাশাদি অন্য চারিভূতেরও স্ব স্ব গুণ অল্প অল্প বিদ্যমান।

৩। প. তেজঃ=ত. তেজ ½+ত. আকাশ ⅛+ত. বায়ু ⅛+ত. জল ⅛+ত. ক্ষিতি ⅛=১ প. তেজঃ।

এই মিশ্রণে তেজের ভাগ অধিক থাকায়, সমষ্টি পঞ্চীকৃত তেজে উষ্ণতা ও রূপগুণ অধিক। তথাপি অন্য চারি ভূতের গুণও অল্প পরিমাণে বর্ত্তমান।

৪। প. জল=ত. জল ½+ত. আকাশ ⅛+ত. বায়ু ⅛+ত. তেজ ⅛+ত. ক্ষিতি ⅛=১ প. জল।

এই মিশ্রণে জলের ভাগ অধিক থাকায় সমষ্টি পঞ্চীকৃত জলে শৈত্য, তরলতা ও রসগুণ অধিক। বাকী চারি ভূতের গুণ অল্প।

৫। প. ক্ষিতি=ত. ক্ষিতি ½+ত. আকাশ ⅛+ত. বায়ু ⅛+ত. তেজ ⅛+ত. জল ⅛=১ প. ক্ষিতি।

এই মিশ্রণে ক্ষিতির ভাগ অধিক থাকায় সমষ্টি পঞ্চীকৃত ক্ষিতিতে কাঠিন্য ও গন্ধগুণ অধিক। অন্যান্য ভূতের গুণ অল্প।

পঞ্চীকৃত আকাশাদিতে তন্মাত্র আকাশাদির গুণের প্রাবল্য থাকায় মিশ্রিত আকাশাদিতে আকাশাদির নামই গ্রহণ করা হইয়াছে। এই মিশ্রণের দ্বারা আমরা ক্ষিত্যাদির অণুর তত্ত্ব অবগত হইতে পারিব। দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন্ মিশ্রিত করিয়া জলোৎপাদন করিলে আমরা যেমন সিদ্ধান্ত করি জলের প্রত্যেক অণুতে (molecule) দুইটী হাইড্রোজেন্ পরমাণু (atom) এবং একটী অক্সিজেন্ পরমাণু (atom) আছে, অতএব জল H_2O, সেইরূপ ক্ষিত্যাদির অণু সম্বন্ধেও বিবেচ্য।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

১ প. ক্ষিতি=½ ত. ক্ষিতি+½ ত. জল+½ ত. তেজ+½ ত. বায়ু+½ ত. আকাশ।

=⅛ ত. ক্ষি+⅛ ত. জ+⅛ ত. তে+⅛ ত. বা+⅛ ত, আ।

অর্থাৎ প্রত্যেক তন্মাত্র ক্ষিতিকে ৮ ভাগ করিয়া তার ৪ ভাগের সহিত অন্য চারি ভূতের প্রত্যেকের এক এক ভাগ লইয়া সমষ্টি পঞ্চীকৃত ক্ষিতি উৎপন্ন হইল। ইহা দ্বারা বুঝা গেল, একটী পঞ্চীকৃত ক্ষিতির অণুতে ৮টী পরমাণু আছে। তন্মধ্যে ৪টী ক্ষিতির, ১টী জলের, ১টী তেজের, ১টী বায়ুর ও ১টী আকাশের। অর্থাৎ

১ পঞ্চীকৃত ক্ষিত্যণু= ৪ ত. ক্ষিতি পরমাণু
+ ১ ত. জল „
+ ১ ত. তেজ „
+ ১ ত. বায়ু „
+ ১ ত. আকাশ „

অপরাপর ভূতের অণু সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই যে পঞ্চীকৃত ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশের অণু রচিত হইল, ইহারা যাবৎ সৃষ্টি থাকিবে তাবৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না। প্রকৃতিতে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন দেখা যায় তাহা কেবল স্থূলাংশে। সূক্ষ্ম অণুসমূহ অবিকৃত থাকে। এবং এই অণুসমূহই যখন সৃষ্টির মূল উপাদান, তখন এই অণুসমূহকে পরমাণু বলা যাইতে পারে। অতএব পরমাণু বলিতে এখন পঞ্চীকৃত ভূতের অবিধ্বংসী সূক্ষ্মতম অংশকেই বুঝিতে হইবে। এখন পঞ্চীকৃত ক্ষিতি পরমাণুর ধারণা কিরূপে লাভ করিতে পারি দেখা যাউক।

গবাক্ষের ছিদ্র পথে সূর্য্যরশ্মি পাত হইলে অসংখ্য রেণুকে দশদিকেই গমনাগমন করিতে দেখা যায়। তন্মধ্যে যেগুলি কেবল ঊর্দ্ধদিকেই ধাবিত হয়, কিন্তু ভূমির দিকে আসে না, তাহাদিগকে ত্রসরেণু বলে। বৈদ্যক পরিভাষা মতে ১ ত্রসরেণু=৩০ পরমাণু। অতএব এক ত্রসরেণুর ত্রিশভাগের একভাগ লইলে ক্ষিতি পরমাণুর ধারণা হয়।

এখন দেখিতে হইবে হিন্দু শাস্ত্রে পঞ্চভূতকে যে মূল পদার্থ বলা হইয়াছে, তাহাদের সংজ্ঞা ও লক্ষণ কি।

১। যাহা অবকাশ প্রদান করে এবং যাহা দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আকাশ বা ব্যোম কহে। সুতরাং উপরিভাগে যে বিশাল আকাশ দেখা যায়, তাহাই কেবল পদার্থ আকাশ নহে। ইহার অণুর বর্ণ ধূম্রাভ।

২। যাহা স্বয়ং চঞ্চল ও যাহা অন্যের চঞ্চলতা উৎপাদন করে, এবং যাহা দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান জন্মে তাহাকে বায়ু বা মরুৎ কহে। সুতরাং অক্সিজেন্ হাইড্রোজেন্ প্রভৃতি গ্যাস্-সমূহও বায়ু সংজ্ঞার অন্তর্গত। ইহার অণুর বর্ণ নীল।

৩। যাহা স্বয়ং উষ্ণ ও যাহা অন্যের উষ্ণতা উৎপাদন করে, এবং যাহা দ্বারা রূপ জ্ঞান জন্মে তাহাকে তেজঃ বা অগ্নি বলে। সুতরাং দীপের বা কাষ্ঠ প্রভৃতির অগ্নিকেই কেবল মৌলিক অগ্নি বলে না। ইহার অণুর বর্ণ লোহিত।

৪। যাহা স্বয়ং শীতল ও দ্রব এবং যাহা অন্যের শৈত্য ও দ্রবতা উৎপাদন করে, এবং যাহা দ্বারা রসজ্ঞান জন্মে তাহাকে জল বা অপ্ বলে। সুতরাং তৈল, বৃক্ষনির্য্যাস প্রভৃতি জল সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। ইহার অণুর বর্ণ শ্বেত।

৫। যাহা স্বয়ং কঠিন ও ভারী এবং যাহা অন্যের কাঠিন্য ও গুরুত্ব সম্পাদন করে, এবং যাহা দ্বারা গন্ধজ্ঞান

জন্মে তাহাকে পৃথিবী বা ক্ষিতি বলে। সুতরাং পাষাণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি ক্ষিতি সংজ্ঞার অন্তর্গত। ইহার অণুর বর্ণ পীত।

পূর্ব্বোক্ত অণুর বর্ণসমূহ যোগীরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চীকৃত দশায়ও ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত সূক্ষ্মাকারে বিরাজমান থাকে। তাহারা যখন দৃশ্য-প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে, তখন তাহারা অসংখ্য অসংখ্য ভাগে পরস্পর বিমিশ্রিত হইয়া কঠিন, তরল, বায়বীয় প্রভৃতি অসংখ্য স্থূল পদার্থের সৃজন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক পদার্থেই পঞ্চভূতের বিদ্যমানতার নিদর্শন পাওয়া যায়। আমরা এখন তাহারই অনুসন্ধান করিব।

১। ক্ষিতি পরীক্ষার্থ একখানা চন্দন কাষ্ঠ গ্রহণ করা যাউক। (১) একটী পেরেক লইয়া ইহাতে বিদ্ধ করা হইল। পেরেক বিদ্ধ হইবার কালে বিপ্রকৃষ্ট অণুগুলি পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইয়া পেরেককে ভিতরে স্থান দিল। অতএব দেখা যাইতেছে, কাষ্ঠের অণুগুলির মধ্যে অবকাশ ছিল। কাষ্ঠকে আঘাত করিলে একরূপ শব্দ হয়। এই শব্দ যখন তাম্রকাংস্যাদি বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন রকম, তখন অবশ্যই ইহাদের মধ্যে আকাশ থাকিয়া স্বস্ব অণুর যোগে বিভিন্ন শব্দ উৎপাদন করে। সিদ্ধযোগীর কর্ণে বিনা আঘাতে কাষ্ঠান্তর্গত আকাশের শব্দ গোচর হয়। এরূপ কোন সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে ত কথাই নাই। কাষ্ঠের এক অংশে শব্দ উৎপন্ন হইলে অন্য অংশে শুনা যায়। ইহাতেও অবকাশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। যাহা হউক, উক্ত প্রকারে অবকাশ ও শব্দ গুণ থাকায় কাষ্ঠে আকাশের অস্তিত্ব নিরূপিত হইল।

(২) কাষ্ঠখণ্ডের অণুসমূহের চতুর্দ্দিক্ বায়্বণু দ্বারা পরিবেষ্টিত বলিয়া কাষ্ঠখণ্ড কঠিন কি নরম, শীতল কি উষ্ণ, এই স্পর্শজ্ঞান আমরা লাভ করি, যোগী-দৃষ্টিতে বা অত্যন্ত শক্তিমান্ যদি কোন অণবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করা যায় তবে জানা যায় যে, ঐ বায়্বণুগুলি নীলবর্ণ এবং নিজেরাও যেমন চঞ্চল সেইরূপ কাষ্ঠের স্পৃষ্ট অণুগুলিকেও চঞ্চল করিতেছে।

(৩) কাষ্ঠখণ্ড যতই কেন শীতল হউক না, উহাতে কিছু না কিছু উষ্ণতা অনুভূত হইবেই। উত্তাপের পরিমাণ যখন অত্যন্ত অল্প হয় তখন প্রভূত শক্তিশালী তাপমান্ যন্ত্রের সাহায্যে বা যোগীর অনুভবে ঐ অল্প তাপ অনুভূত হইতে পারে। পরন্তু এই তেজঃকণা কাষ্ঠে বিদ্যমান আছে বলিয়াই উহা লোহিত, পীত, বা পিঙ্গলবর্ণ রূপে দৃষ্ট হয়। তেজের পরিমাণের তারতম্যই বর্ণভেদের কারণ।

(৪) কাষ্ঠ যতই শুষ্ক হউক না কেন, উহাতে কিছু না কিছু শীতলতা থাকিবেই। কাষ্ঠ যখন দগ্ধ হয়, তখন অত্যন্ত শুষ্ক কাষ্ঠ হইতেও অন্ততঃ কিছু না কিছু বাষ্প বিনির্গত হয়। ইহাতে কাষ্ঠে জলের বিদ্যমানতা প্রকাশ করে। অধিকন্তু কাষ্ঠের তিক্ত মিষ্ট প্রভৃতি আস্বাদও জলকণা থাকার পরিচায়ক।

(৫) কাষ্ঠের মধ্যে ক্ষিতির অংশ থাকায় উহা কঠিন বোধ হয়। সকলেই চন্দনের ঘ্রাণ পায় এই জন্য চন্দন কাষ্ঠ পরীক্ষার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্যান্য কাষ্ঠে বা কঠিন বস্তুতে একটা না একটা গন্ধ পাওয়া যায়; তবে কোন কোনটীতে উহা এত সূক্ষ্ম ও অনির্দ্দিষ্ট যে সাধারণের পক্ষে উহা ধরা অসম্ভব। যোগীর ঘ্রাণে বা কোন গন্ধমাপক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে উহার অনুভব হইতে পারে। যাহা হউক, কঠিনতা ও গন্ধবত্তা থাকার জন্য কাষ্ঠ ক্ষিতি সংজ্ঞায় অভিহিত।

ক্ষিতি সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই কাষ্ঠখণ্ডকে ক্ষিতির আদর্শ স্বরূপ ধরা হইয়াছে। ক্ষিতি বলিতে কেবল মাটিকেই বুঝায় না। ইষ্টক, কাষ্ঠ, কাচ, অস্থি, পাষাণ, বৃক্ষ, লতা, মৃত্তিকা প্রভৃতি কঠিন বস্তু মাত্রকেই পার্থিব পদার্থ বলা হইয়া থাকে। কারণ, ইহাঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই কঠিনতা এবং গন্ধবত্তা প্রবল; যেহেতু মিশ্রিত পঞ্চভূতের মধ্যে পার্থিবাংশ ইহাতে বেশী। তবে যাহাকে মৌলিক পার্থিব পদার্থ বা ক্ষিতি বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা ক্ষুদ্রতম পার্থিব পরমাণুই লক্ষিত হইতেছে। যত কাল এই দৃশ্য জগৎ থাকিবে, তত কাল এই পরমাণুর ক্ষয় নাই; কাজেই ইহাকে মৌলিক পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। এই মৌলিক পদার্থে সাধারণের অনুভবযোগ্য সূক্ষ্ম অণুর এক দৃষ্টান্ত ধরা যাউক। মনে করুন, গৃহে একটি মৃগনাভি বা গোলাপপুষ্প আছে—দূর হইতেই আমরা ইহার সুগন্ধ পাই। কাছেও ঐ একরূপ গন্ধই পাই। কাজেই দৃষ্ট না হইলেও, অনুমান করিতে হইবে, উহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বায়ু দ্বারা চালিত

হইয়া আমাদের নাসিকাপথে আনীত হইলে পর, আমাদের গন্ধজ্ঞান উৎপন্ন হয়। কিছুকাল পরেই মৃগনাভি নিঃশেষিত হয় এবং পুষ্পেরও আর ঘ্রাণ থাকে না। ইহাতে বুঝা যায়, ক্রমে উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুতে বিভক্ত হইয়া নিঃশেষিত হইয়াছে। বিষ্ঠা সম্বন্ধেও এইরূপ। কিন্তু মৌলিক পার্থিব অণু ইহা হইতেও অতিশয় ক্ষুদ্র।

অতএব যাহা অতি অল্পমাত্রও কঠিন এবং যাহা অতি অল্পমাত্রও গন্ধ দান করে তাহাই মৌলিক ক্ষিতি বা পৃথিবী (element of earth).

২। জল বিশ্লেষণার্থ একবাটি পরিস্রুত জল পরীক্ষা করা হউক। (১) একটি অতি সূক্ষ্ম সূচীর অগ্রভাগ জলে ডুবাইয়া দিলে, উহা অনায়াসে জলে প্রবেশ করে। ইহাতে বুঝা যায়, জলে অবকাশ আছে। পুনশ্চ, যদি একবাটি পরিস্রুত জলকে ৪° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্ পর্য্যন্ত লওয়া যায়, তবে দেখা যায় যে, ক্রমেই উহার আয়তন কমিয়া যাইতেছে অথচ ওজন ঠিকই আছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, জলের অণুগুলির মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাহা ক্রমে হ্রাস হওয়ায় উহারা খুব সন্নিকৃষ্ট হইয়াছে। অতএব জলের মধ্যে অবকাশ আছে। দ্বিতীয়তঃ হস্ত দ্বারা জলের উপর আঘাত করিলে একরূপ শব্দের উৎপত্তি হয়। আর স্বতঃও যে জলের মধ্যে শব্দ হইতেছে তাহাও যোগিবোধগম্য বা যন্ত্রবিশেষে গ্রাহ্য। সুতরাং জলে অবকাশ আছে।

(২) জলের অণুগুলি যে চঞ্চল এবং উহার মধ্যে যে মৎস্য বাস করে, তদ্দ্বারা বুঝা যায়—জলের মধ্যে বায়ু আছে। অনেকে বলেন, জলে অক্সিজেন গ্যাস মিশ্রিত (oxygen dissolved) থাকে বলিয়াই জলে মৎস্য বাঁচে। কিন্তু জল যখন ৪° ডিগ্রিতে (4°C) যৎসম্ভব সঙ্কুচিত হয়, তখন অবশ্য ইহার পূর্ব্বে জলের অণুগুলির মধ্যে অবকাশ ছিল এবং এই অবকাশ বাহ্য বায়ুর সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় তাহাতে বায়ু ছিল। বায়ু ব্যতিরেকে কোন প্রাণীই বাঁচে না। জলে মৎস্যের জীবন রক্ষার অবশ্য উভয় কারণই বিদ্যমান। অতি গভীর স্থানে জল নীলবর্ণ দেখায়—তাহার কারণও বায়ু; কারণ, বায়ুর বর্ণ নীল। পরিষ্কার আকাশে সূর্য্য কিরণ পতিত হইলে উহা যেমন নীলবর্ণ দেখায়, গভীর জলেও আলো প্রবেশ করাইলে উহা নীলবর্ণ দেখায়। এই নীলিমা জলের নহে। কারণ জলের বর্ণ শ্বেত। জল যদি নীলবর্ণ হইত, তবে ক্ষুদ্রাংশেও নীলিমা থাকিত। হাতে করিয়া একটু জল লইয়া ছাড়িয়া দিলে জলের শ্বেতবর্ণই দেখা যায়। উহার কারণ কেবল সূর্য্যালোক নহে। কারণ, সূর্য্যালোকেও সাতটি রং আছে; পরন্তু ঘনীভূত জল অর্থাৎ বরফ শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। জলের অণু শ্বেত বর্ণ না হইলে বরফ কখনই শ্বেতবর্ণ হইত না। যোগীরা জলকণা শ্বেত বলিয়াই প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। যাহা হউক, জলে বায়ুর পরিমাণ অল্প বলিয়াই অল্প জলে উহার নীলিমা সাধারণ দৃষ্টিতে অনুভূত হয় না। জল গভীর হইলে দৃষ্টির পরিমিত স্থানে বায়ুকণা প্রভূত পরিমাণে থাকে, তাহাতেই উহা নীলবর্ণরূপে দৃষ্ট হয়। অতএব যাহারা জলকে নির্ব্বর্ণ (colourless) বা কিঞ্চিৎ হরিদ্বর্ণ মিশ্র নীলবর্ণ (Greenish blue) বলে, তাহারা উভয়েই ভ্রান্ত। আর জলাণু বায়্বণু দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে বলিয়া জলে স্পর্শজ্ঞান হয়। অতএব জলে বায়ু আছে।

(৩) জল যতই কেন শীতল হউক না, উহাতে কিছু না কিছু উষ্ণতা থাকিবেই। তাপমান যন্ত্রের দ্বারা ইহার অনেকটা নিরূপণ হয়। আর জলের বর্ণ যে শ্বেত, তাহার কারণ তেজ। যেহেতু তেজই রূপবিধান করে।

(৪) জল যতই কেন উষ্ণ হউক না, উহাতে কিছু না কিছু শৈত্য থাকিবেই; অতি উষ্ণ জল দ্বারাও অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। জলটি দ্রব পদার্থ। একটু জল লইয়া আস্বাদন করিলে কেমন একটা স্বাদ অনুভূত হইবে, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা দুরূহ। কারণ আমরা প্রধানতঃ মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায়—এই ছয় রসের অনুভব করি; এবং অন্যের নিকট প্রকাশ করিলে সে উহা বুঝিতে পারে। আবার এই সমস্ত রসের পরস্পর মিশ্রণে ৫৭টি রস অনুভূত হয় বলিয়া বৈদ্যক শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রসেরও অন্ত নাই। কারণ, পঞ্চভূত অসংখ্য অসংখ্য ভাগে মিশ্রিত হইয়া নানাবিধ রসের উৎপাদন করে। যথা, আয়ুর্ব্বেদে উক্ত হইয়াছে, "পৃথিব্যম্বুগুণ বাহুল্যাৎ মধুরঃ। তোয়াগ্নিগুণ বাহুল্যাৎ অম্লঃ। পৃথিব্যাগ্নিগুণ বাহুল্যাৎ লবণঃ। বায়্বগ্নিগুণ বাহুল্যাৎ কটুকঃ। বায়্বাকাশগুণ বাহুল্যাৎ তিক্তঃ। পৃথিব্যনিলগুণ বাহুল্যাৎ কষায়ঃ।" এইরূপ রসের উৎপত্তির কারণ নিরূপিত থাকিলেও উপাদানের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট নাই। মধুরত্ব প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হইবার উপাদানের পরিমাণ নিশ্চয়ই আছে। তাহার

তারতম্যে বিভিন্ন রসের উৎপত্তি হয়। জিহ্বা দ্বারা আমরা রসগ্রহণ করি। অতি পরিষ্কার পরিস্রুত জল জিহ্বায় লাগিলেই একটা স্বাদের অনুভব হয়। তাহা যদি নাম দ্বারা অন্যের নিকট বলিতে না পারি, (কারণ উক্ত ছয় রস হইতেও অনেকবিধ রস থাকিতে পারে) তবে জলকে নিঃস্বাদ (tasteless) বলা সঙ্গত নহে। অতএব জলের মধ্যে জলাণু আছে।

(৫) জলের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া দিলে হাত কিছু বাধা প্রাপ্ত হয় এবং হাতে একটু কঠিনত্ব বোধ হয়। প্রখর ঘ্রাণশক্তিসম্পন্ন জীবের নিকট জলের গন্ধ প্রতিভাত হয়। যথা, উষ্ট্র বহুদূর হইতে জলের গন্ধ পাইয়া থাকে। মানবে পায় না বলিয়া জলের গন্ধ নাই বলা চলে না। যোগিগণও জলের গন্ধ উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা বলেন যে জল নির্গন্ধ (odourless) তাঁহারা ভ্রান্ত। অতএব জলে ক্ষিতি আছে।

জলসম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

যাহা আমরা পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্ত করি এবং যাহা অক্সিজেন্ ও হাইড্রোজেন্ গ্যাসদ্বয়ের মিশ্রণে নির্ম্মিত, তাহাই কেবল জল নহে ; পরন্তু যে কোন পুষ্প-পত্রাদির রস, তৈল, বৃক্ষনির্য্যাস, জল প্রভৃতি অপ্ বা জল নামে খ্যাত। ইহাদের সূক্ষ্ম অণু, যাহা অল্পমাত্রও শীতল, দ্রব এবং আস্বাদযুক্ত তাহাই মৌলিক জল (element of water)।

৩। তেজ পরীক্ষার্থ কাষ্ঠের প্রজ্বলিত অগ্নি ধরা যাউক।

অরণিকাষ্ঠ, দীপ্তিশলাকা (দিয়াশলাই), বা প্রস্তরের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করিয়া কাষ্ঠ জ্বালাইলাম। কাষ্ঠ জ্বলিতে লাগিল। কাষ্ঠের নিকট শ্বেত বর্ণ জ্বালা, তৎপর লোহিত বর্ণ জ্বালা, তদনন্তর কৃষ্ণাভ ধূম দেখা দিল। ইহারা যথাক্রমে জল, তেজঃ ও ক্ষিতির পরিচায়ক। সূক্ষ্মতা হেতু সাধারণ দৃষ্টি দ্বারা অগ্নির সম্যক্ বিচার করা অসম্ভব। শুনিতে পাই, অগ্নিকে তরল করা যায়। যদি তরল অগ্নি (liquified fire) পাওয়া যায়, তবে ইহা হইতে অগ্নিতে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে। যাহা হউক, অগ্নির উষ্ণতা ও রূপবত্তা প্রত্যক্ষ। অতএব যাহা অল্পমাত্রও উষ্ণ এবং রূপবান্ তাহাকেই মৌলিক তেজঃ (element of fire) বলে।

তেজ সম্বন্ধে বিশেষ দ্রষ্টব্য

তেজ বা তাপ 'বস্তু কি বস্তুর অবস্থা' ইহা বিচার্য্য। এই উভয় মতেরই সমর্থক আছে। (১) বস্তুবাদ (theory of substance, a subtle imponderable fluid) ; (২) স্পন্দনবাদ (theory of undulation) অর্থাৎ বস্তুর অণুসমূহের স্পন্দনে তাপ জন্মে এই মত ; এবং (৩) চালনবাদ (theory of propagation, i. e., the ry of elastic imponderable ether) অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক লঘুতম একরূপ পদার্থ তাপকে বস্তু হইতে বস্তুন্তরে চালন করে, এই মত বৈজ্ঞানিক মহলে প্রচলিত। পাশ্চাত্য মতে শেষোক্ত মত বিশিষ্ট। প্রাচ্য মতে প্রথমোক্ত মত গ্রাহ্য। তেজের পরীক্ষায় আমরা যে ঘর্ষণ দ্বারা দৃশ্য অগ্নিজ্বালা পাইলাম, তাহা বস্তুর অবস্থা নহে, বস্তুই। তবে উহা তেজঃকণার রূপান্তর মাত্র। কাষ্ঠ, প্রস্তর বা দীপ্তিশলাকার ঘর্ষণে যে অগ্নি দৃষ্ট হইল, তাহা কাষ্ঠে, প্রস্তরে বা দীপ্তিশলাকার ফস্‌ফরাসে যে অগ্নিকণা সুপ্ত অবস্থায় ছিল, তাহারই প্রকাশ হইল। শীতল জলকণা-সম্ভূত মেঘের ঘর্ষণ বা মিলনেও বিদ্যুৎ নামক অগ্নির উৎপত্তি দেখা যায়। ঘর্ষণার্হ দুই বস্তুর তেজঃকণা মিলিয়া এক নূতন দৃশ্য তেজের আবির্ভাব হইল। আবার একখণ্ড রজ্জুর এক দিকে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহা যেমন ক্রমে অন্য দিকে চালিত হয়, তদ্রূপ অদৃশ্য তাপকণাও সন্নিকৃষ্ট তাপকণাকে ক্ষোভিত করিয়া উত্তাপ বিকীরণ করিতে পারে। প্রজ্বলিত অঙ্গারে জল ঢালিয়া দিলে, যেমন জলকণা অঙ্গারে চালিত হইয়া তপ্ত অঙ্গারকে শীতল করে, তেজঃকণাও সেইরূপ এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে সঞ্চালিত হইয়া দ্বিতীয় বস্তুকে সন্তপ্ত বা প্রজ্বালিত করিতে পারে। সুতরাং তেজঃ বস্তু, কিন্তু কেবল অবস্থা নহে।

৪। বায়ু পরীক্ষার্থ এক অন্ধকারময় অবরুদ্ধ শ্বেতবর্ণ ইষ্টকালয়স্থ এক প্রকোষ্ঠের বায়ু, এবং একপ্রান্ত বদ্ধ এক সুদীর্ঘ কাচের নল গ্রহণ করা যাউক।

উক্ত গৃহটীতে একজন অতীব সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন লোক বসিয়া দেখিতে পাইবে যে, অসংখ্য নীলাভ সূক্ষ্ম বায়ুকণা ইতস্ততঃ চঞ্চল গতিতে ভ্রমণ করিতেছে। ইহা দ্বারা বায়ুর অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। সূক্ষ্মদৃষ্টির অভাব হইলে

পরোক্ষভাবে বুঝিতে হইবে। মনে করুন, পূর্ব্বোক্ত কাচনলের বায়ুটুকু তরল পদার্থে পরিণত (liquified) করা হইল। তখন ইহাতে নীলবর্ণের আভা দৃষ্ট হয়। তখন ইহাতে কিছু না কিছু উষ্ণত্ব ও শৈত্য এবং কোন না কোনরূপ গন্ধ ও আস্বাদ অনুভূত হইবে। ইহারা তেজ, জল ও ক্ষিতির পরিচয় প্রদান করে। বায়বীয় (fluid) অবস্থায় তরল বায়ুর অণুগুলি অতি সূক্ষ্মদশায় পরস্পর বিপ্রকৃষ্ট ছিল। কাযেই সাধারণের ইন্দ্রিয়ে উহাদের অনুভূতি হয় নাই। আর প্রথম অবস্থায় নলটী ভরাই বায়ু ছিল। তরল হওয়ার পর ইহার আয়তন (volume) অতি অল্পই হইল। কিন্তু ওজন ঠিকই আছে। ইহাতে অনুমান হয় বায়ুর অণুগুলির মধ্যে অবকাশ ছিল। তাহাতে আকাশের অস্তিত্ব বুঝা যায়। তরল বায়ুতে স্পর্শ-জ্ঞানের একটা বিশেষত্ব এবং বিশেষ চঞ্চলত্ব আছে বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং যাহা অল্প মাত্রও চঞ্চল এবং স্পর্শ-জ্ঞান-বিধায়ক তাহাই মৌলিক বায়ু (element of air)।

(৫) অতীব সূক্ষ্মতাহেতু আকাশ পরীক্ষা করা কঠিন। যদি কোন অমিতেন্দ্রিয় শক্তিসম্পন্ন যোগী কোন বায়ু-নিষ্কাশিত প্রকোষ্ঠে বসিতে পারে, তবে সে অতীব সূক্ষ্ম শব্দ শুনিতে পায়। এবং উহাদের রূপাদিও অনুভব করিতে পারে। ইহাতে কয়েকটী আপত্তি উঠিতে পারে—প্রথমতঃ, শূন্য স্থানে (in vacuo) শব্দ হয় না। দ্বিতীয়তঃ বায়ুনিষ্কাশিত স্থানে জীব থাকিতে পারে না ; কারণ বায়ুতে অক্সিজেন্ থাকে ; উহা ভিন্ন জীব বাঁচে না। কিন্তু যোগ বলে ইহা অসাধ্য নহে। তাহার অনেক প্রমাণ আছে। শূন্যস্থানে (in vacuo) যে শব্দ হয় না, তাহা স্থূল শব্দ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। কিন্তু নির্ব্বাত স্থানে অতি সূক্ষ্ম শব্দ শ্রুত হয় ; ইহা সাধারণের কর্ণে গ্রাহ্য নহে। তৃতীয়তঃ বায়ু ভিন্ন শব্দ হয় না। কিন্তু বায়ুকণা শব্দ-চালনের সাহায্য করে মাত্র, পরন্তু উৎপন্ন করে না। যাহা হউক, যাহা শব্দ উৎপাদন এবং অবকাশ প্রদান করে, তাহাকেই মৌলিক আকাশ (elements of sky) বলে।

যাহা হউক, উপরিউক্ত পরীক্ষাসমূহ দ্বারা আমরা মোটামুটি এই বুঝিলাম যে, যাহা প্রত্যক্ষ ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ তাহাই মৌলিক পদার্থ নহে। ইহাদিগের প্রত্যেককেই বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকটীতে অপরাপর চারি ভূতের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। এবং ইহাদের প্রত্যেকটীতে স্বীয় স্বীয় গুণ প্রধান, অপরাপর ভূতের গুণ অত্যল্প ; অর্থাৎ স্বীয় গুণের চারি ভাগের এক ভাগ। সুতরাং ইহারা প্রায় সুপ্ত। পরন্তু জগতের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ইহাদের ধ্বংস হয় না বলিয়া এবং পঞ্চীকৃত অবস্থার বিযোজন বা পরিবর্ত্তন হয় না বলিয়া ভূতসমূহের পঞ্চীকৃত অণুকেই মৌলিক পদার্থ বলা হয়।

এখন পাশ্চাত্য মতের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত। তন্মতে অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন্ প্রভৃতি বায়বীয় পদার্থ (gas) স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু (metals), গন্ধক (sulphur), দারমুজ (arsenic) ইত্যাদি প্রায় ৭০টী পদার্থই মৌলিক পদার্থ (elements), কিন্তু এ মত ভ্রান্ত।

(১) ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থ জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহা সকলেই অনুভব করে। কিন্তু উপরিউক্ত ৭০টী পদার্থের মধ্যে কয়েকটী মাত্র জীবন ধারণের উপযোগী। অন্যগুলি না থাকিলেও চলে। সুতরাং ক্ষিত্যাদিই মূল পদার্থ।

(২) পাশ্চাত্যেরা বলেন গন্ধক (sulphur) প্রভৃতির অণু (atom) এক জাতীয়। ইহা হইতে অন্য পদার্থ বাহির করা যায় না। কাজেই ইহা মূল পদার্থ (elements)। পরন্তু জলের (water) অণ (molecule) বিভিন্ন জাতীয় অর্থাৎ এক ভাগ অক্সিজেন্ ও দুইভাগ হাইড্রোজেন্ এই দুই মূল পদার্থে নির্ম্মিত। কাজেই জল যৌগিক পদার্থ। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রাচ্য মনীষিগণ গন্ধক, অক্সিজেন্ প্রভৃতিতে ক্ষিতি; অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটীই দেখিতে পান।

পাশ্চাত্য মত নিরাকরণার্থ তথাকথিত মৌলিক অক্সিজেন্ (oxygen) গ্যাস্ ধরা যাউক।

পাশ্চাত্য মতে—

(১) ইহা বায়বীয় পদার্থ (gas)।

(২) ইহা বর্ণহীন (Colourless)।

(৩) ইহা স্বাদহীন (tasteless)

(৪) ইহা গন্ধহীন (odourless)।

(৫) যাহাতে ইহা তরল পদার্থে পরিণত হয় ইহার এমন তাপ পরিমাণ (Critical temperature)—

১১৮৮০। অর্থাৎ ইহাকে অত্যন্ত শীতল করিয়া ৩৭৫ সের বায়ুর চাপ দিলে ইহা তরল পদার্থে পরিণত হয়। [one atmospheric pressure = 15 lbs ∴ 50 atmospheric pressures = 50 × 15 lbs = 375 seers nearly]

(৬) তরল অবস্থায় অক্সিজেনের রঙ্ ইস্পাতের ন্যায় নীল বর্ণ (steel-blue)।

(৭) ইহা চঞ্চল তরল পদার্থ (mobile liquid)।

কিন্তু প্রাচ্য মতানুযায়ী পরীক্ষা করিলে জানা যায়—অক্সিজেন্ স্বাভাবিক অবস্থায় কেবল গ্যাস। কিন্তু যখন (৫) সংখ্যোক্ত তাপ পরিমাণ ও চাপ ইহাতে সংযোজিত হয়, তখন ইহা দ্রব পদার্থে পরিণত হয়। বিশেষতঃ এই দ্রব অবস্থা দ্বারাই ইহার প্রকৃত স্বরূপ স্থূলতঃ অনুভব করা যাইবে।

(১) অক্সিজেন্ (oxygen) বর্ণহীন (colourless) নহে। কারণ যখন ইহার অণুসমূহ পরস্পর সন্নিকৃষ্ট হইয়া তরল পদার্থে পরিণত হইল, তখন ইহার নীলাভ রূপ দেখা দিল। কাজেই অণুসমূহের বিপ্রকৃষ্ট অবস্থায় ইহার রূপ নাই এমন বলা যায় না। তবে গ্যাস্ অবস্থায় ইহা অতীত সূক্ষ্ম হওয়ায় সাধারণের দৃশ্য হয় না। পরন্তু (৭) সংখ্যায় উক্ত হইয়াছে তরল অবস্থায় ইহা চঞ্চল (mobile) সুতরাং গ্যাস অবস্থায় অণুগুলি অধিকতর চঞ্চলই হইবে। ইহার নীলবর্ণ ও চঞ্চলতা দ্বারা ইহাতে বায়ু আছে প্রমাণিত হয়। আর ইহার নীলবর্ণ রূপের দ্বারা এবং অন্ততঃ কিছু উষ্ণতার দ্বারা তেজের অস্তিত্ব প্রকাশ হয়। কারণ তেজের ধর্ম্ম রূপ-প্রকাশ করা ও তাপ দেওয়া। তেজের সত্তাতেই রংয়ের জ্ঞান হয় এবং বায়ুর অণুর বর্ণ নীল বলিয়া পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

(২) ইহা স্বাদহীন (tasteless) নহে। যখন ইহা তরল পদার্থে পরিণত হয় তখন অবশ্যই ইহার কোন অনির্দ্দিষ্ট স্বাদ থাকিবে। তবে অম্ল-মধুরাদি কোন বিশিষ্ট স্বাদ না থাকায় ইহা অন্যের নিকট প্রকাশ না করা যাইতে পারে। অতএব অক্সিজেনের বায়বীয় অবস্থায় অণুসমূহ বিপ্রকৃষ্ট থাকায় উহাতে যে স্বাদ নাই ইহা বলা চলে না। তবে উহা অতীব সূক্ষ্ম। আর তরল অবস্থায় ইহাতে কিছু না কিছু শৈত্যও আছে। কাজেই এই সকল ইহার অণুতেও বোধ্য। সুতরাং রসাস্বাদ ও শৈত্য থাকায় অক্সিজেনে জলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

(৩) অক্সিজেন গন্ধহীন (odourless) নহে। ইহার তরল অবস্থায় একটা না একটা অন্ততঃ অনির্দ্দিষ্ট গন্ধ অবশ্যই থাকিবে। কাজেই গ্যাস্ অবস্থায়ও তাহা আছে। তবে অণু বিকীর্ণ থাকায় গন্ধ সূক্ষ্ম হয়। তৎপর তরল অবস্থায় ইহাতে হাত দিলে প্রতিঘাত স্বরূপ কিছু কঠিনতা বোধ হইবে। গ্যাস্ অবস্থায় অণুসমূহ বিপ্রকৃষ্ট থাকায় স্থূলতানুভব হয় না। সুতরাং অক্সিজেনে ক্ষিতি আছে।

(৪) অক্সিজেন্‌কে যখন তরল পদার্থে পরিণত করা যায়, তখন গ্যাস্ অবস্থায় অণুগুলির মধ্যে অবশ্যই অবকাশ ছিল। কারণ তরল অবস্থায় ইহার আয়তন কম হয়। কিন্তু ওজন ঠিক থাকে। ইহা দ্বারা অক্সিজেনে আকাশের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম, যে অক্সিজেন্ গ্যাসকে পাশ্চাত্যগণ মৌলিক পদার্থ বলিয়া থাকে, তাহাও ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতে প্রস্তুত। পূর্ব্বোক্ত চন্দন কাষ্ঠ পরীক্ষার ন্যায় স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতিতেও ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের নিদর্শন পাওয়া যায়। স্বর্ণ রৌপ্য সম্বন্ধে শ্রুতি স্মৃতির মত মনীষিগণের গভীরতম গবেষণার যোগ্য। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"অগ্নিবৈ বরুণানী রকাময়ত।"

"অগ্নেঃ সুবর্ণমিন্দ্রিয়ং বরুণানীনাং রজতম্।"

মনুস্মৃতি বলিয়াছেন—

"অপামগ্নেশ্চ সংযোগাদ্ধৈম-রূপ্যঞ্চ নির্ব্বভৌ।
তস্মাৎতয়োঃ স্বয়োনৈব নির্ণেকো গুণবত্তরঃ॥"

অগ্নি জলকে কামনা করিল।

অগ্নি—সুবর্ণের এবং জল রৌপ্যের প্রধান উপাদান।

জল ও অগ্নির সংযোগে স্বর্ণ ও রৌপ্য উৎপন্ন হইয়াছে। সেই হেতু নিজ উৎপত্তিস্থান (উপাদান) জল ও অগ্নি দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্যের শুদ্ধি (স্পর্শদোষ ও মল সংযোগ হইলে তাহার শোধন) করিলে বিশেষ ভাল হয়। সাধারণ জল ও অগ্নি অবশ্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপাদান নহে। কারণ অগ্নিসংযোগে জল ঘনীভূত না হইয়া বাষ্পাকারেই

পরিণত হয়। কাজেই পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা জানিতে হইলে জল ও অগ্নিকে পূর্ব্বোক্তপ্রকার মৌলিক পদার্থ স্বরূপেই ধরিতে হইবে। স্বর্ণে তেজের ভাগ অধিক থাকায় ইহা রক্তবর্ণ। (স্বাভাবিক ভূমিজ স্বর্ণ লাল) তেজের বর্ণ লোহিত। বিশেষতঃ তেজঃ-প্রধান দ্রব্যের যে যে গুণ আছে, স্বর্ণেও সে সব গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। রৌপ্যে জলের ভাগ অধিক থাকায় ইহার বর্ণ শ্বেত। জলের বর্ণও শ্বেত বলিয়া পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে।

যাহা হউক, বহিঃ প্রকৃতি ছাড়িয়া আমাদের দেহরূপ অন্তঃ-প্রকৃতিকে অনুসন্ধান করিলেও পঞ্চভূতকেই মূল পদার্থ বলা যায়। এই পঞ্চভূতের তত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইলে মনুষ্যের আপন আপন প্রকৃতি ও দেহের অবস্থাকে সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। তখনই দেহ ও মনকে সুস্থ রাখিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়। ইহাই পঞ্চভূতের তত্ত্ব আলোচনার প্রকৃষ্ট ফল।

অতএব পূর্ব্বোক্তরূপে বাহ্যপ্রকৃতির দ্রব্যময় স্বরূপ অবগত হওয়ার পর অন্তঃপ্রকৃতির দ্রব্যময়ত্ব এবং এই উভয়ের ত্রিগুণময় স্বরূপ আলোচনা করিলেই প্রকৃতির সম্যক্ তত্ত্ব অবধারিত হইবে।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩০)

সহসা দূরে উৎকট ঝিঁঝি পোকার ডাকের মত সুতীব্র শিশের শব্দে নির্জ্জন গঙ্গাতট ধ্বনিত হইয়া উঠিল। অসিতের চিন্তাজাল সেই শব্দে ছিন্ন হইয়া গেল। সেও চকিত হইয়া উঠিয়া কিছুদূর আগাইয়া আসিয়া উচ্চরবে শিশ দিয়া পূর্ব্বের শব্দের প্রত্যুত্তর দিল।

তাহার কিছু পরেই পরেশ ও সুধীর তাহার নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—'অসিতদা ?'

অসিত বলিল—এস, আমি অনেকক্ষণ থেকে তোমাদের অপেক্ষায় এখানে একলা বসে আছি। তার পর ?—খবর কি সব ?

'খবর ভালই, চলো—একটু বসা যাক্—তার পরে ক্রমে সব বলছি।'

তিন জনে আসিয়া ঘাটের উপরের সেই চত্বরে বসিল। সুধীর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, অসিতদার কি আজকাল এইখানেই স্থিতি না কি ? তা জায়গাটি চমৎকার বাছা হয়েছে। এখানে কিছুদিন একা একা বেশ স্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

চত্বরের এক প্রান্তে চাঁদের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। পরেশ সেইখানে শুইয়া পড়িল। তাহার ঠিক মাথার উপর একটি তারা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। জনমানবহীন নীরব তটভূমিতে গঙ্গার মৃদু জলোচ্ছ্বাসের শব্দ সমতানে বাজিতেছিল।

শীতল ঝিরঝিরে বাতাসটুকু উপভোগ করিতে করিতে পরেশ বলিল—তা কাটিয়ে দেওয়া যায় বটে, তবে কি না—শুধু চাঁদের আলো আর হাওয়া খেলেই ত পেট ভরে না—দেহটা এক বিষম স্থূল পদার্থ কি না, কাজেই ওটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে যে কিছু বাস্তব দ্রব্যের—

অসিত বাধা দিয়া বলিল, বাস্তব দ্রব্যের জন্যে তোমার কিছু ভাবতে হবে না। এখানে আমি খোদ বেণীমাধবের মন্দিরে অতিথি—দুবেলা প্রচুর আহারের বন্দোবস্ত আছে। সেখানে রাত্রেও থাকবার জন্যে আমি একটি ঘর পেয়েছি—সেবা যত্নের কোন ত্রুটী নেই। তবে দিনের বেলাটা বড় গোলমাল। তাই দিনটা কাটাবার জন্য এই জায়গাটা বের করা গেছে। এখন কাজের কথা বল।

পরেশ বলিল—বাঁচালে দাদা! এতক্ষণে ধাত এল! তুমি যে রকম দার্শনিক মানুষ, খাবার কথা পাড়তে গেলেই হয় ত এক বিষম ধমক দিয়ে উঠবে, বলবে—এত বড় গুরুতর কাযের সময় আবার ও-সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানো কেন? তাই ভেবে আমার ভয় হচ্ছিল। যাই হোক—এখন তোমার এদিককার কি খবর? ওদিকে ত সব প্রস্তুত—শুধু বাংলায়···বাবু বলছিলেন, যে, যদি দিনটা আর কিছু পেছিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে তাঁরা আরো কিছু সময় পেয়ে প্রস্তুত হতে পারেন,—টাকা-কড়িও আরো কিছু সংগ্রহ হতে পারে।

অসিত শুনিয়া বলিল, সে কথা আমিও ভেবে দেখেছি। কিন্তু এখন অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে, যে, সকল দিক বিবেচনা করে দেখলে, আর বিলম্ব করা চলে না। আমি যখন পঞ্জাব থেকে ফিরে আসি, তখনই দেখে এসেছি—সেদিকের সমস্ত সিপাহীরা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তাদের অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে এত দিন চেপে রাখা গিয়েছিল, কিন্তু আর তারা এ ভাবে থাকতে চায় না। বলে, তোমাদের সময় আসতে আসতে আমাদের যদি ইউরোপের যুদ্ধে পাঠিয়ে দেয়, তা হলে ত সবই পণ্ড হয়ে যাবে। উত্তর-পশ্চিম আর বিহারের সমস্ত ব্যারাকে আমি নিজে ঘুরেছি, এখন পর্য্যন্ত তারা সকলেই আমাদের মতে চলতে রাজি আছে,—কিন্তু আর বেশি দিন টেনে রাখা তাদেরো চলবে না। সেই জন্যে আমি ভাবছি—যখন সবই প্রস্তুত, তখন আর সময় নষ্ট না করাই ভাল।

পরেশ বলিল—তা হলে আমার মতে তুমি একবার এখান হতে বেরিয়ে পড়। ওঁরা অনেক দূরে থাকেন, আর বাংলার বাইরের দিকে বেশি খবর রাখেন না বলে এ-সব দিকের অবস্থা ঠিক বোঝেন না। তাঁদের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত অবস্থা বুঝিয়ে বললে তাঁরা মত পরিবর্ত্তন করতে পারেন। আমি বাংলার ভিন্ন ভিন্ন দলে এবার ঘুরে দেখে এসেছি—সঙ্ঘ-গঠনের শৃঙ্খলা ও শক্তি ওদিকে যেমন গড়ে উঠেছে, আমার মনে হয় আর কোথাও তেমন হয় নি। তুমি একবার গিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।

সুধীর এতক্ষণ নীরবে ছিল, সে এখন বলিল, কিন্তু এখন যদি তোমায় বাইরে যেতে হয়, তা হলে এই সব দিক থেকেই সাবধানে বেরিয়ে যেও;—কাশীর ভিতরে এখন যাবার চেষ্টা করো না। পাটনায় আজকাল খুব ধর-পাকড় সুরু হয়েছে। নলিন গ্রেপ্তার হবার পর তার কাছ থেকে কি কাগজপত্র পেয়ে এখন কাশীতেও চারদিকে খানা-তল্লাসীর ধুম পড়ে গেছে। তুমি যে দুখানা বাড়ীতে কাশী গেলে থাক, সে দুখানাই ওরা সার্চ্চ করেছে। আজ দেখে এলুম, দুটো বাড়ীতেই পুলিশ পাহারা।

অসিত মৃদু হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ তারা ভেবে রেখেছে, আমি যখন বাইরে আছি, তখন কাশীতে এসে দুটো বাড়ীর একটাতেও অন্ততঃ যাব, আর ওরা তখন অনায়াসে তখনি আমায় ধরে ফেলবে। এখন কিছুদিন বেচারারা সেই সুখের স্বপ্নে ভোর হয়ে থাক্, আমি ততক্ষণ এদিকের কিছু কিছু কাজ গুছিয়ে আসি। ওরা কি কখনো স্বপ্নেও ভেবেছে—যে আমি ওদের চোখের সামনে দিয়ে দুটো বাড়ীতেই ঘুরে এলাম? দানাপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের কাজ সেরে আমি যেদিন কাশীতে আসি, পর পর দুখানা বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে দেখি—ঐ ব্যাপার। আমার অবশ্য তখন সন্ন্যাসীর বেশ,—কেউ ফিরেও দেখলে না। আমি ফিরে এসে তখন এইখানে আস্তানা নিয়ে তোমায় খবর দিলুম। যা হোক্, এখন আমায় যদি কিছু দিনের জন্য আবার বাইরে যেতে হয়, তা হলে এখানে তোমরা দুজন থাক্‌ছ ত?

পরেশ বলিল, বেশ তো! তুমি যত দিন ফিরে না আসছ, এদিককার যা কিছু কাজ, সে সব আমরাই চালাব।

অসিত বলিল, কাজ নতুন করে করবার মত এখন কিছু নেই। শুধু মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করা, আর পাঁচ রকম কথা বলে তাদের উৎসাহটা বজায় রাখা—এইটুকু হলেই এখন চলবে। অমৃতসর থেকে খবর এসেছে—সেখানেও একবার যেতে হবে। সেদিকের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে দেখা করে একটা দিন স্থির করে না ফেললে আর চলবে না। আমি তা হলে আগে বাংলায় গিয়ে কথাবার্ত্তা স্থির করে তার পরে অমৃতসরে চলে যাব। এবার সেখানে যাওয়ার মানেই—এ ব্যাপারের চরম সিদ্ধান্ত করা। তার পর যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, যদি এতদিন পরে সত্যই ভারতের ভাগ্যে যুগ-যুগান্তরের অধীনতা ঘোচাবার সময় এসে থাকে, তা হলে দেখবে—হয় ত আর দু'সপ্তাহের মধ্যেই এক বিরাট ব্যাপারের মধ্যে ভারতের ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে।

শেষের কথাগুলি অতি ধীরে-ধীরে গভীর স্বরে উচ্চারণ করিয়া অসিত স্বপ্নাভিভূতের মত অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল; যেন সেই সুদূর গ্রহতারাখচিত নীল নভোমণ্ডলে ভারতবর্ষের অনিশ্চিত ভবিতব্য কি, তাহাই সে একমনে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছে।

অসিতের সেই গভীর কণ্ঠস্বরে তাহার সঙ্গীদের অন্তরেও সহসা এক তীব্র ভাবের আবেগ ও এক বিচিত্র অনুভূতির বিদ্যুৎ-স্পন্দন বহিয়া গেল। পরেশ তাহার স্বাভাবিক ব্যঙ্গ ও কৌতুকপ্রিয়তা ভুলিয়া অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কা ও উদ্বেগপূর্ণ চিত্তে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

সুধীর কল্পনায় সারা ভারতব্যাপী বিরাট বিপ্লবের ভীষণ রক্তের খেলার উত্তেজনার মাঝে আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়া নিস্পন্দের মত বসিয়া রহিল।

এত দিন ধরিয়া তিলে তিলে, অতি গোপনে, অতি সন্তর্পণে যে দেশব্যাপী বিষম আয়োজন করিয়া তোলা হইয়াছে,—এবার তাহার সাফল্য পরীক্ষা করিবার দিন আগতপ্রায়,—অনিশ্চিত উদ্বেগ ও সন্দেহে সকলেরই বুকের ভিতর কাঁপিতেছিল।

এত দিনের এত আশা, এত আয়োজন—সত্যই কি তবে সফল হইবে? সকল দিক বজায় রাখিয়া, সকল দিকে শৃঙ্খলা রাখিয়া এ বিরাট যজ্ঞ সমাধা করিতে পারিব কি? শেষ রক্ষা হইবে কি? তিনজনের অন্তরেই এই ভাবের শত শত প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছিল।

নির্জ্জন নদী-সৈকতে মৃদুতান তুলিয়া গঙ্গার জল অশ্রান্ত ভাবে কোন্ অনন্তের উদ্দেশে ছুটিতেছিল। ক্ষুদ্র লহরীগুলি নাচিতে নাচিতে আসিয়া তটভূমিতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে—ছল্-ছলাৎ—ছল্-ছলাৎ। কদাচিৎ কোনো নিশাচর পাখীর অস্পষ্ট স্বর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। রজনীর সুগভীর স্তব্ধতার মাঝে তাহারা এই ভাবে কতক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় কাটাইয়া দিল।

বহুক্ষণ পরে ধ্যানমগ্ন প্রকৃতির নীরবতাকে সচেতন করিয়া পরেশ ডাকিল—অসিতদা?

অসিত চকিত হইয়া মুখ ফিরাইল—কেন ভাই?

'তোমার বিশ্বাস হয়?' পরেশ তাহার আগ্রহে ভরা দৃষ্টি অসিতের প্রতি স্থির রাখিয়া বলিল—এই যে একটা বিপুল আয়োজন এত দিন ধরে করে তোলা হল, এর সাফল্যের ওপর তোমার স্থির বিশ্বাস আছে?

'নিশ্চয়ই! বিশ্বাসের উপরেই এত বড় দেশযোড়া কাণ্ড গড়ে উঠেছে। এক দৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ছাড়া আর আমাদের কি সম্পদ আছে ভাই?'

'তবে কেন প্রাণে এত সংশয় জাগছে?'

অসিত বলিল, ও কিছু নয় পরেশ! সব বড় কাজের আগেই কর্ম্মীদের মধ্যে ও-রকম একটা সংশয়ের ভাব, একটা উদ্বেগ আসেই,—সেটা কোন কাজের কথা নয়। ওটাকে ঝেড়ে ফেলে, দৃঢ় বিশ্বাস ও উৎসাহ নিয়ে আমাদের কাজে নামতে হবে। এই বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ই যুগে যুগে মানুষকে বড় করে তুলেছে—বাধা-বিঘ্নের মাঝ দিয়ে, মানুষকে বড় বড় কাযে নামিয়ে, তাকে সাফল্যে মণ্ডিত করে তুলেছে,—আমাদের বেলাই বা তার অন্যথা হবে কেন?

পরেশ আর কিছু না বলিয়া নীরবে ভাবিতে লাগিল। অসিতও কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল, যে যাই বলুক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—এই পথেই ভারতের জাতীয় উন্নতি, তার স্বাধীনতা সবই ফিরে আসবে। এই যে এত লোকের জীবন পণ করে একনিষ্ঠ সাধনা, এ কি কখনো ব্যর্থ হতে পারে? আমাদের মধ্যে কেউ নামের জন্যে, যশের জন্যে এ পথে আসে নি,—কারুর প্ররোচনা শুনে, কোন লোকের বক্তৃতা শুনে, ক্ষণিক উত্তেজনার মুখে এসে এ দলে যোগ দেয় নি। শুধু তারা নিজেদের অন্তর থেকে যে প্রেরণা পেয়েছে,—নিজের জীবন দিয়ে যে সত্যকে তারা অনুভব করেছে,—তার প্রতিষ্ঠা, তার সাধনার জন্যে তারা সমস্ত উৎপীড়ন, নিগ্রহ, সমস্ত দুঃখকে সাদরে বরণ করে নিয়ে, এই বিপদ-সঙ্কুল জটিল পথে এগিয়ে চলেছে। এই যে তাদের অন্তর-দেবতার প্রত্যাদেশ, এই যে দেশের একদল লোকের মন প্রাণ সুরে-বাঁধা যন্ত্রের মত একই সুরে কাঁপছে,—এ কি সবই মিথ্যা হতে পারে? সে হয় না, সে হবে না। এই পথেই তার মুক্তি। তুমি আমি হয় ত অনন্ত কাল-সাগরে লীন হয়ে যাব,—হয় ত সে দিন দেখা আমাদের ভাগ্যে ঘটে উঠবে না। কিন্তু এই দেশের বুকের ভিতর থেকেই আবার এক দল উঠবে, যারা দেশের মুক্তির জন্যে তাদের হৃদয়ের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত হাসতে হাসতে

উৎসর্গ করবে। এমন প্রাণব্যাপী একাগ্র সাধনা কি কখনো ব্যর্থ হতে পারে?

অসিত কথা শেষ করিয়া নীরবে কি ভাবিতে লাগিল। পরেশ ও সুধীরের মনে হইল—যেন অসিতের কথার রেশ সেখানকার আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে অসিত আবার বলিল, ভেবে দেখ, আজ আমাদের কি শোচনীয় অবস্থা! শুধু তোমার আমার কথা বলছি না,—দেশের নামে যারা যারা এ পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের সকলের কথাই বলছি—ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থায় এসে পড়া গেছে, যেখানে সহায় সম্পদ নেই, আশ্রয় নেই, কোনখান থেকে একটু সহানুভূতি বা দুটো স্নেহের কথা শোনবার আশা নেই। আত্মীয়-স্বজন আশ্রয় দিতে ভয় পায়,—বন্ধু-বান্ধব দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়,—পাছে কোন বিপদে পড়তে হয়। ঘরে স্থান পাবার উপায় নেই,—পথে দাঁড়ালে পুলিশ পিছু নেয়,—বনের জন্তুর মত ঝোপ-ঝাড়ে, মাঠে-জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে অনাহারে অর্দ্ধাশনে দিন কাটাতে হয়। দুঃখের অবধি নেই, তবু ত কেউ ফিরতে চায় না। সকল দুঃখ-কষ্ট মাথায় করে নিয়ে তারা নিজেদের লক্ষ্যপথে অবিরাম ছুটছে—একদিন দুদিন নয়—মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। এত বড় ত্যাগ, এত সহিষ্ণুতা, এত বড় মহৎ প্রেরণা তারা কোথা থেকে পেয়েছে? এ কি ভগবানেরই আদেশ নয়? যাদের দিয়ে তিনি এই মহৎ কায সম্পাদন করবেন, তাদের এই অগ্নি-পরীক্ষার ভিতর দিয়ে তিনিই মানুষ করে তুলছেন। আমি বিশ্বাস করি—এবার ভারতে একটা যুগান্তর নিশ্চয়ই আসছে!

পরেশ বলিল, বিশ্বাস আমিও করি। তবে মাঝে মাঝে যেন কেমন একটা সংশয় জাগে,—হবে কি হবে না—এমনি একটা উৎকণ্ঠা। যাক্—তুমি উপস্থিত আমাদের অবস্থার কথা যা বল্লে, সেটা যে কত সত্য—এবার বাংলায় ঘুরতে ঘুরতে পথে, ঘাটে, ট্রেণে সর্ব্বত্র তার পরিচয় পাওয়া গেছে। যেখানেই যাই, প্রায় একই রকম কথা,—সর্ব্বত্রই একটা বিষম উৎকণ্ঠা একটা উপেক্ষারুভাব। ফেরবার সময় ট্রেণে জনকতক সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত লোক এ দলের ওপর এমন সব মন্তব্য করতে লাগলেন—'দেশের বুকের উপর বসে দেশের লোকের উপরেই ডাকাতি! একে খুন, তাকে খুন! দেশে যত অশান্তি ও উপদ্রব সৃষ্টি করা! এদের উৎপাতে দেশের শান্তি—শৃঙ্খলা সব পণ্ড হবে। গবর্ণমেণ্টের উচিত সব ধরে ধরে কঠোর শাস্তি দিয়ে এ সব দল নির্ম্মূল করা' ইত্যাদি। আমি শুনে শুনে ভাবলুম—মন্দ নয়! আমরা তবে কার জন্যে প্রাণপাত করে এ অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করে মরি? দেশের স্বাধীনতা বলতে ত আর সত্যি দেশের বন জঙ্গল পাহাড় নদীর কথা বোঝায় না,—দেশবাসীর সুখ স্বাধীনতাই ত আমাদের কাম্য বস্তু। তা দেশের লোকের ত আমাদের ওপর টান খুব প্রবল দেখছি। সুধীর বেচারা ছেলেমানুষ,—চেয়ে দেখি, দুঃখে অভিমানে ও-বেচারার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে! আমি ভাবলুম, কেঁদেই ফেলে বা! বলিয়া পরেশ সকৌতুকে সুধীরের দিকে তাকাইয়া হাসিল।

অসিত সস্নেহে বলিল, সত্যি সুধীর? ও-সব কথা শুনে সত্যিই তোমার এত কষ্ট হয়েছিল? ও-সব দিকে আমাদের কাণ দিতে নেই। ভাই, এ দিকে আসতে হলে, মনকে খুব উঁচু সুরে বাঁধতে হবে। আমরা যা সত্য বলে, নিজেদের কর্ত্তব্য বলে বুঝেছি, তাই এক মনে করে যাব। তাতে নিন্দা বা প্রশংসা কিছুতে কাণ দেব না। এই হচ্ছে মোট কথা। গীতার উপদেশ মনে নেই? অনাসক্ত—

সুধীর বাধা দিয়া বলিল, সে সব আমার খুব মনে আছে অসিতদা! তবে তুমি পরেশদার সব কথা বিশ্বাস কোরো না,—ও বড় বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে। এটা সত্যি যে, ও-সব কথা শুনে তখন আমার একটু আঘাত লেগেছিল। তারা যে রকম গাল দিয়ে বলছিল—তুমি যদি শুনতে একবার! যাদের জন্যে আমরা এত করে মরছি, দুটো সহানুভূতির কথা ত তাদের কাছে পাওয়াই যাবে না; উল্টে গালাগালি! অসিতদা, যেদিন দরকার হবে, সেদিন আমিও তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বুকের রক্ত দেব, এটা ঠিক। কিন্তু ভাই! তোমার মত অত মনের বল আমার নেই। আমি মানুষ—সাধারণ মানুষের মতই এখনো আমার মনটা সুখ-দুঃখের অতীত হয়নি।

অসিত গম্ভীর হইয়া বলিল, তুমি ঠিক বলেছ সুধীর! আমরা মানুষ। মানুষ সুখে-দুঃখে আশায়-আকাঙ্ক্ষায় হাবুডুবু খায়,—আবার এই মানুষই জ্ঞানযোগে যুক্ত হয়ে একদিন সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে পরম শান্তি লাভের

অধিকারী হয়। যদি মানুষ হয়ে জন্মেছি, তবে সাধারণের মত ছোট গণ্ডীর মধ্যেই থেকে যাব কেন ভাই? আকাঙ্ক্ষা মহৎ, উঁচু হওয়াই ভালো। আর দেশের লোক ত ও-কথা বলবেই। আমরা ব্যাপারটা যে ভাবে দেখছি, ওরা ত এখনো সে ভাবে দেখতে শেখে নি। ওরা শুধু ভাবে—আমাদের কাজের ফলে ওদের এই নিশ্চিন্ত আরামটুকু লোপ পাবে,—একটা ছন্নছাড়া কাণ্ড হবে। এই ভয়েই তারা আমাদের ওপর খড়্গহস্ত। আর দেশের লোকের কথা ছেড়ে দাও,—ক্রমে আত্মীয়-স্বজনও আমাদের ছাড়তে বাধ্য হবে। তুমি এখনো ঘরের মধ্যে আছ,—দুদিন পরে এমন সময় আসতে পারে, যখন ঘরে আর তোমার ঠাঁই হবে না। আমাদের আপন-পর কোথাও কিছু নেই ভাই, আছেন শুধু মাথার ওপরে ভগবান্—আর নীচে আমাদের এই দেশ। এই দুটির মধ্যে আপনার জনের কথা ডুবিয়ে দাও,—দেশের লোক-মতের কথা বৃথা ভেব না; তা হলেই শান্তি পাবে। পরেশ, তোমার সেই গানটা সুধীরকে একবার শুনিয়ে দাও ত।

তখন সেই নীরব নির্জ্জন গঙ্গাতট মুখরিত করিয়া, নিস্তব্ধ সুপ্ত নৈশ প্রকৃতিকে সচকিত করিয়া পরেশের উচ্চ মধুর স্বর চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে
তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না!
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে—
হয় তো রে ফল ফলবে না—
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।

(ক্রমশঃ)

ময়মনসিংহের মহিলা-কৃত্তিবাস

শ্রীচন্দ্রকুমার দে

(২)

অরণ্য-কাণ্ড। তার পর পঞ্চবটী বন। যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া নাগ শাল তাল তমাল প্রভৃতি বনস্পতিগণের সারি। কোথাও পিতৃতুল্য স্নেহশীল বন-তরুগণ সুরসাল ফল-সম্ভার, শান্তি-শীতল ছায়া লইয়া বনবাসীগণের রক্ষক স্বরূপ দণ্ডায়মান; কোথাও মাতৃ-করুণার মত অবিরামবর্ষী নির্ঝর-ধারা; কোথাও সপুষ্প বনলতা একান্ত প্রেমশীলা সঙ্গিনীর মত বনতরুর কাণ্ডে হেলিয়া পড়িয়াছে—অধরে পুষ্প-হাসি ধরে না। অদূরে গদগদনাদী গোদাবরী যেন প্রেমে নাচিয়া সোহাগে হাসিয়া পঞ্চবটীর পাদদেশ ধৌত করিয়া অবিরাম কুলু ধ্বনিতে ছুটিয়া যাইতেছে।

পঞ্চবটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য পরম রমণীয়। এই স্থান সীতার অতিমাত্র প্রীতিপ্রদ বলিয়া, তথায় তাঁহারা বনবাস কালযাপন করিবেন স্থির হইল। তখন রামের আদেশে লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণ-মুখ বাণ দ্বারা সরল কাষ্ঠ সকল ছেদন করিয়া, তদুপরি লতায়-পাতায় নির্ম্মিত একখানি সুন্দর কুটীর প্রস্তুত করিলেন। লক্ষ্মণ অরণ্য হইতে বনের ফল, ঝরণার জল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। কুরঙ্গ-কুরঙ্গী তাঁহাদের প্রতিবেশী। মৃগশিশুগণ নিত্য নূতন অতিথি-রূপে কুটীরের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইত। সীতা শিশুর মত যত্ন করিয়া গাছের কচিপাতা সকল তাহাদের মুখে তুলিয়া দিতেন। দেবদারু-শাখায় নৃত্যশীলা ময়ূরীগণ সীতার করতালিতে কুটীর-দ্বারে উড়িয়া আসিত। এই সকল অবসর-সঙ্গিনীগণকে পাইয়া বনদেবতা অযোধ্যার রাজভবনের কথা ভুলিয়া গেলেন।

এই পঞ্চবটী প্রাকৃতিক সম্পদে যতই রমণীয় হউক না কেন—ইহা মায়াবী রাক্ষসগণের বিহার-ভূমি—একরূপ মায়া-কানন বলিলেই চলে। এই দুর্গম পঞ্চবটী বনে

আসিয়া রাক্ষস মায়ায় শুধু রাম লক্ষ্মণ সীতা নহেন—রামায়ণ-রচক কবিগণের অনেকেই অল্পাধিক পরিমাণে প্রতারিত ও বিড়ম্বিত হইয়াছেন। সীতা-চরিত্র-চিত্রণে হস্তক্ষেপকারিগণ মাত্রেরই এই স্থানে অতিমাত্র সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রায় সকল কবিই এই দুর্গম বনপথে আসিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। সংস্কৃত কবি-গুরুর কথা ছাড়িয়া দিয়া, বাঙ্গালা কবিগুরু হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক পালা-গায়কগণ পর্য্যন্ত কেহই সীতা চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অন্যান্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা প্রাচীন কবিগুরু ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবির দু'একটী কথা লইয়া আলোচনা করিব।

বনভূমির শ্যামলতার উপর বিদ্যুৎ খেলাইয়া স্বর্ণমৃগ চলিয়া গিয়াছে। রাম ধনুর্ব্বাণ হস্তে তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অকস্মাৎ দূরে রামতুল্য কাতরধ্বনি। ভয়ত্রস্তা সীতা দেবী লক্ষ্মণকে রামের অন্বেষণে যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ সীতাকে বনে একাকিনী রাখিয়া কেমন করিয়া যাইবেন, অথচ না গেলেও নয়। উভয়বিধ বিপদে পড়িয়া লক্ষ্মণ বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। আবার সেই হা—হা-কার। সীতার একান্ত অনুনয়ে লক্ষ্মণ এবারও কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। ধনুর্দ্ধর রাম অপেক্ষা সহায়হীনা মাতা জানকীর চিন্তাই লক্ষ্মণের মনে বেশী করিয়া জাগিতেছিল। এইবার তিরস্কারের পালা—

আধুনিক শ্রেষ্ঠ কবির সীতা এই স্থানে বলিতেছেন—

"সুমিত্রা শ্বাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে
ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী * *

এই স্থানে ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনীর মত সীতাই লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিয়াছেন। এ আক্রমণ যেমন অসঙ্গত, তেমনি অন্যায়। আমাদের বিশ্বাস, কবি এই স্থানে তাঁহার চির-স্বাভাবিক বীররসের প্রাধান্য বজায় রাখিতে যতটুকু চেষ্টা করিয়াছেন, সীতা-চরিত্রের সুশীলতা, কোমলতা রক্ষা করিতে ততটুকু যত্ন করেন নাই।

ততোঽধিক অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী আমাদের গৌড়জন-নমস্য-বাঙ্গালা কবিগুরু কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাসের সীতা বলিতেছেন -

"ভরত লইল রাজ্য, তুই নিলি নারী"

এই ছত্রটী পড়িয়া আমাদিগকে অতিমাত্র ঘৃণায় "ছি" বলিতে ইচ্ছা করে! কৃত্তিবাসী রামায়ণে শুধু এই স্থানে নয়, রাম-বনবাসের কালেও সীতাদেবী স্বামীকে বুঝাইতেছেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া না গেলে

"পেয়েছিলা রাজ্য লইল যেই জন
স্ত্রী লইতে তাহার বিলম্ব কতক্ষণ।"

যে ভরত রামশূন্য অযোধ্যার রাজ্য-প্রাপ্তিকে অভিসম্পাতের মত মনে করিয়া মাতাকে রাক্ষসী বলিয়া গালি দিয়াছিলেন, রাজ্যে রাজভবনে থাকিয়া যিনি বনচারী যোগী—রাম-পদচিহ্নিত পাদুকা মাত্র সিংহাসনে রাখিয়া যিনি ছত্রধারী রূপে দাঁড়াইয়াছেন, একদিন যাঁহার অশ্রুজলে চিত্রকূট গিরিশৃঙ্গ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই ভ্রাতৃ-প্রেমের একনিষ্ঠ সাধক রাজযোগী ভরতকে সীতা কি করিয়া এমন ধিক্কার দিতে পারেন! আর লক্ষ্মণ—লক্ষ্মণের কথা আমরা বেশী কিছু বলিব না। পাঠক তাহা মনে মনে উপলব্ধি করিবেন। এমন যে ভ্রাতৃ-প্রেমের মূর্ত্ত অবতার—রাম সীতার পদবিদ্ধ কুশাঙ্কুর উন্মোচন—তাঁহাদের ক্ষুধার ফল, তৃষ্ণার জল যোগানই যাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম—এই কর্ত্তব্যের প্রেরণাই যাঁহাকে সুখময় রাজত্ব, যুবতী ভার্য্যা—সব ছাড়িয়া বনে আনিয়াছে, যাহা নিজের সুখ, দুঃখ, আশা, তৃষা, ভোগ-লালসা ভ্রাতৃ-প্রেমের একটা উচ্ছ্বসিত ধারার মত রাম-রূপ মহাসাগরে যাইয়া বিলীন হইয়াছে,—নিজের কোন পৃথক সত্তা রাখে নাই—সেই লক্ষ্মণের চরিত্রে সীতা কেমন করিয়া এমন একটা অমূলক সন্দেহ আনিতে পারেন! সত্য বটে সীতা বিপদ-বিহ্বলা—কিন্তু আমরা মনে করি, অতিমাত্র ভয়ে, অতিমাত্র বিপদে—অতিমাত্র ক্রোধে—কিম্বা বিরাগে মাতা পুত্রকে যতটুকু বলিবার ততটুকুই বলিতে পারেন,—কার্য্যকারণ-বশে তিনি যতই অসংযত, অসহিষ্ণু হন না কেন, কিছুতেই গণ্ডীর সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন না। এই স্থানে লক্ষ্মণের অমল-ধবল চরিত্রের উপর সীতার এই ক্রূর কটাক্ষ অতিমাত্র অস্বাভাবিক হইয়াছে। লক্ষ্মণ

দুইবার শক্তিশেলে পড়িয়াছিলেন—একবার পঞ্চবটীতে সীতাবাক্যরূপ বজ্রাগ্নি-বাণে, আর একবার রণ-ক্ষেত্রে রাবণ-নিক্ষিপ্ত শক্তি-বাণে। আমাদের মনে হয়, প্রথমোক্ত শক্তিশেলের ঘা'ই লক্ষ্মণের বুকে বেশী বাজিয়াছিল।

তবে আমাদের বিশ্বাস—এই অমার্জ্জনীয় অপরাধের জন্য আমাদের চির-নমস্য কবি কৃত্তিবাস দায়ী নাও হইতে পারেন। হয় ত কৃত্তিবাসের নামের অন্তরালে কোন কাণ্ডহীন অসামাজিক কবি অক্ষম হস্তে তুলি-চালনা করিয়া নমস্য কবিকে উপহাস্য করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি সীতা চরিত্র আঁকিতে গিয়া এইরূপ রাক্ষসীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। ভুবন-বন্দিতা সীতা-চরিত্রে এই দুরপনেয় কলঙ্করেখা অঙ্কিত করিয়া কবি যে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের বাস্তবিকই দুঃখ হয়। এই কথা কয়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই আমাদের মনে হয়, মহাকবি কৃত্তিাসের লেখনী হইতে এমন কথা বাহির হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

দেখা যাক, এই স্থানে আমাদের কবি চন্দ্রাবতী কি করিয়াছেন। প্রথমেই সেই বনদম্পতির একটি মনোজ্ঞ চিত্র। অদূরে পর্ণ-কুটীর! শাল-বৃক্ষতলে পত্র-শয্যায় সীতার কোলে মাথা রাখিয়া অর্দ্ধশায়িত নব-দূর্ব্বাদল-শ্যামরূপ রাঘব। শিয়রে বসিয়া কুটীর-লক্ষ্মী সীতা চম্পকোপম অঙ্গুলি দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের জটাভার সঞ্চালন করিতেছিলেন। তীক্ষ্ণ-মুখ বাণ দ্বারা লক্ষ্মণ রাম-পদবিদ্ধ কুশাঙ্কুর উন্মোচন করিতেছেন। এমন সময় বনভূমির শ্যামলতায় বিদ্যুৎ খেলাইয়া সোণার হরিণ চলিয়া গেল। কৌতূহলাক্রান্তা সীতা বলিলেন—দেব দেব, দেখ, কি সুন্দর হরিণী।

"হরিণী ধরিয়া দেহগো পালিব ইহারে
যতনে বান্ধিয়া রাখব কুটিরের দুয়ারে
সোণার হরিণ অঙ্গে গো বিজলীর ঝলা
ইহারে ধরিয়া দেও গো পাতিবাম সহেলা

মুগ্ধা প্রিয়ার মনোরঞ্জনার্থ রাম তৎক্ষণাৎ ধনুকে নাগপাশ অস্ত্র যুড়িয়া হরিণীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই বনের ঘনশ্যামলতায় নবঘনশ্যামরূপ মিশিয়া গেল। এর মধ্যে "সীতাদেবী করিলেন কুটিরে প্রবেশ।" কুটীরের অদূরে শাল বৃক্ষের কাণ্ডে হেলিয়া ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অকস্মাৎ দূর বনে—রামের করুণ আর্ত্তনাদ! ভয়-বিহ্বলা সীতা দেবী চকিতের মত দৌড়িয়া কুটীরের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ সেই আকস্মিক রোদন-ধ্বনি শুনিয়া

"ধনুকে যুড়িয়া বীর অগ্নিসম বাণ
লম্ফ দিয়া ধায় বীর গো সিংহের সমান;"

সুপ্ত সিংহ ত্রস্তে জাগিয়া উঠিলে তাহার গ্রীবাদেশের কেশর সকল যেমন নাচিয়া উঠে, লক্ষ্মণের জটা-কলাপ সেইরূপ নড়িয়া উঠিল।

"দুই পাও গিয়া লক্ষ্মণরে ফিরিয়া দাড়ায়"

... ...

এই স্থানে লক্ষ্মণের সজাগ চিত্রটি খুব সুন্দর হইয়াছে। রামের আহ্বান শুনিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার সাহায্যের জন্য ধাবিত হইতেছিলেন। লক্ষ্মণের দশেন্দ্রিয় রাম-সেবায়, রামকার্য্যে কিরূপ উন্মুখ হইয়া থাকিত, এই দুইটি মাত্র ছত্রে তাহা কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! পরক্ষণেই আবার সীতার চিন্তা-রূপ নির্ঝর-ধারা যেন সহসা শৈলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া দাঁড়াইল। সীতা লক্ষ্মণের মানসিক ভাব বুঝিলেন; বলিলেন, লক্ষ্মণ, তুমি আমার জন্য চিন্তা করিও না,—বনে তরু লতা পশুপক্ষী আছে, তারা আমায় রক্ষা করিবে। লক্ষ্মণ তখনও অবিচল, চিত্রার্পিত পুত্তলির মত দণ্ডায়মান। আবার সেই ধ্বনি!

সীতা বলিলেন "বনেতে বসইয়া যত বনের দেবতা
বিপদের কালে তারা রক্ষিবেন সীতা।"

কিন্তু ইহাতেও লক্ষ্মণের প্রবোধ হইতেছে না। বিশাল ধনুকের অগ্রভাগ মাটিতে রাখিয়া নতমুখে তেমনি অচঞ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি করিবেন, এই চিন্তায় তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যৈষ্ঠ মাসের রক্ত-জবার মত লাল হইয়া উঠিল।

এদিকে কাতর আর্ত্তনাদ ক্রমে বাড়িয়া চলিল। সীতা তখন সংযত ভাবে লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—

"যদি আমি সতী হই পতি পদে মতি
আকাশের দেবতাগণ খণ্ডাবেন দুর্গতি।"

আর যদি তা না হয়—

"যদি অমঙ্গল ঘটে ধর্ম্ম বিদ্যমানে,
কি করিবে লক্ষ্মণ তোমার অগ্নিবাণে"

বলিতে বলিতে সীতার মুখমণ্ডল শুকতারার মত জ্বলিয়া উঠিল।

ইহাই সন্তানের প্রতি মায়ের উপযুক্ত বাণী। ঘোর বিপদে এমন সংযত শান্ত মূর্ত্তি একমাত্র সীতা দেবীতেই সম্ভবে। এই স্থানে চিরশান্ত কোমল সীতা-চরিত্রের যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে, অন্য রামায়ণে তাহা বড় দেখা যায় না। আর লক্ষ্মণ—ধর্ম্মপ্রাণা সতী তাঁর সত্যধর্ম্মে নির্ভর করিয়াছেন; সুতরাং লক্ষ্মণের আর কিছু বলিবার নাই। এই সত্যধর্ম্মের কাছে শত লক্ষ্মণের অগ্নিবাণও ছার! লক্ষ্মণ আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অন্যান্য কবির চিত্রিত সীতা অপেক্ষা চন্দ্রাবতীর সীতার এই উৎকর্ষতার কারণ, আমাদের বিশ্বাস, পুরুষ যেস্থানে নারী-চরিত্র আঁকিয়াছেন, সেইখানে পুরুষোচিত দর্প দম্ভ সকল প্রকার অসংযতভাব বজায় রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু নারী নারীর চরিত্র-অঙ্কন-কালে তাঁহার স্বভাবসংযত হস্তে লজ্জা, বিনয়, ধর্ম্মশীলতা, ঔদার্য্য, মাধুর্য্য প্রভৃতি নারীর স্বাভাবিক কোমল বৃত্তিগুলিকে যথাযথ ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই কারণে পঞ্চবটীর দুর্গম অন্ধকারে রাক্ষস-মায়ায় প্রতারিত সীতাকেও আমরা প্রকৃত সীতারূপে দেখিতে পাই। আরও একটি কথা—কবির কাব্য একরূপ দর্পণ স্বরূপ। তবে সাধারণ দর্পণে ও কাব্য-দর্পণে এইটুকু প্রভেদ,—সাধারণ দর্পণে বাহ্য প্রতিকৃতির ছায়া মাত্র পড়ে, কিন্তু কাব্য-দর্পণে কবির অন্তর-প্রকৃতির ছায়াই বিশেষরূপে প্রতিফলিত হয়। আমরা এই স্থানে সেই যোগশান্তা, একান্ত শুদ্ধচারিণী ধর্ম্মপ্রাণা মহিলা-কবির স্বরূপটি বুঝিয়া লইতে পারিতেছি।

সীতাহরণ। পথে মহাপ্রাণ জটায়ুর অস্থিদান। এ সব ব্যাপারে কোনও নূতনত্ব, বিশেষত্ব নাই। মহাশূন্য ভেদ করিয়া পুষ্পকরথ লঙ্কাভিমুখে ছুটিয়া চলিল। রথচক্রের ঘর্ঘণে ও সীতার আকুল আর্ত্তনাদে আকাশ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। রাবণ সীতাকে লইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন।

জনশ্রুতি। সীতা লঙ্কায় পদার্পণ করিবামাত্র একটা আকুল জনরব সহস্র মুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। এই সীতা রাবণের কন্যা! লঙ্কার গোঠে-মাঠে ঘাটে-পথে যেখানে-সেখানে পর্ব্বতে-পুলিনে বনে-বিপিনে বাজারে-বন্দরে অন্তঃপুরে-দরবারে কেবলই এই কথা। সাগরের জলোচ্ছ্বাসে, পাখীর কাকলীতে, বৃক্ষের মর্ম্মরে কেবলই এই কথা। জলে স্থলে আকাশে বাতাসে কেবলই এই কথা। স্বামী-স্ত্রীতে, সই-সঙ্গিনীতে, ভ্রাতায়-ভগ্নীতে, পিতায়-পুত্রে কেবলই এই কথা। রাজপথে গৃহে যেখানেই জনতা, সেই স্থানে সহস্র মুখে কেবল এই কথা লইয়াই আন্দোলন!

এ সংবাদ কে আনিল, কোথা হইতে আসিল, তাহার কোনও উত্তর নাই। অথচ সহস্র মুখে এই জনরব প্রচারিত হইতেছে। রাবণ চিন্তিত হইয়া শুক-সারণকে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া জনরবের মূল ভিত্তি অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। উদ্দেশ্য—যদি সীতা প্রকৃতই রাবণ-কন্যা হন, তবে কনক-লঙ্কার অর্দ্ধেক রাজত্বসহ রামের সীতা রামকে অর্পণ করিবেন; সমুদ্রোপকূলে মানুষে-রাক্ষসে একটা মেলামিলি কোলাকুলি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু দুরদৃষ্ট রাবণের সে সাধ পূর্ণ হইল না। পথে ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্রাগ্নিতে পুড়িয়া শুক-সারণ ভস্ম হইয়া গেল। তাহা না হইলে রাবণ-বধ হয় না।

সুগ্রীব-মিলন। এই ব্যাপারেও কোন নূতনত্ব নাই। উভয়ে সমদুঃখভাগী, স্ত্রী-রাজ্য-হারা। যজ্ঞকাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া রাম ও সুগ্রীবে সখ্যতা স্থাপিত হইল। সাক্ষী রহিল—এই ঋষ্যমুখ গিরি—আর মাথার উপরে চন্দ্র সূর্য্য!

অভিযান। দুরদৃষ্ট রাবণের সুখের নিশি ধীরে ধীরে পোহাইতেছিল। এদিকে শুক-সারণ ফিরিয়া আসিল না। এমন সময় এক দিন নৈশ রজনীর বিপুল অন্ধকারের মধ্য দিয়া বানর-সেনা লঙ্কার চারিদিক ঘেরাও করিয়া বসিল। লঙ্কাবাসিগণ সহসা সুপ্তোত্থিতের মত সভয়ে সুখ-নিদ্রা হইতে জাগিয়া দেখিল, লঙ্কার গাছে-গাছে, ডালে-ডালে, পাতায়-পাতায়, প্রাসাদ-শিখরে, গৃহচূড়ে অসংখ্য কপি-সৈন্যের সারি। আষাঢ়ের মেঘের মত কোথা হইতে আসিয়া—এই এক রাত্রে লঙ্কার আকাশ-বাতাস ছাইয়া ফেলিয়াছে—মহাসাগর নিজ বুকের উপর দিয়া তাহাদের গন্তব্য পথ খুলিয়া দিয়াছে।

লঙ্কাকাণ্ড। চন্দ্রাবতীর লঙ্কাকাণ্ডে তুরী ভেরী রণ-দামামার ঘোর রোল, সৈনিকগণের আস্ফালন—এ সব আড়ম্বর বড় বেশী নাই। এত বড় লঙ্কাকাণ্ডটা কবি যেন এক

লক্ষ্মণ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী [Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। রাক্ষস-বীরগণের মধ্যে একদিন যে যুদ্ধে গিয়াছে, সে আর ফিরিয়া আসে নাই।

ইহার দুইটী কারণ হইতে পারে; একটী—চন্দ্রাবতী নারী—ভয়াবহ রণক্ষেত্রের বর্ণনা ততটা ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। আর দ্বিতীয় কারণ—হয় ত উপেক্ষা করিয়াও যাইতে পারেন। রাম রাবণের যুদ্ধ, ধরিতে গেলে, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মের অভিযান। অত্যাচারীর দর্পোন্নত শিরকে নমিত করিয়া শান্তি তাহার বিজয়-পতাকার ধ্বজ-দণ্ড প্রোথিত করিতেছেন। পুণ্যের আলো ফুটিয়া উঠা মাত্র পাপের তিমির নিমেষে নাশ হইয়া গিয়াছে। এই জন্য মহিলা-কবি বোধ হয় যুদ্ধ-বর্ণনার বাহুল্য দেখাইতে ইচ্ছা করেন নাই। কপিল মুনির একমাত্র অগ্নিদৃষ্টিতে যেমন সগর রাজার ষষ্টিসহস্র পুত্র নিমেষে ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছিল, সেইরূপ সতীর একটী মাত্র দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে বিশাল রাক্ষসপুরী জলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে। রাক্ষস-বংশে দীপ জলিবার এক বিন্দু তৈল কিংবা সলিতার অংশটুকু অবশিষ্ট পড়িয়া থাকিতে পায় নাই। কিন্তু চন্দ্রাবতী যেটুকু বর্ণনা করিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত হইলেও, তাহা যুদ্ধ-বর্ণনা; আমরা তাহার একটুকু স্থান তুলিয়া দেখাইতেছি।

"আজি রণে আইল বীর গো বীরবাহু নাম
রাবণের পুত্র সেই বীরবাহু নাম
দশ বাণ রামচন্দ্র গো ধনুকেতে জুড়ে
ভস্ম হইয়া বীরবাহু গো আকাশেতে উড়ে"

এই চারি ছত্রে বীরবাহু-বধ শেষ। ইন্দ্রজিৎ রাবণ সকলেই এইরূপ অল্পেতেই শেষ হইয়াছেন।

প্রভেদ। এই স্থানে আর একটী কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও বাঙ্গালার অন্যান্য পালা-গায়কগণের রামায়ণ বৈষ্ণব-কবিগণের হস্ত-প্রক্ষেপে একখানা অভিনব ভাগবতে পরিণত হইয়াছে। এই সমস্ত কবিগণের অতিমাত্র ভক্তি ও প্রেমাশ্রুতে কৃত্তিবাস অতি দূরে ভাসিয়া গিয়াছেন। লঙ্কার রণভূমি সংকীর্ত্তন-ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। রণভূমিতে বীরবাহুর দিব্যজ্ঞান, রাম-শরে হত না হইলে রাক্ষস-দেহের উদ্ধার নাই, রামের অগ্নিবাণ তরণীর গলে পুষ্প-মালার আকার ধারণ, রাবণ কর্ত্তৃক রামের স্তব, বিংশতি লোচন হইতে দরদর প্রেমাশ্রু বহিয়া রণক্ষেত্রে যমুনা নদী প্রবাহিত হওয়া, ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া রামের অভিমান করিয়া বসা, তিনি ভক্তকে মারিয়া সীতা উদ্ধার ত করিবেনই না পরন্তু অযোধ্যায়ও ফিরিয়া যাইবেন না,—এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় প্রক্ষিপ্তকারী বৈষ্ণব কবিগণ মস্ত একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা যদি রামকে কানাই, লক্ষ্মণকে বলাই, সীতাকে প্রেমময়ী রাই সাজাইয়া, রাবণকে কংসে পরিণত করিয়া, রামায়ণ নাম মুছিয়া ফেলিয়া তদ্দ্বারা একখানা অভিনব ভাগবত রচনা করিয়া যাইতেন, ইচ্ছা করিলেই তাঁহারা প্রেমভক্তির অশ্রুর বন্যায় কৃত্তিবাসকে দূরে অতি দূরে ভাসাইয়া দিতে পারিতেন; —করেন নাই কেন? কবিগুরুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হার হইবে বলিয়া কি? আমাদের বিশ্বাস, রাজপ্রাসাদ হইতে মুদির দোকান পর্য্যন্ত সকলে সমস্বরে বৈষ্ণব কবিরই জয়ধ্বনি করিত—ভোটে কবিগুরু নিশ্চিত হারিয়া যাইতেন।

কবির কাব্য সাময়িক দর্পণস্বরূপ। তাহাতে যুগে যুগে সমাজ ও জাতীয় জীবনের ছায়া প্রতিফলিত হইয়া থাকে। রামায়ণ যে যুগের কাব্য, তাহা শৌর্য্য-বীর্য্যের যুগ। বালক রাম লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক তাড়কা রাক্ষসীর নিধন—হরধনুর্ভঙ্গ—দাক্ষিণাত্যের বিরুদ্ধে অভিযান—এ সবে বীরত্বেরই আদর সূচিত হইতেছে। অনুবাদের যুগে দেখা যায়—বাঙ্গালী পুরুষোচিত শৌর্য্য-বীর্য্য হারাইয়া তাহার স্বভাবের অর্জ্জিত অতিভক্তি ও প্রেমাশ্রু লইয়া ঘরে বসিয়াছিল। তাই অন্যান্য জাতির যাহা রণক্ষেত্র, বাঙ্গালীর তাহা মৃদঙ্গ-মুখরিত কীর্ত্তন-ভূমি। অন্যান্য জাতির অস্ত্র তীর তরোয়ার, বাঙ্গালীর ব্রহ্মাস্ত্র ভক্তি আর চক্ষের জল! কিন্তু সকল মানুষই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নহেন যে, কেবল প্রেমাশ্রুতে জয়লাভ করিবেন; আর সকল দস্যুই জগাই মাধাই নহে যে কেবল মাত্র চক্ষের জলে গলিয়া যাইবে। এই কালে বাঙ্গালী যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া আপন জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তখন জাতীয় সাহিত্যের আদর্শকে এইরূপ খাটো করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রভেদের কারণ। শুধু কৃত্তিবাসী রামায়ণ নহে—ময়মনসিংহের প্রচলিত অনেক পালা-গায়কগণও গঙ্গাজলে এইরূপ যমুনার ধারা মিশাইয়াছেন। সম্ভবতঃ লোক-মনোরঞ্জনার্থ তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব-কবিগণের নিকট হইতে এইরূপ ধার করিতে হইয়াছে। কারণ সেকালে রামায়ণ-গান গায়কগণের জীবিকা-নির্ব্বাহের একটা উপায় ছিল।

কিন্তু চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ময়মনসিংহের কুলললনাগণের অঞ্চলের ধন। তাহাকে আসর-গানের মুখাপেক্ষী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয় নাই। তাই খাঁটি জিনিষে ভেজাল মিশিতে পায় নাই।

অন্যতম ঘটনা। রাবণ-বধের পর দুইটী প্রধানতম ঘটনা। একটী রাবণের নিকট রামচন্দ্রের রাজনীতি-শিক্ষা; দ্বিতীয়টি সীতার অগ্নি-পরীক্ষা। এই দুইটী ঘটনাই চন্দ্রাবতীর রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। রাজনীতি-শিক্ষার কথা ছাড়িয়া দিয়া অগ্নি-পরীক্ষার কথাই বলিব। এইরূপ পরীক্ষা শুধু রামায়ণে নহে—পৌরাণিক যুগে অধিকাংশ কাব্যেই এইরূপ অগ্নিশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাই। বোধ হয় দেশ জুড়িয়া তখন এই ভাবের একটা বন্যা বহিয়া গিয়াছিল। যে গরীয়সী নারী জীবনের পর-পার হইতে ধাতার নিয়তি খণ্ডন করিয়া আনিয়াছিলেন—লৌকিক পরীক্ষার হাত হইতে তিনিও অব্যাহতি পান নাই। বনবাসে ছেলী চড়াইবার অপরাধে পতিব্রতা খুল্লনাকেও এইরূপ অগ্নিদগ্ধ হইতে দেখিতে পাই। কবিগুরুর রামায়ণেও সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথা জমকালো ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে! তবে চন্দ্রাবতীর রামায়ণে তাহা নাই কেন?

কারণ—বোধ হয় একমাত্র রাবণের অশ্রুজল। রাম-শরে নিপতিত ছিন্নমূল মহাদ্রুমের মত রাবণ-দেহ সাগর-সৈকতে পড়িয়া লুটাইতেছে। ব্রহ্মাস্ত্রে ক্ষত বক্ষস্থল হইতে রক্তোৎসের ধারা বহিয়া সাগর-তরঙ্গকে রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছে। কুড়ি চক্ষু স্থির। মুখে শব্দ নাই। বজ্রাঘাতে ভূপতিত গিরিশৃঙ্গের মত অচঞ্চল—কেবল মাঝে মাঝে একটা মর্ম্মন্তুদ দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাঁহার বুকের পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিতেছিল। হৃদয়ে এক জ্বালা। সে জ্বালার কাছে ব্রহ্মাস্ত্রের ঘাও নির্ঝর-ধারার মত শীতল। রাক্ষসগণ ভীমবাহু লঙ্কানাথের চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাবণ তাহাদিগের পানে চাহিয়া অতি কষ্টে বলিতেছেন

"আজও যদি শুকসারণরে তারা আসিত ফিরিয়া
অর্পিতাম রামেরে সীতা অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া।"

কুড়ি চক্ষে শ্রাবণের ধারা বহিল। বক্ষের রক্তোৎস অকস্মাৎ থামিয়া গেল। ত্রিলোকের শঙ্কাস্বরূপ দুর্জ্জয় দেবদৈত্য-বিজয়ী বীর জন্মের মত চক্ষু মুদিলেন।

এই স্থানে অনুতপ্ত রাবণের অন্তিম অশ্রুজলে সীতা-চরিত্রের সমস্ত সন্দেহ কলঙ্ক নিশ্চিহ্নে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কৃত্তিবাসাদি রামায়ণে সীতা-চরিত্রের এই সন্দেহ অপনোদন জন্য রাবণের রম্ভাবতী-হরণ প্রভৃতি অনেক অবান্তর গল্প-ঘটায় কাব্য-কলেবর অসঙ্গতরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তা ছাড়া, কবিগণ আরও অনেক অসার আড়ম্বরপূর্ণ কথায় পাঠকের হৃদয় হইতে সীতা-চরিত্রের সন্দেহ-কালিমা মুছিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক স্থানে দেখা যায়, কৃত্তিবাসের সীতা বলিতেছেন—

"বাল্যকালে খেলিতাম বালক মিশালে
স্পর্শ নাহি করিয়াছি পুরুষ ছাওয়ালে"

এই সব ছত্রে তদানীন্তন ছোঁয়াচে-রোগগ্রস্ত বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ধারণা উত্তমরূপে প্রকটিত হইতেছে। এইরূপ উদ্ভট কল্পনায় গড়া নারীর সতীত্বের উপকরণ, আমাদের মনে হয়, দুর্ব্বলচিত্ত বাঙ্গালীর সেই ভাবাবেশ ও অশ্রুজল। সন্দিগ্ধচিত্ত কবিগণ পরের মনের সন্দেহ ঘুচাইতে গিয়া নিজের মনকেই বুঝাইয়া উঠিতে পারেন নাই। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের মহিলা-কবি অনুতপ্ত রাবণের এই কথার পরেও সীতাকে পুনরায় অগ্নি-পরীক্ষায় ফেলিয়া, অবিচারিত পরছন্দানুবর্ত্তিতা-দোষে দোষী হন নাই। এইটুকু চন্দ্রাবতী রামায়ণের নিজস্ব। এই মহিলা-কবির কাছে যাহা সত্যধর্ম্ম, তাহা চিরকাল অক্ষত ও নির্ম্মল বস্তু। তাহা পার্থিব মণিমুক্তা বা স্বর্ণ নহে যে, অগ্নিতে পুড়াইয়া বিশুদ্ধ করিতে হইবে। ইহা অপার্থিব, ইহা দেবতার দান!

আরও একটী কথা—বিশ্ব-সাহিত্যের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমার্জ্জনীয় মহাপাপী—পরাক্রমী, পরস্বাপহারী, পরদারগ্রাহী, একান্ত-ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, দুরাচার, দুর্ব্বিনীত রাক্ষস—যাহার জন্য অন্ততঃ আমাদের আহা বলিবার অধিকারটুকু নাই—সেই অনুতপ্ত রাবণের শেষ-শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চন্দ্রাবতী তাহার জন্য আমাদিগকে এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিবারও অধিকার দিয়াছেন; আমরাও তাঁহার প্রসাদে এই শান্তিটুকু লইয়া ঘরে ফিরিতে পাইতেছি।

উত্তরকাণ্ড অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন। রাবণ-বধের পর পুষ্পকা-রোহণে রাম সীতা চৌদ্দ বৎসরের পর অযোধ্যায় ফিরিয়া

গেলেন। রামের অযোধ্যা রামকে পাইয়া আবার পূর্ণশ্রীতে ভরিয়া উঠিল। অযোধ্যার সে আনন্দ অবর্ণনীয়। বশিষ্ঠাদি কুলপুরোহিত ও পাত্রমিত্র সকলে মিলিয়া আবার অভিষেকের আয়োজন করিলেন। পূর্ব্বাভিষেকে যে আনন্দ অর্দ্ধাবয়বে বিকাশ পাইয়া শরতের উষার মত অকাল-মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিল—আজ তাহা দ্বিগুণ শোভা ও সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিল। কলস্বরা সরযূ আবার গিরি-বনের কাণে কাণে রাম-সীতার আগমন-বার্ত্তা গাহিয়া গদগদ নাদে উজান বহিল। সরযূর যে রেখাটি রাজ-অন্তঃপুরের পাদমূল ধৌত করিয়া প্রবাহিত হইত, সীতার অলক্তক-রঞ্জিত পদের নূপুর-শিঞ্জিনী ও স্পর্শসুখ হারাইয়া আজ চৌদ্দ বৎসর অভিমানে তাহা শুকাইয়া গিয়াছিল,—সহসা তাহা কূলে কূলে ভরিয়া উঠিল। উল্লসিতা অযোধ্যাবাসিনিগণ রাম সীতার মঙ্গল-কামনায় সরযূ-তরঙ্গে আবার দীপ ভাসাইয়া দিলেন।

সীতার বারমাসী। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে ইহা একটী কবিত্বময় অধ্যায়। সীতা চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে গত জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী সখিগণের নিকট ব্যক্ত করিতেছেন।

"সাত পাচ সখি বৈসে জোড় মন্দির ঘরে
এক সখি কহে কথা জিজ্ঞাসে সীতারে
তুমি যে গেছলাগো সীতা অশোক বন বাসে
কোন কোন দুঃখ পাইলা কোন মাসে
আমার দুঃখের কথা শুনিতে কাহিনী
কহিতে কহিতে উঠে জ্বলন্ত আগুনী—"

এই বারমাসী বর্ণনায় কেবল অশোক-বনের কথা নহে। হরধনুর্ভঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া বনবাস ও অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত সমস্ত কাহিনী কবি নিজ চক্ষের জলে সহজ সুললিত ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। চন্দ্রাবতীর সমস্ত রামায়ণ অপেক্ষা এই অংশটিই অধিক পরিমাণে গীত হইয়া থাকে। উচ্ছ্বাস দমন করিতে না পারায় এই বারমাসীতে কবির অনেক পুনরুক্তি দোষ ঘটিয়াছে। হইলেও তাহা মহিলাগণের কাছে অত্যন্ত আদরের সামগ্রী।

অশোক-বনবাসের দুঃখপূর্ণ দিনগুলি বন্দিনী সীতা কিরূপ উৎকণ্ঠায় কাটাইয়াছেন, আমরা তাহার দুই একটী পদ মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি। এই বারমাসী ধরিতে গেলে একটি খণ্ড-রামায়ণ। স্থানাভাবে ইহার নূতনত্ব সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিলাম না।

বৈশাখমাসে—

"রাঙ্গা না অশোক পুষ্প ফুটিয়াছে ডালে
এত দুঃখ অভাগিনী গো সীতার কপালে
আমার কান্দনেরে ভাসে অশোক বন
বৃক্ষডালে রইসা কান্দে পবন নন্দন"

এত দুঃখের পর আবার যুদ্ধের চিন্তা—কি জানি কি হয়—

"আজি শুনি ইন্দ্রজিতরে যাইবেক রণে
প্রভু রামে কে রাখিবে রাক্ষসার বাণে"

পাশাখেলা—ইহাতে সীতার বনবাসের পূর্ব্ব-সূচনা আনিয়া দিতেছে। এই পাশাখেলা চন্দ্রাবতী রামায়ণে একটি অভিনব ঘটনা।

"সুখবসন্তের কথা শুন সখীগণ।
রতণ মন্দিরে রে কৌশল্যানন্দন॥
উপরে চান্দোয়া টাঙ্গায় গো নীচে শীতলপাটি।
রাম সীতা বসিলেন হাতে সোণার কাটি॥
সুবন্নের গুটিতে গো ঘড় সাজাইয়া।
রামচন্দ্র খেলে পাশা সীতারে লইয়া॥
লক্ষ্মীর সহিত পাশা গো খেলায় নারায়ণে।
ইন্দ্র যেন খেলায় পাশা শচীরাণীসনে॥
মদনের সহিত যেমন গো পাশা খেলায় রতী।
হরের সহিত পাশা খেলায় পার্ব্বতী॥

অশোক কিংশুক চাম্পা সম্ভার-শোভিত শীতল মন্দির হাস্য-পরিহাসে জয়-মঙ্গলগীতে নূপুর-রুণুতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। চটুলা সহচরিগণ সোণার বাটায় পান-গুয়া লইয়া— "চান্দেরে ঘেড়িয়া যেন তারার মণ্ডলী।"

পাশাখেলা আরম্ভ হইল। রামচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিলেন খেলায় সীতার জয় হইলে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট পূর্ণ করিবেন।

"পড়িল পাশার দান খেলিতে খেলিতে
হারিলেন রামচন্দ্র সীতাদেবী জিতে"

সীতা রামের নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন। সে বর আর কিছুই নহে—

"বহুদিন হইতে গো মোর আশা ছিল মনে।
আর বার যাইতাম আমি গো মুনি তপোবনে।

তমসা নদীর কথাগো সদা পড়ে মনে
রাজহংস খেলা করে কমলের বনে
প্রতি নিশি স্বপ্নে দেখিগো মুনির কন্যাগণে
তোমার সঙ্গেতে যেন বেড়াই বনে বনে”

পঞ্চবটীর সেই কেকাধ্বনি-নিরত নৃত্যশীল ময়ূর-ময়ূরী, হরিণ-হরিণীকে সীতা তখনও ভুলিতে পারেন নাই। গোদাবরী-তরঙ্গে সন্তরণশীলা রাজহংস সকল ও পদ্মবনের শোভা তাঁহার চক্ষের সম্মুখে চিত্রপটের মত বিলম্বিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। স্বামীর হাত ধরিয়া অটবী-গুল্ম-পার্শ্বে বিচরণকারিণী সীতা অযোধ্যার রাজভবনে আসিয়াও প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের কথা ভুলিতে পারেন নাই। বনসঙ্গিনীদের কথা রহিয়া রহিয়া সীতার মনে পড়িতেছিল।

সীতা তখন অন্তঃসত্তা। এ অবস্থায় তাঁহার কোন কামনা অপূর্ণ রাখিতে নাই। রাম প্রিয়তমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

“চন্দ্রা কহে দৈবের দুঃখ আর না যায় খণ্ডানি
কি বর মাগিলে হায় জনকনন্দিনী!”

সীতার বনবাস। যে উত্তরকাণ্ডে সীতাচরিত্র চরম উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, অনেকের মতে তাহা কবিগুরুর লেখনী-প্রসূত নহে। উত্তরকাণ্ডের যে অংশটি কবিগুরুর নামে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে সীতা-চরিত্রে সন্দেহ-বশে রামকে তেমন বিচলিত হইতে দেখি না। “তিনি জগৎ মধ্যে শুদ্ধা। তিনি আমার প্রতি প্রীতা হউন” এই বলিয়া রাম ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

মহাকাব্যের নায়কের উপযুক্ত কথা বটে। সাগর পর্ব্বত অনন্ত আকাশ এ সব একরূপ স্বভাবের মহাকাব্য। এই সকল মহাকাব্যের স্রষ্টা বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং। এই সকল স্বাভাবিক মহাকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত মনুষ্য-বিরচিত যে গ্রন্থ, তাহাই মহাকাব্য। যিনি এই মহাকাব্যের নায়ক তাঁহাতে থাকিবে মহাসাগরের মত অতলস্পর্শ বিশ্বপ্রেম; তিনি হইবেন পর্ব্বতের মত অটল অচল—দৃঢ়চেতা উন্নত। তাঁহার হৃদয় হইবে ঐ অনন্ত আকাশেরই মত উদার-উন্মুক্ত। সাধারণ মানুষ হইতে তিনি থাকিবেন একটু স্বতন্ত্র। তিনি বীর অথচ আশ্রিত-পালক, সাহসী অথচ ধর্ম্মভীরু, দণ্ডদাতা অথচ ক্ষমাশীল। কিন্তু সীতা-নির্ব্বাসন-দাতা রামচন্দ্র সেই মহাকাব্যের নায়কের আসন হইতে স্খলিত-পদ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি সাধারণ মানুষের মতনই অল্পতেই বিচলিত, সন্দিগ্ধমনা, লঘুচেতা।

বনচারিণী সীতা। কিন্তু এই রাম-চরিত্রকে দোষদুষ্ট করিয়া যিনি বনবাসিনী সীতার চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি কবিগুরুর মতনই আমাদের চক্ষে নমস্য। সীতা-চরিত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; একটি—পতি-সঙ্গে বনচারিণী সীতা; অপরটি পতি-পরিত্যক্তা বনবাসিনী সীতা। প্রথমটি অঙ্কিত করিয়াছেন—কবিগুরু স্বয়ং। দ্বিতীয়টি অঙ্কিত করিয়াছেন—তাঁহার কোনও লুপ্তনামা প্রতিভাশালী শিষ্য! যদি তাই হয়, তবে বলিতে হইবে—গুরুর সীতা অপেক্ষা শিষ্যের সীতা কাব্যাংশে বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ধরিতে গেলে বনচারিণী সীতা দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছায়ার মত কায়ার অনুবর্ত্তিনী—হাস্য-ক্রন্দনশীলা। তাঁহার নিজের কোন সত্তা নাই। সুখদুঃখ-বোধ নাই—তাঁহার আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগশীলতা সাধারণ নারীরই মত। তাহাতে অসাধারণত্ব কিছুই নাই। পতিকে বনবাসে দিয়া কোন নারীই রাজ্য-সম্পদ লইয়া নিশ্চিন্তমনে ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতে পারেন না। এ স্থানে অতি সাধারণ নারী যাহা করিতেন, সীতা তদপেক্ষা বেশী কিছু করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বিশেষ এই তমসা-গোদাবরীতটবিহারিণী চিরহাস্যময়ী সীতা—যিনি বনচারী পতির গলে বনমালার মত শোভা পাইতেছেন, যিনি পুষ্পাভরণভূষিতা বনদেবীর মতন সকৌতুকে বনহরিণী ও নৃত্যশীলা ময়ূরীগণকে সখীভাবে কোল দিতেছেন, বনলতা ও বনপুষ্পকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া তরুগুল্মপার্শ্বে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার সেই বনবাস-সুখের কাছে অযোধ্যার রাজসুখ অতি তুচ্ছ। এই বনচারিণী সীতাকে দেখিয়া আমাদের মনে ত একটুকুও দুঃখ হয় না। তবে অশোক-বনবাসের কথা—তাহাও বিরাট যুদ্ধোদ্যমের কোলাহলে কাটিয়া গিয়াছে। এ সময়টা আমরা বন্দিনী সীতার দিকে ততটা মনোযোগ করিতে পারি নাই। বনবাসিনী সীতা,—এই তুলনা-রহিত নারী-চিত্রটি আমরা কোথায় পাইলাম? ঔদার্য্য, মাধুর্য্য, ধর্ম্মশীলতা, পতিপ্রাণতা প্রভৃতি যে সকল গুণের উপর নারীর নারীত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহার সবগুলি ফুটিয়াছে ঐ বনবাসিনী সীতাতে। তিনি

নিরপরাধে পতিকর্ত্তৃক বনবাস-পরিত্যক্তা হইয়াও বিসর্জ্জনের প্রতিমার মত অবিকৃতা। পতিপ্রেমশীলা সূর্য্যমুখীর মত একমাত্র রামচন্দ্রের মুখপানেই চাহিয়া আছেন। তাঁহার বিদ্বেষ নাই, বিরক্তি নাই, উপেক্ষা নাই, অভিমান নাই, ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই। এই শান্ত সংযত বনবাসিনী সীতার চরিত্র যিনি অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি কবিগুরুর উপযুক্ত শিষ্য; এবং তাঁহারই সঙ্গে একাসনে বসিয়া আমাদের ভক্তির অর্ঘ্য পাইবার যোগ্য। উত্তরকাণ্ড রচিত না হইলে যে কেবল রামায়ণ অসম্পূর্ণ থাকিত তাহা নহে, সীতা-চরিত্রের একটী অত্যুৎকৃষ্ট অংশ অবিরচিত থাকিয়া যাইত। বনচারিণী সীতা বর্ণাত্মক, আর বনবাসিনী সীতা হৃদয়াত্মক। কবিগুরু অস্থি, মাংস, মেদ, মজ্জা দ্বারা সীতামূর্ত্তি গড়িয়া তাহাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যে হৃদয়—যদ্দ্বারা মানুষ মানুষ হইতে স্বতন্ত্র আসনে স্থান পাইয়া থাকে, সেই হৃদয়টুকু গড়িয়াছেন আমাদের উত্তরকাণ্ডের লুপ্তনামা কবি।

বনবাসিনী সীতা সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের কিংবদন্তী।—

গুরুর সীতা অপেক্ষা শিষ্যের সীতা মানুষের হৃদয়ে সমধিক শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়া লইয়াছে। এই জন্যই বনবাসিনী সীতার মূর্ত্তি ভারতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কবি—ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গড়িয়া পূজার মন্দিরে স্থান দিয়াছেন। বনবাসের কারণ সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। পালা-গায়ক ও কথক-ঠাকুরদিগের মুখে নানারূপ শাখা-প্রশাখা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গঠিত হইয়াছে। বনবাসিনী সীতার চরিত্র-মাধুর্য্য-পূর্ণ নারীত্বই বোধ হয় ইহার একমাত্র কারণ। আমাদের কবি চন্দ্রাবতী অগ্নি-পরীক্ষার কথা বাদ দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বনবাসিনী সীতাকে ভুলিতে পারেন নাই। চন্দ্রাবতী রামায়ণে বনবাসের কারণ যেটুকু ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিলাম।

চন্দ্রাবতীর সীতার বনবাস—

পাশাখেলার পর রামচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। তিনি সীতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তপোবন-দর্শনাভিলাষিণী সীতার মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য আজ দিনমানের মধ্যে তাঁহাকে সমস্ত আয়োজন ঠিক করিতে হইবে। স্বয়ং তিনিও সীতার সঙ্গে যাইবেন। এদিকে—

“শয়ন-মন্দিরে একা গো সীতা ঠাকুরাণী
সোণার পালঙ্ক পরে গো ফুলের বিছানী
চারিদিকে শোভে তার গো সুগন্ধি কমল
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা গো সরযূর জল
নানা জাতি ফুল আছে গো গন্ধেতে রসিয়া
যাহা চায় তাহা দেয় গো সখিরা আনিয়া
ঘন ঘন হাই উঠে গো নয়ন চঞ্চল
অল্পেতে অবশ অঙ্গ গো মুখে উঠে জল
উপকথা সীতারে শুনায় আলাপিনী
এমন সময় আসল তথা কুকুয়া ননদিনী”

কুকুয়ার পরিচয়—

কাল সাপিনী কুকুয়া গো কাল কূটে ভরা
সীতার সুখ দেখতে নারে গো এমন কপাল পোড়া
কুরূপা কুৎসিতা সে যে গো দুরন্ত মুখরা
শিখাইয়া পালিয়া বড়গো কইরাছে মন্থরা
কৈকয়ীর কন্যা সে যে ছোট ভরতের
রাজার ঘরে বিয়া হইয়া গো কপালের ফের

* * * * * *

বাতাসে করিয়া ভর গো পাতায় কোন্দল
ঔষধ খাওয়াইয়া করছে স্বামীরে পাগল

এই কুকুয়ার চিত্র দেখিয়া লঙ্কার কালাগ্নি-রূপিণী সূর্পণখার কথা আমাদের মনে পড়ে। কুকুয়া ধরিয়া বসিল—বধূ দয়া করিয়া রাবণের চিত্রটি আঁকিয়া দেখাও।

কুকুয়া বলিছে বধূ গো মম বাক্য ধর
কিরূপে বঞ্চিলা তুমি রাবণের ঘর
দেখি নাই রাক্ষসে গো শুনিতে কাঁপে হিয়া
দশ মুণ্ড রাবণ-রাজা—দেখাও আকিয়া।
মূর্চ্ছিতা হইলা সীতা গো রাবণ নাম শুনি
কেহ বা বাতাস দেয়, কেহ মুখে পানি
সখিগণ কুকুয়ারে করিল বারণ
অনুচিত কথা তুমি গো বল কি কারণ
রাজার আদেশ নাই গো বলিতে কু কথা
তবে কেন ঠাকুরাণীর গো মনে দেও ব্যথা
প্রবোধ না মানে গো কুকুয়া ননদিনী
বার বার সীতারে বলায় সেই বাণী

সীতা বলিলেন—আমি সেই পাপিষ্ঠ রাক্ষসের পানে কখনও মুখ তুলিয়া দেখি নাই; কি করিয়া তাহার পাপ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিব? কিন্তু কুকুয়াও ছাড়িবার পাত্রী নহে। শেষে এই স্থির হইল হরণকালে সীতা সাগরজলে প্রতিবিম্বিত রাক্ষসের যে ছায়া একবার বিদ্যুতের মত দর্শন করিয়াছিলেন, সেই ছায়া আঁকিয়া দেখাইবেন।—

তখন এড়াতে না পারে সীতা গো পাখার উপর
আকিলেন দশমুণ্ড গো রাজা লঙ্কেশ্বর
শ্রমেতে কাতর সীতা গো নিদ্রায় ঢলিল
কুকুয়া তালের পাখা গো বুকে তুলি দিল।

প্রিয়তমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাম তপোবন-যাত্রার উদ্যোগ লইয়া একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় দর্পিতা কুকুয়া আসিয়া বলিল—দাদা, তুমি কাকে ভালবাস—যে তোমার চোখের তারা, বুকের নিধি, সে কি না আজ দশমুণ্ড রাবণ পাখাতে আঁকিয়া বুকে করিয়া ঘুমাইতেছে। যদি বিশ্বাস না হয় স্বচক্ষে দেখিতে পার।

ধীরে ধীরে রাম শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—

পঞ্চমাসের গর্ভ সীতাগো অলসে ঘুমায়
তর্জ্জনী হেলায়ে কুকুয়া রামেরে দেখায়।

রঘুকুলকমলিনী তখন অলসভাবে ফুল-শয্যার উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছিলেন। তাহার বুকের উপর দশমুণ্ড-চিত্রিত পাখা! হায়, হায়—জানকী জানিতেন না যে, কুকুয়া কাল-সাপিনী এইরূপে তাঁহাকে শিয়রে বসিয়া দংশন করিবে।

তারপর সীতার বনবাস। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে—এই সীতা-নির্ব্বাসনের কারণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। জৈন রামায়ণে সীতার সতিনী তাহাকে এইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। কাশ্মীর রামায়ণেও এই ধরণের কথাটা আছে। উড়িষ্যা অঞ্চলে সাধারণ শ্রেণীর মধ্যেও এইরূপ একটা বিশ্বাসের আবহাওয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহাতে দেখা যায়—সীতা তালের পাখাতে রাবণের চিত্র অঙ্কিত না করিয়া শাড়ীর অঞ্চলে আঁকিয়াছিলেন,—এইমাত্র প্রভেদ।

এর পর চন্দ্রাবতীর কোনও ভনিতা আমরা খুঁজিয়া পাই না। সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার পর চন্দ্রাবতীর কোমল হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়ে। তিনি রামায়ণখানা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

কবি কৌশল্যা সুন্দরী

এর পর হইতে পাই কৌশল্যা সুন্দরীর ভনিতা। এই কৌশল্যা সুন্দরী কে? আমরা বহু চেষ্টায় তাঁহার জীবনের কোন একটি লহরী খুঁজিয়া লইতে পারি নাই। "কৌশল্যা সুন্দরী কান্দে সীতা বনে দিয়া" এই চরণটি দেখিয়া আমরা মনে করিয়াছিলাম ইনি হয় ত রামের মা কৌশল্যা হইবেন। কিন্তু আর একটি চরণে দেখিতে পাই—

"রাম ভজ রাম চিত্ত রামপদে আশ
কৌশল্যা সুন্দরী গায় সীতার বনবাস"

নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম যে, ইনিও একজন মহিলা-কবি। কৌশল্যা সুন্দরী যে কেবল সীতার বনবাসের শেষাংশটুকু রচনা করিয়াছিলেন তাহা নহে; খুব সম্ভব রামায়ণের অন্যান্য ঘটনা অবলম্বনেও তিনি গীত রচনা করিয়াছিলেন। সংগ্রাহিকা মহিলাগণ চন্দ্রাবতীর গানের শেষাংশটুকু কৌশল্যার ভনিতা দ্বারা পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন। হয় ত ইহার অনেকাংশ চন্দ্রাবতীর ভনিতার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। উভয়েই মহিলা-কবি, উভয়েই অনন্য-সাধারণ কবি-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রাবতীর কবিতার মত কৌশল্যার কবিতাও অমৃতের অলকানন্দা। সারল্যে, কারুণ্যে, উচ্ছ্বাসে তেমনি কূল-প্লাবী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কোন অজানিত দিবসে ময়মনসিংহের জলাভূমিতে এই মহিলা-কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার কোন অজানিত দিবস-রজনীর মাঝখানে তিনি মায়িক সংসারের খেলা-ধুলা শেষ করিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। দুই একটি কবিতার শেষ চরণে মাত্র তাঁর অশ্রুময় স্মৃতিটুকু দেখিতে পাইতেছি। কবিগুরুর মতনই তাঁর জীবন-স্মৃতি কোন নিশীথ বিজনের অন্ধকারে বিস্মৃতির বল্মীক-স্তূপে জন্মের মত ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। একটা প্রচলিত প্রবাদ কিংবদন্তী হইতেও আমরা তাঁহার জীবনের একটি লহরী খুঁজিয়া লইতে পারিলাম না।

কৌশল্যা-কৃত সীতার বনবাসের শেষাংশ

স্বামী-বিরহ-বিধুরা উন্মাদিনী কখনও অতিমাত্র দুঃখে রোদন করিতেছেন, কখনও অতিমাত্র শোকে মূক ভাবে বসিয়া অশ্রু-মার্জ্জনা করিতেছেন। শিশিরাপ্লুত বনলতিকার মত তাঁহার সেই দুঃখশান্ত ক্ষীণ মূর্ত্তিটি দেখিয়া বনের পশু-পক্ষী

রোদনশীল হইয়া উঠিতেছে। উন্মাদিনীর মত কখনও নদীর তীরে ছুটিয়া গিয়া হা নাথ বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছেন। সঙ্গিনী মুনি-কন্যাগণ সেই সম্বিতহারা অলস-বিবশ তনুটিকে আনিয়া কুশশয্যায় স্থান দিতেছে। হায়, অযোধ্যার সোণার পালঙ্কে কুসুমশয্যায় শুইয়াও যে দেহ কষ্ট অনুভব করিত, আজ তাহার শয্যা কি না ক্ষুরধার কুশদল! কুশ-কণ্টকে সীতার পদদ্বয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্তধারা অলক্তকের মত শোভা পাইতেছে। হায়! এবার ত লক্ষ্মণ সঙ্গে নাই—কে এই কুশ-কণ্টক উন্মোচন করিবে।

পঞ্চবটীতে স্বামীর বাহুমূল উপাধান করিয়া যে সীতা প্রত্যহ রজনীতে শয়ন করিতেন, আজ সেই আশ্রয়হীনা ব্রততী একাকিনী ভূতল-শয্যায় শায়িতা। সীতা কখনও বনভূমির শ্যামলতার পানে চাহিয়া চাহিয়া সেই নব-দূর্ব্বাদল শ্যাম রূপ চিন্তা করিতে করিতে চক্ষু মুদ্রিত করেন—কখনও বা বনলতা হইতে শ্যামল পত্রাবলী সংগ্রহ করিয়া রাম মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। পত্রদলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, অপরাজিতায় কেশ, নীলোৎপলে নীল নয়ন। অবিচয়িত পত্রপুষ্প চক্ষের জলে কলঙ্কিত হইয়া যায়। রজনীর সঙ্গে সঙ্গে সেই মলিন বাসি ফুলগুলি নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া সেই স্রোত-পতিত পুষ্পাঞ্জলির পানে অনিমেষে চাহিয়া থাকেন। সহসা অনুসন্ধান-নিরতা মুনি-কন্যার ডাকে সীতার চমক ভাঙ্গিয়া যায়,—বিরহ-বিহ্বলা বনবাসিনী অলস পাদক্ষেপে সঙ্গিনীগণ সহ বনকুটীরে ফিরিয়া আসেন;—আবার ভোরে তেমনি ভাবে নূতন পত্র-পুষ্পদল সংগ্রহ করিয়া অনন্যমনে রাঘবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন।

লবের জন্ম।—এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। দশ মাস অন্তে সীতা এক পুত্র প্রসব করিলেন। নামাকরণের দিন বাল্মীকি স্বয়ং নাম রাখিলেন লব। পুত্র সর্ব্বাংশে পিতার অনুরূপ হইল। বনবাসের অতিমাত্র দুঃখে এই নবজাত শিশুর মুখ দেখিয়া সীতাদেবী বনবাস-ক্লেশ ভুলিয়া গেলেন। মাঝে মাঝে একটা চিন্তা প্রসূতির মনে আসিত বটে—হায়! এ বালক যদি বনে না জন্মিয়া অযোধ্যার রাজভবনে জন্মগ্রহণ করিত! কিন্তু সীতা এর অধিক বেশী কিছু ভাবিতে পারিতেন না।

কুশের জন্ম।—প্রচলিত অন্যান্য রামায়ণে আছে—সীতা যমজপুত্র প্রসব করিয়াছিলেন; কিন্তু কৌশল্যাকৃত রামায়ণে দেখিতে পাই—সীতা একমাত্র পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। কুশের কথাও আছে, কিন্তু অন্যরূপ।

মহর্ষি বাল্মীকি বালক লবকে ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অস্ত্রবিদ্যায় লব ক্রমে রামতুল্য পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সীতা মাথার দিব্য দিয়া লবকে সর্ব্বদা মানা করিতেন যেন সে বনের পশু পক্ষীর প্রতি বাণ নিক্ষেপ না করে।

একদিন বালক লব মুনির জন্য বনফল আহরণ করিতে চলিয়াছে। তাহার অব্যর্থ লক্ষ্যে বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখাস্থিত ফলটিও বৃন্তচ্ছিন্ন হইয়া কোলে আসিয়া পড়িতেছে। অকস্মাৎ বনভূমি-প্রান্তে এক সিংহ কোনও আসন্নপ্রসবা হরিণীর প্রতি ধাবিত হইল। তাহার লোল জিহ্বা, করাল-মূর্ত্তি দেখিয়া আর্ত্ত হরিণী প্রাণভয়ে বন ভাঙ্গিয়া দৌড়িয়া পলাইতেছিল। লব কিছুমাত্র না ভাবিয়া ধনুকে নাগপাশ অস্ত্র যুড়িয়া তৎক্ষণাৎ সেই সিংহের প্রতি ধাবিত হইল।

এদিকে সন্ধ্যা প্রায় হইয়া আসে—সীতা লবের অদর্শনে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। মুনি-কন্যাগণ, যাঁহারা সীতা-সম্ভাষণে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও মধ্যে কেহ লবের বার্ত্তা দিতে পারিলেন না। মহর্ষিও চিন্তিত হইয়া শেষে লবের অন্বেষণে ছুটিলেন। বন-পথের এক স্থান রুধিরাক্ত দেখিয়া ভয়ে মুনির মন বিচলিত হইল। ব্যর্থমনোরথে তিনি যখন আশ্রমে ফিরিতেছিলেন, ঘন তমসায় বনভূমি-মুখ প্রায়াচ্ছন্ন করিয়া দিতেছিল;—মুনি ত একাকী কুটীরে ফিরিতেছেন। সীতা যখন লবের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন উত্তর কি! কি বলিয়া বনদুঃখিনী মাকে সান্ত্বনা করিবেন!

"সাত পাঁচ ভাবি মুনি গো কোন কার্য্য করে।
পঞ্চ গাছি কুশ মুনি লইলেন তোলে॥
কুশেতে পুতুলা এক করিলা নির্ম্মাণ।
মন্ত্র পড়ি মহামুনি গো দিলা সে জীবদান॥"

মুনি-মন্ত্রে কুশ-পুত্তুলি লবের সম্পূর্ণ আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে তৎপশ্চাৎ নাচিয়া নাচিয়া ছুটিল। মহামুনিও আশ্বস্ত হইলেন।

এই নাও মা তোমার দুরন্ত ছেলে—সমস্তটা বন উহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে হয়রাণ হইয়া পড়িয়াছি। এই বলিয়া যাই মুনি কুশকে লইয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন—অমনি পশ্চাতে দাঁড়াইয়া লব—মা', মা বলিয়া ধনুর্ব্বাণ মাটিতে রাখিয়া

মুনির চরণে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল—তাহার সঙ্গে একটি পাশবদ্ধ সিংহের শবদেহ। সীতা অবাক্। মুনি টিপি টিপি হাসিয়া বলিলেন—মা, আজ হতে তুমি যমজ পুত্রের জননী।

"কুশেতে গড়িলা শিশু নাম থুইলা গো কুশী—"

লব কুশী মায়ের কোল যুড়িয়া বসিল। এইরূপে দিন যাইতে লাগিল—বালকদ্বয় উপযুক্ত গুরুর শিক্ষাধীনে অল্পদিন মধ্যে সর্ব্ব-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মহামুনি তাহাদিগকে পবিত্র রামায়ণ গান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বীণার ঝঙ্কারের সহিত সেই পবিত্র রাম-গুণগান শুনিতে শুনিতে বর্ষার মেঘের মত কত কথা সেই তপোবন তরুতলবাসিনী সীতার বুকের মধ্যে জমিতে থাকিত। অশ্রু যখন অসংবরণীয় হইয়া উঠিত, তখন মুক্তাবিন্দুর মত গড়াইয়া কুটীর-প্রাঙ্গণের দূর্ব্বাদলকে সিঞ্চিত করিয়া দিত। সীতা তখন বল্কলাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া, প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা পাইতেন—পাছে লবকুশী দেখে।

কিন্তু লব কুশীর চোখ কিছুতে এড়াইতে পারিতেন না। সময় অসময় নাই—দুই ভাইয়ে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, মা, সব সময় তুই এমনিধারা কাঁদিস্—বল্ না মা, তোর কি দুঃখ—আমরা দুই ভাইয়ে তোর দুঃখ দূর করে দেব। সীতা লবকুশীকে প্রবোধ দিতেন, কিন্তু নিজে প্রবোধ পাইতেন না।

"তোরা পুত্র থাক্‌তে বাছারে মোর কিসের দুখ
বলিতে কহিতে গো সীতার শুকাইত মুখ"

এক দিন মাকে কাঁদিতে দেখিয়া লবকুশী বলিল, মা, আমরা রামায়ণ গাইতে শিখিয়াছি। মুনি বলিয়াছেন এই গান যে শুনে, তার শোক তাপ জ্বালাযন্ত্রণা কিছুই থাকে না। শিশুদ্বয়ের যুগল বীণা মায়ের দুঃখ দূর করিবার জন্য যখন ঝঙ্কার দিয়া উঠিত, সেই সঙ্গে মিশিত তরুণ করুণ কণ্ঠ দুটি। অভাগিনী তখন আর চক্ষের জল সামলাইতে পারিত না।

"লব বলে কুশী ভাইরে আর গান গা
এই গান শুনিলে কান্দে অভাগিনী মা"

কারণ কি! এক দিন কুশী স্পষ্টাক্ষরে মাকে জিজ্ঞাসা করিল—আমরা যে রামায়ণ গান করি, তাহাতে আছে—অযোধ্যার মহারাজ রামচন্দ্র বিনাদোষে সীতাদেবীকে বনবাসে পাঠিয়েছেন! তোর নামও ত সীতা,—হাঁ মা, তুই কি সেই সীতা? বাষ্পবিজড়িতকণ্ঠে সীতা 'না' বলিতে যাইতেছিলেন—মুখে কথা ফুটিল না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ইহার কিছুদিন পরই অযোধ্যা হইতে রাজসূয় যজ্ঞের নিমন্ত্রণ আসিল। এই স্থানে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক। কি কারণে জানি না—মেয়েলী সঙ্গীতে আমরা কোথাও লবকুশের যুদ্ধ-বৃত্তান্তের উল্লেখ পাইতেছি না। এই পিতা-পুত্রের যুদ্ধের কথা অনেক রামায়ণেই আছে। পালা-গায়কগণ এই কাহিনীটি লইয়া বাল্মীকির আশ্রমের অনতিদূরে একটা বিরাট লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়াছেন; তাহাতে রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন বিভীষণাদি সকলে শিশুরণে নিপতিত। লঙ্কাকাণ্ডে রাবণের যে দশা,—এ যুদ্ধে রামচন্দ্রাদিরও সেই দশা।

এই পিতা-পুত্রের যুদ্ধ শেষে সংক্রামক ব্যাধির মত, পরবর্ত্তী পুরাণ সকলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। লবকুশের অস্থিমজ্জা লইয়া মণিপুরের অর্জ্জুন-বিজয়ী বভ্রুবাহনের সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক কোন পুরাণে শ্রীরাধিকার যমজ পুত্রদ্বয়ের হস্তে নারায়ণী সেনাসহ শ্রীকৃষ্ণ বলরামকে পরাজিত বিধ্বস্ত হইতে দেখিতে পাই। খুঁজিলে এরূপ অনুকরণ হয় ত আরও অনেক মিলিতে পারে।

এর মধ্যে এক দিন মুনি আসিয়া সীতার কাছে লবকুশকে ভিক্ষা চাহিলেন—

"দে মা তোর পুত্র দুটি সঙ্গে লইয়া যাই"

মুনির ইচ্ছা, তিনি বালকদ্বয়কে যে রামায়ণ শিক্ষা দিয়াছেন, অযোধ্যার রাজসভাসদকে তাহা শুনাইয়া আসেন। কিন্তু সীতা সহসা সে প্রস্তাবের উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার দুনয়নের মণি বুকের নিধি দুর্ল্লভ লবকুশীকে দিয়া কি লইয়া ঘরে থাকিবেন! এই দু'টি শিশু—যাদের মুখ চাহিয়া সীতা বনবাস দুঃখ কিয়ৎপরিমাণে পাশরিতেছিলেন! তিনি মহর্ষির চরণে কাঁদিয়া পড়িলেন। তাঁহার ইচ্ছা অন্ততঃ একজন কাছে থাক্। লব বলিল, আমি মা'র কাছে থাকি, কুশী যাক্। সীতা বলিলেন—আচ্ছা তাই হউক, লব থাক্, কুশীকে আপনি সঙ্গে লইয়া যান।

চট্‌পটে কুশী ছাড়িবার পাত্র নহে। সে বলিল, মা, আমরা রামায়ণ গাই। তাতে আছে রামের মাতা কৈকেয়ী ভরতকে রাজ্য দিবার জন্য রামকে চক্রান্তক্রমে বনে পাঠাইয়াছিলেন। আজ দেখ্‌ছি আমার ভাগ্যেও সেই দশা!

"যেমন বন হইল অযোধ্যা গো রাম হইলাম আমি।
ভরত হইল লব দাদা আর কৈকেয়ী হইলা তুমি॥"

যাট্ বলিয়া সীতা কুশকে টানিয়া কোলে নিলেন—তাঁহার দুই চক্ষের জলে কুশীর জটাভার ভিজিয়া গেল। স্থির হইল—দুইজনেই মুনির সঙ্গে যাইবে।

তার পর শিশুদ্বয়ের অযোধ্যায় গমন—সীতাদেবীর পাতাল প্রবেশ—এ সবে কোনও নূতনত্ব, বিশেষত্ব নাই।

আমরা যথাসাধ্য চন্দ্রাবতী ও কৌশল্যাকৃত মেয়েলী সঙ্গীতের আলোচনা করিলাম। কৃত্তিবাসাদি বঙ্গীয় সাহিত্য-কল্পতরুগণের পার্শ্বে এই পুণ্য তুলসী দুটি কোথায় স্থান পাইবে, তাহার নির্দ্দেশ বিশেষজ্ঞের হাতে।

মিলন-পূর্ণিমা

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল্

(২১)

নিত্যরঞ্জন চলিয়া গেলে, অনেক দিন পর্য্যন্ত রেখা তার কোনও চিঠি পাইল না। সে উৎকণ্ঠিত হইয়া রোজ ডাকের চিঠি আসিলে ছুটিয়া যাইত নিত্যরঞ্জনের একখানা চিঠির আশায়—রোজ সে নিরাশ হইয়া ফিরিত।

শেষে সে হতাশ হইয়া পড়িল। সে স্থির করিল, নিত্যরঞ্জন সৌরীনের কোনও সন্ধানই করিতে পারে নাই—কোনও সন্ধান তার পাওয়া যাইবে না। এ কথা ভাবিতে তার জীবনের নিদারুণ নিঃসঙ্গতা যেন তার চারিদিক দিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল।

ভালবাসিবার এবং ভালবাসা পাইবার তৃষ্ণায় তার অন্তর ছট-ফট করিতেছিল, সে আকুল অনুসন্ধানে বিশ্বের ভিতর এমন বস্তু খুঁজিয়া পাইল না যে, তাহার এই তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে পারে। মনের তলা পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া সে দেখিতে পাইল যে, তার সমগ্র জীবন, সমস্ত অন্তর একটা আদি-অন্তহীন বিরাট অতিকায় শূন্য,—তার সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল। তার জীবনের এ শূন্যতাবোধে তার শক্তি অবসন্ন, সংবিৎ অচল হইয়া পড়িল।

এমন সময় তাকে চিত্তের আসন্ন পক্ষাঘাত হইতে রক্ষা করিল একটি ছোট্ট শিশু। হাঁসপাতালে একটি নারীর মৃত্যু হইয়াছিল—তার কেউ ছিল না, ছিল কেবল একটি দুগ্ধপোষ্য কন্যা। মেয়েটি যেন স্বর্গভ্রষ্টা পরী! রেখা এ মেয়েটির সন্ধান পাইয়া ছুটিয়া গেল। হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ আনন্দের সহিত এই মাতৃহীনা কন্যাকে রেখার হাতে সমর্পণ করিয়া দিলেন।

রেখার অন্তরের সকল নিরুদ্ধ প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া এই ছোট্ট মেয়েটির উপর বন্যার মত ছুটিয়া পড়িল। তার বঞ্চিত মাতৃ-হৃদয় আকুল আবেগে এই শিশুটিকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিল। কোনও জননী বুঝি তার গর্ভজাত সন্তানকে এত ভালবাসে নাই, এমন আপনার করিয়া দেখে নাই।

সে তার নাম রাখিল লতা। লতার মত এই শিশুটি তার সমস্ত চিত্ত বেষ্টন করিয়া তার শুষ্ক কাণ্ড এক অপূর্ব্ব রসে আপ্লুত করিয়া দিল। পত্নী হইবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়া রেখা মাতৃত্বে তার চরম সার্থকতা উপভোগ করিল।

ইহার দুই মাস পরে রেখা নিত্যরঞ্জনের পত্র পাইল। নিত্যরঞ্জন লিখিয়াছে যে সৌরীন ময়মনসিংহে গিয়া কাপড় ও জুতার কারবার করিয়াছিল এবং তাহাতে অনেক ঋণগ্রস্ত হইয়া সে ফেরার হইয়াছে। তার নামে দশ হাজার টাকার ডিক্রী হইয়াছে।

সংবাদ শুনিয়া রেখা প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সৌরীন গভর্ণমেণ্টের এত বড় চাকরী ছাড়িয়া গিয়া ময়মনসিংহে জুতা ও কাপড়ের দোকান করিবে, এবং শেষে পাওনাদারদিগকে ঠকাইয়া পলায়ন করিবে, তাহা তার কাছে একেবারেই অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইল।

কিন্তু ক্রমে তার মনে হইল যে, কথাটা হয় তো সত্য হইতেও পারে। না হইলে নিত্যরঞ্জনের তাহাকে অযথা এ মিথ্যা সংবাদ দিবার কোনও হেতু নাই। যদি সত্য হয়, তবে কি ভয়ানক কথা এ! এমন একটা প্রকাণ্ড চরিত্রের এই নির্ম্মম পরিণতি! তার মনের ভিতর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—সৌরীনের অপহৃত জীবনের মর্ম্মান্তিক আর্ত্তনাদ, তার আশা-ভঙ্গের নিদারুণ জ্বালা। মনে হইল, সৌরীনের এ পরিণতির জন্য দায়ী সে নিজে। সে যদি দারুণ অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া না উঠিয়া সৌরীনকে আপনার করিয়া লইত, তবে তো সে মরিয়া হইয়া এমন ভাবে আপনার সর্ব্বনাশ করিতে পারিত না। রেখা যে প্রেমে

অভিষিক্ত করিয়া তাহার চিত্ত শান্ত করিয়া রাখিতে পারিত, তার ভিতরকার আশার দীপ নিয়ত উৎসাহ দানে প্রদীপ্ত করিয়া রাখিতে পারিত। সৌরীনের সকল ভার গ্রহণ করিয়া গৃহপত্নীর অধিকার প্রচার করিয়া সে তাহাকে অভীষ্টসিদ্ধির পথে পরিচালিত কেন করিল না!

ব্যথায় তার অন্তর ভাঙ্গিয়া পড়িল। নিদারুণ আত্ম-তিরস্কারের কশাঘাতে সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। তার সমস্ত হৃদয় সৌরীনের মানস-মূর্ত্তির পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া অনুশোচনায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

প্রথমে সে হতাশায় ডুবিয়া গেল। পরে তার মনে হইল এখনো তো তার কর্ত্তব্য আছে, এখনও হয় তো সৌরীনকে পাওয়া যাইতে পারে। দশ হাজার টাকা সৌরীনের দেনা। সে দশ হাজার টাকা তো রেখা সঞ্চয় করিয়াছে—ঋণ মুক্ত হইলেই সৌরীন ফিরিয়া আসিবে—আবার নূতন উদ্যমে সে প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইবে!

যাহা হউক, এখন সৌরীনের সন্ধান করিবার কোনও চেষ্টা না করিয়া, কেবল শান্ত ভাবে বসিয়া মেয়েদের পড়া শিখান তার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তার ব্যথিত ব্যাকুল চিত্ত প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া চলিল ময়মনসিংহে সৌরীনের কর্ম্মক্ষেত্রে।

* * * *

নিত্যরঞ্জন কলিকাতায় থাকে তার সেবাসঙ্ঘের কর্ম্মীদের সঙ্গে। তেতলার একখানা ছোট ঘর, তার ভিতর আসবাবের ভিতর আছে শুধু একখানা তক্তপোষ ও একটা পাইন কাঠের টেবিল ও দুখানি চেয়ার। বিছানা কি আসবাব কোনও কিছুর মধ্যেই কোনও সৌষ্ঠব সম্পাদনের কোনও চেষ্টাই তার নাই।

অনেক টাকা তার হাত দিয়া আনাগোনা করে; কিন্তু তার একটি পয়সাও নিত্যরঞ্জন নিজের সুখ-সুবিধার জন্য খরচ করে না। তার নিজের যা টাকাকড়ি আছে, তাহাও সে সম্পূর্ণ নিজের কাজে খরচ করে না। অভাব যথাসাধ্য কমাইয়া, নিজে অত্যন্ত দীনভাবে থাকিয়া, সে তার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করে তার সঙ্ঘের কাজে। কিন্তু তার এই ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ভিতর একটা প্রকাণ্ড অহঙ্কার আত্যোপান্ত জড়াইয়া আছে। সে যে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী, ইহাই তার প্রধান অহঙ্কার,—এ কথা বলিয়া এবং ভাবিয়া সে পরম আনন্দ লাভ করে।

নিজের বেশ-ভূষা সম্বন্ধেও সে একান্ত উদাসীন। তিন দিন তার ক্ষৌর-কার্য্য করা হয় নাই। লম্বা লম্বা চুলগুলির ভিতর চিরুণী-বুরুষের প্রবেশ নিষেধ। এমনি দীন্হ দীনতা ও অপরিচ্ছন্নতার ভিতর তার অন্তরে বিরাজ করে একটা বিশ্বব্যাপী বিরাট অহঙ্কার!

সেদিন নিত্যরঞ্জন তার ঘরটিতে বসিয়া সঙ্ঘের কাজ করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি কর্ম্মীর সঙ্গে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল রেখা।

চমকিত হইয়া নিত্যরঞ্জন আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ তার গৃহের দৈন্য ও অশোভনতা তাকে লজ্জায় যেন অভিভূত করিল। তার বৈরাগ্যের অহঙ্কারের ভিতর আর সে কোনও আশ্রয় লাভ করিতে পারিল না। সে অত্যন্ত লজ্জিত কুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। এই দীনতার আবেষ্টনের ভিতর ওই গৌরবময়ী নারী-মূর্ত্তিকে সে আমন্ত্রণ করিয়া লইতে পারিল না,—সে রেখাকে বসিতে বলিতেও কুণ্ঠিত হইল।

রেখাও লজ্জিত ভাবে তার আবেগভরা শুষ্ক মুখখানি নীচু করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। যে কর্ম্মী যুবক তাহাকে এ ঘরে লইয়া আসিয়াছিল, সে চেয়ারখানা বাড়াইয়া দিল,—রেখা তাহাতে অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িল।

নিত্যরঞ্জন দেখিতে পাইল যে, এই কয় দিনের মধ্যে রেখা যেন শুকাইয়া আধখানা হইয়া গিয়াছে। নিত্যরঞ্জনের মনটা ইহাতে ব্যথিত হইয়া উঠিল। তার চিঠি পাইয়াই যে রেখার এ দশা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে নিত্যরঞ্জনের বিলম্ব হইল না। রেখার এ করুণ মূর্ত্তি দেখিয়া তাই তার বড় অনুতাপ হইল—কেন সে এই কোমল-হৃদয়া নারীকে এ মর্ম্মান্তিক সংবাদ জানাইতে গিয়াছিল? সে কিছু না লিখিলে তো রেখা ইহার চেয়ে স্বস্তিতে থাকিতে পারিত!

অনেকক্ষণ পর রেখা প্রথম কথা কহিল। বাগ্মী নিত্যরঞ্জনের রসনায় যেন কে পাথরের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছিল।

রেখা বলিল, "আমি আপনাকে আবার কষ্ট দিতে এলাম।" বলিতেই তার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। টস্ টস্ করিয়া দুই ফোঁটা চোখের জল গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

নিত্যরঞ্জনের হৃদয়ে একটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাতপূর্ব্ব ব্যথার আক্ষোভ আরম্ভ হইল। অপূর্ব্ব লাবণ্যমণ্ডিত এই নারীর এ দুঃখ দেখিয়া সে অস্থির হইয়া উঠিল। তার যেন মনে হইল যে, ইহার দুঃখ দূর করিবার জন্য সে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

ব্যস্ত হইয়া নিত্যরঞ্জন বলিল, "বলুন, কি ক'রতে হ'বে আমায়।"

"আপনি যদি দয়া ক'রে একবার আমার সঙ্গে ময়মনসিংহে যান তবে—"

তার আর কিছু বলা হইল না,—মনে হইল, যেন আর কথা বলিতে গেলে সে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

নিত্যরঞ্জন বলিল, "বেশ তো, চলুন। কবে যেতে হ'বে?"

"আমি আজই যেতে চাই, যদি আপনার সুবিধা হয়।"

নিত্যরঞ্জন বলিল, "আমার সব সময়েই সুবিধা। ভব-ঘুরে মানুষ আমি—ঘুরে বেড়ানই আমার ব্যবসা।"

তার পর সেই রাত্রেই ময়মনসিংহ যাত্রা করা স্থির করিয়া রেখা নিত্যরঞ্জনের কাছে বিদায় গ্রহণ করিল। নিত্যরঞ্জন নীচে গিয়া গাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত তার প্রত্যুদ্গমন করিল।

গাড়ীতে বসিয়া ছিল আয়ার কোলে লতা। রেখাকে দেখিয়া সে হাত বাড়াইয়া তাকে মা বলিয়া ডাকিল। রেখা তাকে কোলে করিয়া চুমো খাইয়া গাড়ীতে বসিল।

নিত্যরঞ্জনের মুখ হঠাৎ অন্ধকার হইয়া উঠিল। রেখার মেয়ে! তবে কি তার বিবাহ হইয়াছে?—না—? ভাবিতে নিত্যরঞ্জনের মাথার ভিতর হঠাৎ আগুন ছুটিল। তার ভয়ানক রাগ হইল রেখার উপর। এই সে! আর ইহারই উপর নিত্যরঞ্জনের এত করুণা হইয়াছে!

নিত্যরঞ্জন মনে মনে স্থির করিল—রেখার বিবাহ হইয়াছে, এবং লতা তার গর্ভজাত সন্তান। ইহাতে তার রাগ হইবার কোনও ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই, তবু তার রাগ হইল। কেন হইল, তাহা নিত্যরঞ্জন তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল না। শুধু তার রাগ হইল; তার মনে হইল—এই নারীর সৌরীন সম্বন্ধে এই আগ্রহ একটা প্রকাণ্ড ভণ্ডামী।

আসল কথা এই যে, রেখার এই বিষাদ-ক্লিষ্ট মূর্ত্তি নিত্যরঞ্জনের বঞ্চিত নিষ্পেষিত যৌবনকে হঠাৎ জাগাইয়া তুলিয়া, তাহার সেবায় একাগ্র ও উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল। এই সেবার আকাঙ্ক্ষার তলায় যে সুগুপ্ত প্রেমের প্রথম নিঃশ্বাস প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহার উপর এই ক্ষুদ্র শিশুটি দারুণ আঘাত করিয়া নিত্যরঞ্জনকে পীড়িত করিয়া তুলিল। কিন্তু নিত্যরঞ্জন তাহা বুঝিল না। সে শুধু রাগে ফুলিতে লাগিল!

সেই দিন রাত্রে সে শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়া রেখার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এই প্রতীক্ষার ভিতর যে একটা চঞ্চলতা ছিল, তাহা নিত্যরঞ্জনের পক্ষে একান্ত অস্বাভাবিক। রেখার বিলম্ব দেখিয়া সে ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, আর ক্রমেই রেখার উপর রাগ বাড়িতে লাগিল। কিন্তু যখন রেখা হঠাৎ আসিয়া একটা করুণ ম্লান হাসি হাসিয়া কৃতার্থতার সহিত বলিল, "এই যে আপনি এসেছেন।" তখন তার হৃদয়ের সমস্ত মলিনতা ও উদ্বেগ দূর হইয়া সহসা সমগ্র অন্তর যেন জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

রেখা একলা আসিয়াছে—তার মেয়েটি সঙ্গে নাই।

ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাশের মেয়ে কামরায় তাকে উঠাইয়া দিয়া নিত্যরঞ্জন বলিল "আপনার মেয়ে কোথায়? তাকে নিয়ে এলেন না?" এ প্রশ্নটা তার মনের ভিতর গোড়া হইতেই খোঁচা দিতেছিল,—কিন্তু কিছুতেই সে এতক্ষণ এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না।

রেখা বলিল, "তাকে মার কাছে রেখে এলাম। ক' দিনই বা হ'বে আমাদের?"

—তবে তাই ঠিক! এটি তবে রেখারই মেয়ে! রেখা বিবাহিতা! কিন্তু কি বেহায়া! আর এর স্বামীটা কি ভেড়া। সে তার যুবতী স্ত্রীকে এমনি একলা পথে ছাড়িয়া দিয়াছে,—আর সে নিঃসঙ্কোচে একটা পরপুরুষের সঙ্গে দেশ-দেশান্তর ঘুরিতেছে। এই পাশ-করা মেয়েদের ক্ষুরে নমস্কার! এরা সব করিতে পারে!—এমনি সব, কথা অত্যন্ত অসংলগ্ন ভাবে নিত্যরঞ্জনের মনে হইতে লাগিল, আর সে রাগে ফুলিতে লাগিল।

(২২)

ময়মনসিংহে গিয়া রেখা জানিতে পারিল, নিত্যরঞ্জন কেবলই একটা উড়ো খবর পাইয়া সৌরীনের নামে মিথ্যা

কলঙ্ক দিয়াছে। সৌরীনের দোকানের প্রকৃত অবস্থা শুনিয়া তার অন্তর আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল। সৌরীন দুঃখ পাইয়াছে, নিরাশায় হয় তো ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তার গৌরবের আসন্ হইতে এক ধাপও নামিয়া যায় নাই। ইহাতে সে এতটা তৃপ্তি লাভ করিল যে, সে নিত্যরঞ্জনের উপর রাগ করিতে ভুলিয়া গেল।

সৌরীনের দেনার খবর লইয়া জানা গেল যে, তার নামে যে দশ হাজার টাকা ডিক্রী হইয়াছে, তার বেশীর ভাগই ভুয়া—যাদের টাকা সৌরীন সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়া গিয়াছে, তাহারাও তার নামে একতরফা ডিক্রী করিয়া রাখিয়াছে। তার প্রকৃত দেনা মায় সুদ প্রায় হাজার দুই টাকা। সে টাকা সে তার নিজের একজন দেনদারকে বরাত দিয়া গিয়াছিল, সে ফেরার হইয়াছে।

নিত্যরঞ্জন ময়মনসিংহে আসিয়াই তার ও সৌরীনের এক বন্ধু উকীলের সন্ধান করিয়াছিল। সেই উকীলটি অনেক খাটিয়া এ বিষয়ে অনুসন্ধানাদি করিয়া সমস্ত ডিক্রী আড়াই হাজার টাকা দিয়া মিটাইয়া দিল।

ব্যাপার শেষ হইলে নিত্যরঞ্জন তার উকীল বন্ধুটির সামনে একদিন রেখাকে বলিল, "আমার বিশ্বাস ছিল যে, উকীল জাতটা সমাজের একটা অনাবশ্যক ব্যাধিবিশেষ,—এখন দেখা গেল যে তাদের দিয়াও লোকের উপকার হয়।"

উকীল বন্ধু বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার নিজের কোনও দিন আবার নূতন ক'রে এ অভিজ্ঞতা লাভ ক'রতে না হয়।"

এই সব ব্যাপারে তাদের প্রায় পোনেরো দিন কাটিয়া গেল। এ কয়দিন রেখা ডাক-বাঙ্গলায় ছিল,—নিত্যরঞ্জনকেও কাজেই সেইখানেই থাকিতে হইয়াছিল।

এই পোনেরো দিন দুইজনে অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়াছিল—সৌরীনের ব্যাপারটা পরিষ্কার করিবার জন্য। সব সময় তারা সেই আলোচনায় আর সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধানে এত তন্ময় ছিল যে, তাদের আর কিছু ভাবিবার অবসর ছিল না।

যখন এ বাসা ভাঙ্গিবার প্রয়োজন হইল, তখন নিত্যরঞ্জনের মনের ভিতরটা একটা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বেদনা অনুভব করিল। এত দিন নিত্যরঞ্জন তার সেবা-সজ্ঞ লইয়া মত্ত হইয়া ছিল,—সেই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান—সেই তার তপস্যা। কিন্তু এ পোনেরো দিন তার সঙ্ঘের কথা একবারও মনে হয় নাই, কিম্বা এই কাজে এক ফোঁটা ক্লান্তি সে বোধ করে নাই। একটা আনন্দের স্বপ্নের ভিতর দিয়া তার এ কটা দিন কাটিয়া গিয়াছে। আজ এ সুখস্বপ্নের আসন্ন ভঙ্গের সময় তার মনটা আকুল হইয়া উঠিল।

সে আর এ কথাটা নিজের কাছে গোপন করিতে পারিল না যে, এই পোনেরো দিনের নিরন্তর সাহচর্য্যে সে রেখাকে একান্ত ভাবে কামনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই কাজটির অবসরে রেখার পেলব হৃদয়ের সব কটি কোমল পাপড়ি এমন পরিপূর্ণ রূপে খুলিয়া তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছিল যে, তার পক্ষে রেখাকে ভাল না বাসিয়া উপায় ছিল না। তাই আজ আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় নিত্যরঞ্জন চঞ্চল হইল। কিন্তু সে চঞ্চলতা প্রকাশ হইল আত্মনিপীড়নের একটা প্রচণ্ড নিদারুণ চেষ্টায়। রেখাকে সে একান্ত ভাবে কামনা করে বলিয়াই যেন সে তাকে ঘৃণা করিতে লাগিল,—তাকে আদর করিয়া বুকে টানিয়া লইতে ইচ্ছা করে বলিয়াই সে আপনাকে তাহা হইতে যথাসম্ভব তফাৎ রাখিতে লাগিল। পাছে কথার কোনও ফাঁকে তার মনের কোমলতা প্রকাশ পায়, সেই আশঙ্কায় রেখার প্রতি তার বাক্য ও ব্যবহার প্রায় রূঢ় হইয়া উঠিল।

বৈকালে রেখা গিয়াছিল তার এক নারী-বন্ধুর কাছে—সে ময়মনসিংহ স্কুলের শিক্ষয়িত্রী; ফিরিতে তার সন্ধ্যা হইয়া গেল। নিত্যরঞ্জন একা বসিয়া তার প্রতীক্ষা করিতে করিতে ছটফটাইয়া উঠিল। যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই তার অন্তর রেখার উপর সম্পূর্ণ অহেতুক ভাবে চটিয়া উঠিতে লাগিল। যখন রেখা ফিরিয়া আসিল, তখন সে গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

রেখাও ভয়ানক উন্মনা ভাবে আসিয়া বসিল। নিত্যরঞ্জন তাহাতে আরও চটিয়া উঠিল। সে যেন প্রতীক্ষা করিতেছিল—রেখা আসিয়া ভয়ানক ব্যাকুল ভাবে তার বিলম্বের জন্য ত্রুটি স্বীকার করিবে—রেখা সেরূপ করিলে সে অত্যন্ত মহানুভবতার সহিত সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবে। কিন্তু তার কিছুই হইল না। রেখা যেন আজ তাকে গ্রাহ্যই করিতেছে না।

সে ভাবিল, এই তো মেয়ে-লোকের স্বভাব—ভীষণ স্বার্থপর। যত দিন নিত্যরঞ্জনকে দিয়া তার প্রয়োজন ছিল,

তত দিন তার সঙ্গে কথার অন্ত ছিল না,—আজ সে প্রয়োজন মিটিয়া গিয়াছে, আজ সে একটা অনাবশ্যক আবর্জ্জনা বই কিছুই নয়। নিত্যরঞ্জন তার এই কল্পিত অবহেলায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

রেখা উন্মনা ভাবে এটা ওটা বাজে কাজ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, কোনও কথা বলিল না।

অনেকক্ষণ পরে নিত্যরঞ্জনই কথা বলিল। সে বলিল, "যাক, এখন তো আপনার কাজ হ'য়ে গেছে, এখন আমার ছুটি।"

রেখা খুব বিব্রত ভাবে বলিল, "বাস্তবিক, অনেক দিন অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে। আপনার কাজেরও বোধ হয় বড্ড ক্ষতি হ'ল। আর আপনাকে এখন কষ্ট দেব না। আপনার কাছে আমার দেনার অন্ত নাই।"

এই কথা শুনিবার জন্য নিত্যরঞ্জন কথাটা পাড়ে নাই। সে ছুটি চাহিল বলিয়াই রেখা তাকে এমনি করিয়া গলাধাক্কা দিবে—এ আশা সে করে নাই। তার অভিমান তাহাকে বলিয়াছিল—রেখা তাদের এ আসন্ন বিচ্ছেদে নিদারুণ ব্যথা বোধ করিবে এবং তার কথায় ও ব্যবহারে সে ব্যথার কতকটা প্রকাশ হইবে। তা নয়—এ কি?

সে বেশ ঝাঁঝের সহিত বলিল, "হাঁ, আমার অনেকটা ক্ষতি হ'য়ে গেছে। চলুন তবে কাল সকালেই যাওয়া যাক।"

রেখা বলিল, "হাঁ, আপনি কালই যান। আমি কলকাতায় গেলে আপনার সঙ্গে আবার দেখা ক'রবো—কিছু উপদেশ নেবার জন্য। আমায় আরও কয়েক দিন এখানে থাকতে হ'বে।"

নিত্যরঞ্জনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল,—সে কোনও রূপ ভদ্রতার আচরণ পর্য্যন্ত না রাখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন?"

রেখা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমার আরও কিছু কাজ আছে।"

নিত্যরঞ্জনের মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল! এই তবে তার পুরস্কার! তার কাছে রেখা তার মতলবটা প্রকাশ করিতেও প্রস্তুত নয়! এত অবিশ্বাস!—

ক্রমে নিত্যরঞ্জন সাব্যস্ত করিল, এর ভিতর কোনও গূঢ় অভিসন্ধি আছে। রেখার যে প্রয়োজন সেটা প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়। সে গোপন কাজটার পক্ষে নিত্যরঞ্জন অন্তরায় হইবে বলিয়া তাকে তাড়াইবার এই নির্লজ্জ আয়োজন! কিন্তু কি সে? কোন্ হতভাগ্য পতঙ্গকে এই পাপিষ্ঠা আপনার মোহের আগুনে আকৃষ্ট করিতেছে! তিন চার জনের কথা মনে হইল। তাদের সঙ্গে সৌরীনের ব্যাপার উপলক্ষে রেখার কথাবার্ত্তা হইয়াছে। তাদের সঙ্গে রেখার ব্যবহারটা নিত্যরঞ্জনের কাছে বরাবরই বিসদৃশ মনে হইয়াছে। বেশ! বেশ!

ভয়ানক বিরক্ত হইয়া নিত্যরঞ্জন তার ঘরে গেল। তার পর সে রেখার সঙ্গে আর বাক্যালাপ করিল না।

সারারাত্রি সে ছট্ ফট্ করিয়া কাটাইল। পরের দিন সকালে সে অত্যন্ত সংক্ষেপে রেখার কাছে বিদায় হইয়া চলিয়া গেল।

* * * *

ময়মনসিংহে সৌরীনের যে কয়জন শিষ্য অবশিষ্ট ছিল, তাহাদিগকে রেখা একত্র করিল। দুই একজন লোক সৌরীনকে বেশ শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহারা ইহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। রেখা তাঁহাদের হাতে সাড়ে সাত হাজার টাকা দিয়া তাঁহাদের দ্বারা সৌরীনের অসমাপ্ত কাজ আবার আরম্ভ করিয়া দিয়া গেল। মাসে মাসে সে টাকা পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া গেল।

রেখার যে নারী-বন্ধু ময়মনসিংহে চাকরী করিত, তার সঙ্গে যুক্তি করিয়া এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করিয়া সে স্থির করিল যে, বাঙ্গলা ও বিহার উভয় গভর্ণমেণ্টকে সম্মত করিয়া সে তার বন্ধুটির সঙ্গে চাকরী বদল করিয়া লইবে।

এই সব ব্যবস্থা স্থির করিয়া সে কলিকাতায় ফিরিয়া গেল। সেখানে গিয়া শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। তার পর পাটনায় যাইবার আগে সে নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করিল।

নিত্যরঞ্জনকে যখন রেখা তার ময়মনসিংহের কাজের বিবরণ প্রকাশ করিয়া জানাইল, তখন নিত্যরঞ্জন একটু তৃপ্তিলাভ করিল এই ভাবিয়া যে, রেখাকে পাপীয়সী ভাবিয়া সে যে দুঃখ পাইয়াছে, তাহার কোনও হেতু নাই। কিন্তু তার চেয়ে রাগ তার বেশী হইল। এই যদি তার প্রয়োজন ছিল, তবে সে কাজে সে নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে পরামর্শ করিল

না, তাকে সে কাজের ভাগ দিল না কেন? তাকে এমন করিয়া গলহস্ত দিল কিসের জন্য?

রেখার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় সে বিশেষ ভদ্রতা রক্ষা করিতে পারিল না।

(২৩)

রেখার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। সে পাটনা হইতে ময়মনসিংহের স্কুলে চাকরী লইয়া আসিয়াছে এবং নিজে "সৌরীন্দ্র আশ্রমের" কাজে অনেকটা সাহায্য করিতেছে।

সৌরীন্দ্র দীর্ঘ সাধনায় যে নিষ্ফলতা লাভ করিয়াছিল তাহা হইল তার পরবর্ত্তী কর্ম্মীদের সফলতার ভিত্তি। সৌরীন যে সব ভুল করিয়াছিল পরবর্ত্তীরা সে সব ভুল ত্রুটি সংশোধন করিয়া কাজ করিতে লাগিল। কাজ বেশ চলিতে লাগিল। এক বৎসরের মধ্যে চার পাঁচটি গ্রামে বেশ সুন্দরভাবে কাজ হইতে লাগিল। সেখানকার তাঁতি, জোলা, মুচি প্রভৃতি শ্রমজীবীদের অবস্থা ফিরিয়া গেল। তাই দেখিয়া অন্যান্য গ্রামের শ্রমিকেরা সৌরীন্দ্রের আশ্রমের দুয়ারে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিতে লাগিল। রেখার সর্ব্বস্ব সে এ কাজে ব্যয় করে—তার দেখাদেখি আরও কয়েকজন অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল। সৌরীন্দ্র-আশ্রম সফলতা ও প্রতিষ্ঠায় দেশের মধ্যে একটা আদর্শ-স্থানীয় হইয়া উঠিল।

রেখা ইহাতে তৃপ্ত হইল। সে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া সৌরীন্দ্র-আশ্রমের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিত। তার এ কাজে না ছিল ক্লান্তি, না ছিল তুষ্টি—একটা বৃহৎ কর্ম্মস্রোতের ভিতর গা ঢালিয়া দিয়াই সে তৃপ্তি পাইত।

লতা তার বুকের পুরাতন স্নেহবুভুক্ষা প্রচুর পরিমাণে তৃপ্ত করে। সে যতই বড় হইতে লাগিল, ততই তার ভিতর নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তার কাজ-কর্ম্ম, কথাবার্ত্তার ভিতর রেখা নূতন নূতন অমৃত-প্রস্রবণের সন্ধান পাইতে লাগিল। তার ভিতর সে আপনাকে একেবারে ডুবাইয়া দিল।

তবু তার অন্তরের ভিতর একটা দারুণ শূন্যতা হাহাকার করে—তার তরঙ্গের আঘাতে তার হৃদয় বেদনায় লুটাপুটি খায়। মাতালের মত সে কাজে ডুবিয়া থাকে,—লতাকে লইয়া, সৌরীন্দ্র-আশ্রম লইয়া সে আপনাকে সর্ব্বদা ব্যস্ত রাখে—মনের সঙ্গে সে মুখোমুখী হইতে চায় না;—যখন না হইয়া উপায় থাকে না, তখনই তার ভিতর এই অন্ধকার বিরাট শূন্য একটা হিংস্র গর্জ্জনে তার অন্তর ফাটিয়া ছিঁড়িয়া ছারখার করিয়া ফেলে।

ময়মনসিংহে প্রথমবার আসিয়াই সে সৌরীনের খোঁজ করিবার জন্য নানা রকম চেষ্টা করিয়াছে—নানা সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছে, কিন্তু দুই বৎসরের ভিতর সে তার কোনও সন্ধানই পায় নাই। সৌরীন ময়মনসিংহ হইতে কিছুদিন পরে ঢাকায় গিয়াছিল। সেখানে কিছু দিন প্রাইভেট টিউশনি করিয়াছিল—এ সংবাদ পাওয়া গেল। কিন্তু তার পর যে সে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, তার আর কোনও সন্ধান কেউ বলিতে পারিল না।

এত দিনে সৌরীনের কোনও সংবাদ না পাইয়া রেখা মনে মনে স্থির করিল, সৌরীন বাঁচিয়া নাই—যদি থাকিত, তবে কি সে রেখার শত শত করুণ মিনতিপূর্ণ বিজ্ঞাপন অগ্রাহ্য করিতে পারিত? সৌরীন্দ্র-আশ্রমের লম্বা লম্বা বিবরণ রেখা সব কাগজে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। তার আশা ছিল যে, এ বিবরণ সৌরীনের দৃষ্টিতে পড়িলে, সে একবার তার এই কীর্ত্তি দেখিবার জন্য না আসিয়া পারিবে না,—যে স্বপ্নের সাধনায় সে আপনাকে নিঃস্ব করিয়া বিলাইয়া দিয়াছিল, তারই প্রেমের উদ্দীপনায়, তারই আদর্শের অনুপ্রেরণায়, তারই একান্ত প্রিয়তমা রেখা যে সেই স্বপ্ন সফল করিয়া তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, এটা দেখিবার লোভ সৌরীন কখনও সম্বরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু যখন সৌরীন ইহার কোনও সংবাদই লইল না, তখন রেখা হতাশ হইয়া স্থির করিল সৌরীন বাঁচিয়া নাই।

এ কথা ভাবিতে তার অন্তরের সেই শূন্যতা একেবারে প্রাণের ভিতর তাণ্ডব নৃত্য লাগাইয়া দিল—রেখা অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। সৌরীন যদি বাঁচিয়া না থাকে, তবে কিসের জন্য তার এ চেষ্টা;—তার সাধনার সফলতা যদি সৌরীন আসিয়া না দেখিল, তবে কেন এত নিষ্ফল আয়োজন? সে নিদারুণ হতাশায় ছটফট করিয়া উঠিল—জীবনের সমস্ত সাধ তার ফুরাইয়া গেল—সুধু লতা তাকে এ জগতের সঙ্গে একটি মাত্র সূক্ষ্ম সূত্রে বাঁধিয়া রাখিল।

ইহার পর রেখার জীবনে একটা মত্ত কর্ম্মোন্মাদ ও

একটা নিদারুণ অবসাদ পর পর তাকে আলোড়িত করিতে লাগিল। কিছু দিন সে পাগলের মত কাজ করে, বাহ্যজ্ঞান তার লোপ পায়, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সে কাজ করে—অনুভব করে যে এই কাজেই তার জীবনে একমাত্র সার্থকতা, একমাত্র সিদ্ধি। তার পর আসে অবসাদ, সমস্ত তিক্ত বিস্বাদ হইয়া উঠে, জীবনের বা কর্ম্মের আর তার কাছে কোনও মানে থাকে না, কেবল লতাকে মানুষ করিয়া তোলা ছাড়া আর তার কোনও প্রয়োজন বা সার্থকতা সে খুঁজিয়া পায় না।

এক দিন সে এই অবসন্নতার অতল গহ্বরে পড়িয়া নিস্পন্দ হইয়া তার ঘরে বসিয়া ছিল। তার আয়া আসিয়া খবর দিল, নিত্যরঞ্জন আসিয়াছে। সে তার অবসন্ন দেহ কোনও মতে টানিয়া তুলিয়া নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল।

তার সে মূর্ত্তি দেখিয়া নিত্যরঞ্জনের বুকের ভিতর ছুরী বিঁধিয়া গেল। রেখার বেশভূষা কিছুই ছিল না। সে বেশভূষা আর করে না। পাড়ওয়ালা সাড়ীও পরে না। ঠিক বিধবার বেশ না করিলেও সে পরে সুধু নরুণ-পেড়ে একখানা ধুতি ও সাধা একটি ব্লাউজ—তাও খুব মোটা কাপড়ের। হাতে দুগাছা সুতার মত সরু চুড়ী। কেশের প্রসাধন সে বহু দিন ছাড়িয়া দিয়াছে। তার মুখ শুকাইয়া আমসী হইয়া গিয়াছে—তাতে তার বড় বড় চোখ দুটি আরও বড় হইয়া উঠিয়াছে—আর সমস্ত মুখখানিকে এক অপরূপ করুণ লাবণ্যে ভূষিত করিয়াছে।

নিত্যরঞ্জন মনে অনেক ক্ষোভ লইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু সব ক্ষোভ তার মিলাইয়া গেল এক করুণ মর্ম্মবেদনায়।

রেখা যখন পাটনায় ফিরিয়া যায়, তখন নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল, কিন্তু নিত্যরঞ্জন তাকে অতিরিক্ত রূঢ়তার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিল। সেই জন্য তার পর রেখা আর তার সঙ্গে দেখা করে নাই বা তার কাছে কোনও সংবাদই দেয় নাই। একবার তার মনে হইয়াছিল যে, সৌরীন্দ্র-আশ্রমের পরিচালনা বিষয়ে নিত্যরঞ্জনের সাহায্য ভিক্ষা করে। কিন্তু তখন তার মনে হইল—সৌরীনের সঙ্গে নিত্যরঞ্জনের সেবা বিষয়ে মতামত ও কর্ম্মপ্রণালীর কত গুরুতর প্রভেদ ছিল। মনে পড়িল যে, নিত্যরঞ্জন সৌরীন্দ্রকে সেবাকার্য্য লইয়া বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা করিয়াছিল, এবং তার ন্যায্য সম্মান হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছিল। সে স্থির করিল সৌরীনের স্মৃতিরক্ষা ও তার কর্ম্মানুষ্ঠানকে সফল করা বিষয়ে নিত্যরঞ্জনের সহায়তা লইলে সে সৌরীনের কাছে অপরাধী হইবে। সৌরীনের কি আদর্শ তাহা রেখা যেমন জানিত তেমন আর কেউ জানিত না। তার কর্ম্ম-পদ্ধতি ময়মনসিংহের অনুষ্ঠানের ভিতর পরিস্ফুট। সেই আদর্শ ও সেই পদ্ধতি রেখা একা, নিত্যরঞ্জনের সহায়তা না লইয়া, অনুসরণ করিবে, ইহাতে সে সফল হউক বা না হউক।

তাই নিত্যরঞ্জনের সঙ্গে রেখার আর দেখা শোনা বা কোনও রকম সম্ভাষণই হয় নাই।

কিন্তু নিত্যরঞ্জন রেখাকে ভুলিতে পারে নাই। যতই তার রেখার উপর রাগ হইতেছিল, ততই সে তাকে কামনা করিতেছিল। আর যত কামনা করিতেছিল, ততই নির্ম্মম ভাবে আপনাকে নিষ্পেষিত করিতেছিল।

রেখার সংবাদ সে প্রায়ই পাইত। খবরের কাগজে তার সৌরীন্দ্র-আশ্রমের সংবাদ সে আগ্রহের সহিত পড়িত। পড়িয়া মুগ্ধ হইত, বিরক্ত হইত। রেখার অসামান্য চরিত্র-গৌরব তাহাকে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিত—তার সফলতায় তার মনে প্রশংসা ও আনন্দ সঞ্চারিত করিত—কিন্তু সে ঠিক সেই পরিমাণে বিরক্ত হইত এই ভাবিয়া যে, রেখার এই যে বিশাল আয়োজন, ইহার সঙ্গে তার কোনও যোগই নাই। রেখা তার কাছে একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করে নাই। ইহাতে তার অন্তর অভিমানে ভরিয়া উঠিত। ইহাই যদি তার অভিপ্রায় ছিল, তবে সে কেন নিত্যরঞ্জনের নীরস শুষ্ক জীবনপথে রসের জীবন্ত মূর্ত্তির মত নামিয়া আসিয়াছিল—সুধু পোনেরটি দিন সে কেন তাকে সঙ্গী ও সহচর করিয়া, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া—একপ্রাণ, একলক্ষ্য লইয়া কাজ করিয়াছিল! কোনও দরকার তো ছিল না। রেখার মত মেয়ে একা ময়মনসিংহে গিয়া নিজেই সব কাজ করিতে পারিত—নিত্যরঞ্জনকে সঙ্গে লইবার, তাকে সাহায্য করিবার অধিকার দিবার কোনও দরকার ছিল না।

শুধু তাই তো নয়—সে পোনেরো দিন তো তারা সুধু পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কাজ করে নাই—তারা যে অন্তরঙ্গ হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল। অন্ততঃ নিত্যরঞ্জনের মনে হইয়াছিল যে, রেখা তার সঙ্গে খুব বেশী সহৃদয়তা—বুঝি বা স্নেহ, বুঝি বা একটু প্রেম—দেখাইয়াছিল। রেখার

হাসি, অশ্রু, তার আলাপ, সম্ভাষণ—সকলের ভিতর নিত্যরঞ্জন দেখিতে পাইয়াছিল অনেক জিনিষ—দেখিয়াছিল নিত্যরঞ্জনের উপর তার একান্ত নির্ভরতা! নিত্যরঞ্জনের কাছে সে প্রাণ খুলিয়া বলিত তার সব সুখ-দুঃখের কথা, আশার কথা, নিরাশার কথা। তার কাছে সে হাসিত, তারই কাছে কাঁদিত—আর নিত্যরঞ্জনের মনে হইত, যেন এ হাসি কান্নার ভিতর দিয়া সে ঢালিয়া দিত তার সমগ্র অন্তর।

কিন্তু যেই তার কাজ শেষ হইয়া গেল, অমনি রেখা হঠাৎ যেন নিত্যরঞ্জনের হাতের মুঠা হইতে পিছলাইয়া গেল, আর সে তার নাগাল পাইল না। সে তখনি শম্বুকের মত কঠিন খোলের ভিতর ঢুকিয়া নিত্যরঞ্জনকে কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করিল—কথায় নয়, ব্যবহারে।

কেন এমন হইল? একবার নিত্যরঞ্জন ভাবিত, এ কেবল রেখার খামখেয়ালী—তার নারীসুলভ চাতুরী! তার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য রেখা নিত্যরঞ্জনকে তার নারী-চরিত্রের সব ছলা-কলা দিয়া ভুলাইয়াছিল। তার কাজ ফুরাইয়া গেলে তাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে। এ কথা ভাবিতে তার অন্তর ঘৃণায় ভরিয়া উঠিত।

কিন্তু আবার সে ভাবিত যে, রেখা তো কোনও তুচ্ছ প্রয়োজনে তাকে ডাকে নাই, কোনও তুচ্ছ সুখের লালসায় তো সে নিত্যরঞ্জনকে বর্জ্জন করে নাই—সে যে একটা মহৎ কর্ম্মে আপনাকে নিঃশেষে বিসর্জ্জন করিয়াছে, একটা দুরায়াসলভ্য আদর্শের অনুশীলনে আত্মনিবেদন করিয়াছে। সে তো তুচ্ছ নারী নয়, সে মহীয়সী! যারা খামখেয়ালী, খেয়ালের বশে পুরুষের হৃদয় লইয়া ছিনি-নি-নি খেলে, সে মেয়ে তো রেখা নয়! এ কথা ভাবিতে নিত্যরঞ্জনের দিব্যচক্ষু খুলিয়া যাইত। সে দেখিতে পাইত, রেখা সৌরীনের প্রেমে সন্ন্যাসিনী—নিত্যরঞ্জনকে সে কোনও দিন এক ফোঁটা স্নেহ করে নাই, সুধু সৌরীনের বন্ধু বলিয়া সে তাকে তার কাজের একটুকু ভাগ দিয়াছিল।

এ কথা ভাবিতে নিত্যরঞ্জনের সুখ হইত না—হইত একটা নিদারুণ হিংসা, একটা অসহনীয় জ্বালা! সৌরীন কী এমন, যার জন্য রেখা এমন করিয়া নিত্যরঞ্জনকে তুচ্ছ করে! দুইটা পরীক্ষায় সে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল সত্য, কিন্তু জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে কোথায় সৌরীন আর কোথায় নিত্য-রঞ্জন! তবু রেখার কাছে কি না সেই অপদার্থ সৌরীনই সব, আর নিত্যরঞ্জন কিছুই না,—দুটো কথা কহিবারও যোগ্য নয়।

তা ছাড়া তার সৌরীনের উপর আরও বেশী রাগ হইত এই ভাবিয়া যে, রেখা সেই অপদার্থটার জন্য এমন ভাবে আপনাকে বিনাশ করিতেছে,—জীবনটাকে তুচ্ছ করিয়া দুই হাতে উড়াইয়া দিতেছে। আর নিত্যরঞ্জন তার প্রেম লইয়া সে জীবন সার্থকতায় ভরিয়া দিবার জন্য তাহার দুয়ারে বৃথাই ঘা মারিতেছে! এ রেখার একটা অন্যায় বাড়াবাড়ি। নিত্যরঞ্জন যদিও চির দিনই বড় গলায় হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শের প্রশংসা করিয়া আসিয়াছে, তবু এক অলভ্য দূরগত পুরুষের প্রতি এ ঐকান্তিক নিষ্ঠা তার চোখে আজ ভাল লাগিল না। রেখার বেদনা তাহার অন্তরকে পীড়ন করিল—তার নিজের জীবনের ব্যর্থতা-বোধ তাহাকে অন্ধ করিয়া দিল। সে রেখার ত্যাগ ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যের ভিতর প্রশংসা করিবার বা আনন্দ দিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না—সে দেখিল, ইহার ভিতর শুধু একটা নিরর্থক আত্মপীড়ন।

অনেক বার তার মনে হইয়াছে যে, একবার রেখার সঙ্গে মুখোমুখী হইয়া এ কথা আলাপ করিয়া সৌরীনের প্রতি তার এই অদ্ভুত নিষ্ঠা হইতে তাহাকে বিরত করে। মনে মনে রেখার কল্পনা-মূর্ত্তি চক্ষের সামনে স্থাপন করিয়া সে অনেক দিন তার সঙ্গে এ বিষয়ে প্রচণ্ড তর্ক করিয়াছে, রেখার সকল যুক্তি বার বার করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে; কিন্তু, খুব বেশী আকৃষ্ট হইয়াও সে একবারও রেখার কাছে উপযাচক হইয়া যাইতে সাহসী হয় নাই। তার প্রথম কারণ রেখার উপর অভিমান—সে কেন একবার ডাকে না। তা ছাড়া একটু সঙ্কোচ, একটু ভয়ও ছিল। সে যদি রেখার সঙ্গে বিনা প্রয়োজনে দেখা শোনা, আলাপ সালাপ করিতে যায়, তবে রেখা নিশ্চয় ভাবিবে, তার মতলব ভাল নয়—হয় তো সে তাকে ঘৃণা করিবে। এ পর্য্যন্ত রেখা নিত্যরঞ্জনকে মোটের উপর ত্যাগী, চরিত্রবান পুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধাই করিয়া আসিয়াছে। রেখার প্রেমলাভ করিবার অনিশ্চিত—প্রায় অসম্ভব আশায় সে এই শ্রদ্ধাটুকু হারাইতে সাহস করে নাই। তাই অনেকবার ময়মনসিংহে যাইবার জন্য তল্পীতল্পা বাঁধিয়াও নিত্যরঞ্জন শেষ মুহূর্ত্তে তার সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছে।

শেষে এক দিন সে সত্য সত্যই ময়মনসিংহে গিয়া রেখার গৃহে গিয়া দেখা দিল।

অনেক কথা সে তৈয়ার করিয়া আসিয়াছিল, অনেক তর্ক-যুক্তি সে সংগ্রহ করিয়াছিল,—রেখার পক্ষে অনেক উত্তর কল্পনা করিয়া তাহা নিরস্ত করিবার আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু রেখার করুণ উদাস মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া তার সে সব অতল জলে ডুবিয়া গেল,—তার বুক ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল শুধু একটা নিবিড় বেদনার অসহ্য আলোড়ন—একটা নাম-রূপ-শূন্য অনির্দ্দিষ্ট কান্নার সুর!

রেখাকে দেখিয়া সে চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, "এ কি, তোমার এ কি মূর্ত্তি?"

এত দিন মনের নিভৃত কন্দরে রেখার সঙ্গে অভিসার করিয়া সে তাকে এমন আত্মীয় করিয়া তুলিয়াছিল যে, সে ভুলিয়া গেল যে, রেখাকে সে বরাবর 'আপনি' বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছে, এবং তাই তার করা উচিত।

রেখা তার চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া একটা শুষ্ক হাসি হাসিয়া সুধু বলিল, "কেন? কি হ'য়েছে?"

"কি হ'য়েছে!—একেবারে যে আম্‌সী হ'য়ে গেছ।"

আবার একটু হাসিয়া রেখা বলিল, "আমার চেহারা তো কোনও দিনই সুন্দর ছিল না।"

"সুন্দর!—যা'ক, সে কথা বলে আর তোমার অভিমান বাড়াব না। কিন্তু রূপের কথা বলছি না। বলছি, তুমি এমনি করে আপনাকে মেরে ফেলবে স্থির ক'রেছ না কি?"

"তাই যদি হয় তাতে ক্ষতি কি? মেয়ে মানুষের জীবন যত বড় হয় ততই দুঃখ।"

"এ কথা তোমার মুখে শুনবো আশা করিনি—এই আপনার মুখে!"

এতক্ষণে নিত্যরঞ্জনের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। তার পক্ষে রেখাকে 'তুমি' সম্বোধন যে অত্যন্ত অশোভন এ কথা খেয়াল হইতে নিত্যরঞ্জন ভয়ানক লজ্জিত হইয়া উঠিল।

রেখাও একটু লজ্জিত হইল। সে বলিল, "আপনি আমাকে 'তুমি'ই ব'লবেন—আপনি যে আমার দাদা।"

কথাটায় যেন নিত্যরঞ্জনকে চাবুক মারিল। সে কিছুক্ষণ কথা কহিল না। গম্ভীর ভাবে অনেকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

রেখা বলিল, "আপনি ভাল আছেন?"

নিত্যরঞ্জন অনেক মুশাবিদা করিয়া স্থির করিল, এই প্রশ্ন ধরিয়া সে ক্রমে আসল কথাটা পাড়িবে। তাই সে হাসিয়া বলিল, "আমি সন্ন্যাসী মানুষ, আমার ভাল মন্দের খবরে কার কি প্রয়োজন বলুন।"

রেখা বলিল, "সে কি? আপনার ভাল মন্দে যে দেশের সবার প্রয়োজন আছে।"

এইবার নিত্যরঞ্জন একটা দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া তার প্রেম ব্যক্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু ঠিক সেই সময় লতা আসিয়া রেখার কোল জুড়িয়া বসিল। এই মেয়েটা নিত্যরঞ্জনের ভাবনা চিন্তা সব এলোমেলো করিয়া দিল। নিত্যরঞ্জনের বক্তৃতা আর করা হইল না। সে স্থির করিল, রেখাকে প্রেম নিবেদন করিবার পূর্ব্বে এই লতার ব্যাপারটা তলাইয়া দেখিতে হইবে।

সুতরাং কিছুক্ষণ উভয়ে নীরবে বসিয়া রহিল। তার পর রেখা বলিল, "পোড়াকপাল আমার! আমি দিব্যি বসে আপনাকে বকাচ্ছি,—আপনার নিশ্চয় খাওয়া-দাওয়া হয় নি।"

নিত্যরঞ্জন বলিল, "না—কিন্তু সেজন্য ব্যস্ত হ'বেন না, আমি সুপতির ওখানে যাচ্ছি"—

"না না, সে কি! আপনি যে দুদিন আছেন, এখানেই থাকুন। আমাদের আশ্রমটা একবার দেখে শুনে যাবেন।"

এ নিমন্ত্রণে নিত্যরঞ্জন প্রীত হইল। সে রেখার বাড়াতেই রহিয়া গেল।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে নিত্যরঞ্জন রেখার কাছে লতার প্রকৃত বিবরণ শুনিল। তার মন হইতে একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। ইহার পর সে তার অবসর খুঁজিতে লাগিল।

রেখা যে বাড়ীতে থাকিত, সেটা তার আশ্রমেরই বাড়ী। একতলায় আশ্রমের আফিস ও কতক কারখানা আছে। দুই চারজন কর্ম্মীও বাস করে, দোতলায় থাকে রেখা ও তার সঙ্গী দুটি নারী-কর্ম্মী। নিত্যরঞ্জন তাদের এই উপরের গৃহস্থালীর ভিতর স্থান পাইয়াছিল।

রেখার সঙ্গে তার দেখা-শোনা খুব বেশী হয় না, আর যাও বা হয় তাহা নির্জ্জনে নয়। স্কুলের কাজের অবসরে যেটুকু সময় রেখা পায়, তার সবটুকুই সে আশ্রমের লোকজন লইয়া আশ্রমের কাজে ব্যয় করে। কাজেই নিত্যরঞ্জনের অবসর পাইতে কিছু বিলম্ব হইল।

কিন্তু তার এ আশ্রম ছাড়িয়া যাইবার বিশেষ তাড়া না থাকায়, একদিন তার সুযোগ জুটিয়া গেল।

রেখা সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সকলকে বিদায় দিয়া তার বসিবার ঘরে একা উদাস প্রাণে বসিয়া ছিল। বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া সে একটা সোফার উপর এলাইয়া পড়িল।

তার অন্তর জুড়িয়া ছিল তখন একটা ব্যর্থতার হাহাকার—ক্ষুধাতুর শূন্য হৃদয়ের তীব্র শুষ্ক আর্ত্তনাদ। সে ইহা সহিতে পারিল না, ক্রমে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

নিত্যরঞ্জন বাহিরে গিয়াছিল, ফিরিয়া ঘরে ঢুকিয়াই দেখিতে পাইল রেখার এই দীন মূর্ত্তি। এক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধ হইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া সে রেখার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তার গায় হাত দিতে তার ভয়ানক সঙ্কোচ বোধ হইল—কিন্তু তার বুক ঠেলিয়া একটা আকাঙ্ক্ষা তাহাকে চালাইয়া লইল,—এই বেদনার মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া ২ঙ্কোচের বাধা কাটিয়া গেল। সে রেখার হাতখানি ধরিয়া মুখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কাঁদছো তুমি রেখা?" তার বুকের ভিতর প্রচণ্ড বেগে হাতুড়ি পিটিতে লাগিল।

রেখা নিত্যরঞ্জনের এ স্পর্দ্ধায় রাগ করিল না, বরং বিশাল সীমাশূন্য অস্নেহের সাগরে পড়িয়া সে নিত্যরঞ্জনের এই সহানুভূতিটুকু পাইয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে কোনও কথা কহিল না।

নিত্যরঞ্জন বলিল, "রেখা, কেঁদো না, আমার কাছে বল, তোমার কিসের ব্যথা—আমাকে তোমার দুঃখের ভাগ দেও।"

রেখা কতকটা সংযত হইয়া উঠিয়া বসিল। নিত্যরঞ্জন বিনা নিমন্ত্রণেই তার পাশে একটু তফাতে বসিল। রেখার হাতখানা তার হাতেই রহিল।

নিত্যরঞ্জন বলিল, "শোন রেখা, অনেক দিন হ'ল তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছি, ব'লতে সাহস পাই নি। আজ না বলে পারি না। ধৃষ্টতা হয় তো ক্ষমা করো। তুমি এমনি ক'রে নিজেকে ব্যথা দিচ্ছ, এমন ক'রে আপনার মূল্যবান জীবন নষ্ট ক'রছো, এ আমি সইতে পারি না। তোমার কথা ভাবতে আমার বুকের ভিতরটা পুড়ে যায়। কেন এমন ক'রছো? কেন তুমি আত্মহত্যা ক'রছো? জীবনে তোমার সুখ নেই ভেবেছ? ভুল ভেবেছ। সুখ তোমাকে দুই হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন ক'রতে চাচ্ছে, তুমি সুধু কঠোর প্রতিজ্ঞা দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখছো। কি এতে লাভ? কেন এ ক'রছো। সন্ন্যাস ভাল কথা, কিন্তু নিরর্থক আত্মপীড়ন তো সন্ন্যাস নয়। নইলে আত্মহত্যার চেয়ে বড় ধর্ম্ম জগতে থাকতো না।"

রেখার মনে কথাগুলি অনেক দীর্ঘ চিন্তা-সূত্রের সৃষ্টি করিল। সেগুলি অনুসরণ করিতে গিয়া সে কথা কহিবার অবসর পাইল না। নিত্যরঞ্জন আবার বলিল, "তুমি যে কর্ত্তব্য বেছে নিয়েছ জীবনে, তা' আমি তোমায় ছাড়তে বলি না, কিন্তু সে কাজ এমন ক'রে করলে তো চলবে না—সে কাজ ক'রতে হ'বে আনন্দের সঙ্গে, তৃপ্তির সঙ্গে,—তাতে জীবনের সার্থকতা-বোধ থাকা দরকার। এমন ক'রে আপনাকে পীড়ন ক'রে তো সে ধর্ম্ম-সাধন করা যাবে না।—তোমায় সুখী হ'তে হ'বে"—

রেখা সুধু বলিল, "সে আর এ জীবনে নয়!"

নিত্যরঞ্জন বলিল, "এই জীবনেই হ'বে। এমন ক'রে তোমায় আমি নষ্ট হ'তে দেব না। আমাকে সুধু ভার দেও রেখা, আমি তোমার দুঃখের বোঝা বই, তোমাকে সুখী করি। তোমার এ ব্যথা দেখে আমার জীবন মরুভূমি হ'য়ে যাচ্ছে—আমি কাজের শক্তি হারিয়েছি, উৎসাহ হারিয়েছি। কেবল তোমার ঐ ব্যথাতুর মুখখানি আমার দৃষ্টির ক্ষেত্র আচ্ছন্ন ক'রে র'য়েছে। আমাকে রক্ষা কর রেখা, আপনাকে রক্ষা কর!"

রেখা হাত টানিয়া লইয়া সংযত হইয়া বসিল। তার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। তার চক্ষে ভাসিয়া উঠিল অনেক দিনের পুরাতন চিত্র—সৌরীন যখন তার পাশে বসিয়া এমনি করিয়া প্রেম নিবেদন করিত। তার মনের ভিতর একটা অনির্ব্বচনীয় মিশ্রভাবের সৃষ্টি হইল। সৌরীনের সেই প্রিয় স্মৃতি তাহাকে ব্যথিত করিল। অথচ তার উদাস স্নেহবুভুক্ষু হৃদয়ে নিত্যরঞ্জনের প্রীতি যেন মরুভূমে বারির মত বর্ষিত হইয়া তার অন্তর স্নিগ্ধ করিয়া দিল। একটু লোভ হইল, তার চেয়ে বেশী হইল ভয়। তার চঞ্চল চোখের ভিতর ফুটিয়া উঠিল ত্রস্তা হরিণীর ভাব।

কিন্তু সে সরিয়া গেল না, নিত্যরঞ্জনকে তিরস্কারও করিল না, সুধু বলিল, "কি ব'লছেন আপনি?"

নিত্যরঞ্জন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কি বলছি বুঝতে পারছো না রেখা? বুঝতে হবে তোমায়। বলছি আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমার সুখ দুঃখের ভার বইতে চাই। আমি পারি না তোমাকে তোমার জীবন এমনি ক'রে নষ্ট ক'রতে দিতে।"

রেখা স্তব্ধ ভাবে পাথরের মূর্ত্তির মত নিত্যরঞ্জনের দিকে সুধু চাহিয়া রহিল। তার বোধশক্তি চলিয়া গেল, কোনও কিছু ভাবিবার শক্তি তার রহিল না। ভাবিয়া চিন্তিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা তার পক্ষে অসম্ভব হইল। সে সুধু বসিয়া রহিল।

নিত্যরঞ্জন আর একটু অগ্রসর হইল। হাত বাড়াইয়া রেখার একখানা হাত টানিয়া লইল। রেখা বাধা দিল না—তার মনের অসাড় নিস্পন্দতার উপর দিয়া যেন একটা তৃপ্তির মৃদু সমীরণ-স্পর্শ খেলিয়া গেল। নিত্যরঞ্জন বলিল, "হাঁ রেখা, আমি তোমায় ভালবাসি। বল রেখা, আমাকে বিমুখ ক'রবে না—আমাকে ভার দেবে তোমাকে সুখী করবার?"

রেখা চুপ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তার বুকের ভিতর দুম দাম শব্দ হইতে লাগিল। সহসা কি একটা তুমুল পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবের বন্যা তার পাথর-চাপা হৃদয়ের ভিতর দিয়া বহিয়া তাহাকে নাচাইয়া বেড়াইতে লাগিল। সে কি বলিবে, কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

নিত্যরঞ্জন উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সে উঠিয়া মেঝের উপর রেখার পায়ের কাছে বসিয়া রেখার দুই হাত চাপিয়া ধরিল—

এমন সময় বাহিরে কে বলিল, "আমি আসতে পারি।"

যেন বিদ্যুৎ-স্পর্শে চমকিত হইয়া রেখা উঠিল। সে ছুটিয়া দুয়ারের কাছে গেল।

দ্বারের কাছে যাকে দেখিল, তাহাকে দেখিয়া রেখা এক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সে তার মুখের দিকে চাহিল। সে একটী দীন বেশী ভিক্ষুক। পরিধানে তার ছিন্নবাস। মাথার চুলে জটা ধরিয়া গিয়াছে। অযত্ন-রক্ষিত দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকিয়া গিয়াছে। রোগে জীর্ণ-শীর্ণ সে মূর্ত্তি—তবু অপূর্ব্ব দ্যুতিমান তার চক্ষু।

আগন্তুক রেখার দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ পরে ডাকিল, "রেখা!"

রেখা এতক্ষণে নিশ্চয় জানিল—সে সৌরীন!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মুর্শিদাবাদ

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

(আলোকচিত্র—শ্রীযুক্ত ললিতাপ্রসাদ দত্ত এম-আর-এ-এস্ এবং লেখককর্ত্তৃক গৃহীত)

(২)

মুর্শিদাবাদ সহরের উপকণ্ঠের উত্তর দিকে স্থিত জিয়াগঞ্জের দিক হইতে নৌকা-যোগে ভাগীরথী দিয়া আসিতে পূর্ব্বপারে জাফরগঞ্জ ও উহার বিপরীত দিকে পশ্চিম পারে নবাব সিরাজদ্দৌলার মনসুরগঞ্জ ও হীরা ঝিল প্রাসাদের স্থান আছে। ৩রা তারিখে অপরাহ্ণে বড়নগর হইতে জলপথে ফিরিবার সময় আমাদিগের তরণী হীরাঝিলের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। দেখিলাম যে ভাগীরথীর এই দিকের পাড় অত্যন্ত খাড়া এবং বর্ষাকালে তরঙ্গাঘাতে এই দিকের পাড় ভাঙ্গিয়া থাকে। ভাঙ্গা পাড়ের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মনসুরগঞ্জ প্রাসাদের ও হীরা ঝিলের প্রমোদ-উদ্যানের ইমারতগুলির বজ্রের ন্যায় মজবুদ, ও অতিশয় স্থূল ভিতের গাঁথনিগুলি পাড় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পাড়ের উপরে বন জঙ্গল হইয়াছে। স্থানটি নির্জ্জন, এক স্থানে ভগ্ন পাড়ের নীচে নদী-সৈকতে দুইজন মুসলমান নমাজ পড়িতেছে। নদী-সৈকতে নির্জ্জনে ভগবানকে ডাকিবার এমন সুন্দর স্থান অধিক মিলে না। আমরা ও এই দুইটি প্রাণী ছাড়া আর কাহাকেও এই স্থানে দেখা গেল না।

পাড়ের উপরে উঠিয়া দেখিব বলিয়া মাঝিকে নৌকা লাগাইতে বলিলাম। সে তীরের সন্নিকটে নৌকা আনিয়া জলের দিকে তাকাইতে কহিল। আমরা দেখিলাম যে, ইষ্টক-নির্ম্মিত ইমারতের অতি বৃহৎ পাকা গাঁথনির ভগ্ন অংশ জলের মধ্যে পড়িয়া আছে। মাঝি কহিল, ঐ

গুলির সহিত যদি তাহার নৌকার ধাক্কা লাগে, তবে নৌকা ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু তথাপি সে আমাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করিল না; কারণ, ইতিপূর্ব্বে, তাহার প্রার্থনা অনুসারে, নৌকাসহ তাহার একখানি ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছিল। সে উক্ত ফটোগ্রাফের একখানি পাইবার প্রত্যাশা করে বলিয়া, বিপদ তুচ্ছ করিয়া, অতি সন্তর্পণে তীরে নৌকা লাগাইল। আমরা তখন ঢালু পথ দিয়া পাড়ের উপরে উঠিলাম। উপরে উঠিয়া দেখিলাম, দুই পার্শ্বে শান-বাঁধান অতি বিস্তৃত উচ্চ মেঝের ন্যায় আছে। উহার স্থানে স্থানে আম্র ও অন্যান্য বৃক্ষাদি আছে।

রোসনী-বাগ—সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁর সমাধি-গৃহ

এই জনমানবহীন নির্জ্জন স্থানের মধ্য দিয়া আমরা পদব্রজে কিয়ৎদূর দক্ষিণ দিকে যাইয়া দেখিলাম, একটি পরিত্যক্ত বেগুণের ক্ষেত্র ও তাহার পশ্চিম প্রান্তে নিম্ন-ফলাকৃতি পিতলের ধ্বজশোভিত একটি পূর্ব্বদ্বারী একচূড়, অর্দ্ধভগ্ন পরিত্যক্ত শিবমন্দির আছে। মন্দিরটির চতুষ্পার্শ্বে কাঁটা-গাছ হইয়াছে। মন্দিরমধ্যে একটি শিবলিঙ্গ পড়িয়া আছেন। কোন ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি—উক্ত মন্দির জনৈক সাধু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কোন কোন ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি—এই মন্দিরটি এবং মুর্শিদাবাদের সন্নিকটস্থ অনুরূপ অপর কতকগুলি মন্দির লালাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মনসুরগঞ্জ প্রাসাদের ও হীরা ঝিলের আর কিছুই দেখিবার নাই। গৌড়ের ধ্বংস-স্তূপ হইতে প্রস্তরাদি আনাইয়া এই স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে—এই স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া সিরাজদ্দৌলা তাঁহার মাতামহ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁকে প্রাসাদ দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। আলীবর্দ্দী উহা দেখিতে আসিলে, সিরাজ তাঁহাকে কৌশলে একটি গৃহে বন্দী করেন; এবং সমাগত জমীদারগণ অর্থ দিয়া তাঁহাকে উদ্ধার না করিলে তিনি আলীবর্দ্দীকে মুক্তি দিবেন না—ইহা প্রকাশ করেন। অগত্যা জমিদারবর্গ যথেষ্ট অর্থ দিয়া আলীবর্দ্দীর উদ্ধার সাধন করেন। এই স্থান হইতেই সিরাজ পলাশীর যুদ্ধের জন্য যাত্রা করেন; এবং পলাশীর প্রাঙ্গণে পরাজিত হইয়া তিনি এই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভগবানগোলা অভিমুখে পলায়ন করেন। এই স্থানেই ক্লাইব মির্জাফরকে বাঙ্গালার মসনদে বসাইয়াছিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মির্জাফর এই স্থানের প্রাসাদে বাস করিতেন। এই স্থানেই সিরাজের ধনাগার ছিল। হীরাঝিলের ঝিল ও প্রাসাদ ভাগীরথী-গর্ভে লুপ্ত হইয়াছে। "রিয়াজে" লিখিত আছে—এই স্থানটি ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

এই বহুদূর-বিস্তৃত পরিত্যক্ত স্থানের উত্তর দিকে "ফাররাবাগের" ধ্বংসাবশেষ ও ডাহাপাড়া নামক হিন্দুপল্লী অবস্থিত। এই অঞ্চলে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হিন্দুদিগের শ্মশান আছে। এই স্থানে সিক্ত সৈকতের মৃত্তিকা খনন করিয়া নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ শবদেহ প্রোথিত করিয়া চলিয়া যায়। অনেক সময় সেগুলিকে শৃগাল ও কুকুর খুঁড়িয়া বাহির করিয়া আহার করে। এখানে ভাগীরথী-সৈকতে যত্র-তত্র ছিন্ন বস্ত্র ও শয্যাদি, বংশদণ্ড, নরকঙ্কাল ও নরমুণ্ডাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকি পথিকের মনে বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছে।

যে স্থানে "ফাররাবাগ" উদ্যানের চিহ্নমাত্র অবস্থিত আছে, ঐ স্থানটি নবাব সাহেবের বর্ত্তমান প্রাসাদের বিপরীত দিকে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই স্থানে মুর্শিদ কুলী খাঁর রাজস্ব-সংগ্রাহক অত্যাচারী নাজির আহম্মদ একটি উদ্যান-বাটিকা রচনা করিতে আরম্ভ করে। বাকী রাজস্বের জন্য নাজির আহম্মদ জমিদারদিগের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিত। এ কারণ নবাব সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁ তাহার প্রাণদণ্ড বিধান করিয়া, এই বাগানট স্বয়ং সুসজ্জিত করিয়া উহা প্রমোদ-কাননে পরিণত করেন এবং ইহার নাম "ফাররাবাগ" বা "সুখ কানন" রাখেন। বিলাসী নবাব এই রমণীয় উদ্যানে রমণীগণ সহ জলকেলি করিতেন এবং হোলি উৎসবের সময় তাহাদিগের সহিত আবির ও কুঙ্কুম লইয়া ক্রীড়া করিতেন। এই স্থানে ভাগীরথীর জলে অতি বৃহৎ পাকা ইমারতের ভগ্নস্তূপ ঐরাবতের মত পড়িয়া আছে। ফাররাবাগের অধিকাংশই এক্ষণে ভাগীরথীর কুক্ষিগত হইয়াছে।

ফাররাবাগের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ডাহাপাড়া নামক প্রাচীন হিন্দুপল্লী অবস্থিত। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ যখন ঢাকা হইতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে লইয়া আসেন, সেই সময় উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ মিত্রবংশ-সম্ভূত কানুনগো দর্পনারায়ণ ও অন্যান্য হিন্দু কর্ম্মচারীগণ এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানেই মুর্শিদ কুলী খাঁর মুস্তৌফী দপ্তরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী উল মুস্তৌফী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর মিত্র মুস্তৌফী ঢাকা হইতে উঠি আসিয়া বাস করেন। তৎপরে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র শিবরাম তৎপদে অধিষ্ঠিত হইয়া এইখানেই বাস করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঢাকা হইতে আগত হিন্দু কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা এখানে যে ঢাকা-পাড়া প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল, 'ডাহাপাড়া' তাহার অপভ্রংশ মাত্র। দর্পনারায়ণের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী বহু হিন্দু জমিদার এই স্থানে স্বীয় বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দর্পনারায়ণ বংশীয় "বঙ্গাধিকারী"দিগের এই স্থানে প্রাধান্য ছিল। এই পল্লীতে আজিও বহু প্রাচীন কোঠ বাড়ী ও বহু হিন্দুর বাস আছে। এখানে বাজার ও পোষ্টাফিস আছে। কিরীটেশ্বরী এই পোষ্টাফিসের অধীন।

ফাররাবাগের দক্ষিণে "রোসনীবাগ"। এই স্থানে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত কবর স্থানের বা মকবরার উঠানের মধ্যস্থলে একটি একতলা কোঠা আছে। উহার মধ্যস্থলে নবাব সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁর উচ্চ ও বৃহৎ কবর আছে। ১১৫১ হিজরি ১৩ই জেলহজ্জ বা ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বিলাসী কিন্তু বিনয়ী, দাতা ও উচ্চমনা নবাব সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁর মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে এই স্থানে কবর দেওয়া হয়। এই মকবরার মধ্যে আরও কয়েকটি কবর আছে। এই সমাধি-স্থানের প্রবেশ-দ্বার উত্তর দিকে। ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ডাইন বা পশ্চিম প্রান্তে একটি তিন-গুম্বজ-শোভিত মসজিদ আছে। উহা দেখিতে সঙ্কীর্ণাকারে পূর্ব্ববর্ণিত খুসবাগ মকবরার মসজিদের ন্যায়। উঠানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণায় একটি চতুষ্কোণ ছোট ঘর এবং উত্তর-পূর্ব্ব কোণায় একটি অষ্টকোণ ছোট ঘর আছে। বর্ত্তমানে এই মকবরাটি পূর্ত্ত-বিভাগ কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে।

মকবরার বহির্ভাগে উত্তর দিকে একটি এক-চূড় মন্দির আছে। উহার গঠন তদঞ্চলের হিন্দু মন্দিরগুলির ধ্বজের ন্যায় পিতল-নির্ম্মিত। ইহা শিবের বা গণেশের মন্দির হইবে। এই স্থানে জনমানব নাই।

এগুলি ব্যতীত মুর্শিদাবাদ সহরের উপকণ্ঠে পূর্ব্বে বর্ণিত মবারক-মঞ্জিল হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে নিশাত বাগ নামক স্থানে নবাবদিগের একটি প্রমোদ-উদ্যান ছিল,—বর্ত্তমানে তথায় একটি গোপপল্লী মাত্র আছে।

পূর্ব্বে ভাগীরথীর দুই পার্শ্বেই মুর্শিদাবাদ সহর অবস্থিত ছিল। বহু পূর্ব্বে ভাগীরথীর উভয় পারে ইহার দৈর্ঘ্য ১ মাইল ও বেড় ৩০ মাইল ছিল। পলাশীর যুদ্ধের সময় প্রকৃত সহর ভাগীরথীর উভয় পারে ৫ মাইল দীর্ঘ ও ২॥০ মাইল প্রশস্ত ছিল বলিয়া শুনা যায়। মুর্শিদাবাদের অধঃপতনের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই স্থানের অভিজাতবর্গের মধ্যে—বিশেষতঃ মুসলমানদিগের মধ্যে—ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও অবৈধ প্রণয়াদির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সার উইলিয়ম হাণ্টার (Hunter's "Rural Bengal") করুণ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গ দেশ জুড়িয়া যে মহাকাল-রূপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "আনন্দমঠে" করিয়াছেন,—উহা মুর্শিদাবাদের যথেষ্ট সর্ব্বনাশ করিয়াছিল শুধু দুর্ভিক্ষ নহে, উহার সহিত বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সে সময় মুর্শিদাবাদের যত্রতত্র লোক মরিয়া শৃগাল কুকুর ও শকুনীর ভক্ষ্য হইয়াছিল। এই সময় হইতে মুর্শিদাবাদের পতন আরম্ভ। তৎপরে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই স্থান হইতে সর্ব্ব প্রধান দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত উঠাইয়া কলিকাতায় লইয়া যাওয়ায় ও অবশেষে লর্ড কর্ণওয়ালিস যাবতীয় দপ্তর কলিকাতায় উঠাইয়া লইয়া যাইবার পর হইতে, ইহা অবনতির চরম সীমায় পঁহুছিয়াছে। মুর্শিদাবাদের নবাবের পূর্ব্ব-প্রতাপের কিছুই অবশিষ্ট নাই। মির্জাফর হইতেই প্রতাপ কমিয়া আসিতেছিল, নবাব নাজিমের সকল ক্ষমতা ইংরাজদিগের গবর্ণর জেনারেল স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া নবাবকে চিরতরে রাজ্যশাসনের দুশ্চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি দিলেন। অনেক দিন হইতে মুর্শিদাবাদের নবাবগণ ইংরাজ সরকারের নিকট হইতে ভাতা পাইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান নবাব মুর্শিদাবাদের ইন্দ্রভবন-তুল্য সুসজ্জিত বৃহৎ প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া অধিকাংশ সময় কলিকাতায় বাস করিয়া থাকেন।

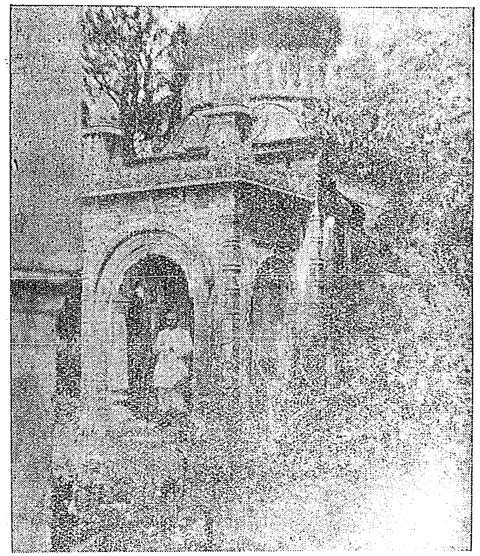

রোসনীবাগ—গণেশের মন্দির

মুর্শিদাবাদের বাসন, রেশমী বস্ত্র, বালাপোষ, মৃন্ময় কুঁজা ও হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে যে সকল উৎসব হয়, তন্মধ্যে "বারা" উৎসব বিশেষ বিখ্যাত। এই উৎসবটি হিন্দু-মুসলমান সকলেই পালন করেন। শুনা যায় যে, এই উৎসবটি নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। দরিয়ার পীর বা জলদেবতা খোজা খিজিরের সম্মানার্থ এই উৎসবের সৃষ্টি। উৎসবটি এই—বর্ষান্তে ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে মুর্শিদাবাদের আপামর জনসাধারণ সন্ধ্যাগমে কলার ভেলার উপরে কাগজের নৌকায় প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া ভাগীরথী-বক্ষে ভাসাইয়া দেয়। এই দিন নবাব-বাহাদুরের একটি বৃহৎ কলার ভেলা আলোক-মালায় সজ্জিত করিয়া ভাগীরথী-বক্ষে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। উহা ৪০ ফিট দীর্ঘ ও উহার

গঠন বজরার ন্যায়। সর্ব্বশেষে নানাবিধ আতসবাজি পোড়াইয়া এই উৎসব করা শেষ হয়।

বড়নগর।

৩রা এপ্রেল প্রাতে ৬টার সময় আমরা উত্তর দিকে বড়নগর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। নিজামৎ কিল্লা, জাফরগঞ্জ, নসীপুর, জগৎশেঠের পরিত্যক্ত ভিটা ও সতীচৌরা অতিক্রম করিয়া নির্জ্জন পথ ধরিয়া গাড়ী ছুটিল। ৭টার সময় ই, বি, রেলের মালগাড়ী চলাচলের শাখা লাইন অতিক্রম করিয়া চলিলাম। মালগাড়ী যাতায়াতের জন্য এই অস্থায়ী লাইনটি জিয়াগঞ্জ হইতে ভাগীরথী-বক্ষের অস্থায়ী কাষ্ঠনির্ম্মিত পুলের উপর দিয়া পরপারে ই, আই, রেলের আজিমগঞ্জ ষ্টেসন পর্য্যন্ত গিয়াছে। অবশেষে আমরা জিয়াগঞ্জ সহরের মধ্য দিয়া ভাগীরথী-তীরে নিমতলা নামক ঘাটে উপস্থিত হইলাম। ঘাট বলিতে এখানে কিছুই নাই, একটি

বড়নগরের ভাগীরথীবক্ষে আমাদের তরণী

নিম গাছ আছে বলিয়া ইহার "নিমতলা" নামকরণ হইয়াছে। ঘাটের নিকটেই ধনবান মাড়োয়ারীদিগের বড় বড় বাড়ী ও ২।৩টি জৈন মন্দির আছে। ঘাটের সন্নিকটেই বালুচর বাজার, তথায় রেসমের বস্ত্র, বাসন ও মিষ্টান্নাদির অনেকগুলি দোকান আছে। ঘাটে আসিয়া একখানি নৌকা ভাড়া করিলাম। মাঝির সহিত বন্দোবস্ত হইল যে, সে আমাদিগকে বড়নগরের ঠাকুর বাটী, সাধুর বাগ ও পূর্ব্ববর্ণিত হীরাঝিল প্রভৃতি দেখাইয়া মুর্শিদাবাদে বাসার নিকটস্থ ঘাটে নামাইয়া দিবে।

নৌকা উত্তর দিকে বড়নগর অভিমুখে চলিল। ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে জিয়াগঞ্জ ও বালুচর এবং পশ্চিম পারে আজিমগঞ্জ সহর। আজিমগঞ্জ সহরটি ভাগীরথীর পশ্চিম পারে রাঢ় দেশে অবস্থিত বলিয়া অধিক বন জঙ্গল নাই। সহরটি দেখিতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ছবির ন্যায়। কিন্তু জিয়াগঞ্জ ও বালুচর ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে বাগড়ী দেশে অবস্থিত বলিয়া বন জঙ্গল আছে; এবং দেখিতে আজিমগঞ্জের ন্যায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নহে। ভাগীরথীর উভয় পারে জিয়াগঞ্জে ও আজিমগঞ্জে ওসোয়াল জাতীয় ধনী মাড়োয়ারী জমিদার ও ব্যবসাদারদিগের বাসস্থান আছে। আজিমগঞ্জ সহরের দক্ষিণ প্রান্তে ফাঁকা মাঠের মধ্যেই ই, আই, রেলের আজিমগঞ্জ জংসন ষ্টেসন অবস্থিত। ভাগীরথীর বক্ষে অস্থায়ী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়া ই, বি, রেলের মালগাড়ী যাতায়াতের অস্থায়ী লাইনটি বর্ষার কয়মাস বন্ধ থাকে। তখন ভাগীরথী-বক্ষের অস্থায়ী সেতু ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এতদঞ্চলে ভাগীরথী-গর্ভে জলের গভীরতা স্থান বিশেষে ২।২॥ ফিট হইতে ২৫।৩০ হাত পর্য্যন্ত আছে। যেখানে জল অত্যন্ত কম, সেখানে মাঝি অতি সন্তর্পণে লগি ঠেলিয়া নৌকা চালাইলেও, জল মধ্যস্থ চড়ায় ঘন ঘন নৌকা বাধিয়া যাইতে লাগিল। জিয়াগঞ্জ ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর উত্তর দিকে যাইলে, আজিমগঞ্জে ভাগীরথী-তীরে যে স্থানে ধুধুরিয়াদিগের বাটী আছে, উহার পাদদেশে ভাগীরথী-গর্ভে ২৫।৩০ হাত গভীর জল আছে। জল নীলবর্ণ ও পুষ্করিণীর জলের ন্যায় স্থির। জলের উপরিভাগ অত্যন্ত অপরিষ্কার। আজিমগঞ্জের ভাগীরথী-তীরবাসী মাড়োয়ারীগণ ভাগীরথী জলে অপরিষ্কার বস্ত্রাদি ধৌত করায় উহার ময়লা জলের উপরে সরের ন্যায় ভাসিতেছে। এই স্থানের গভীর জলে অসংখ্য মৎস্য আছে; কারণ, জৈনগণ এই স্থানে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া মৎস্য ধরা নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। প্রচুর মৎস্য আছে বলিয়া এই স্থানে কুম্ভীরও আছে। শুনিলাম, কিছুকাল পূর্ব্বে এই স্থান হইতে একটি বালককে কুম্ভীরে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। আজিমগঞ্জে যে স্থানে ধুধুরিয়াদিগের বাটী আছে, উহার পাদদেশে ভাগীরথী-বক্ষে স্থানীয় মাড়োয়ারী বা কাঁইয়া ধনীদিগের জল-ভ্রমণের জন্য কয়েকখানি মাঝারি ও ছোট বোট বা বজরা এবং একখানি ছোট মোটর বোট ভাসিতেছে।

আজিমগঞ্জ অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে যাইতে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে যেখানে, উচ্চ পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তথায় ভাঙ্গা পাড়ের ধারে কোথাও কূপের পাট, কোন স্থানে উনান ও পাকা বাটীর ভিত বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এককালে এই নির্জ্জন পাড়ের উপরে মনুষ্যের বাস ছিল—ইহা তাহারই নিদর্শন। সে সকল লোক নাই; কিন্তু তাহাদিগের পরিত্যক্ত স্মৃতিচিহ্ন আজি পথিকের মনে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিতেছে। এই স্থানে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে লোহাগঞ্জ নামক স্থানে পাড়ের উপরে একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত বাঙ্গালা ঘরের আকৃতি বিশিষ্ট লাল বর্ণের ছোট শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি দক্ষিণ-দ্বারী, ইহার সম্মুখের দেওয়ালে ইষ্টকের উপর নানাবিধ মূর্ত্তি ও কারুকার্য্য খোদিত আছে। মন্দিরমধ্যে

একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গ আছেন, উহার চারি পার্শ্বে চারিটি ও উপরিভাগে একটি নরমুণ্ড খোদিত আছে,—অর্থাৎ শিবলিঙ্গটি পঞ্চানন। মন্দিরের পশ্চিম দিকের খোলা রোয়াকের উপরে তিনটি কাল পাথরের সরু শিবলিঙ্গ মেঝেয় গাঁথা আছে। দেখিলাম—২।১টি ফুল দিয়া পূজা সম্পন্ন করা হইয়াছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে বড়নগর হইতে আজিমগঞ্জ যাইবার সরকারি কাঁচা রাস্তা আছে। উহার পশ্চিম পার্শ্বে জটাজুট-শোভিত একটি প্রাচীন ও বৃহৎ বটগাছ আছে। মন্দিরের

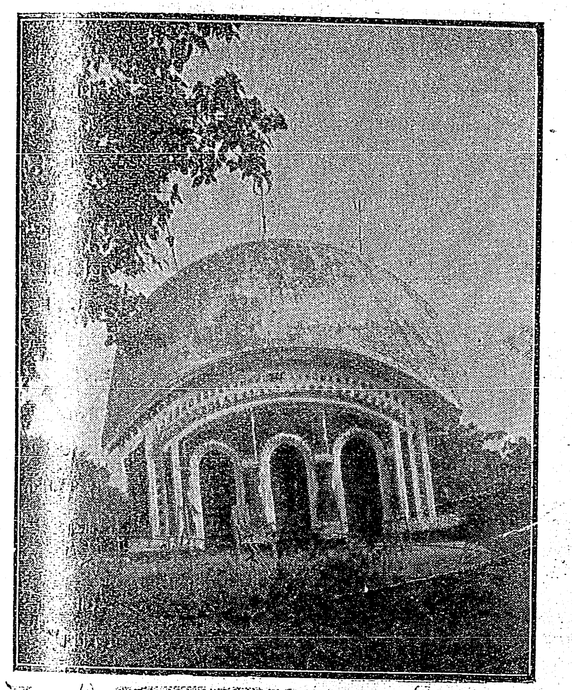

বড়নগর যাইবার পথে লোহাগঞ্জের বাঙ্গালা শিবমন্দির

উত্তর-পশ্চিম দিকে রাস্তার পরপারে ৺গোপীনাথ ঠাকুরের মোহান্তের শুভ্রবর্ণের বৃহৎ অট্টালিকা আছে। মোহান্ত মহাশয় হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব। নৌকা হইতে তীরে নামিয়া খাড়া উচ্চ পাড়ে আরোহণ পূর্ব্বক উক্ত শিবমন্দিরটী ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া পুনরায় নৌকা খুলিয়া দিয়া বড়নগর অভিমুখে চলিলাম।

অল্প দূর যাইয়াই ভাগীরথীর পশ্চিম পারে বড়নগরের কাছারী-ঘাটে উপস্থিত হইলাম। নাটোর বড় তরফের রাজ-কুমারের বড়নগর জমিদারীর অন্যতম কর্ম্মচারী ও পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস ইতিপূর্ব্বে আমার পত্র পাইয়া বড়নগর পর্য্যন্ত আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহারই ভরসায় বড়নগরে আসিলাম। যখন বড়-নগরের ঘাটে পঁহুছিলাম, তখন বেলা প্রায় ৮৷৷৯টা। পাড়ের উপরে উঠিলেই ডাইন দিকে একটি হরিদ্রাভ ক্ষুদ্র শিবমন্দির আছে। অদূরে বামে ভগ্ন গৃহের স্তূপ এবং সম্মুখে নাটোরের রাজ-কাছারি ও কয়েকটি মন্দির আছে। আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া পূর্ণবাবু আমাদিগের নিকটে আসিয়া পরিচয় লইলেন এবং সঙ্গে করিয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইতে চলিলেন।

ঘাটের উপরেই যে ছোট শিবমন্দিরটি আছে, উহা অল্পকাল মধ্যে ভাগীরথীর কুক্ষিগত হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। মন্দিরটি রাণী ভবানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই প্রকারের শিবমন্দির বীরভূম জেলার শিউড়ীতে দেখিয়াছি। ভাগীরথীর পাড়ের উপরে যে রাস্তা আছে, উহার পশ্চিমে, নাটোরের বড় তরফের মহারাজার একতলা কাছারীবাটী আছে। উহারই একটি প্রকোষ্ঠে বড়নগরের ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস বিদ্যমান। কাছারী বাটীর সম্মুখের ভূমিখণ্ডে ভগ্ন গৃহাদির স্তূপ আছে।

কাছারীর পশ্চিম দিকে একটি অত্যুচ্চ অষ্টকোণ শিবমন্দির আছে। উহার নিম্নভাগ দেখিতে নদীয়া জেলার শিবনিবাসের ৺রাজরাজেশ্বর শিবের বৃহৎ অষ্টকোণ মন্দিরের নিম্নভাগের ন্যায়। এই বৃহৎ মন্দিরটির ঊর্দ্ধদেশ দেখিতে একটি বৃহৎ ধুতুরা ফুলের ন্যায়—যেন একটি ধুতুরা ফুল উপুড় করিয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মন্দির-চূড়া লৌহ-ত্রিশূল-শোভিত। মন্দির-গাত্রে মিহি সুরকীর জমাটের উপরে সপুষ্প লতিকা, পুষ্প-মালিকা, পদ্মপুষ্প, কানাই বলাই ও সিংহ প্রভৃতি মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে খোলা রোয়াক আছে, রোয়াকে অযত্নে কাঁটা নটের গাছ ও আগাছা জন্মিয়াছে। রোয়াকের পশ্চাতে গর্ভ-মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া খিলান-করা ছাদ-বিশিষ্ট বারান্দা আছে। এই

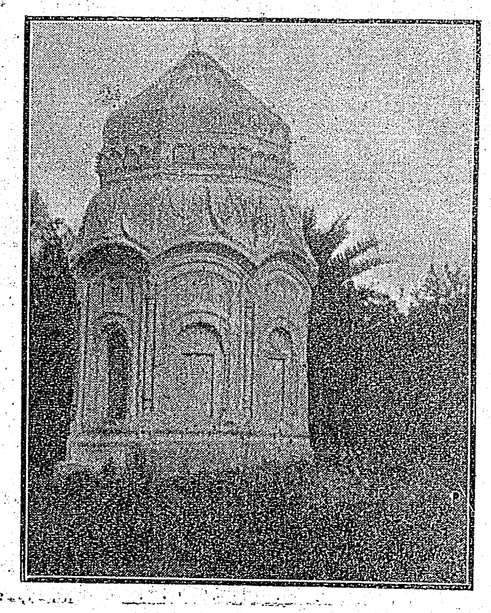

বড়নগর ভাগীরথীতীরে একটি শিবমন্দির

বারান্দার ৮টি ফোকর বা খিলান-করা দ্বার আছে। বারান্দাটি-বহু দিনের পক্ষীর বিষ্ঠায় অপরিষ্কার হইয়া আছে। এই বারান্দা বেষ্টিত

যে গর্ভমন্দিরটি আছে, উহা অষ্টকোণ। দক্ষিণ দিকে ইহার প্রবেশ-দ্বার। এই দ্বারের উপরে যে শিলালিপি ছিল, তাহা বর্ত্তমানে নাই। গর্ভ-মন্দিরের উপরিভাগে আলোক ও বায়ু-প্রবেশের জন্য ৮টি ঘুলঘুলি বা ক্ষুদ্র গবাক্ষের ন্যায় ছিল। তাহা পরে ইষ্টক দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মন্দিরতলে মধ্যস্থলে একটি কাল পাথরের অষ্টকোণ বেষ্টনী বা গণ্ডী আছে। তাহার মধ্যস্থলে একটি কাল পাথরের বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছেন। এই শিবলিঙ্গটি শিবনিবাসের ৺রাজরাজেশ্বর শিব অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহাঁর নাম ৺ভবানীশ্বর। ইঁহার মস্তক ও গাত্র ফাটিয়া গিয়াছে।" দেখিয়া বোধ হইল না যে ইহাঁকে কোন যত্ন করা হয়। আমাদের দেশে আমাদের নিজের বাটীর ও অপর ব্যক্তিদিগের শিব সম্বন্ধে এইরূপ শুনিয়াছি যে, প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবলিঙ্গাদিতে নিয়মিত

বড়নগর ঠাকুরবাড়ীর দৃশ্য

তৈল, ঘৃত ও দুগ্ধ বা জল না পড়িলে উহা ফাটিয়া যায় এবং ফাটিয়া গেলে বিসর্জ্জন দিতে হয়। এখানে দেখিলাম যে, ফাটা ঠাকুরেরও পূজার অভিনয় চলিতেছে। 'বিশ্বকোষ' লিখিয়াছে যে, রাণীভবানী ১৬৭৫ শকে কাশীধামে ভবানীশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন; এবং সেই বৎসরেই বড়নগরে এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া শিব প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা এক্ষণে রাণী ভবানীর গুরুবংশীয়দিগের সম্পত্তি। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে একতলা ভোগের ঘর ছিল; উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শুনিলাম যে, রাণী ভবানীর গুরুকুলের বর্ত্তমান বংশধরগণ বাৎসরিক কয়েক সহস্র মুদ্রা আয়ের সম্পত্তির অধিকারী। কিন্তু শিব ও শিবমন্দিরের অবস্থা দেখিয়া আদৌ বোধ হইল না যে এগুলির প্রতি কোন যত্ন লওয়া হয়।

এই শিবমন্দিরের পশ্চিম দিকে নাড়ুগোপালের দোল ও রাসমঞ্চের একতলা কোঠা ঘর আছে। ইহারই পশ্চিম দিকে নাড়ুগোপালের পূজাবাটী আছে, ইহার সদর দ্বার পূর্ব্বদিকে। দ্বারের দুই পার্শ্বে তারেশ্বর শিবের দুইটি একচূড় মন্দির আছে। উহাদের সম্মুখ-দেশে বাঙ্গালা ঘরের আকৃতি বিশিষ্ট খিলান-শোভিত প্রবেশ দ্বার মন্দির-গাত্র হইতে পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ বাহির হইয়া দণ্ডায়মান আছে। এই শিবমন্দিরদ্বয়ের দুর্দ্দশা দেখিয়া সন্দেহ হইল যে, এই দুইটি মন্দিরও বোধ হয় রাণী ভবানীর গুরুকুলের দখলে আছে।

শিবমন্দিরদ্বয়ের মধ্যস্থ দরওয়াজা দিয়া নাড়ুগোপালের একতলা চকমিলান বাটীতে প্রবেশ করিলে, উত্তর দিকের দক্ষিণ-দ্বারী ৫ ফোকর-শোভিত একতলা কোঠায় কাল পাথরের সুশ্রী নাড়ুগোপাল অধিষ্ঠিত আছেন দেখিতে পাওয়া যায়। উঠানের দক্ষিণ দিকে আর একটি ৫ ফোকর শোভিত একতলা কোঠা আছে, এবং পশ্চিম দিকে ৩ ফোকরযুক্ত আর একটি একতলা কোঠা আছে। কোঠাগুলির গাত্র মিহি সুরকী দিয়া মাজা। এই নাড়ুগোপাল বিগ্রহটি রাণী ভবানীর কন্যা তারা দেবী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নাড়ুগোপালের স্মৃতি ফলকে যাহা লিখিত আছে, তাহা অতি কষ্টে এইরূপ পাঠ করা যায়—

"খ শূন্য মিত্র শকে শ্রী
ভবানী তনু সম্ভবা
নির্ম্মমে শ্রীমতী তারা
শ্রীমদ্গোপাল মন্দিরম্।"

শুনিলাম—বর্ত্তমানে রাণী ভবানীর পৌত্রবধূ রাণী জয়মণির দত্তক-বংশীয়গণ এই বিগ্রহের সেবাএত নিযুক্ত আছেন। নিত্যসেবার জন্য নাড়ুগোপালের বাটীতে একজন পূজারি, একজন পাচক ও ভৃত্যাদি নিযুক্ত আছে।

নাড়ুগোপালের বাটীর উত্তর দিকে একটি নবসংস্কৃত রক্তবর্ণের শান-বাঁধান বেদী আছে। ইহা রাণী ভবানীর দত্তক-পুত্র বিখ্যাত সাধক রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ড আসন। শুনা যায় যে, রাজা রামকৃষ্ণ তাঁহার সাধনার সহায় উত্তর সাধক ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়কে উদ্দেশ করিয়া এই বড়নগরে ভাগীরথী তীরে এই বিখ্যাত গীতটি রচনা করিয়াছিলেন—

"ভোলা! মন যদি মোর ভুলে
তবে বালির শয্যা কালীর নাম
দিয়ো কর্ণমূলে।

এ দেহ আপনার নয়, রিপুসঙ্গে চলে,
দেরে ভোলা জপের মালা
ভাসাই গঙ্গা-জলে॥
ভয় পেয়ে রাজা রামকৃষ্ণ ভোলা প্রতি বলে
আমার ইষ্ট প্রতি দৃষ্টি খাট কি আছে কপালে"॥

এই পঞ্চমুণ্ডাসনের পশ্চিম দিকে একটি ত্যক্ত পুষ্করিণীর খাত ও বন জঙ্গল আছে। ইহাই গোপাল পুষ্করিণী।

উক্ত নাড়ুগোপালের বাটীর দক্ষিণ দিকে দশভুজার একতলা কোঠা আছে। এই বাটীর প্রবেশ-দ্বার উত্তর দিকে। বাটীটি সম্প্রতি সুসংস্কৃত হইয়াছে। বাটীর মধ্যস্থ বিস্তৃত উঠানের উত্তর দিকের একতলা ঘরে উচ্চ বেদীর উপরে তিনটি পিতলের বা অষ্টধাতুর ছোট বড় দশভুজা মূর্ত্তি আছে। এগুলির গঠন-প্রণালী যশোহর জেলার মহম্মদপুরে স্থিত বিখ্যাত রাজা সীতারাম রায়ের (যাহা এক্ষণে নাটোরের বড় তরফের রাজ-কুমার শ্রীযুক্ত জ্যোতীশচন্দ্র রায়ের অধিকার আছে) দশভুজা মূর্ত্তির ন্যায়। গৃহমধ্যে পূর্ব্বদিকে স্থিত সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মূর্ত্তীর নাম ৺করুণাময়ী। ইঁহার পশ্চিম দিকে স্থিত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অপর দশভুজার নাম ৺জয়দুর্গা, এবং তাহার পশ্চিমদিকে স্থিত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দশভুজার নাম ৺রাজরাজেশ্বরী। মূর্ত্তি কয়টিই অতি সুশ্রী। প্রত্যেক মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে একটি করিয়া অপ্সরী বা স্ত্রী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা আছে। ৺রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিটি রাণী ভবানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ৺জয়দুর্গা মূর্ত্তি রাজা রামজীবন কর্ত্তৃক স্থাপিত, এবং ৺করুণাময়ী মূর্ত্তি রাণী ভবানীর পিত্রালয় রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ছাতিম গ্রাম হইতে আনীত। দেবোত্তর সম্পত্তি সহ এই মূর্ত্তিগুলি নাটোরের বড় তরফের রাজকুমারের তত্ত্বাবধানে আছে। বিগ্রহ কয়টী সযত্নে রক্ষিত এবং ইঁহাদিগের নিত্যপূজার ব্যবস্থা ভাল বলিয়াই বোধ হইল। নাটোরের বড় তরফের কর্ত্তৃত্বাধীনে মহম্মদপুরে রাজা সীতারাম রায়ের বিগ্রহ ও মন্দিরগুলির যে অবস্থা দেখিয়াছি, এখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখিলাম। এই ঠাকুরবাটীতে একজন পূজারি, দুইজন পাচক ও ভৃত্যাদি আছে। দুর্গা ও বাসন্তী পূজা উপলক্ষে বিশেষ ব্যয়ের ব্যবস্থা আছে।

দশভুজার বাটীর পূর্ব্ব দিকে আর একটী পৃথক প্রাচীর-বেষ্টিত ক্ষুদ্র মহলের মধ্যস্থ উঠানের উত্তর দিকে একটি ছোট একতলা কোঠা ঘরে স-রাধিকা দারুময় বৃহৎ ৺মদনগোপাল মূর্ত্তি আছেন। অতি সুশ্রী মূর্ত্তি, দেখিতে ঠিক যেন মহম্মদপুরে স্থিত রাজা সীতারাম রায়ের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দারুময় ৺হরেকৃষ্ণ মূর্ত্তির ন্যায়। এই উভয় মূর্ত্তির মধ্যেই সজীবতা ও দেব ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ঘরের মধ্যে স্ফটিকের ও প্রস্তরের কয়েকটি বাণলিঙ্গ শিব, একটি প্রস্তরের নাড়ু-গোপাল মূর্ত্তি, একটি প্রস্তরের প্রাচীন চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তি, একটি ক্ষুদ্র কৃষ্ণ-মূর্ত্তি ও দুইটি অষ্টধাতু-নির্ম্মিত সুশ্রী দশভুজা মূর্ত্তি আছেন। মদনগোপাল মূর্ত্তিটি রাজসাহী জমিদারীর প্রাচীন অধীশ্বর বড়নগর-অধিপতি রাজা উদয়নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। রাজসাহী জমিদারী ও বড়নগর নবাব মুর্শিদ-কুলী খাঁর কৃপায় নাটোর রাজবংশের হস্তগত হইবার পূর্ব্বে উদয়নারায়ণ এই সকল জমিদারীর অধীশ্বর ছিলেন। উদয়নারায়ণের জমিদারীর সহিত তাঁহার বিগ্রহগুলিও নাটোরের রাজবংশের হস্তগত হয়। এই গৃহে যে কয়টি বিগ্রহ আছে, তাহার কোনটিই বোধ হয় নাটোরের রাজবংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহে। সম্ভবতঃ এগুলি সমস্তই রাজা উদয়নারায়ণের বা অপর কোন লোকের বিগ্রহ, এবং সেই জন্যই বোধ হয় এগুলিকে একটি পৃথক ক্ষুদ্র ঘরে রাখিয়া একই স্থানে বিভিন্ন বিগ্রহের পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই গৃহে হয়গ্রীব নামক একটি মূর্ত্তি আছে; উহা কুসুমখোলার কুসুমেশ্বরের

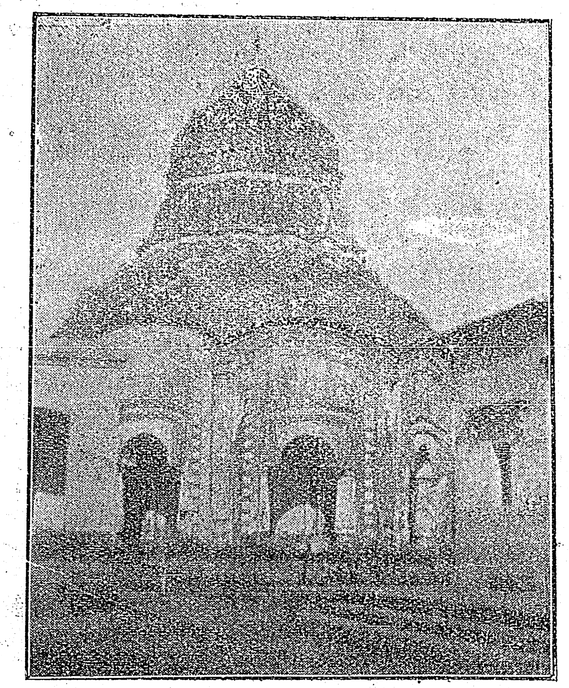

বড়নগর—ভবানীশ্বর শিবের বৃহৎ অষ্টকোণ মন্দির

বিগ্রহ। দুই প্রহরের সময় আমরা এই মদনগোপালের বাটীতে অন্ন-প্রসাদ পাইয়াছিলাম। এই ঠাকুর-বাটীতে নিত্য সেবার জন্য একজন পূজারি, পাচক, ভৃত্য ও পরিচারিকা নিযুক্ত আছে। ঠাকুর-বাটীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে একটি করিয়া দ্বার আছে।

এই ঠাকুর-বাটীর পূর্ব্ব-দ্বার দিয়া বাহির হইয়া ভাগীরথার দিকে যাইতে পথের দুই পার্শ্বে মন্দির ও গৃহাদির ইষ্টকময় ভগ্নস্তূপ আছে। স্তূপগুলির পূর্ব্বদিকে একটি ঠাকুর-বাটী আছে। উহার নাম দ্বাদশ শিবের চারিবাঙ্গালা মন্দির। উহা রাণী ভবানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুর-বাটীর মধ্যস্থলে একটি উঠান আছে। উঠানের চারি দিকে কারুকার্য্য-খচিত ইষ্টক-নির্ম্মিত বাঙ্গালা ঘরের আকৃতি বিশিষ্ট চারিটি শিবমন্দির আছে। উঠানের উত্তর দিকের মন্দিরটির সম্মুখভাগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কারুকার্য্য আছে। মন্দিরটি তিন-ফোকর-বিশিষ্ট। মধ্যের ফোকরের

উপরিভাগে দুই পার্শ্বে রাম-রাবণের যুদ্ধ উৎকীর্ণ আছে। রাম হনুমানের স্কন্ধে চাপিয়া বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, আর রাবণ অস্ত্রাদি ভূমিতে ফেলিয়া দিয়া যোড় হস্তে রামের স্তব করিতেছেন। পার্শ্বস্থ একটি ফোকরের উপরিভাগে কৃষ্ণ-বলরাম-মূর্ত্তি ও শিশুপাল-বধ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা উৎকীর্ণ আছে। পার্শ্বের অপর ফোকরটির উপরিভাগে শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ উৎকীর্ণ আছে। এই মূর্ত্তিগুলি অতি মসৃণ। অতি মিহি সুরকীর সহিত অতীব পরিষ্কৃত চুণ মিশাইয়া মসলা বানাইয়া উহা জমাইয়া এই মূর্ত্তিগুলি প্রস্তুত করিয়া মাজিয়া মসৃণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে খোলা রোয়াক ও তৎ পশ্চাতে মন্দিরাভ্যন্তরে তিনটি কাল পাথরের শিবলিঙ্গ আছে। মধ্যস্থলের শিবটির চতুর্দ্দিকে প্রস্তরের বেষ্টনী বা গণ্ডী দেওয়া আছে। মন্দিরের ছাদের উপরিভাগে তিনটি ধ্বজ আছে। প্রত্যেক ধ্বজে তিনটি করিয়া পিতলের নিম ফলের ন্যায় পদার্থ আছে ও তদুপরি বৃহৎ ত্রিশূল আছে। মন্দিরের পূর্ব্ব-দিকের গাত্র হইতে একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দিরের ন্যায় গাঁথনি বাহির হইয়া আছে। উহার ছাদ বাঙ্গালা ঘরের চালের ন্যায়, এবং উহার সম্মুখদেশ খোলা। ইহার মধ্যে একটী অতি বৃহৎ ও সুশ্রী হস্তপদ-বিশিষ্ট মহাদেব-মূর্ত্তি উপবিষ্ট আছে। ইহার একটী হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিটি সুরকী ও পরিষ্কৃত চুণ মিশাইয়া মসলা প্রস্তুত করিয়া উহা দ্বারা গড়িয়া পরে মাজিয়া দেওয়া হইয়াছে। মন্দিরের সন্নিকটস্থ একটী বৃক্ষের ডালে প্রকাণ্ড এক মৌচাক হইয়া আছে। মন্দির-গাত্র হইতে এরূপ বাহির-করা মন্দির ও তন্মধ্যে এরূপ বৃহৎ ও সুশ্রী সজীববৎ মহাদেব আজ পর্য্যন্ত অন্য কুত্রাপি দেখি নাই। বড়নগরের যাবতীয় মন্দির-মধ্যে কারুকার্য্য হিসাবে এই মন্দিরটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্রেণীর মিহি চুণ-সুরকী জমাইয়া নির্ম্মিত পুত্তলিকাদি এই ঠাকুরবাটীর আর একটী বাঙ্গালা শিবমন্দিরের সম্মুখভাগে দেখিয়াছি এবং কালনায় বর্দ্ধমানের মহারাজার ঠাকুরবাটীতে (৺লালজীর বাটীর সম্মুখস্থ) প্রতাপচন্দ্র মহিষী প্যারীকুমারী কর্ত্তৃক ১২৫৬ সালে নির্ম্মিত শিবমন্দিরের গাত্রে ও হুগলী জেলার সুখড়িয়া গ্রামে মুস্তৌফীদিগের ৺আনন্দময়ী ঠাকুরাণীর মন্দিরের সম্মুখভাগে দেখিয়াছি, অন্য কুত্রাপি দেখি নাই।

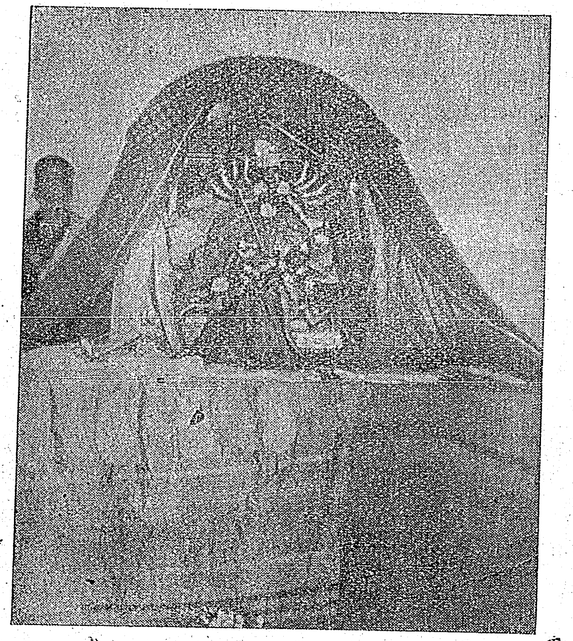

বড়নগর—রাজরাজেশ্বরী দশভুজা

এই ঠাকুরবাটীর উঠানের পশ্চিমে যে বাঙ্গালা মন্দির আছে, উহা পূর্ব্ব-দ্বারী। উহাও তিন-ফোকর-বিশিষ্ট। উহার মধ্যের ফোকরের উপরিভাগে পূর্ব্বোক্ত রূপ মিহি ও পরিষ্কৃত চুণ-সুরকী জমাইয়া নির্ম্মিত রাম-রাবণের যুদ্ধ ও অন্যান্য পৌরাণিক ঘটনা ও মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরটির সম্মুখে খোলা রোয়াক ও তৎপশ্চাতে গর্ভমন্দিরে তিনটি কাল পাথরের শিবলিঙ্গ আছে। তন্মধ্যে মধ্যেরটির চতুর্দ্দিকে কাল পাথরের গণ্ডী দেওয়া আছে। মন্দিরের উপরে তিনটি ত্রিশূল আছে।

উঠানের দক্ষিণ দিকের তিন-ফোকর-যুক্ত বাঙ্গালা মন্দিরের সম্মুখ-দেশে সামান্য কারুকার্য্য ও পদ্মপুষ্পাদি ইষ্টকে খোদিত আছে, কিন্তু কোন পুত্তলিকা নাই। মন্দিরমধ্যে পূর্ব্বোক্ত রূপ তিনটি শিবলিঙ্গ আছে ও মধ্যের লিঙ্গটির চতুর্দ্দিকে গণ্ডী আছে। মন্দিরের উপরিভাগে তিনটি ত্রিশূল আছে। উঠানের পূর্ব্ব দিকে একটি তিন-ফোকর-যুক্ত বাঙ্গালা মন্দির আছে। উহার মিহি সুরকীর জমাট করিয়া তাহার উপরে বালির জমাটে সূক্ষ্ম লতিকাদি ও যৎসামান্য কারুকার্য্য আছে।

এই চারি-বাঙ্গালা মন্দিরের আনুমানিক মাপ সম্মুখদেশে ১৯॥ ফিট× পার্শ্বে ১৫॥ ফিট। মন্দির-ভ্যন্তরের মেঝের মাপ ২৪ ফিট ... ফিট, দেওয়ালের স্থূলতা ৩॥ ফিট। মন্দিরের সম্মুখের রোয়াক ৪॥ ফিট প্রশস্ত। এই চারিটি মন্দিরের প্রত্যেকটির তিনটি করিয়া দোকর বা দ্বার আছে। এই দ্বারগুলির চৌকাঠ স্থূল কাল পাথরের। এই পাথরগুলি গৌড়ের ধ্বংস-স্তূপ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। রাণী ভবানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এই সুন্দর চারিবাঙ্গালা মন্দিরের বর্ত্তমান সেবাএত তাঁহার গুরু-বংশীয়গণ। দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইল যে, মন্দির ও বিগ্রহ-গুলির যত্ন লওয়া হয় না। মন্দির কয়টি ভাল মালমসলা দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া, অযত্নে থাকা সত্ত্বেও আজিও ঝঞ্ঝাবাতকে উপেক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান আছে। শিবগুলির উপরে ২।১টি অর্দ্ধ-শুষ্ক পুষ্প পড়িয়া আছে দেখিয়া বুঝা গেল যে আজিও কোন প্রকারে পূজা হইয়া থাকে। মন্দিরগুলির একটিরও কবাট নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় যে দেবোত্তর সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও রাণীভবানীর অমূল্য মন্দির ও বিগ্রহগুলি এই প্রকার অযত্নে রহিয়াছে। এই দেবালয়গুলি সমগ্র বঙ্গদেশের গৌরবের সামগ্রী, এগুলি নষ্ট হইলে আর হইবে না।

চারিবাঙ্গালা ঠাকুর-বাটীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে, আজিমগঞ্জ যাইবার

পথের দুই পার্শ্বে জটাজট-শোভিত তিনটি অতি বৃহৎ ও প্রাচীন বটবৃক্ষ বহুদূর পর্য্যন্ত বিশাল ডালপালা বিস্তৃত করিয়া ছায়া-শীতল করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ঠাকুরবাটী ও এই বটবৃক্ষগুলির দক্ষিণ দিক দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটি প্রশস্ত খালের খাত আছে। এই খালটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কিরীটেশ্বরী পর্য্যন্ত গিয়াছে। জপতপের জন্য শীঘ্র নৌকাযোগে কিরীটেশ্বরী যাইতে পারিবেন বলিয়া সাধক রাজা রামকৃষ্ণ বড়নগর হইতে কিরীটেশ্বরী পর্য্যন্ত এই খালটি কাটাইয়াছিলেন।

উক্ত চারিবাঙ্গালা ঠাকুরবাটীর উত্তর দিকে একটি অসম্পূর্ণ গৃহের কয়েকটি দ্বারের খিলান দণ্ডায়মান আছে। স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তির নিকট শুনিলাম, যে, রাজা রামকৃষ্ণের পুত্র বিশ্বনাথের হপ্তপরগণার অসম্পূর্ণ কাছারীর ইহাই স্মৃতিচিহ্ন।

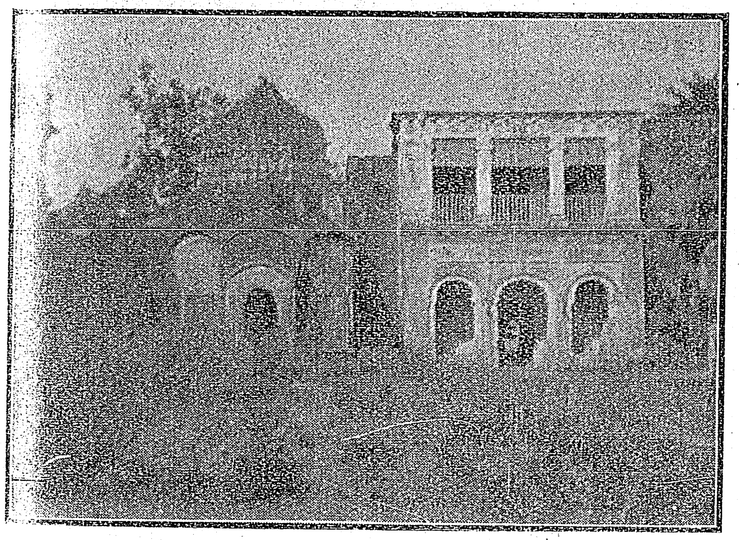

বড়নগর—নাড়ুগোপালের বাড়ী ও শিবমন্দির

পূর্ব্বোক্ত নাড়ুগোপালের বাটীর ও রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডী আসনের কিয়ৎদূর উত্তর দিকে একটি বড় দ্বিতল বাটী আছে। উহা রাণী ভবানীর গঙ্গাবাসের বাটী ছিল বলিয়া শুনা যায়। উহা এক্ষণে রাজা বিশ্বনাথের প্রথমা সহধর্ম্মিণী রাণী জয়মণির দত্তক পুত্রের বংশধর-দিগের দখলে আছে। এই বাটীর উত্তর দিকে একটি একতলা কোঠা ঘরে গণেশ ও কালীমূর্ত্তি আছে। গণেশটী পাষাণময় ও অষ্টভুজ, ইহাই স্থানীয় গ্রাম্যদেবতা।

উক্ত গণেশ ও কালীর কোঠার কিয়ৎদূর উত্তরদিকে মঠবাটী নামক একটি বাটী আছে। ইহার উঠানের পূর্ব্বদিকে একটি পশ্চিম-দ্বারী যোড়বাঙ্গালা মন্দির আছে। বড়নগরে চারিবাঙ্গালা ঠাকুর-বাটীতে যে চারিটি বাঙ্গালাঘরের আকৃতিবিশিষ্ট মন্দির আছে, সেগুলি যোড়া নহে—এক বাঙ্গালা মন্দির,—কিন্তু এই মন্দিরটি যোড়বাঙ্গালা—অর্থাৎ একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত বাঙ্গালা ঘরের সহিত সংযুক্ত হইয়া উহার পশ্চাতে ঐরূপ আর একটি বাঙ্গালা ঘর আছে। মন্দিরটির সম্মুখদেশে নানাবিধ নক্সা ও মূর্ত্তি খোদিত আছে। মন্দিরমধ্যে তিনটি শিবলিঙ্গ আছেন, ইঁহাদিগের নাম গঙ্গেশ্বর। রাণী ভবানী বাটী ও বিগ্রহসহ এই মন্দিরটি গুরুকে গঙ্গাবাসের জন্য দিয়াছিলেন। এই মন্দিরে পূজার ভাল ব্যবস্থা আছে বলিয়া বোধ হইল। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিকে একটী উচ্চ একচূড় শিবমন্দির আছে। উহার মধ্যে রাণী ভবানীর মাতা কস্তূরী দেবীর নামানুসারে কস্তূরীশ্বর নামক শিবলিঙ্গ আছেন। রাণী ভবানীর মাতার অপর নাম জয়দুর্গা।

শুনা যায় যে রাণীভবানী বড়নগরে ১০৮টী শিব-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে ২৮টী গুরু প্রাপ্ত হন। শিবগুলির দেবোত্তর সম্পত্তির অধিকাংশ কাশীতে ছিল, কিন্তু ইংরাজের কৃপাকটাক্ষে সে সকল সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হয়। রাণীভবানীর গুরুর নাম রুদ্রানন্দ চক্রবর্ত্তী। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইঁহাদিগের আদিবাস রাজসাহী জেলার পাকুড়িয়া নামক স্থানে। গুরুবংশের বর্ত্তমান বংশধর জনৈক যুবক এখানে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহার ভূসম্পত্তির বাৎসরিক আয় কয়েক সহস্র মুদ্রা। উক্ত যুবক কহিলেন যে, তিনি সত্বর রাণীভবানীর শিব-মন্দিরগুলির (যাহা এক্ষণে ইঁহার দখলে আছে) সংস্কার করিয়া বিগ্রহগুলির পূজার সুব্যবস্থা করিবেন।

কস্তূরীশ্বর শিবমন্দিরের কিয়ৎদূর উত্তর দিকে একটি কালীবাটী আছে। উহার উঠানের মধ্যস্থলে বারান্দাবেষ্টিত চাঁদনী আছে। চাঁদনীর উত্তর দিকে একটি একতালা কোঠা ঘরে ৺দয়াময়ী নামক প্রস্তর-নির্ম্মিত কালীমূর্ত্তি আছে। একটি মাত্র অখণ্ড প্রস্তর কুঁদিয়া শিব ও কালীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। শিবমূর্ত্তিটি শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত। "মুর্শিদাবাদ কাহিনীতে" লিখিত আছে যে, এই মূর্ত্তিটি রাজা রামকৃষ্ণের পরম মিত্র ব্রহ্মানন্দ নামক সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক স্থাপিত। পুষ্করিণী খননকালে মূর্ত্তিটি উত্থিত হয়। রাণীভবানীর গুরুবংশীয় তারিণীশঙ্কর ইহার মন্দিরের সংস্কার করেন। এখানে নিত্যসেবা হইয়া থাকে। এই মন্দিরের উত্তরদিকে নাটোর রাজ-বংশের দেওয়ান ও দিঘাপতিয়ার রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম একটি গোপালমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

এইগুলি ব্যতীত বড়নগরে অন্য কোন মন্দিরাদি দেখিতে পাইলাম না। বড়নগর আজিমগঞ্জ রেল-ষ্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ উত্তর দিকে এবং মুর্শিদাবাদ সহর হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সময় বড়নগর রাজসাহী জমিদারীর তদানীন্তন অধিস্বামী রাজা উদয়নারায়ণের রাজধানী ছিল। রাজা

উদয়নারায়ণ রাঢ়ীশ্রেণীর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় (বন্দ্যোপাধ্যায়) ব্রাহ্মণ ছিলেন। বড়নগরের নিকটস্থ বিনোদ গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সহিত উদয়নারায়ণের শত্রুতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ হইবার পরে মুর্শিদ কুলী খাঁ উদয়নারায়ণকে ও তদ্বংশীয়দিগকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার সাহায্যকারী ও প্রিয়পাত্র নাটোরের রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবনকে উদয়নারায়ণের সম্পত্তি ও রাজসাহী জমিদারী প্রদান করেন। উদয়নারায়ণের রাজসাহী জমিদারী পাওয়া অবধি নাটোরের রাজবংশ রাজসাহীর রাজা বলিয়া বিদিত। রাজসাহী অধিপতি উদয়নারায়ণের ও ভূষণার অধিপতি সীতারাম রায়ের জমিদারীর উপর নাটোরের রাজাদিগের জমিদারীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। নাটোরের রাজা রামকান্তের সহধর্ম্মিণী প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানী ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে (বাঙ্গালা ১১৫৩ সালে) বিধবা হইবার পরে তাঁহার বিধবা কন্যা তারাসহ এই স্থানে বাস করেন ও তাঁহার জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। ইংরাজের শোষণ-নীতির ফলে তাঁহার মৃত্যুর বহু পূর্ব্ব হইতে একে একে তাঁহার জমিদারী সকল বাজেয়াপ্ত হইয়া অর্থের অনাটন হইয়াছিল। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের দরখাস্তে তিনি অতি করুণ ভাষায় স্বীয় অনাটনের কথা মুর্শিদাবাদের কাউন্সিল অব রেভেনিউর গোচরীভূত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (Petition of Ranny Bowanny d/ 16.9.1771 and letter d/ 16.9.1771 from the Council of Revenue at Murshidabad to Mr. C. W. Boughton Rous, supevisor of Rajeshahy—Vide Records of the Government of Bengal—Proceedings of the Controlling Council of Revenue at Murshidhbad. Vol VII (A)। অনুমান ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই বড়নগরেই তিনি গঙ্গালাভ করেন।

একদা জলভ্রমণ কালে নবাব সিরাজদ্দৌলা এই বড়নগরের প্রাসাদোপরি আলুলায়িতকেশা রাজকুমারী তারাকে দেখিয়া তাঁহাকে পাইবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু বড়নগরের অপর পারের অধিবাসী মস্তরাম বাবাজী বাউলিয়ার প্রভাবে যেরূপে ইন্দ্রিয়পরায়ণ সিরাজকে বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস পাঠকগণ অবগত আছেন। এই বড়নগরেই রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র সাধক রাজা রামকৃষ্ণ কঠোর সাধনা করিতেন। রাণী ভবানীর মৃত্যুর পূর্ব্বে রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। তৎপরে রামকৃষ্ণের পুত্র বিশ্বনাথ জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। বিশ্বনাথ কৌলিক শাক্ত মত ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব মত গ্রহণ করায়, তাঁহার ভার্য্যা রাণী জয়মণি বড়নগরে আসিয়া রাণী ভবানীর নিকটে বাস করেন। ভবানী দানপত্র দ্বারা জয়মণিকে সকল দেবোত্তর সম্পত্তি অর্পণ করেন। উক্ত দানপত্র লইয়া জয়মণির পোষ্যপুত্র ও নাটোর রাজ-বংশীয়দিগের মামলা মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। বিচারফল বাহির হইলে উক্ত সম্পত্তি তিনভাগ হয়—নাটোর রাজ-বংশ ৺রাজ-রাজেশ্বরী বিগ্রহের, জয়মণির দত্তক বংশীয়গণ ৺নাড়ুগোপালের এবং মঠবাটীর ঠাকুরেরা অর্থাৎ রাণী ভবানীর গুরুবংশীয়গণ শিবলিঙ্গগুলির সেবাএত নিযুক্ত হন।

রাজা উদয়নারায়ণের সময় হইতে রাণী ভবানীর সময় পর্য্যন্ত বড়নগর সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। রেনেলের প্রাচীন মানচিত্রে ইহার নাম বৃহৎ অক্ষরে লিখিত আছে। ইহা পূর্ব্বে এরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল যে অন্যান্য জাতি বাদে একমাত্র কাঁসারী জাতীয় ৩৫০ ঘর লোকের বাস ছিল। এককালে বড়নগরে একটী প্রকাণ্ড গঞ্জ ছিল। ইংরাজের আমলে বঙ্গের জমিদারবর্গের তথা মুর্শিদাবাদ সহরের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর সহিত

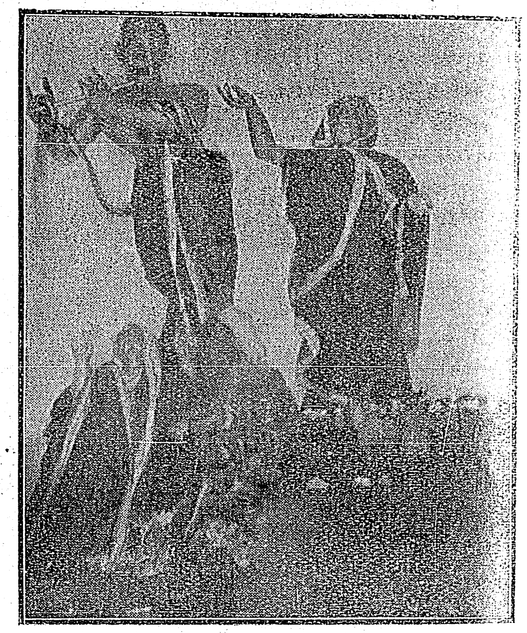

বড়নগর—রাজা উদয়নারায়ণের ৺মদনগোপাল

বড়নগরের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে এই স্থানে মাত্র ২৫।৩০ ঘর লোকের বাস আছে। বিদ্যালয়াদির মধ্যে পূর্ব্বে একটী পাঠশালা ছিল, তাহাও উঠিয়া গিয়াছে। ভাগীরথী-তীরে যে অংশে রাণী ভবানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবালয়াদি আছে সেই অংশ বাদে বড়নগরের বাকী অংশে ব্যাঘ্র-সমাকুল নিবিড় অরণ্য আছে এবং তৎসহ ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব থাকিলেও চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। এতদঞ্চলের অধিবাসীদিগের ডাক্তারের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী।

বড়নগরের পাদদেশে ভাগীরথীর জল অপরিষ্কার দেখিয়া আমরা পরপারে নৌকা লইয়া গিয়া স্নান করিয়া আসিলাম। তৎপরে রাজা উদয়নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৺মদনগোপাল বিগ্রহের কিঞ্চিৎ অন্ন প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বেলা ১ টার সময় বড়নগর ত্যাগ করিয়া নৌকারোহণে পরপারে চলিলাম।

সাধুর বাগ।

বড়নগর ত্যাগ করিয়া পরপারে সাধুর বাগ উদ্দেশে যাইবার সময় দেখিলাম—এই স্থানে ভাগীরথী পূর্ব্ব দিক হইতে বড়নগরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণায় আসিয়া মোড় ফিরিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ভাগীরথী পার হইয়া বড়নগরের পরপারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, ভাগীরথীর বাঁধের এক স্থানে কয়েকটি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির আছে। মন্দিরগুলি একচূড় ও অযত্নে রক্ষিত। আমরা এই মন্দির সমষ্টির উত্তর-পূর্ব্ব দিকে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। গ্রামটিতে বৈষ্ণব ও নিম্নশ্রেণীর লোকের বাস দেখিলাম। গ্রামের মধ্যে কিয়ৎদূর প্রবেশ করিয়া একটী পরিত্যক্ত বনাকীর্ণ উচ্চ পথের পূর্ব্ব পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীর তীরে উপস্থিত হইলাম। স্থানটি বনাকীর্ণ ও নির্জ্জন। কাঁটা গাছের মধ্য দিয়া পুষ্করিণীর জলের ধারে যাইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ

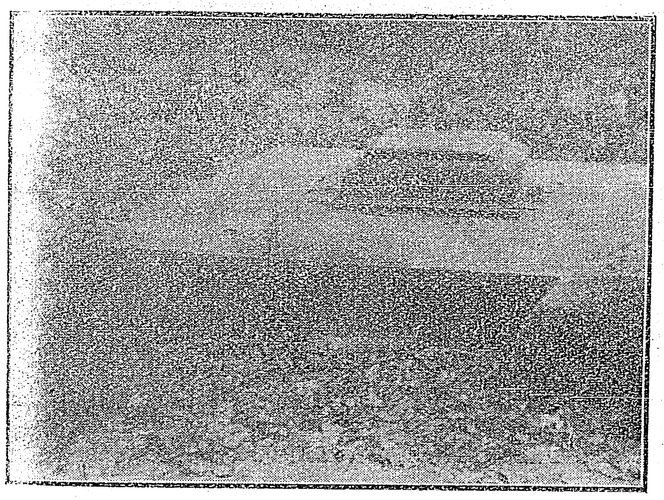

বড়নগর—রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডী আসন

ক্ষতবিক্ষত হইল। পুষ্করিণীটি উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। ইহাতে সামান্য জল আছে। ইহার দক্ষিণ দিকে পাথান-বাঁধান উচ্চ পোস্তার ন্যায় গাঁথনি আছে। পুষ্করিণীর পূর্ব্ব দিকে একটী আম ও লিচুর বাগান আছে। বাগানের মধ্যে কতকগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত ইমারতের ভগ্নাবশেষ দণ্ডায়মান আছে। এই স্থানে একটী ঠাকুরবাটীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। একটী উঠানের চারিদিকে চারিটী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। উঠানের দক্ষিণ দিকে একটী বৃহৎ মন্দির অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। ইহার গর্ভমন্দিরের চতুর্দ্দিকে ছাদে কড়িবরগা দেওয়া যে বারান্দা ছিল, উহার ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই বারান্দার বহির্দ্দেশ দিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে রোয়াক ছিল, উহা উত্তর দিক বাদে অন্য সকল দিকে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এই বারান্দা প্রায় ৬ ফিট প্রশস্ত। প্রত্যেক দিকের বারান্দার সম্মুখে তিনটি করিয়া অপ্রশস্ত বা সরু ফোকর অর্থাৎ দ্বারের খিলান আছে। এই ফোকরগুলি ২॥ ফিট প্রশস্ত। উত্তর দিকের বারান্দার সম্মুখে যে তিনটি দ্বারের ফোকর আছে, উহাতে ৪ জোড়া গোল থাম আছে। অপর দিকের বারান্দাগুলিতে চতুষ্কোণ থাম আছে। গর্ভমন্দিরের চারি দিকে একটি করিয়া দ্বার আছে। ইহার অভ্যন্তরে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণার দিকে একটি ইষ্টকের বেদী ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু মন্দিরের উপরের খিলান অত্যন্ত মজবুদ আছে। বড়নগরের মন্দিরগুলির ন্যায় এই মন্দিরের গাত্রে মিহি সুরকী ও চুণ-মিশ্রিত মশলা দ্বারা জমাট করিয়া তাহার উপরে চুণকাম করা হইয়াছিল। গর্ভমন্দিরের দেওয়াল ২॥ ফিট স্থূল। ইহার বহির্দ্দেশের মাপ প্রত্যেক দিকে ১৩॥ ফিট। উত্তর দিকই এই মন্দিরের সম্মুখভাগ। এই দিকে মন্দিরের উচ্চ রোয়াক হইতে উঠানে নামিবার কয়েকটি সিঁড়ি আছে। মন্দিরটি নবচূড়। গর্ভ-মন্দিরের উপরিভাগে মধ্যস্থলে যে উচ্চ চূড়া আছে, তাহার চারি কোণায় চারিটি ক্ষুদ্রতর চূড়া আছে।

তদ্ব্যতীত মন্দিরের বারান্দার ছাদের উপরে চারি কোণায় আর চারিটি চূড়া আছে। অর্থাৎ মন্দিরে উপরে মোট ৯টি চূড়া আছে। মন্দিরের বারান্দার বহির্দ্দেশের মাপ প্রত্যেক দিকে প্রায় ২৮ ফিট। এই মন্দিরে রামচন্দ্র বিগ্রহ ছিলেন।

এই বৃহৎ মন্দিরের উত্তর দিকে অর্থাৎ ঠাকুরবাটীর মধ্যস্থলের উঠানের অপর তিন দিকে একটী করিয়া ছোট পঞ্চচূড় মন্দির ছিল। তন্মধ্যে কেবল মাত্র উত্তর দিকেরটি আজিও অর্দ্ধভগ্ন অবস্থায় আছে। এই মন্দির মধ্যে একটী বেদী মাত্র আছে। এই মন্দিরগুলি মস্তরাম আউলিয়ার বা মস্তরাম বাবাজীর আখড়া।

এই ঠাকুরবাটীর উত্তর দিকে আম-বাগানের মধ্যে ভগ্ন দ্বিতল অট্টালিকা ও পায়খানা আছে। এইখানে আখড়ার মোহান্ত ও বৈষ্ণবগণ বাস করিতেন। চতুর্দ্দিকে আম ও লিচুবাগান থাকায় স্থানটি দিবসে অন্ধকার হইয়া আছে। এখানে জন-প্রাণী নাই—চতুর্দ্দিকে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। এই স্থানের অদূরে ভাগীরথী বহিয়া যাইতেছে; তাহা এই স্থান হইতে দেখা যায়। শুনা যায় যে, কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের মস্তরাম আউলিয়া বাবাজী নামক জনৈক সাধু এই আখড়া স্থাপন করেন। ইন্দ্রিয়পরায়ণ সিরাজদ্দৌলা রাণী ভবানীর কন্যা আলুলায়িতা-কেশা তারাকে দেখিয়া তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা করিলে মস্তরাম তাঁহাকে রক্ষা করেন। প্রবাদ আছে যে, মস্তরাম তপঃপ্রভাবে ভাগীরথীর জলের উপর দিয়া খড়ম পায়ে দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন। মস্তরামের এই আখড়ার মন্দিরাদি নির্ম্মাণ কালে সম্ভবতঃ রাণী ভবানী বিবিধ উপায়ে সাহায্য করিয়া থাকিবেন। জ্বরাদি ব্যাধির জন্য কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এই আখড়ার মোহান্ত এই স্থান পরিত্যাগ করিয়াছেন। শুনিয়াছি, এই স্থানে রথযাত্রা উপলক্ষে সমারোহ হয়।

বেলা ১টা ৪৫ মিনিটের সময় আমরা মস্তরামের ত্যক্ত আখড়া

দেখিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম। যখন নৌকা জিয়াগঞ্জে পঁহুছিল, তখন অপরাহ্ন ২টা ৪৫ মিনিট হইয়াছে। ১লা এপ্রেল মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে আমার মাতৃহীন বালক পুত্র বায়না ধরিয়া বসিল যে, আমার সহিত মুর্শিদাবাদ দেখিতে যাইবে, কিরীটেশ্বরী কালীকে পূজা দিবে এবং প্রয়োজন হইলে ২।৩ ক্রোশ পথ অবলীলাক্রমে আমার সহিত হাঁটিয়া যাইবে, একবেলা আহার না জুটিলেও কাতর হইবে না। অনেক কষ্টে বুঝাইয়া রুদ্যমান বালককে নিরস্ত করিয়া আমার মাতৃদেবীর নিকট রাখিয়া আসিবার সময় বলিয়া আসিয়াছিলাম যে, মুর্শিদাবাদ হইতে তাহার জন্য ভাল সিল্কের চাদর আনিব। প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ জিয়াগঞ্জের ঘাটে ক্ষণিকের জন্য নামিয়া সন্নিকটস্থ বালুচরের বাজারে সিল্কের চাদর কিনিতে চলিলাম। ইত্যবসরে মাঝিরা ভাত খাইয়া লইবে স্থির করিল। বালুচরের বাজারটি বড়। এখানে নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভারের অনেক দোকান আছে। আমরা কয়েকটি দোকান ঘুরিয়া, মনোমত সিল্কের চাদরাদি কিনিয়া আনিয়া, নৌকায় উঠিলাম। মাঝি নৌকা খুলিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে পাড়ি জমাইল। জিয়াগঞ্জের দক্ষিণ প্রান্তে পূর্ব্ব-বর্ণিত ভাগীরথী-বক্ষে ই, বি, রেলের অস্থায়ী কাঠের সেতুর নীচে দিয়া নৌকা চলিল। অদূরে ভাগীরথীবক্ষে একটী ফ্লাট বাঁধা আছে। উহাতে জল পম্প করিবার যন্ত্রাদি আছে। এই স্থান হইতে আজিমগঞ্জ ষ্টেসনে জল সরবরাহ হয়। ক্রমে বাম দিকে সতীচৌরার স্থান ও জগৎশেঠের ত্যক্ত ভিটা ফেলিয়া রাখিয়া, ভাগীরথী-বক্ষে যে স্থানে উপস্থিত হইলাম, উহার বাম দিকে জাফরগঞ্জ ও ডাইন দিকে পূর্ব্বে বর্ণিত মনসুরগঞ্জ ও হীরা ঝিলের পরিত্যক্ত স্থান আছে। পাড়ে উঠিয়া মনসুরগঞ্জ হীরাঝিলের স্থান দেখিয়া যখন মুর্শিদাবাদ লালবাগে আমাদের বাসার দিকে অগ্রসর হইতেছি, তখন ভাগীরথী-বক্ষ হইতে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের আলোকে নবাব সাহেবের প্রাসাদাদির নয়ন-বিমোহন ছবি দেখিয়া মোহিত হইলাম। নবাব-বাড়ী ছাড়াইয়া যখন আমাদের বাসার সন্নিকটস্থ ঘাটে তরণী হইতে অবতরণ করিলাম, তখন সন্ধ্যা হইল। মাঝি বিদায় লইবার সময় প্রার্থনা জানাইল যে, নৌকা সহ তাহার যে ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে, উহার একখানি তাহাকে ডাকযোগে যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ললিতা দাদা তাহাকে প্রতিশ্রুতি দিলে পর আমরা বাসায় উপস্থিত হইলাম। গত রাত্রের ন্যায় এরাত্রেও রন্ধন যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন উদরস্থ করিয়া শয্যা গ্রহণ করা গেল।

কিরীটেশ্বরী।

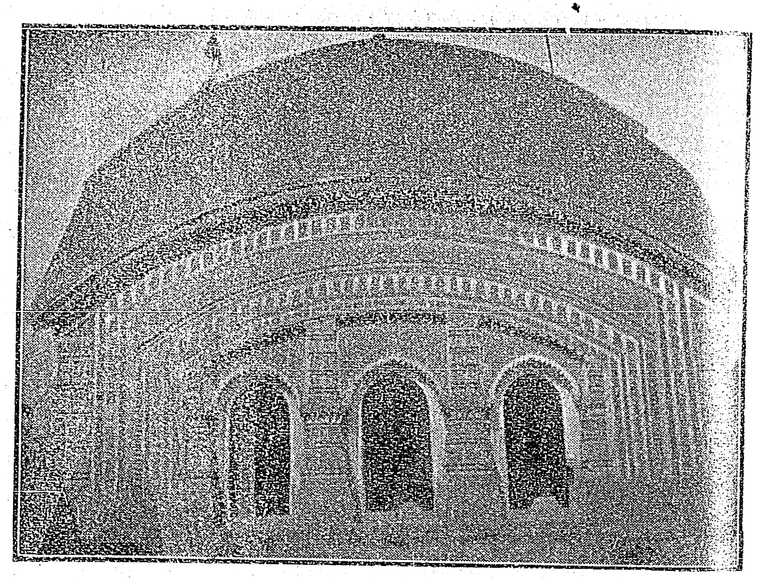

পরদিন ৪ঠা এপ্রেল প্রাতে ৫॥টার সময় আমাদিগের বাসাবাটীর নিকটের ঘাটে নৌকা-যোগে ঘোড়াগাড়ী সহ ভাগীরথী পার হইয়া পরপারে ডাহাপাড়ার নিকটস্থ পারঘাটে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া কিরীটেশ্বরী অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমরা পূর্ব্ব-বর্ণিত রোসনী-বাগের মকবরার নিকট দিয়া চলিলাম। এই মকবরার উত্তর ও পশ্চিম দিকে প্রাচীন হিন্দুপল্লী ডাহাপাড়া অবস্থিত। ইহার বিষয় পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা ডাহাপাড়া গ্রামের মধ্য দিয়া পশ্চিম দিকে কিরীটেশ্বরী অভিমুখে চলিলাম। ডাহাপাড়া হইতে কিরীটেশ্বরী প্রায় ১॥ ক্রোশ। ৬টার সময় আমরা ই, আই, রেলের লাইন পার হইলাম। এই স্থানে যদি ই, আই, রেলের একটী ষ্টেসন হইত, তাহা হইলে কিরীটেশ্বরী ও সম্ভবতঃ ডাহাপাড়া যাইবার অনেক সুবিধা হইত। রেল লাইন পার হইয়া আমরা জনমানব-শূন্য প্রান্তর মধ্যস্থ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। পথের দুইপার্শ্বে স্থানে স্থানে বড় বড় বৃক্ষ ও আগাছার ঝোপ আছে। তন্মধ্যে শুভ্র কাঠমল্লিকা ফুল ফুটিয়া থাকায় প্রভাত-সমীরণ অনেক দূর হইতে তাহার সুবাস বহিয়া আনিতেছে। কোথাও আলোকলতা, কোন ঝোপের উপরিভাগ স্বর্ণ-সূত্রের জালে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। চারি দিকের দারুণ নিস্তব্ধতা বিহগদিগের প্রভাত-কাকলীতে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রকৃতির এই অভিনব দৃশ্যে মন প্রাণ আনন্দে ভাসিয়া উঠিল। আমার স্বগ্রাম উলার প্রান্তভাগের নির্জ্জন পথগুলি দিয়া এমন দিনে এমন সময় যতবার গিয়াছি, ততবার দেখিয়াছি যে, বনফুল ও কাঠ-

বড়নগর—রাণীভবানী চারিবাঙ্গালা মন্দিরের একটি মন্দির

মল্লিকার সুবাসে আকাশ বাতাস ভরিয়া গিয়াছে, আর বিহঙ্গকুল পাগল হইয়া চারিদিকে গান জুড়িয়া দিয়াছে। এদেশ ও সেদেশে বিশেষ পার্থক্য নাই।

ই, আই, রেল লাইন পার হইয়া কিয়ৎ দূর যাইলে দেখা যায় যে, আজিমগঞ্জ হইতে একটী কাঁচা রাস্তা আসিয়া এই রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। রাস্তার উত্তর পার্শ্বে একস্থানে একটী পুষ্করিণী ও আর এক স্থানে একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত পরিত্যক্ত বৃহৎ সেতুর ন্যায় গাঁথনি আছে। সম্ভবতঃ ইহা কানুনগো দর্পনারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ কর্তৃক নির্ম্মিত কিরীটেশ্বরী যাইবার পথের সেতু। ৬টা ৪৫ মিনিটের সময় ভবানী স্থান নামক গ্রামে প্রবেশ করিলাম। ভবানী স্থান বা ভবানী থান গ্রাম এবং কিরীটেশ্বরী বা কিরীট কণা গ্রাম একই। বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণ রায় কানুনগোর পিতার খুল্লতাত বঙ্গবিনোদ রায় দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে যে সকল দেবোত্তর ও নিষ্কর ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলেন, কিরীটেশ্বরী তাহার অন্তর্গত ছিল এবং ভবানী থান নামে ব্যক্ত ছিল। এখানে পথের দুই পার্শ্বে কয়েকটি অর্দ্ধশুষ্ক পুষ্করিণী ও ইতস্ততঃ বহু তালগাছ শূন্য ভেদ করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেখিলে মনে হয়, যেন কতকগুলি ভূত বায়ুভরে কেশপাশ উড়াইয়া দিয়া কিরীটেশ্বরীর প্রবেশ-দ্বারের দুই পার্শ্বে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

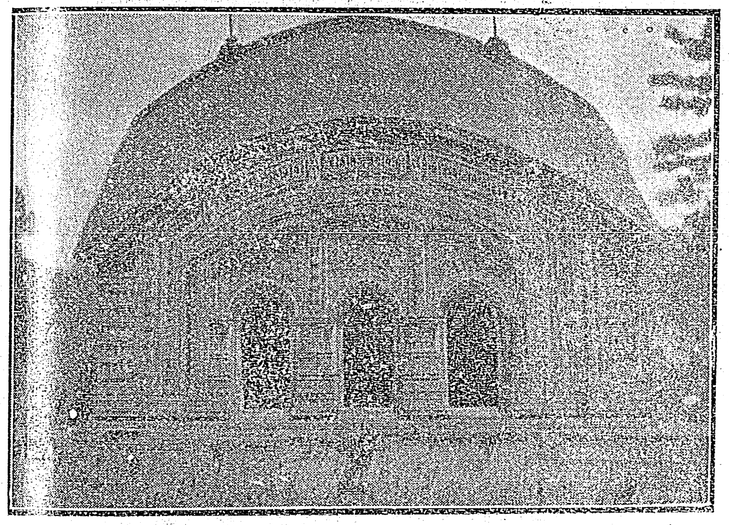

ইহার পরে আমরা কিরীটেশ্বরীর সীমার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং কিরীটেশ্বরীর ঠাকুরবাটীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। তাল-গাছ ও পুষ্করিণীর প্রাচুর্য্য ও বন-জঙ্গল কম দেখিয়া মনে হইল যে আমরা রাঢ় দেশের কোন গ্রামে প্রবেশ করিয়াছি।

তালগাছ-শোভিত একটী পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ভূমির পশ্চিম দিকে কতকগুলি ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন শিবমন্দির ও ভগ্ন স্তূপ পরিবেষ্টিত বটচ্ছায়া-শীতল স্থানে ৺কিরীটেশ্বরীর কোঠা ঘর বা মন্দির রহিয়াছে। ঠাকুর-বাটীর উত্তর-পূর্ব্ব কোণার নিকটে কিরীটেশ্বরীর বাটীর প্রবেশ-দ্বারের ভগ্নাবশেষ আছে। ঠাকুরবাটীর মধ্যস্থ উঠানের পূর্ব্ব দিকে ৺কিরীটেশ্বরীর একতালা মন্দির বা কোঠা ঘর আছে। কেহ কেহ বলেন যে, কানুনগো দর্পনারায়ণ এই কোঠাটি করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা দেখিয়া মনে হয় না যে, ইহা তত দিনের প্রাচীন। গর্ভগৃহ বা মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে থামযুক্ত বারান্দা আছে, উহা ৬। ফিট প্রশস্ত। কিরীটেশ্বরীর ঘরের সম্মুখ-ভাগ পশ্চিম দিকে। গর্ভগৃহের পশ্চিম দিকের প্রধান দ্বারের সম্মুখে একটী দরদালানের ন্যায় আছে। উহার মাপ উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৯ ফিট × পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৬ ফিট। গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার ছাদ খিলান করা। গর্ভগৃহের দক্ষিণ দিকে আর একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে। গৃহতল কাল মার্ব্বেল পাথর দিয়া বাঁধান। গৃহ মধ্যে পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন একটী বেদী আছে। বেদীর উপরে দেওয়ালের গাত্রে প্রতিমার পশ্চাতের চালের ন্যায় দেখিতে একটী স্থান আছে, উহাতে লতা, পাতা ও নক্সা খোদিত আছে। গৃহমধ্যে যথেষ্ট আলোক না থাকায় এই পদার্থটি কি, তাহা ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। শুনিলাম যে, এই পদার্থটি প্রতিমার চালের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একখানি প্রস্তর মাত্র। আমার মনে হয় যেন এই প্রকারের শিলা গৌড়ের ধ্বংস-স্তূপে দেখিয়াছি। শিলাটির পুরোভাগে (উক্ত বেদীর উপরে) গাত্রে-শিরতোলা কিন্তু দেখিতে কতক কমল পুষ্পের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট একটি কৃষ্ণ বর্ণের প্রস্তর রহিয়াছে। উহা দেখিয়া মনে হয়, যেন উহা কোন মূর্ত্তির পাদপীঠ ছিল,—মূর্ত্তিটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কিন্তু পাদপীঠটি রহিয়া গিয়াছে। এই স্থানেই ৺কিরীটেশ্বরীর পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। উক্ত পাদপীঠ দেখিয়া এবং কিরীটেশ্বরীর কোন মূর্ত্তি নাই দেখিয়া মনে হয়, যেন পূর্ব্বে এই পাদপীঠের উপর কোন মূর্ত্তি ছিল, পরে উহা মুসলমানদিগের অনুগ্রহে হউক বা কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে হউক নষ্ট হইয়াছে। এই ঠাকুর-ঘরে প্রত্যহ পাঁচ ছটাক চাউলের কাঁচা নৈবেদ্য ভোগ দেওয়া হয়। কিরীটেশ্বরীর কোঠার বহির্দ্দেশের মাপ—পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৪০ ফিট × উত্তর-দক্ষিণে ৩৬ ফিট। দেবী বিমলা নামে বিদিতা। সেবার পুরীধামে যাইয়া আর একটি বিমলা মূর্ত্তি দেখিয়াছি। কিরীটেশ্বরীর ঘরের সম্মুখের উঠানে একটি হাড়িকাঠ প্রোথিত আছে, উহাতে ছাগ বলি হয়।

বড়নগর—রাণীভবানীর চারি বাঙ্গালা মন্দিরের আর একটি মন্দির

কিরীটেশ্বরীর কোঠার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি শুষ্ক অশ্বত্থ বৃক্ষের কাণ্ড মাত্র দণ্ডায়মান আছে। উহার মধ্যে উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য-খচিত কষ্টিপাথরের শীতলা, বিষ্ণু, মঙ্গলচণ্ডী, ৪টি শিবলিঙ্গ ও কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। বৃক্ষকাণ্ড পচিতে আরম্ভ হওয়ায় এই মূর্ত্তিগুলি ক্রমে বাহির হইয়া পড়িতেছে। কিরীটেশ্বরীর গৃহের পশ্চাৎ দিকে দুই পার্শ্বে ৫।৬টি ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন শিবমন্দির আছে, এতন্মধ্যে দ্বারের পার্শ্বের একটি বড় শিবমন্দির ও আর একটি শিবমন্দির রাজা রাজবল্লভ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। এই শিবমন্দিরগুলির পশ্চাৎ বা পূর্ব্বদিকের গলি পথের পূর্ব্বপার্শ্বে উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে আর এক সারিতে ৬।৭টি ভগ্ন ও অর্দ্ধভগ্ন সশিব শিবমন্দির আছে। একটি মন্দিরের উপরে বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষ হইয়াছে, উহার ডালে দুইটি মোচাক ঝুলিতেছে।

কিরীটেশ্বরীর কোঠার সম্মুখস্থ উঠানের পশ্চিম দিকে একসারি ইষ্টকের ভগ্নস্তূপ ও একটি অর্দ্ধভগ্ন শিবমন্দির আছে। যে স্থানে এই ভগ্নস্তূপগুলি আছে, উহার মধ্যভাগে পূর্ব্বকালে কিরীটেশ্বরীর তোষাখানা ছিল। তথায় দেবীর পোষাকী ও নিত্যব্যবহার্য্য যে সকল অলঙ্কার ও আসবাবপত্র ছিল, উহার মূল্য অনুমান তিনলক্ষ মুদ্রা। বলা বাহুল্য, দেবীর অলঙ্কার ও আসবাবপত্রাদি এখন আর কিছুই নাই। নানাদেশ ঘুরিয়া দেখিয়াছি যে, হিন্দুর দেব-মন্দিরাদি ও দেবতার অলঙ্কারাদি রক্ষার বিশেষ কোন সুব্যবস্থা নাই। অধিকাংশ স্থলে দেবতার মূল্যবান সামগ্রী ও প্রণামী প্রভৃতি সেবাএত, মোহান্ত ও পূজারীগণ লুঠিয়া খায়। ফলে মন্দিরাদির সংস্কার ও দেবতার নিত্য পূজার সুব্যবস্থা হইয়া উঠে না,—মন্দির সংস্কারের প্রয়োজন হইলে সাধারণের নিকটে চাঁদা চাহিতে হয়। হয় ত কিরীটেশ্বরীর বহুমূল্য অলঙ্কারাদি ও আসবাবপত্র এইরূপে সেবাএত ও রক্ষকদিকের কুক্ষিগত হইয়া বা চৌর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া আজ কিরীটেশ্বরীর চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। দেবায়তনের এরূপ দুর্দ্দশা হিন্দুদিগের পক্ষে অতীব কলঙ্কের কথা। উক্ত তোষাখানার পার্শ্বে কিরীটেশ্বরীর নহবৎখানা ছিল, উহাতে প্রহরে প্রহরে সুমধুর নহবৎ বাজিত। এক্ষণে নহবৎখানার ধ্বংস স্তূপে কাঁটাবন হইয়া আছে।

উঠানের উত্তর দিকে এক সারিতে ভগ্ন স্তূপ ও কিরীটেশ্বরী ঠাকুরাণীর প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরের ফোকর সহ দেওয়াল ও একটি শিব মন্দির আছে। এই স্থানের ভগ্নস্তূপগুলি পূর্ব্বে শিবমন্দির ছিল বলিয়া মনে হয়। উঠানের উত্তর দিকে প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরের যে দেওয়াল দণ্ডায়মান আছে, উহা কিরীটেশ্বরী ঠাকুরাণীর প্রাচীন গুপ্ত পীঠের মন্দির। কথিত আছে যে, এই প্রাচীন মন্দিরটির বন-জঙ্গল কাটাইয়া কানুনগো দর্পনারায়ণ ইহার সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। এই ভগ্ন মন্দিরের বহির্দ্দেশের মাপ প্রত্যেক দিকে প্রায় ১৬ ফিট। পশ্চিম দিকে দুইটি ফোকর বা খাঁজকাটা দ্বারের খিলান আছে; উহার মাপ ৬।০ × ৫৸০ ফিট। ইহার দেওয়ালের স্থূলতা প্রায় ১৸০ ফিট। দেওয়ালের চৌহদ্দীর মধ্যে (সম্ভবতঃ) পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত একটি প্রকোষ্ঠ বা গর্ভ গৃহের ন্যায় আছে, কিন্তু উহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। এই গর্ভ-গৃহটি দক্ষিণদ্বারী। গর্ভগৃহমধ্যে উত্তর দিকের দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন উপর্য্যুপরি কয়েকটি শিলা সাজাইয়া বেদীর ন্যায় করা আছে। এই বেদীর উপরে কোন হিন্দু বিগ্রহের চালের ধারির ন্যায় একটি প্রস্তরের পাড় আছে—ইহা দেখিয়া সন্দেহ হয় যে, ইহা কোন প্রস্তর-নির্ম্মিত বিগ্রহের পশ্চাতের শিলাময় চাল ছিল; বিগ্রহটি নষ্ট হওয়ার পরে ভগ্ন চালের

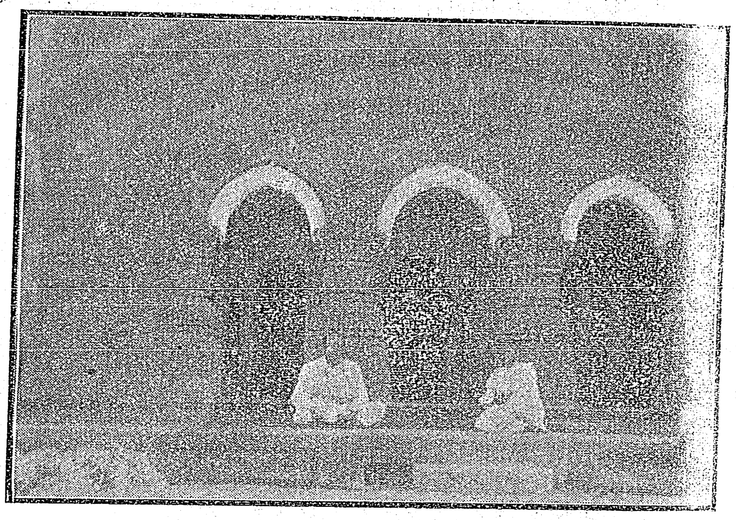

বড়নগর—ষোড়বাঙ্গালা শিবমন্দিরের সম্মুখ ভাগ

উপরিভাগ মাত্র পড়িয়া আছে। হয় ত অধুনালুপ্ত প্রাচীন কিরীটেশ্বরী ঠাকুরাণীর প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তির পশ্চাৎদেশের চালের ইহাই শেষ চিহ্ন। কিরীটেশ্বরী ঠাকুরাণীর গুপ্ত কিরীট পূর্ব্বে এই মন্দিরে ছিল। পরে উহা কিরীটেশ্বরীর বর্ত্তমান পশ্চিমদ্বারী কোঠা ঘরে লইয়া যাওয়া হয়; এবং পরে তথা হইতে গ্রামের উত্তর-পূর্ব্ব কোণার দিকে নব-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র একতলা কোঠা ঘরে রাখা হইয়াছে। উহাকে গুপ্ত পীঠের গুপ্ত মঠ কহে। কিরীটেশ্বরীর এই ভগ্ন মন্দিরের দক্ষিণ দিকের একমাত্র প্রবেশদ্বারের বাহিরে বাম পার্শ্বে একটি প্রস্তর দেখাইয়া স্থানীয় লোকে কহে যে, উহা নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের জপের আসন ছিল। রাজা রামকৃষ্ণ বড়নগর হইতে অনেক সময় অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্রের ছদ্মবেশে নগ্নপদে কম্বলমাত্র গায়ে দিয়া কিরীটেশ্বরী দেবীর মন্দিরে আসিয়া জপতপ করিয়া সমাগত যাত্রী ও সাধুসন্ন্যাসীদিগের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত হইতেন। ছদ্মবেশী নরপতি দেবীকে প্রণাম করিবার সময় অন্যমনস্ক ভাবে মোহর দিয়া ফেলিতেন বলিয়া অনেক সময় তাঁহার ছদ্মবেশ প্রকাশ হইয়া পড়িত। কিরীটেশ্বরী তান্ত্রিক সাধক রাজা রামকৃষ্ণের অতি প্রিয় সাধনার স্থান ছিল।

কিরীটেশ্বরীর বাটীর ভিতরে উঠানের দক্ষিণ দিকে একসারি শিবমন্দির ছিল; এক্ষণে তাহার ভগ্ন স্তূপগুলি মাত্র আছে। দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত ভগ্ন রোয়াকের উপরে এই তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিমলার বা কিরীটেশ্বরীর ভৈরব—সম্বর্ত্ত ভৈরব—নামক একটী শিবলিঙ্গ উন্মুক্ত আকাশতলে অযত্নে পড়িয়া থাকিয়া রৌদ্র ও ঝঞ্ঝাবাতের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন; এবং বিলাসী ও আত্মসুখী হিন্দুর অধোগতির সাক্ষ্য দিতেছেন। এই ভগ্ন রোয়াকের উপরে আরও কয়েকটি ছোট বড়

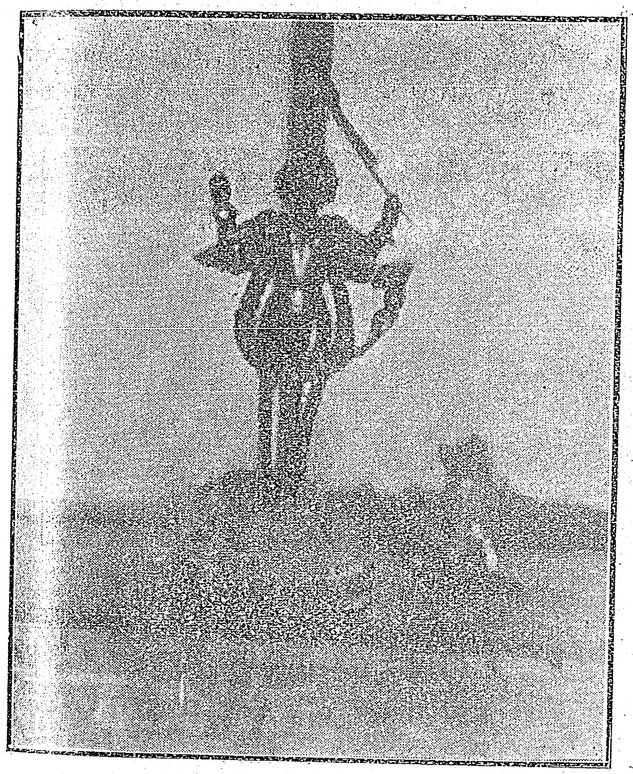

বড়নগর—বয়াময়ী কালী

শিবলিঙ্গ অযত্নে ঘাস ও আবর্জ্জনার মধ্যে পড়িয়া আছে, কেহ তাহাদিগের যত্ন লয় বলিয়া বোধ হইল না। কিরীটেশ্বরীর বাটী হইতে বাহির হইবার জন্য দক্ষিণ দিকে একটী দ্বার ছিল; তাহার চিহ্ন আজিও আছে। উক্ত সারির পশ্চাৎ বা দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ একটী গলি পথ ছিল, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। এই গলি-পথের দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে আর এক সারি শিবমন্দির ছিল; তন্মধ্যে ৫।৬টি ভগ্ন ও অর্দ্ধ-ভগ্ন অবস্থায় আজিও দণ্ডায়মান থাকিয়া আপন দুরদৃষ্টের ও হিন্দুর স্বধর্ম্মের প্রতি অনাস্থার পরিচয় দিতেছে। দক্ষিণ দিকের বহির্দ্দেশের এই মন্দির সারির পূর্ব্ব দিকে একটী পশ্চিমদ্বারী অভগ্ন শিবমন্দির আছে, উহার পূর্ব্ব দিকের দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন একটী কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর বেদীর উপরে কাল পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তি উপবিষ্ট আছেন। জীবহিংসা-বিরোধী বুদ্ধদেব এখানে হিন্দুর হাতে পড়িয়া কালভৈরব উপাধি লাভ করিয়া পূজা প্রাপ্ত হইতেছেন। বুদ্ধদেব ওরফে কালভৈরবের পশ্চাতের দেওয়ালে ও অন্য তিন দিকের দেওয়ালের জমাটে ভল্লুকাদি মূর্ত্তি ও লতা-পুষ্পাদি অঙ্কিত আছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকের ভিতের গাত্রে কাল পাথরের উপরে অতি সুশ্রী লতা, পাতা, পুষ্প ও অন্য কারুকার্য্য খচিত আছে। এই প্রকারের কারুকার্য্য-খচিত প্রস্তর গৌড়ের রামকেলি ও অন্যান্য স্থানে দেখিয়াছি। এগুলি যে গৌড়ের কোন প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই মন্দিরের বহির্দ্দেশের মাপ উত্তর-দক্ষিণে ১২ ফিট + পূর্ব্ব-পশ্চিমে ১১½ ফিট। দেওয়ালের স্থূলতা ২ ফিট।

এই মন্দিরের পশ্চিম দিকে কালীসাগর নামক পুষ্করিণীর ঘাটে যাইবার যে পথ আছে, উহার পশ্চিম পার্শ্বে একটি পুরাদ্বারী ছোট শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরের সম্মুখদেশে ললাটের স্মৃতিফলকে যাহা লিখিত আছে তাহার শুদ্ধ পাঠ এই:—

সাকে সপ্তাষ্ট কালেন্দু
সংখ্যে সন্তু প্রিয়া পুরে
সভারাম সুতোঽকর্ষী
দ্রঘুনাথো মঠং শুভং।

দক্ষিণ দিকের বহির্দ্দেশের এই মন্দির-সারির দক্ষিণে কালীসাগর নামক বৃহৎ পুষ্করিণীর ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহার মধ্যে দাম, ঘাস ও নল-খাগড়ার বন হইয়া আছে। কিরীটেশ্বরীর বাটীর দক্ষিণ দিকের দ্বার দিয়া এই পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ের যে ঘাট যাত্রীগণ ব্যবহার করিত, উক্ত ঘাট গৌড়ের ধ্বংস স্তূপ হইতে সংগৃহীত প্রস্তর দ্বারা বাঁধান ছিল, আজিও তাহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। বঙ্গাধিকারীবংশীয় কানুনগো দর্পনারায়ণ এই পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। পুষ্করিণীটির পূর্ব্ব দিকে কয়েকটি অতি বৃহৎ ও প্রাচীন জটাজূটশোভিত বটবৃক্ষ বহুদূর পর্য্যন্ত ডালপালা বিস্তৃত করিয়া সগর্ব্বে যুগযুগান্ত ধরিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া কিরীটেশ্বরীর অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন দেখিয়া আসিতেছে।

কিরীটেশ্বরীর বাটীর গঠন, ভগ্ন স্তূপ ও শিবমন্দিরগুলির অবস্থান দেখিয়া মনে হয় যে, পূর্ব্বে এই ঠাকুর-বাটীর ভিতরের অংশে উঠানের চতুর্দ্দিকে একসারি করিয়া মন্দির ও গৃহ ছিল এবং অন্ততঃ পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে এক একটি করিয়া দরওয়াজা ছিল—পশ্চিম দিকে নহবৎখানা ছিল। এই ভিতরের অংশের বহির্দ্দেশে চতুর্দ্দিক দিয়া একটি গলিপথ ছিল। এই গলিপথের বহির্দ্দেশ দিয়া চতুর্দ্দিকে আর

এক সারি শিবমন্দির ছিল। কিরীটেশ্বরীর বাটীর ভিতরের অংশের বহির্দ্দেশের মাপ পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ১৫২ ফিট×উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১১২ ফিট।

কিরীটেশ্বরীর বাটীর সন্নিকটে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণার দিকে দুইটি শিবমন্দির আছে। এই মন্দির দুইটি আজিও অভগ্ন অবস্থায় আছে। কিরীটেশ্বরীর বাটীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পূর্ব্বোক্ত কালীসাগর পুষ্করিণীর পূর্ব্ব দিকের সদর রাস্তার পূর্ব্ব দিকে, কিরীটেশ্বরীর বাটীর প্রায় ২॥ রসি দূরে ৺বাঁকাভবানীর উচ্চ মন্দির ও সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। এই মন্দিরের সম্মুখস্থ নাট-মন্দিরের গঠন-প্রণালী নূতন ধরণের। পূর্ব্বাংশে একটি উচ্চ একচূড় শিবমন্দির আছে। মন্দির-মধ্যে একটি শ্বেত প্রস্তরের শিবলিঙ্গ প্রস্তরের গণ্ডীর মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। ভগ্নশিবের পার্শ্বেই হোমের কুণ্ড রহিয়াছে। মন্দিরটির প্রবেশদ্বার পশ্চিম দিকে। এই শিবমন্দিরের সহিত সংলগ্ন থাকিয়া ইহার পশ্চিম দিকে বহুকোণবিশিষ্ট একটি নাটমন্দিরের ন্যায় আছে, উহার পূর্ব্বদিক ব্যতীত অন্য তিন দিকে কতকগুলি খিলান-করা গবাক্ষের ন্যায় আছে। এই নাটমন্দিরের মধ্যস্থলে গুম্বজ-শোভিত একটি গোলাকার গর্ভগৃহ আছে। উহার ব্যাস প্রায় ৯½ ফিট। এই গোলাকার গর্ভগৃহ মধ্যে ৺বাঁকাভবানী নামক প্রস্তরময়ী মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি ছিল। এই মূর্ত্তিটি এক্ষণে কান্দীর নিকটস্থ জজানিয়া নামক গ্রামে আছে। উক্ত গোলাকার গর্ভগৃহের চতুর্দ্দিকে ৮টি গোল থাম শোভা পাইতেছে। ইহার দেওয়ালের স্থূলতা ২।০ ফিট। ইহারই চতুর্দ্দিকে বহুকোণবিশিষ্ট খিলান-করা ছাদ-যুক্ত সরু বারান্দা আছে, উহা ২½ ফিট প্রশস্ত। নাট-মন্দিরের পশ্চিম দিকে সিঁড়ি আছে এবং পশ্চিম দিকই ইহার সদর। নাটমন্দির-শোভিত বাঁকাভবানীর মন্দিরের বহির্দ্দেশের মাপ পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৪৬' ফিট×উত্তর-দক্ষিণে ২৮ ফিট। মন্দিরটি এক্ষণে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। মন্দিরটির দক্ষিণ দিকে যে বড় পুষ্করিণীটি আছে, উহার পশ্চিম পাড়ে শান-বাঁধান ঘাট আছে। কিরীটেশ্বরী গ্রামের অধিবাসীগণ এই পুষ্করিণীর জল পান করে।

৺কিরীটেশ্বরীর বাটী হইতে প্রায় ৭ রসি উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ৺কিরীটেশ্বরীর গুপ্ত পীঠের বর্ত্তমান বাটীতে যাইতে পথের বাম দিকে ৬টি পরিত্যক্ত অর্দ্ধভগ্ন শিবমন্দির আছে। তন্মধ্যে দুইটি পঞ্চচূড় ও বাকীগুলি একচূড়া-বিশিষ্ট। স্থানীয় এক ব্যক্তি কহিলেন যে, এই ছয়টি মন্দির রাণী ভবানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

এই মন্দির কয়টি ছাড়াইয়া সামান্য দূর যাইলে গুপ্তপীঠের প্রাচীর-বেষ্টিত ক্ষুদ্র বাটীতে উপস্থিত হওয়া যায়। বাটীর মধ্যে একটী একতলা ছোট ঘরে রক্তবর্ণ চেলির বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত একটী বেদীর ন্যায় আছে। উহাই ৺কিরীটেশ্বরীর গুপ্তপীঠ বলিয়া বিদিত। লোকের ধারণা এই যে, উক্ত গুপ্তপীঠের মধ্যে বিষ্ণু-চক্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভগবতীর কিরীট নামক অলঙ্কারের কণা আছে। পূর্ব্বে এই গুপ্তপীঠ ৺কিরীটেশ্বরীর বাটীতে উত্তর দিকের প্রাচীন মন্দিরে ছিল, তৎপরে উহা ৺কিরীটেশ্বরীর বর্ত্তমান পশ্চিমদ্বারী মন্দিরে ছিল। সর্ব্ব শেষে উহা তথা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া এখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। প্রত্যহ বেলা ১১টার সময় গুপ্তপীঠকে মন্ত্র-স্নান করাইয়া দেবসের চাউলের অন্নভোগ দেওয়া হয়। ৺কিরীটেশ্বরীর মন্দিরে এবং এই গুপ্তপীঠে প্রত্যহ মোট সোয়া আট আনা মূল্যের তণ্ডুলাদি দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর মহাষ্টমীর দিন পূজারী গৃহদ্বার অর্গল বন্ধ করিয়া চক্ষে বস্ত্র বাঁধিয়া গুপ্তপীঠকে স্নান করাইয়া থাকেন, ও তৎপরে উহার উপরে ঘাঘরার ন্যায় করিয়া কুঁচাইয়া একখানি চেলির কাপড় ঢাকা দিয়া দেন। মহাষ্টমীর দিন গুপ্তপীঠে একটী ছাগ বলি হয়। সেদিন এখানে ৩০৲ টাকার উপকরণ দ্বারা ভোগ দেওয়া হয় এবং যাত্রীদিগকে প্রসাদ দেওয়া হয়। গুপ্তপীঠের ঘরের মধ্যে কয়েকটি প্রস্তর-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ এবং বুদ্ধ, বিষ্ণু ও দুর্গা প্রভৃতি মূর্ত্তি আছে। এই সকল রক্ষিত মূর্ত্তিগুলির অঙ্গ অপরিষ্কার অবস্থায় আছে। ইহাদিগের নিত্য সেবা কিরূপ চমৎকার হয়, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জনৈক ধন-কুবেরের অষ্ট্রিয়ান যুবক ভিয়েনা হইতে কলিকাতায় আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায় খুলিবার জন্য আসিয়াছিলেন। একদিন তাঁহার সহিত আমি দেখা করিতে গেলে, তিনি আমাকে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত পিতল ও প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর ছোট ছোট কতকগুলি মূর্ত্তি দেখাইলেন। অবশেষে দুঃখের সহিত বলিলেন যে, তাঁহার একটি প্রাচীন দুর্গামূর্ত্তি আবশ্যক—তজ্জন্য তিনি ২০০৲৩০০৲ টাকা ব্যয় করিতেও রাজি আছেন। কিন্তু তিনি

সাধুর বাগ—মস্তরাম বাবাজীর ত্যক্ত পুকুর ও উহার দক্ষিণ পার্শ্ব

এরূপ মূর্ত্তি চান যাহা প্রাচীন ও যাহার পূজা হইয়াছে। আমি বলিয়াছিলাম যে গৃহদেবতা হিন্দুর স্ত্রীর পরিজনবর্গের সামিল, কেহই আপন গৃহদেবতাকে বিক্রয় করিবে না। সাহেব সে কথা স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তথাপি চেষ্টা করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এখানে এই মূর্ত্তি কয়টির ও অন্যান্য স্থানে আরও

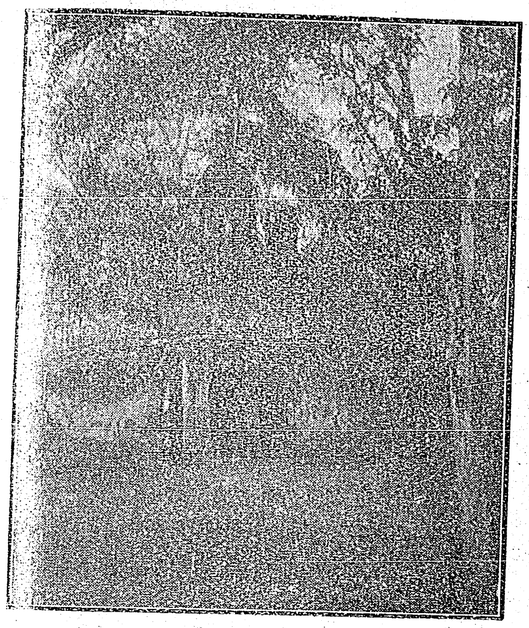

সাধুর বাগ—মস্তরামের ত্যক্ত আখড়ার নবচূড় মন্দির

কতকগুলি দেবমূর্ত্তির যে দুর্দ্দশা দেখিয়াছি, তাহাতে মনে মনে শঙ্কা হয় যে, এই সকল বিদেশী সৌখীন সাহেব যদি এই সকল মূর্ত্তির সন্ধান প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে অর্থ-বলে বিগ্রহগুলিকে সম্ভবতঃ হস্তগত করিতে পারেন।

গুপ্তপীঠের বাটীর পার্শ্বে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বিভিন্ন আকৃতির ছয়টী একচূড় শিবমন্দির ও ধ্বংসস্তূপ আছে। স্থানীয় কোন ব্যক্তি কহিলেন যে এই মন্দির কয়টি রাণী ভবানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। কিরীটেশ্বরী গ্রামের বাবদীয় শিবলিঙ্গের দুর্দ্দশা দেখিয়া বোধ হয় না যে তাহাদের পূজা হয়।

কিরীটেশ্বরী গ্রামে আর কিছুই দেখিবার নাই। এই গ্রামের প্রকৃত নাম কিরীটকণা, কিন্তু ৺কিরীটেশ্বরী ঠাকুরাণীর নামানুসারে লোকে এই গ্রামকে কিরীটেশ্বরী বলে। এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিমলা এবং তাঁহার ভৈরব সম্বর্ত্ত বলিয়া বিদিত। তন্ত্রচূড়ামণির মতে বিষ্ণুচক্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া ভগবতীর কিরীট এই স্থানে পতিত হইয়াছিল বলিয়া দেবীকে কিরীটেশ্বরী বলিয়া অভিহিত করা হয়:—

"ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা কিরীটতঃ।
দেবতা বিমলা নাম্নী সম্বর্ত্তো ভৈরবস্তথা॥"

কিরীটেশ্বরী একটি মহাপীঠ।

মহানীল তন্ত্রে লিখিত আছে:—

"কালীঘাটে, গুহ্যকালী কিরীটে চ মহেশ্বরী।
কিরীটেশ্বরী মহাদেবী লিঙ্গাখ্যে লিঙ্গ বার্হিনী॥"

কেহ কেহ মনে করেন যে এককালে কিরীটেশ্বরী বা কিরীটকণা গ্রামের নিকট দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। আমার স্বগ্রাম উলা নিবাসী দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত প্রাচীন পদ্যগ্রন্থ "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনীতে" লিখিত আছে:—

"সুতির নিকট গঙ্গা আইল ফিরিয়া।
চলিল কিরীটকোণা দক্ষিণে রাখিয়া॥"

ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে পাল ও সেন রাজাদিগের রাজত্ব কালের পূর্ব্বে, অনুমান খৃষ্ট পূর্ব্ব দুই শত বৎসরের পর হইতে ৺কিরীটেশ্বরীর মাহাত্ম্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে কিরীটেশ্বরীর পীঠে কোন মূর্ত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয়, পরে উহা কোন প্রকারে বিধ্বস্ত হইয়া থাকিবে।

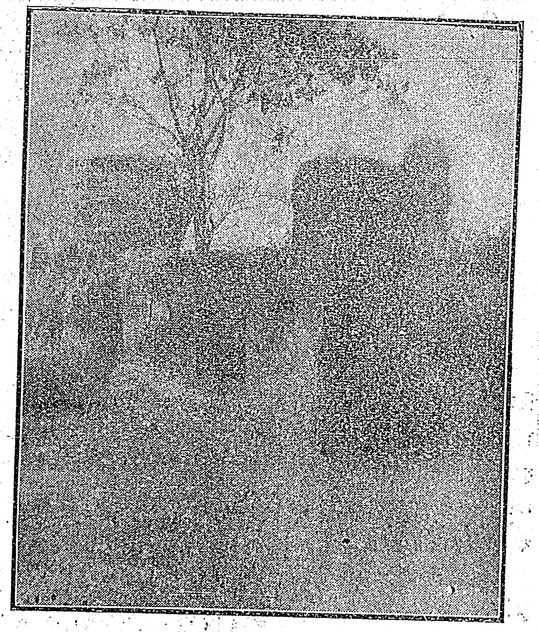

৺কিরীটেশ্বরীর প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ

নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ যখন ১৭০৩।৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী উঠাইয়া আনেন, সেই সময় "বঙ্গাধিকারী" বংশীয় প্রধান কানুনগো দর্পনারায়ণ ৺কিরীটেশ্বরীর প্রাচীন মন্দিরাদির সংস্কার, দেবীর নূতন মন্দির এবং ভৈরবের মন্দির ও অপর কয়েকটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ

ও পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করাইয়া কিরীটেশ্বরীর উন্নতি করেন। বঙ্গাধিকারীবংশীয় ভগবান রায় মোগল বাদশাহের নিকট হইতে কিরীটকণা গ্রামটি নিষ্কর (দেবোত্তর) জায়গীর রূপে প্রাপ্ত হন। দর্পনারায়ণের পরেও বঙ্গাধিকারীবংশীয়গণ এই স্থানের অনেক উন্নতি সাধন করেন। জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্যের জন্য বঙ্গের জমিদারদিগকে বঙ্গাধিকারীদিগের শরণাগত হইতে হইত। এই সকল জমিদার কিরীটেশ্বরীতে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া এই স্থানের উন্নতি কল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন। বঙ্গাধিকারীদিগের অবস্থা মন্দ হইতে আরম্ভ করিলে কিরীটেশ্বরীরও দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। তৎপরে মুর্শিদাবাদের গৌরব-রবি অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কিরীটেশ্বরীর সমৃদ্ধি লুপ্ত হইয়াছে। নাটোরের সাধক রাজা রামকৃষ্ণের নিকট কিরীটেশ্বরী অতি পবিত্র সাধনার স্থান ছিল। তিনি এক কালে এই স্থানের মন্দিরাদি সংস্কার করাইয়া-

৺কিরীটেশ্বরীর বর্ত্তমান গৃহ

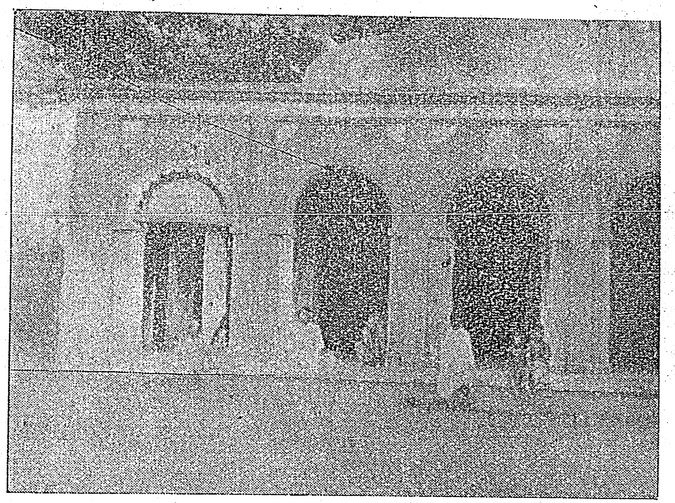

ছিলেন—ইহা শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের "মুর্শিদাবাদের ইতিহাস" হইতে জানা যায়। ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, নবাব মির্জাফর যখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, সেই সময় রোগ আরোগ্য কামনায় দেওয়ান মহারাজা নন্দকুমারের পরামর্শ অনুসারে তিনি ৺কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে এই গ্রামে ১৭২ ঘর শুধু কিরীটেশ্বরীর পাণ্ডার বাস ছিল। এতদ্ব্যতীত কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাক, স্যাকরা, বাগ্দী ও মাল প্রভৃতি জাতীয় বহু লোকের বাস ছিল। সর্ব্বদা কাঁসর, ঘণ্টা ও শঙ্খ-ধ্বনিতে গ্রাম মুখরিত হইত। তখন গ্রামে টোল, পাঠশালা ও বাজার ছিল। বর্ত্তমানে গ্রামে মাত্র ৪ ঘর পাণ্ডা ও ১ ঘর ভট্টাচার্য্য আছে। এতদ্ব্যতীত ১৪।১৫ ঘর ভুঁইয়া, ১১।১২ ঘর মাল ও ২।৩ ঘর বাগ্দী আছে। পাণ্ডাদিগের মধ্যে বৃদ্ধা কুমুদকামিনী দেব্যা কিরীটেশ্বরীর বহু পুরাতন কাহিনী অবগত আছেন। রোগের জন্য ডাক্তার বৈদ্য, শিক্ষার জন্য একটী পাঠশালা পর্য্যন্ত গ্রামে নাই। বাজার নাই, দুইখানি মাত্র মুদীর দোকান আছে। স্থানীয় লোকের মুখে শুনিলাম যে, কিরীটেশ্বরী মহালটি বর্ত্তমানে কান্দীর নিকটস্থ বহরালের শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষের জমিদারী-ভুক্ত। ৺কিরীটেশ্বরীর ও গুপ্তপীঠের আজিও প্রত্যহ যে সামান্য ভোগ হয়, তাহা ইঁহারই ব্যয়ে হইয়া থাকে। যাত্রীগণ ইচ্ছা করিলে ৺কিরীটেশ্বরীর সম্মুখে মানসিক করিয়া ছাগ বলি দিতে পারেন। পৌষ মাসের প্রথম মঙ্গলবার বাদে অন্য তিন মঙ্গলবারে এখানে মেলা হয় ও বহু লোক সমাগম হয়। কানুনগো দর্পনারায়ণ এই মেলার সৃষ্টি করেন। পূর্ব্বে কিরীটেশ্বরীর জমিদারী, বাগান বাগিচা, বহুমূল্য অলঙ্কার ও আসবাবপত্র ছিল, বর্ত্তমানে তাহার কিছুই নাই। এক্ষণে চতুর্দ্দিকে ধ্বংস ও দৈন্যের করাল ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে ও গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। আজি এ অভিশপ্ত স্থানে দেবতা নিদ্রিত, পূজারী নির্ব্বংশ। যাতায়াতের অসুবিধার জন্য ও লোকের ধর্ম্মভাবের অভাব হওয়ায় এক্ষণে প্রত্যহ যাত্রী সমাগম ঘটিয়া উঠে না। গ্রামটি জেলা মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার ও ডাহাপাড়া পোষ্টাফিসের অধীন।

বেলা ১০টার পূর্ব্বে দেবীর পূজা হয় না শুনিয়া, পূজারির নিকট নামধাম ও গোত্রাদি লিখিয়া দিয়া ও পূজার ব্যয় দিয়া বেলা ৯টা ৪৫ মিনিটের সময় আমরা মুর্শিদাবাদ অভিমুখে ফিরিয়া চলিলাম। ফিরিবার পথে পূর্ব্বে বর্ণিত রোসনীবাগের মকবরা বা কবর স্থান দেখিয়া লইয়াছিলাম। তৎপরে খেয়া নৌকায় ভাগীরথী পার হইয়া বেলা ১১৷৫০ টার সময় বাসা বাটীতে পঁহুছিলাম এবং পূর্ব্ব দিনের ন্যায় অতিসংক্ষেপে দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার শেষ করিয়া বৈকালের ডাউন কৃষ্ণপুর— রাণাঘাট লোকাল ট্রেণে স্থান সংগ্রহ করতঃ মুর্শিদাবাদে ত্যাগ করিলাম। এই ট্রেণে যাইলে রাণাঘাটে গাড়ী বদল করিয়া রাত্রি প্রায় ১২টার সময় কলিকাতা পঁহুছিতে হয়। পথে যখন পলাশী ষ্টেসনে ট্রেণ দাঁড়াইল, তখন কলিকাতা হইতে আগত ট্রেণের লোকের মুখে শুনিলাম যে, আর্য্যসমাজীদিগের বাৎসরিক শোভাযাত্রা লইয়া কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতেছে। ইহা শুনিয়া কলিকাতায় যাওয়া স্থগিত রাখিয়া উলা—বীরনগর ষ্টেসনে ট্রেণ আসিলে ললিতা দাদাকে সঙ্গে লইয়া নামিয়া পড়িলাম এবং নিজ বাটীতে গমন করিলাম। তখন রাত্রি প্রায় ৯টা। এইরূপে এবারের মত মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ শেষ করিলাম।

ব্যথার পূজা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শ্রান্ত দেহের অবসাদ লইয়া ম্লানমুখে সূর্য্য তখন ধূসর আবিল পশ্চিম গগনের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। দয়াদেবী মালার থলে হাতে জপ করিতেছিলেন; আর এক-একবার উৎসুক দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিতেছিলেন—বোধ করি কাহারও আগমন-প্রতীক্ষায়। এমন সময় মেজবাবুর কোঁচান ধুতি হাতে লইয়া নবীন খানসামা অন্দরে প্রবেশ করিতেই দয়াদেবী আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে নবনে, দেখতে পেলি কোথাও ছোটবাবুকে?"

নবীন ঘাড় নাড়িয়া শুষ্কমুখে কহিল "না।"

দয়াদেবী নবীনের স্বভাব বিলক্ষণ জানিতেন; কাজেই তাহার কথায় ততটা আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া, তিনি একটু বিরক্ত ভাবেই কহিলেন, "বলি কোথাও খুঁজতে গিয়েছিলি, না ঘরে পড়ে ঝিমুচ্ছিলি?"

নবীন একটু অপ্রস্তুত ভাবে মাথা চুলকাইয়া কহিল, "তা আজ্ঞে সকল দিক ভাল করে খোঁজা হয়নি!" সে আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু ইতিমধ্যে দোতালার সিঁড়িতে মেজবাবুর জুতার শব্দ শুনিয়া থামিয়া গেল। দয়াদেবীও আর কোন কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না।

নবীনকে কাপড় হাতে দয়াদেবীর কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দেবেন বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "কি—এতক্ষণে বাবুর ঘুম ভাঙ্গল না কি? হারামজাদা দিন দিন পাজীর ধাড়ী হচ্ছে! যেদিন দূর করে দেব, সেইদিন টের পাবে। যা—হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে, হাত মুখ ধোবার জল দে!"

নবীন চলিয়া যাইতেই দেবেন চোখ রগড়াইয়া কহিল, "কি পিসী, আজ তোমার একাদশী না কি? সারাদিন ধরে যে মালাই জপছ?"

দয়াদেবী হাসিবার ভঙ্গীতে কহিলেন, "একাদশীটা তোদের পাঁজীতে মাসে দুটো না হয়ে বোধ হয় দশ পনেরটা হলে তোদের বড় ভাল হত—না রে দেবু?"

দেবেন হাসিয়া কহিল, "রাগ করছ কেন পিসী? ভাল কথাটাও যদি ভাল ভাবে না শোন, তবে আর আমার দোষ কি? সাধে কি বলি 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'।"

নবীন এক গাড়ু জল ও গামছা আনিয়া হাজির করিল। দেবেন হাত মুখ ধুইয়া উঠানে নামিতেই, কল্যাণীর মা দিগম্বরী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"এই যে, এস পিসী, কলির বে ঠিক হয়ে গেছে শুনলুম" বলিয়া দেবেন বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইল। দিগম্বরী নিতান্তই সেকেলে ধরণের; কাজেই মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ বাবা, জাত রক্ষা করতে ত হবে? এই ১৫ই দিন ঠিক হয়ে গেছে,—এখন নির্ব্বিঘ্নে সাত পাক ঘোরে ত বাঁচি।"

দিগম্বরীকে দেখিয়া দয়াদেবী জপের মালা তিনবার কপালে ঠেকাইয়া দেয়ালের পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিলেন; এবং ঘরের ভিতর হইতে একখানা আসন আনিয়া বারান্দায় পাতিয়া দিয়া কহিলেন, "বস দিদি,— শুনি, বিয়ের কি রকম কি করছ...কি দিতে থুতে হচ্ছে...কদিন থেকেই একবার যাব যাব ভাবছি,— বোস সব শুনি।"

দিগম্বরী বসিলেন। সত্যবালা একটু অন্তরালে দাঁড়াইল।

দেবেন একটু গম্ভীর ভাবে মুরুব্বিয়ানা চালে কহিল, "তা তোমার যা অবস্থা পিসী, সে হিসেবে কলির যা বে দিচ্ছ, সে খুব ভালই দিচ্ছ। মল্লেনপুরের জগদীশ মুখুজ্যের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার মত অবস্থা ত আর সত্যি তোমার নয়—মেয়েটার নেহাৎ বরাত-জোর তাই!" দিগম্বরীকে কোন কথা কহিতে না দেখিয়া দেবেন একটু থামিয়া কহিল, "এ

অঞ্চলের ভেতর আজকাল জগদীশ বাবুর অবস্থাই সব চেয়ে ভাল। আর তার স্বভাবও শুনেছি ভালই।"

দিগম্বরী একটু দুঃখিতভাবে কহিলেন "কিন্তু বয়েসটা"—

দেবেন বাধা দিয়া বলিল, "তা এখন সব দিক খতিয়ে দেখতে গেলে চলবে কেন পিসী! আর তা না হলে সে তোমার মেয়েকেই বা বিয়ে করবে কেন? দেশে কি আর সুন্দরী মেয়ে নেই? ওসব কিছু ভেবো না পিসী! ও যার ঘর, সে ঠিক গড়ে-পিটে নেবে।" দেবেন একবার আড়-চোখে সত্যবালার দিকে চাহিল। কথাগুলি সত্য হইলেও সহায়হীনা দরিদ্রা জননীর কাণে তাহা শ্রুতিমধুর ঠেকিল না। দিগম্বরী একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন—"মেয়ের বরাত।"

দয়াদেবী কল্যাণীর মার মনের কষ্ট বুঝিলেন, এবং স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, "বিয়ে-থাওয়া হচ্ছে দিদি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ! যার সঙ্গে যার লেখা—তা হবেই। দেখ—এখন মেয়ের অদেষ্ট। কি দিতে থুতে হচ্ছে?"

দিগম্বরী ক্ষুণ্ণ ভাবে কহিলেন, "কি আর আছে আমার যে তাই দেব। দাদার যা অবস্থা তা ত তোমরা সবই জান। তবে তারা কিছু নেবে না বলেছে। কিন্তু তাই বলে ত সত্যি আর মেয়েকে কিছু খালি-হাতে বিদেয় করতে পারব না। যা হোক্ করে দাদাকেই কিছু দিতে হবে বৈকি!"

দয়াদেবী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "তা ত সত্যিই!"

"তা ছাড়া গ্রামের দু-পাঁচজন এয়োকে আর স্বজাতিকেও ত ডাকতে হবে।"

দেবেন বাধা দিয়া কহিল, "ওসব হাঙ্গামায় তুমি যেও না পিসী! তোমার যা অবস্থা, তাতে সেজন্যে তোমায় কেউ কিছু বলবে না!"

নবীন চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, "মহিম গোঁসাই এসেছেন!"

"বিন্তেবাগীশকে বসতে বল্—যাচ্ছি!"

দিগম্বরী দেবেনকে কহিলেন, "যেও বাবা, একটু দেখা শোনা করো, তোমরাই আমার ভরসা!"

দেবেন তাহার গোঁপের ডগায় পাক দিয়া কহিল, "তা আর বলতে হবে কেন পিসী? সেজন্যে তুমি কিছু ভেবো না,—আমরা ত পাঁচজন আছি,—যা হোক্ করে এ কাজ উদ্ধার করতেই হবে।" দেবেন বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেল। সত্যবালাও একখানা গামছা কাঁধে ফেলিয়া পুকুরঘাটে গা ধুইতে গেল!

দিগম্বরী দয়াদেবীকে নিম্নস্বরে কহিলেন, "ধীরুর সঙ্গে দেবুর আজ নাকি ঝগড়া হয়েছে?"

দয়াদেবী গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া কহিলেন, "ধীরু ত ঝগড়া করবার ছেলে নয় বোন! দেবুই আজ সকালে তাকে গালাগাল দিলে। বাছা আমার না খেয়ে বাড়ী থেকে চলে গেছে,—সারাদিন গেল, এখনও ফেরে নি। আর আমি হাপিত্যেশে পথের দিকে চেয়ে আছি!" দয়াদেবী চক্ষু মুছিলেন।

"ধীরু আমাদের বাড়ী খেয়েছে। কিন্তু আহা, তোমার মুখে এখনও বুঝি জলটুকুও পড়ে নি!"

দয়াদেবী একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "খেয়েছে? যাক্, বাঁচালি বোন্! সেই থেকে আমি ভেবে সারা হচ্ছি! সে আমার বড় অভিমানী ছেলে! কেবলই মনে কু-গাইছিল,—বুঝি বা ঘেন্নায় কিছু করে বসে বা কোথাও চলে যায়।"

"বোধ করি তা যেত! অনেক করে বলতে সে কলির বিয়ের কদিন থাকতে রাজী হয়েছে! তার পর না কি কাজ-কর্ম্মের চেষ্টায় বিদেশে যাবে। পড়াশুনো আর করবে না।"

দয়াদেবী ভগ্নস্বরে কহিলেন, "আহা, ভগবান তার সুমতি দিন! সে তোকে আমার চাইতেও মানে, তাই তোর কথা ঠেলতে পারেনি। আর কলিকে ও কি ভালই বাসে··· যদি আজ দাদা থাকত·····"

দিগম্বরী কহিলেন, "সে কথা আর বলতে!···আমারও ত বড় সাধ ছিল·····কি করব সবই বরাতে করে!"

দয়াদেবী কহিলেন "সে কথা বলে আর কি করব দিদি! আমারও বড় ইচ্ছা ছিল·····কিন্তু না হয়েছে ভালই! সংসারের অবস্থা ত দেখতে পাচ্ছ? কলিকে তা'হলে হাত-পা-বেঁধে আগুনে ফেলে দেওয়া হত! এ ত তবু"····· দয়াদেবী আর বলিতে পারিলেন না!

পুকুরঘাট হইতে সত্যবালা ভিজা কাপড়ে দালানে উঠিয়া আলনা হইতে একখানা কাপড় টানিয়া লইল।

দিগম্বরী কহিলেন, "মেজ বৌমা, কালকে তোমাকে একবার যেতে হচ্ছে যে মা। ছিরী গড়তে হবে; বরণডালা

সাজিয়ে রাখতে হবে·····পরশু কলির গায়ে হলুদ, এয়োতীর কাজ-কর্ম্ম আছে!"

সত্যবালা দড়িতে ভিজা কাপড় মেলিয়া দিতে দিতে কহিল, "কেন—বড়গিন্নীকে নিয়ে যাও না, সব ত জানে শোনে।"

"হ্যাঁ, বড় বউমাও যাবে,—তবে তোমাকেও যেতে হবে! সব কাজই যে সধবাদের করতে হয় মা।"

"দেখি, যদি পারি ত যাব।" সত্যবালা আপনার ঘরে চলিয়া গেল। দয়াদেবী হাতের আঙ্গুল চিবুকে ঠেকাইয়া কহিলেন, "দেখলে দিদি, ওর রকমখানা, কথাবার্ত্তার ছিরি! হাড় জ্বালিয়ে দিলে! ধীরুর এ সর্ব্বনাশটা ত ওই করলে! নইলে দেবু ত এদ্দিন·····যাক্ ওপরে ধর্ম্ম আছেন, তিনি ত সবই দেখছেন।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া দিগম্বরী কহিলেন, "আজ দেখছি তোমার বরাতে আর বকনো চড়লো না!" দয়াদেবী তাচ্ছিল্যভাবে কহিলেন, "না হকগে—আমার ধীরু যে দুটো খেয়েছে, এতেই আমার পেটের অনেকখানি ভরে গেছে; বাকীটুকু জল দিয়ে ভরিয়ে রাখলেই হবে! এমন বরাতও করেছিলুম, পোড়া মরণ ত হয় না!"

রাজেন্দ্রনাথের স্ত্রী একগোছা ধোয়া বাসন হাতে লইয়া ভিজা কাপড়ে উঠানে আসিতেই, দিগম্বরী ঠাকুরাণীকে দেখিতে পাইয়া, বারান্দায় বাসনের গোছা নামাইয়া, মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া দিগম্বরীকে প্রণাম করিল। দিগম্বরী রাজলক্ষ্মীর মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন! "এস মা, তোমার জন্যেই বসে আছি! কলির বে এই মাসের ১৫ই,—পরশু গায়ে-হলুদ! আমার ঘরে ত আর কেউ নেই—তোমাদেরই করতে কম্মাতে হবে!" রাজলক্ষ্মী হাসি-মুখে ঘাড় কাত করিল এবং দয়াদেবীর দিকে চাহিল।

দয়াদেবী কহিলেন, "ও যাবে'খন, আমি রাজুকে বলব! যাও, তুমি ভিজে কাপড় ছাড়গে বড় বৌমা!"

রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেলে দয়াদেবী কহিলেন, "ওর দিদি কোন বালাই নেই, মাটির মানুষ!"

"তাহলে আসি দিদি, সন্ধ্যে হয়ে এল!"

"এস।"

দিগম্বরী চলিয়া গেলেন। দয়াদেবী মালার থলে হাতে ঠাকুর-ঘরের দিকে সন্ধ্যাদীপ ও বৈকালী ভোগ দিবার জন্য দু এক পা যাইতেই, সত্যবালা সম্মুখে আসিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "ও মাগির কাছে আমার নামে কি এতক্ষণ ধরে ফিস্ ফিস করে লাগানো হচ্ছিল শুনি!"

দয়াদেবী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "সে কি মেজ বৌমা!"

সত্যবালা মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "তা বটেই ত, আমি আর কিছু শুনি নি কি না! যত পাড়ার মাগী আমার বাড়ীতে আসবে, আর উনি করবেন তাদের কাছে আমার কেচ্ছা! বলে—যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া!"

দয়াদেবী সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন, "বলে থাকি বেশ করেছি, তুই যা করতে পারিস করিস! এমন ছোট লোকের ঘর থেকে মেয়ে এনেছিলুম যে সংসারে আগুন জ্বেলে দিলে গা!"

আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িলে যেমন প্রচণ্ড ভাবে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সত্যবালাও তেমনি গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল "দেখ, মুখ-সামলে কথা কও,—ভাল হবে না বলছি।—বাপ-মা তুলে কথা! আজন্ম রাঁড় হয়ে সাতকুল খেয়ে ভাইপোদের দোরে পড়ে আছেন, আবার দেমাক কত! আমার হিংসেতেই মলেন, আমি যেন বুকে ভাতের হাঁড়ী চাপিয়েছি।"

সমস্ত দিন অনাহারে ও দুশ্চিন্তায় দয়াদেবীর শরীর-মন দুই ই অবসন্ন ছিল,—সত্যবালার কথায় দুঃখে, অভিমানে, রাগে তাঁহার দেহ কাঁপিতে লাগিল! বিকৃত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "দেখ্, অত তেজ ভাল নয়,—ওপরে ধর্ম্ম আছেন, সইবে না, কখনও সইবে না!" দয়াদেবী কম্পিত চরণে সে স্থান কোন প্রকারে ত্যাগ করিয়া ঠাকুর-ঘরে গেলেন এবং সাক্ষীগোপালের সম্মুখে উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "নারায়ণ, তোমার মনে এতও ছিল!" চোখের জল ধারা বহিয়া ঠাকুরের বেদী স্পর্শ করিল! সে গৃহে সন্ধ্যা-দীপ জ্বলিল না, বৈকালী নিবেদন হইল না, গাঢ় অন্ধকার বিগ্রহ এবং ভক্তকে ঢাকিয়া রাখিল!

রাজলক্ষ্মী দয়াদেবীর কান্নার শব্দে বারান্দায় আসিতেই দেখিল, সত্যবালা ক্রুদ্ধ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে! ঘরের দীপের আলো তাহার মুখের উপর পড়ায় রোষ-দীপ্ত মুখখানা আরও লাল দেখাইতেছিল!

"কি হয়েছে মেজ বৌ?"

সত্যবালা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তোমার অত খবরে দরকার কি গা!"

রাজলক্ষ্মী অপ্রস্তুত ভাবে কহিল "পিসীমার কান্নার শব্দ পেলুম কি না তাই"—

সত্যবালা বাধা দিয়া কহিল, "তা আমায় কেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করগে না! দরদ দেখাতে এসেছেন! অমন হ্যাকা-কান্না ঢের দেখেছি! আমায় যে এত শাপ-শাপান্ত, মা-বাপ তুলে গাল দিলে, তা বুঝি কাণে গেল না—তখন সবাই কাণের মাথা খেয়েছিলে!"

রাজলক্ষ্মী আর কোন কথা না বলিয়া ঠাকুর-ঘরের দিকে যাইতেই সত্যবালা কহিল, "কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি?"

রাজলক্ষ্মীর পায়ে শিকল পড়িল! সে ধীরে ধীরে কহিল, "পিসীমা আজ সারাদিন—"

বাধা দিয়া সত্যবালা কহিল, "বড় যে দরদ দেখছি?"

"দরদ নয় মেজ বৌ,—সংসারের ত একটা মঙ্গল-অমঙ্গল দেখতে হয়?"

সত্যবালা ব্যঙ্গস্বরে কহিল, "ওগো আমার দরদী, সংসারের মঙ্গল দেখছেন? এতদিন ছিলে কোথায়? তখন ত বিদেশে সব সুখ করছিলে, আর এই বাঁদী তোমাদের সংসার চালিয়েছে! আজ ত তোমরা সব ভাল, আমি মন্দ হবই!"

রাজলক্ষ্মী মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আমি ত তা বলিনি মেজ বৌ!"

"আবার কি করে বলতে হয় তা ত জানি না! সকলে মিলে দশের কাছে আমায় খেলো করছো! তা কর, ভগবান ত দেখছেন!"

"আমি কি করলুম মেজ বৌ?"

"কেন? এই যে সকালে রাগী পুরুষ রাগ করে না খেয়ে বাড়ী থেকে চলে গেছেন, কই, ভাল ভাজ সব, ডাকিয়ে এনে খাওয়াতে পার নি? আমি ত মন্দ, তিনি আমার মুখ দেখবেন না! ওই যে পিসী ভাইপোকে বল্লেন 'থাকিসনি ধীরু, এখানে থাকিসনি, যেখানে দুচোখ যায় চলে যা'—কই তার বেলা কেউ একটা কথা বলতে পেরেছিলে? আমিই তোমাদের সংসার ভাঙ্গছি, না?"

মোক্ষদা ঝী আসিয়া কহিল, "পুরুত মশাই এসেছেন বৌদি!" রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেল!

সত্যবালা বলিল, "কি পাষাণ রে বাবা! কি না কি একটা কথা দাদা বলেছে, অমনি ঠেকার করে বাড়ী থেকে চলে যাওয়া হল, আর আসা হল না! ওই শাশুড়ী মাগী কি কম শত্তুর ছিল, মোক্ষদা,—মরবার সময় সত্যি করিয়ে নিলে 'মা, ধীরুকে তোমার হাতে দিয়ে গেলুম, তোমার ছেলের মতন দেখো!' এখন আমি কি করি তোরাই বল?" চক্ষে বসনাঞ্চল দিয়া সত্যবালা কাঁদিতে লাগিল!

মোক্ষদা বলিল, "তা ত বটেই বৌদি! হাজার হক ছেলের মতন মানুষ করেছ, ছোটবাবু যে মানুষ খারাপ, তা ত নয়। তবে ওই এক দোষ—ভারী একগুঁয়ে, মেটি ধরবে সেটি করবে! আরও পাঁচজনে মন্তনা দিয়ে লাগিয়ে ছোটবাবুর মনটি ভাঙ্গিয়েছে বৌদি!"

"তা আর জানি না মোক্ষদা, সবই জানি! ১০ বছরের বেলায় এদের বাড়ীতে এসেছি, আর ৩০ বছর এখানে কাটালুম, সকলকে চিনেছি। আমি বলে মেয়ে, তাই সকলকে নিয়ে মানিয়ে এতদিন একসঙ্গে ঘর করছি। বড় গলা করে বলছি, কোন্ বাপের বেটী এ রকম পারে আমায় দেখিয়ে দিক্!"

"ও বৌদি, মেজদাদা-বাবু আসছেন!" স্বামীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সত্যবালা আঁচলে চোখ মুছিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল, "বেশ ত, আমি মন্দ, আমায় আজই বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিক্! আমার জন্য ওঁর ভাই বাড়ী ছাড়বে, পিসী উপোস করে হত্যে হবে, এর ত কোন দরকার নেই!" বলিয়া সত্যবালা আপনার ঘরে চলিয়া গেল!

৬

বিবাহের পর কল্যাণী মল্লেনপুরে স্বামীর ঘরে আসিয়াছে আজ প্রায় মাস খানেক হইল,—খড়দার কোন খবরই সে জানে না। সে শুনিয়াছিল, ধীরু গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কোথায় বিদেশে যাইবে,—গিয়াছে কি না তাহার কোন খবর পায় নাই। এখানে আসিয়া সেই খবরটা জানিবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইতেই, সে তাহার নির্লজ্জ মনকে ভর্ৎসনা করিয়া দাবিয়া রাখিল। 'ধীরুর সহিত আমার কি সম্বন্ধ? সে তাহার জীবনটা যে ভাবে চালাইয়া নিয়া যায় যাক না কেন, আমার কি? সে কি কখনও আমার কথা কোন দিন ভাবিয়া দেখিয়াছে? ইচ্ছা করিলে সে কি আমায় রক্ষা করিতে পারিত না? না, সে আমার কেউ নয়!' কিন্তু

পরক্ষণেই মনটা ঘুরিয়া ফিরিয়া কি জানি কেন তাহারই কল্যাণ চায়···প্রাণটা কাঁদিয়া বলে, "ঠাকুর, তুমি তাহাকে দেখিও, সে চিরদিন আপনার সম্বন্ধে উদাসীন! আমার যাহা হইবার হইয়াছে, হউক,—কিন্তু সে যেন সুখে থাকে।"

এখানে জগদীশ বাবুর বিধবা ভগিনী কাদম্বিনী তাহাকে যত্ন করে, স্নেহ করে। বৃদ্ধ জগদীশ বাবু প্রাণের মধ্যে নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া কল্যাণীকে তুষ্ট করিবার জন্য যাবতীয় সুখের ভাণ্ডার সম্মুখে ধরিলেন। কল্যাণী সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না! খাঁচায়-পোরা বনের পাখীর মতন সে হতাশ ভাবে এক কোণে সরিয়া নির্জ্জীব অবস্থায় ছটফট করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

সন্ধ্যার মুক্ত বাতাসে ছাদে বসিয়া কল্যাণী আজ তার জীবনের লাভ-লোকসান খতাইয়া দেখিতেছিল। বর্ত্তমান অন্ধকারময়—ভবিষ্যতের কোন অস্তিত্বই নাই,—তাই অতীতের মধুর স্মৃতি তাহার মনের কোণে মাথা উঁচু করিল। বাল্যের খেলা-ধূলার মধ্যে গঠিত হইয়া উৎসাহ-আনন্দ লইয়া একটি গন্ধসিক্ত ফুলের কুঁড়ীর মতন যে কল্পনা তাহার কুমারী জীবনকে প্রফুল্লিত রাখিয়াছিল, কৈশোরের যে উন্মাদনা মনকে টানিয়া লইয়া কোন্ দৃষ্টির অগোচরে একটা পরিপূর্ণ সার্থকতাময় সুন্দর বিশ্বের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিল, আজ বাস্তবের কঠিন আঘাতে স্বপ্নের মত তাহা মিলাইয়া গিয়াছে! সত্য জগতের এক কোণেও তার একতিল অস্তিত্ব আজ নাই। কেন এমন হইল? সে যাহা চাহিয়াছিল তাহা কি এমনই দুর্লভ ছিল? হয় ত বা তাই! এই না-পাওয়ার দুঃখটা অন্তরের মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া থাকিলেও, সেই চাওয়ার মধ্যে যে সুখটুকু প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল, কল্যাণী আজ সেইটুকুই বুকে চাপিয়া ধরিল।

হতাশ ভাবে তাহার সজল দৃষ্টি ফিরাইতেই দেখে, অদূরে এক গৃহস্থ-বাড়ীর মাটির দাওয়ার উপর কতকগুলি ছোট মেয়ে অবাধ আনন্দে খেলা করিতেছে, যুবতী বধূ হাসিমুখে তার গৃহকর্ম্মে নিরতা, স্বামী প্রশংসমান চক্ষে স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া আছে। কল্যাণী দৃষ্টি ফিরাইল, তাহার চোখের কোণ দিয়া কয় ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

পশ্চাৎ হইতে কাদম্বিনী আসিয়া কহিল, "এ কি বৌদি, তুমি কাঁদছ?"

কল্যাণী কোন উত্তর করিল না,আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিল।

"মার জন্যে মন কেমন করছে বুঝি?...ছিঃ, কাঁদে না, সকলেই ত শ্বশুরবাড়ী যায়! যতদিন বিয়ে না হয় ততদিনই বাপ-মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ, বিয়ে হলে স্বামীর ঘরই হচ্ছে আপনার। আর সত্যি ভাই, তুমি ত ছেলেমানুষ নও; এস নীচে এস, চুল বাঁধবে।" কল্যাণীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া কাদম্বিনী বিরক্তস্বরে কহিল, "আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি।"

"তবে এস আমার সঙ্গে।"

কল্যাণী ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল, "আমায় একটু নিরিবিলি বসে থাকতে দেখলেও তোমাদের সয় না?"

"ও কি কথা বৌদি·····চুপ করে একাটি বসে আছ···"

"আমার ভাল লাগে তাই"·····

"তাই থাক"···বলিয়া কাদম্বিনী বিরক্তভাবে সে স্থান ত্যাগ করিল। জগদীশ বাবুর দূর সম্পর্কীয়া মামী সৌদামিনী ঠাকুরাণী নীচের বারান্দায় বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন; কাদম্বিনী মুখভার করিয়া নীচে আসিতেই সদু ঠাকরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে লা কাদি?"

"বৌ একাটি ছাদে বসে রয়েছে দেখে বল্লুম, 'এস তোমার চুল বেঁধে দিই'—তা আমায় ঝঙ্কার করে উঠল!"

"কই, যাই দেখি একবার নবাবের বেটিকে দেখি! জগুকে তখন পই পই করে বারণ করলুম—অমন তিনকুল-খেগো হা-ঘরের মেয়ে এনে কাজ নেই। বাপ মিন্সে জন্ম দিয়েই খালাস, মা মাগীর উদ খেতে ক্ষুদ নেই...এক মামা, সেও ত শুনি গেঁজেল···দুচার ঘর যজমানরা দয়া ধর্ম্ম করে যা দেয় তাই দিয়েই দিনপাত···তাদের মেয়ের এত দেমাক কিসের শুনি? জগুর যেমন কাণ্ড···না দেখলে তার ঘর-সংসারের হাল, না গুণ্‌লে তার রাশ নক্ষত্তর, না করলে তার বয়েসের বিচার,—রূপসী দেখে ঘুরে পড়ল! রূপ ত কত? পাঁকাটির মতন গড়ন, সাদা ফেকফেকে রং, যেন শ্বেতা হয়েছে। বুড়ো শালিক কখনও পোষ মানে? এই কি বিয়ের কনে? ওই বয়সে আমার "মেনী" "ভবি" হয়ে মরেছে, "খুকনী" পেটে···না ছাই কি বলছি—খুকনী তখন ১৪ মাসের···"আন্না" পেটে···হ্যাঁ তাই বটে···"আন্না"ই পেটে। তা মা-মাগীকেও বলি—অত বড় থুবড়ো মেয়ে ঘরে রেখেছিলি কি করে?...গলায় ভাত আটকাত না?...

আমাদের হলে অমন মেয়ের গলা টিপে এমনি করে···উহু··· হু···হু ..গেছি রে···"বলিয়া সহু ঠাকরুণ তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুলী চাপিয়া ধরিয়া যাতনার অনুভূতি-সূচক অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিলেন। গয়লা বৌ কহিল "আহা-হা আঙ্গুলটা কেটে ফেল্লে বুঝি? তোমারও যেমন কাজ···বুড়োমানুষ, গেছ···তরকারী কুটতে, বাড়ীতে কি আর মানুষ নেই? এস, আঙ্গুলটা তেল নেকড়া দিয়ে বেঁধে দিই!" গয়লা বৌ একটা নেকড়া রেড়ীর তেলে ভিজাইয়া সহু ঠাকরুণের আঙ্গুলে বাঁধিয়া দিল।

বঁটিখানা এক পাশে সরাইয়া রাখিয়া সহু ঠাকরুণ কহিলেন "শত্তুরদের জ্বালায় আর তেষ্টাবার যো নেই। রাতদিন মনে মনে রিষ করবে আর গাল দেবে···আর আমার এই দশা হবে। থাকছি না আর এখানে···আজ জগু এলে বলছি, দিক আমায় বিন্দাবনে পাঠিয়ে···থাকুক সে তার ধিঙ্গী বৌ নিয়ে,···দেখতেও আসব না, বলতেও আসব না।"

গয়লা বৌ কহিল "তা হক্ কথা বলব মামী, নতুন বৌদি ত আর ছোটটি নন, দৈবি সৈবি এক আধ দিন ত কুটনোটাও কুটতে পারে? এই ত বড় গিন্নী থাকতে কত কাজ করেছেন...আমরা যদি বলেছি, তা হলে বলতেন... তোদেরও ত মানুষের শরীর! আহা, সতী লক্ষ্মী মানুষ সগ্‌গে গেছেন···তার নামে মিথ্যে বলব না!"

সহু ঠাকরুণ হতাশভাবে কহিলেন, "তার মায়াতেই ত আজও এই মাটি কামড়ে পড়ে আছি, ..বলি, তার রাজ্যি-পাটে ছুঁচোর কেত্তন হবে মা?"

গয়লা বৌ একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া নিম্নস্বরে কহিল, "কি দেমাক, মা, কি দেমাক! সেদিন বড়মুখ করে বললুম 'নতুন বৌদি, বাবুকে বলে আমায় বিশ গণ্ডা টাকা দিইয়ে দাও, আমার নেড়ার জন্যে পাশের ধানজমীটা কিনি, তোমাদের এখানে গতর খাটিয়ে শোধ করব'··তা বল্লে কি জান, 'তুমি বাবুকে বল, আমি পারব না' দুঃখী গরীবের প্রতি একটু দয়া নেই। সদাই মুখখানা হাঁড়ী করে আছেন। না আছে একটু হাসি, না আছে দুটো মিষ্টি কথা!"

"কি বল্‌ব বল্, তোরাই দেখ! কিছু বলি না মা, পাছে জগু কিছু মনে করে! জগু ত আজকাল অন্দর থেকে এক পা নড়তে চায় না, কাছারীতেও রোজ বসে না। আগে তবু দু' একবার মহালে যেত, এখন তাও না! জগুকে যেন কি তুক করেছে। যাক্‌গে, সন্ধ্যে হয়ে এল, দুধ নিয়ে আয়···আর দেখ্ কাদী পুজোর জোগাড় করলে কি না!"

গয়লা বউ চলিয়া গেল। সহু ঠাকরুণ ছাদে আসিয়া দেখিলেন, কল্যাণী আলিসার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি কহিলেন—"বলি বউ, তোমার আক্কেলখানা কি গা? সন্ধ্যেকালে ছাদের ওপর দিব্বি তুমি মাথার কাপড় ফেলে হাঁ করে চেয়ে আছ? এ ত আর বাছা তোমার মামার বাড়ী নয়, যে, লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ধেই ধেই করে পাড়ায় পাড়ায় নেত্য করবে! ওমা, সোমত্ত বউ এমন বেহায়া হয়? ওই হারু ঘোষের বাড়ী দেখা যাচ্ছে, ওরা হল আমাদের সাত পুরুষের পেরজা···একটা কোন কথা রটলে তখন আমার জগুর মুখখানা থাকবে কোথায়? তোমার মা-মাগী কি তোমায় বাছা এটাও শেখায় নি?···ছ্যা ছ্যা কি ঘেন্না···কি ঘেন্না!"

লজ্জায় দুঃখে কল্যাণীর চোখ দিয়া জল বাহির হইল। একটা রুদ্ধ ক্রন্দন বুকের ভিতর ফুলিয়া ফুলিয়া সজোরে ধাক্কা মারিতে লাগিল! আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কল্যাণী ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল। একটি কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

সহু ঠাকরুণ পশ্চাতে নামিতে নামিতে কহিলেন, "বল্লেই ত বাছা রাঙ্গা চোখের পানি ফেল,—কিই বা এমন বলেছি ..আবার পার ত জগুর কাছে সাতখানা করে লাগিও,···মামীকে বিদেয় করে দশ হাত বার করে খেও।" বলিয়া সিঁড়ীর নীচে নামিয়া জগদীশ বাবুকে অদূরে আসিতে দেখিয়া কল্যাণীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "জল-খাবার নেবে এস বউমা, সেই কখন চারটি ভাত মুখে করেছ"·····বলিয়া তাড়াতাড়ি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

কল্যাণী একাকী জানালার পাশে গিয়া বসিল এবং আঁচলে চোখ মুছিয়া দূরে অন্ধকার-পূর্ণ আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, এ কি জীবন্ত সমাধি তার! এ-রকম করিয়া কত দিন চলিবে? একে একে তাহার

ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল! কি সুখের জীবনই ছিল!···তার পর প্রহেলিকাময় নব জীবনের উন্মেষ! দেহ মনে সাড়া দিয়া হঠাৎ কে আসিয়া যেন চোখ দুটির উপর কিসের কাজল পরাইয়া দিয়া গেল! সারা জগৎ অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিল! আকাশে নূতন রূপ, পুষ্পগুচ্ছে নূতন রূপ! যেন কোথাও কোন দুঃখ দৈন্য নাই—আনন্দের অবাধ একটানা স্রোতে জগতের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে,—কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, জানে না···শুধু এইটুকু জানে যে, এই যাওয়ার মধ্যেই সমস্ত চাওয়া পাওয়ার পূর্ণ সার্থকতা কোন্ দূরে অপেক্ষা করিতেছে! কিন্তু এ কি হইল? সে রূপরাজ্য সূর্য্যকরপাতে তুষারের মতন কোথায় অদৃশ্য হইল? কল্যাণীর ইচ্ছা হইল, মার কোলে ফিরিয়া যাই...কিন্তু সে স্বাধীনতাই বা তাহার কোথায়! তাহাকে এখন একজনের বিধান মানিয়া চলিতে হইবে, এমনি ভাবে জীবন কাটাইতে হইবে। বিবাহিতা বলিয়া তাহাকে সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে হইবে, চক্ষের জলে প্রাণের ব্যথা ডুবাইয়া রাখিতে হইবে; বুদ্বুদের মত দুঃখবিম্ব আপনি ভাসিবে, আপনি ভাঙ্গিবে, আপনি মিলাইয়া যাইবে,—কেহ দেখিবে না, জানিবে না, শুনিবে না। যাহাকে সে কল্পনাতেও কোন দিন চাহে নাই, যাহাকে সে কোন দিনও ভালবাসিতে পারিবে না, তাহারই সঙ্গে তাহাকে জীবন কাটাইতে হইবে! তাহার হৃদয়ে আঘাত করিয়া, সময় অসময়ে তাহার দেহটাকে লইয়া শকুনীর মত টানিয়া ছিঁড়িয়া যথেচ্ছাচার করিবে,—কোন প্রতিবাদ করা চলিবে না, ইহাই সতীত্ব! অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণরেখায় সতী-ধর্ম্মের পাথর বুকে এই নির্ব্বিরোধ নির্ম্মম অত্যাচার হয় ত খুব বড় হইয়া অঙ্কিত থাকিবে, কিন্তু সত্যকে একটা এত বড় মিথ্যা দিয়া গোপন রাখিয়া তাহার সত্যিকার নারীধর্ম্ম নিষ্ফল করিলে কি পুণ্য সঞ্চয় হইবে।

আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই, কল্যাণী চোখ মুছিয়া বারান্দা পার হইয়া ঠাকুর-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

পুরাতনী

শ্রীহরিহর শেঠ

কলিকাতার সম্পদ

(৩)

এক্ষণে কলিকাতা "City of Palaces" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই দ্বিতীয় নগরী আজিকার কলিকাতার শ্রী দেখিয়া দুই শত বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা কল্পনা করাও দুরূহ। তখন তথায় অর্দ্ধশতখানি পাকা বাড়ী ছিল বলিয়াও উল্লেখ পাওয়া যায় না। যে সব প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, সুবৃহৎ মনোহর সরকারী ভবনাদি, বর্ত্তমানে এই সহরকে এতাদৃশ শোভা ও সম্পদ-সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সকলের মধ্যে কতকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গের কথা বলি। বর্ত্তমান দুর্গ যে স্থানে অবস্থিত, পুরাতন দুর্গ তথায় ছিল না। লালদীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে যেখানে এক্ষণে কাষ্টম্ হাউস্, কলেক্টরি অফিস, জেনারেল্ পোষ্ট অফিস্ আছে, দুর্গ তথায় ছিল। উহার নির্ম্মাণ-কাল সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দৃষ্ট হইলেও, জানা যায়, ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে উহার নির্ম্মাণ শেষ হয়। তৎপূর্ব্বে তিন চারি বৎসরের মধ্যে উহার নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ দুর্গের

বাহিরের মাপ মোটামুটি ২১০ গজ লম্বা ও ১২০ গজ চওড়া ছিল। (১) এই দুর্গ মধ্যেই অন্ধকূপ হত্যা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে জানা যায়।

গোবিন্দপুরের জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে বর্ত্তমান দুর্গের পত্তন হয়। এবং ১৭৭৩ তে শেষ হয়। (২) ইংলণ্ডেশ্বর ৪র্থ উইলিয়মের নামে উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে মোট ব্যয় হয় দুই মিলিয়ন্ ষ্টার্লিং। তন্মধ্যে কেবল গঙ্গার ধার বাঁধিতে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। যে সময় উহা নির্ম্মিত হয়, তৎকালে উহার ভিতরে চারি সহস্র লোকের থাকিবার মত স্থান করা হইয়াছিল। সে সময়ে ফরাসীদের দ্বারা কলিকাতা আক্রমণের সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া উহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও বিবিধ বাধা প্রযুক্ত অনেক বিলম্ব হইয়া যায়। (৩)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর যে সব প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও তজ্জন্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাঁসপাতাল, মাদ্রাসা, সুপ্রিম্ কোর্ট, ফ্রী স্কুল, লাটভবন, এক্সচেঞ্জ বাটী প্রভৃতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাদ্রাসা,—তৎকালীন আদালতের প্রচলিত আরবি ও পারস্য ভাষা এবং মুসলমান আইন শিক্ষার উদ্দেশ্যে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কর্ত্তৃক ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠা-কাল কেহ কেহ ১৭৮১ও বলিয়াছেন। (৪) মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর এই বিদ্যালয়ের জন্য ৩০০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। (৫) ইউরোপীয় আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ইহাই বোধ হয় এদেশের প্রথম বিদ্যালয়। হেষ্টিংসের নিজ ব্যয়ে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াও কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। (৬)

প্রথম কোন্ স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কোন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাই নাই। ইহার বর্ত্তমান ভবন দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয় এবং ইংরাজি ১৮২০সালে এই আবাসে স্থানান্তরিত হয়। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইহার ইংরাজি বিভাগ খোলা হয়। (৭)

ফ্রি স্কুল,—খৃষ্টান বালক-বালিকাদের জন্য ইহা প্রথম ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে জানবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ওল্ড্ ক্যাল-কাটা চ্যারিটি এবং ফ্রি স্কুল্ সোসাইটির তহবিলের ৩ লক্ষ টাকার উপর ইহাতে ব্যয় হইয়াছিল। জান্‌বাজারে প্রথম যে জমি ও বাড়ী খরিদ করা হইয়াছিল, উহার মূল্য ২৮০০০৲ টাকা। পর বৎসর একটি মেয়েদের বিদ্যালয় খোলা হয়। বর্ত্তমানে উহা যে বাড়ীতে আছে, উহা, পুরাতন বাড়ী ভূমিসাৎ হওয়ার পর, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। (৮)

জেনারেল এসেমব্রিজ্ ইনষ্টিটিউশন্ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই ডাক্তার ডফ্ (Dr. Alexander Duffs) কর্ত্তৃক প্রথম চন্দননগরের ফিরিঙ্গি কমল বসু মহাশয়ের অপার চিৎপুর রোডের বাটীতে স্থাপিত হয়। (৯) সর্ব্বপ্রথম মাত্র ৫টি বালক লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। তাহারা কেহ বেতন দিত না; বরং তাহাদের বিদ্যালয়ে আগমন মিশনারিদের নিকট অনুগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইত। বসু মহাশয়ের বাটী হইতে উঠিয়া গিয়া কতিপয় বৎসর ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে স্কুল বসিতে থাকে। তৎপরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে ফেব্রুয়ারি কলিকাতার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট্ ডেভিড্ ম্যাক্-ফারলেন্ কর্ত্তৃক কর্ণওয়ালিশ্ স্কোয়ারের বর্ত্তমান ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয় এবং পর বৎসর গৃহ-নির্ম্মাণ শেষ

(১) Echoes from old Calcutta.

(২) The Good Old Days of Honourable John Company, vol—I এবং The Early History and Growth of Calcutta.

(৩) The Good old days of Honourable John Company. Vol.—I

(৪) The Good Old Days of Honourable John Company. vol. I.

(৫) The Farly History and Growth of Calcutta.

(৬) The Hand Book of India.

(৭) The Good Old Days of Honourable John Company, vol.—I

(৮) The Good Old Days of Honourable John Company, vol.—I

(৯) বসু মহাশয়ের প্রকৃত নাম রামকমল বসু, তৎকালে তিনি চন্দননগরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসী ছিলেন। ফিরিঙ্গীদের সহিত জাহাজে মাল দেওয়া লওয়ার কার্য্য করিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে ফিরিঙ্গী কমল বলিত।

হইলে তথায় বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়। তখন ইহার ছাত্র-সংখ্যা সাত শতেরও অধিক। (১০)

ডাক্তার ডফের চেষ্টাতেই ফ্রি চার্চ্চ্ ইনষ্টিটিউশন্ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা উপরিউক্ত বিদ্যালয়ের শাখা স্বরূপ প্রথমে নিমতলায় একটি ভাড়াটীয়া বাটীতে স্থাপিত হয়। তৎপরে ১৮৫৭ সালে নূতন বাড়ীতে উঠিয়া যায়। উহার নির্ম্মাণে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

ডাক্তার ডফ্ একটি অনাথ আশ্রম, একটি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় ও নর্ম্মাল স্কুলও স্থাপিত করিয়াছিলেন। (১১)

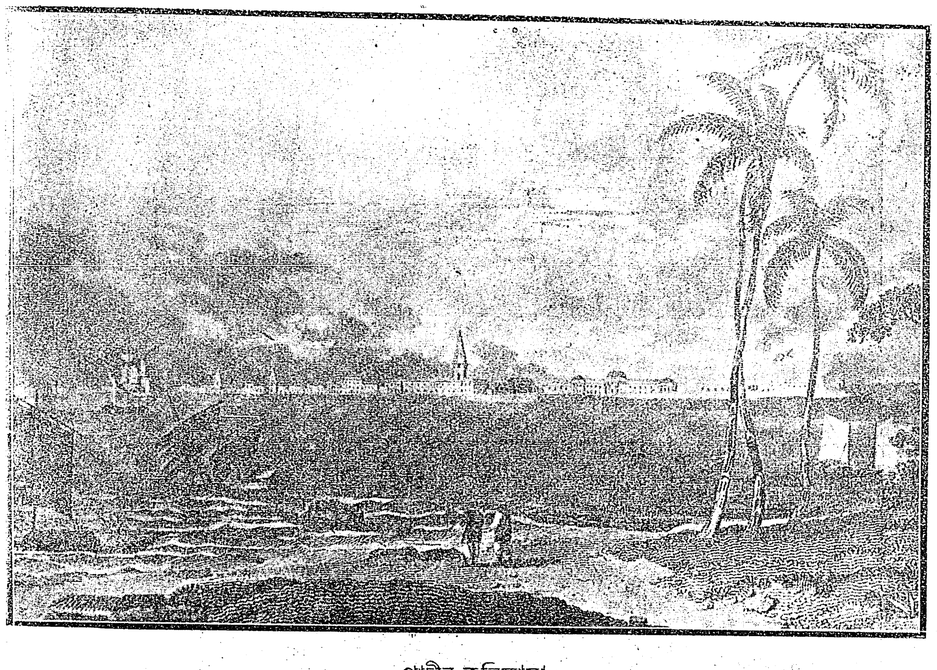

প্রাচীন কলিকাতা

সেণ্ট্ জেভিয়ার্ কলেজ প্রথম পার্ক্ ষ্ট্রীটে খোলা হয়। তখন উহার নাম ছিল সেণ্ট্ জনস্ কলেজ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার বারু (Rev. Dr. Barew) ৪০০০০৲ টাকা মূল্যে কলেজের বর্ত্তমান বাড়ীটি খরিদ করিয়াছিলেন। (১২)

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা সর্ব্বপ্রথম ডেভিড্ হেয়ারের মনে উদয় হয়। রাজা রামমোহন রায়ের বাটীতে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার মনে এই কল্পনার সূত্রপাত হয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষমতাবান উদারপ্রাণ হিন্দু তাঁহাদের পুত্রদিগকে ইংরাজি ভাষা ও ইংরাজি বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার মানসে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ রূপে ইচ্ছুক হন। তৎকালীন সুপ্রীম্ কোর্টের চিফ্ জাষ্টিস্ স্যার এডোয়ার্ড হাইড্ (Sir Edward Hyde) এই বিষয়টির বিশেষ ভাবে সমর্থন করেন ও কার্য্যে পরিণত করিতে উৎসাহিত করেন। তৎপরে ৪ঠা মে তাঁহার বাটীতে লর্ড ময়রার সভাপতিত্বে হিন্দু সমাজের প্রধান ব্যক্তিদের একটি সভা হয়। এই সভাতেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সেই স্থানেই ১১৩১৮ পাউণ্ড চাঁদা উঠে। কোন ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন জাতীয় উন্নতির জন্য দেশীয়দের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা। (১৩)

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২০ শে জানুয়ারি অপার চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে স্কুল প্রথম খোলা হয়। তৎপরে

(১০, ১১, ১২) প্রধানতঃ The Good old Days of Honourable John Company, vol. I হইতে গৃহীত।

(১৩) The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. II.

পূর্ব্বোক্ত ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ীতে স্কুল উঠিয়া যায়। প্রথম দিন ২০ জন ছাত্র হয় এবং ৩ মাসের মধ্যে এই সংখ্যা ৭২তে পরিণত হয়। হিন্দু কলেজের বাড়ীর জন্য প্রথম ১২০০০৲ টাকা এবং পরে আরও ৫০০০০৲ টাকা ব্যয়িত হয়। উহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে। ১৮৫৫ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ খোলা হইলে এই বিদ্যালয়টি উহার

কাষ্টম হাউসের পূর্ব্বাংশ ও অন্ধকূপ হত্যার স্মৃতিস্তম্ভ

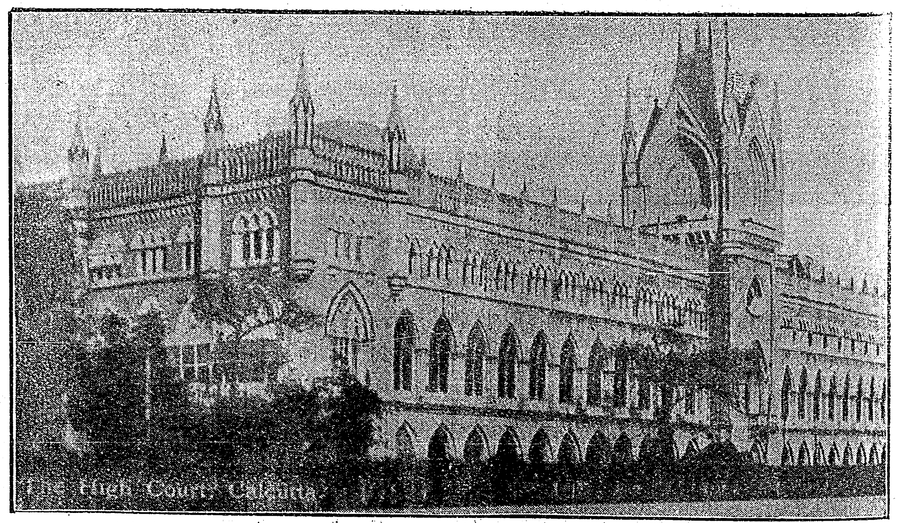

হাইকোর্ট

অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষণে সে হিন্দু কলেজ আর নাই; তৎস্থানে হিন্দুস্কুল হইয়াছে। (১৪)

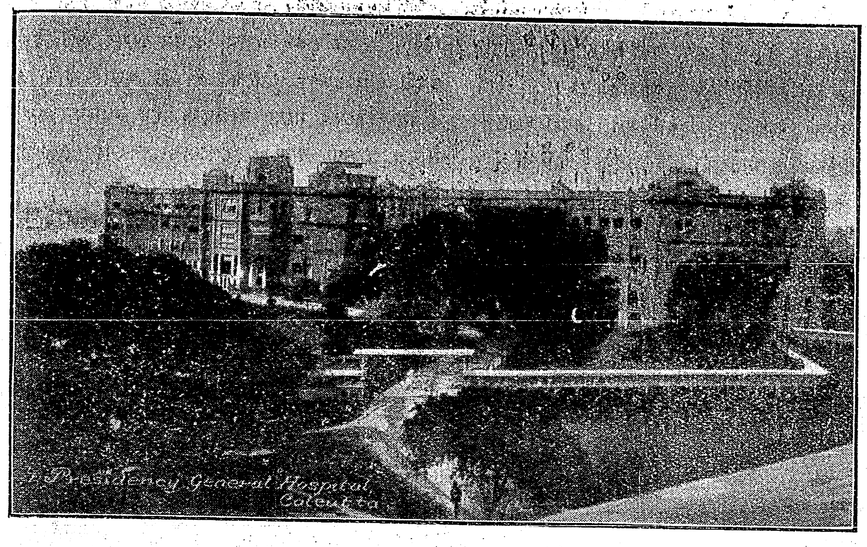

প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতাল

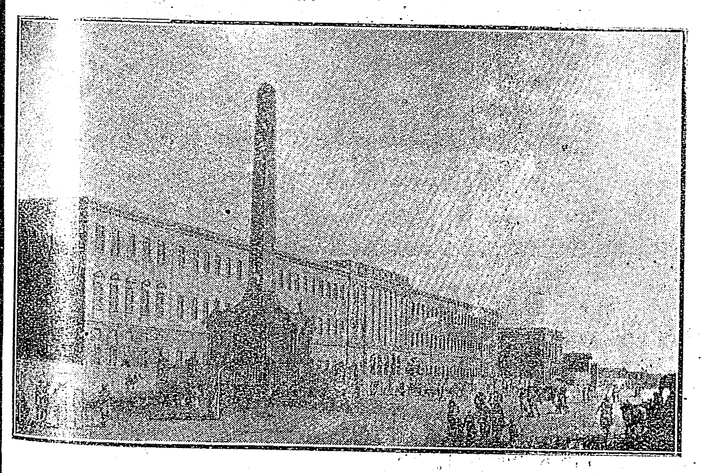

পুরাতন রাইটার্স বিল্ডিং

কলিকাতার লা মার্টিনারও একটি পুরাতন শিক্ষামন্দির। ইহা জেনারেল্ ক্লড্ মার্টিনের (General Claude Martin) এর উইলের সর্ত্তানুসারে ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। বিদ্যালয় পরিচালন জন্য তিনি আরও দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। উহা ইংরাজি ১৮৪৬ অব্দে ১লা মার্চ খোলা হয়। প্রথম এখানে একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত ছেলে মেয়ে উভয়ই পড়িত। উহার নামকরণ মার্টিনের অভিপ্রায়ানুসারেই হইয়াছে। (১৫)

মেডিক্যাল্ কলেজ ভবন লর্ড্ বেণ্টিঙ্কের সময় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয় এবং পর বৎসর নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। হাঁসপাতাল পরে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পুরাতন এবং নূতন জ্বরের হাঁসপাতালের ও ক্বটারি কমিটির তহবিলের বাকি টাকা ও রাজা প্রতাপসিংহের ৫০০০০৲ টাকা চাঁদা হইতে প্রধানতঃ

(১৪ক) The Bengal Magazine, Vol. II (1873—74)
(খ) Calcutta Review, Vol. X (1848)
(গ) The Early History and Growth of Calcutta.
(ঘ) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I.
(১৫) The Early History and Growth of Calcutta & The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I.

নির্ম্মিত হয়। ঐ বৎসরের ৩০শে সেপ্টেম্বর মারকুইস্ অব্ ডালহাউসির দ্বারা উহার ভিত্তি-প্রস্তর সংস্থাপিত হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর হইতে রোগীদের লওয়া আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথম ৫০০ রোগীর স্থান করা হইয়াছিল। বাটীর নক্সা প্রস্তুত ও নির্ম্মাণ-কার্য্য কলিকাতার মেসার্স বার্ণ্ কোম্পানির দ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল। রাজা প্রতাপ সিংহের চাঁদা ভিন্ন শ্যামাচরণ লাহা, মিঃ এজ্‌রা ও কলুটোলার শীলেদের দানও উল্লেখযোগ্য।

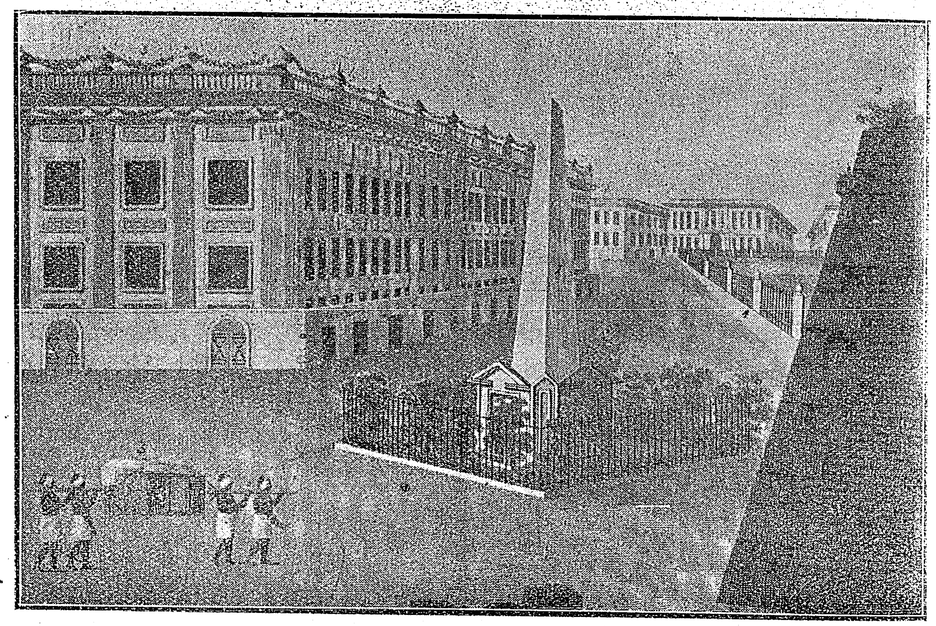

(১) অন্ধকূপহত্যার পুরাতন স্মৃতিস্তম্ভ

(২) পুরাতন দুর্গ (৩) পুরাতন রাইটার্স বিল্ডিং (৪) সহরের মধ্যস্থ বৃহৎ জলাশয় (একখানি পাল্কী)

কলেজ স্থাপনকালে লর্ড্ বেণ্টিঙ্ক বিশেষ সন্দিগ্ধ ছিলেন যে, কোন বাঙ্গালী যুবক মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া পরীক্ষা করিতে স্বীকৃত হইবে না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সে সন্দেহ অমূলক হইয়াছিল। সে বিষয় কোন আপত্তি উপস্থিত হয় নাই। অচিরে দেশীয় ছাত্রগণ এই কলেজে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল।

মেডিক্যাল্ কলেজে যে যুবক প্রথম মড়া কাটেন, তাঁহার নাম মধুসূদন গুপ্ত। যেদিন প্রথম বাঙ্গালী যুবক মড়া কাটেন, সে দিন দুর্গ হইতে তোপধ্বনি করা হইয়াছিল। মধুসূদনের ছবি আজিও কলেজের গৃহে সজ্জিত আছে। প্রথম বৎসর অর্থাৎ ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ৬০টি মড়া কাটা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, প্রথম বৎসর ৬টি দ্বিতীয় বৎসর ১২টি এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ৫০০টি মড়া কাটা হইয়াছিল। প্রথম ছাত্রদের মধ্যে রাজকৃষ্ণ দে নামক একটি বালকের নামও পাওয়া যায়। শেষোক্ত বৎসরে ভোলানাথ বসু, গোপালচন্দ্র শীল, দ্বারকানাথ বসু ও সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী প্রথম ডাক্তারি শিক্ষার জন্য বেণ্টিঙ্ক নামক জাহাজে ডাক্তার গুডিবের (Dr. Goodeve) সহিত বিলাত যাত্রা করেন। (১৬)

মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার বহুকাল পূর্ব্বে দেশীয় লোকদের জন্য একটি হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছিল। উহা সাধারণের চাঁদার দ্বারা ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর

(১৬) (ক) The Administration of the East India Company.

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাই দেশীয়দের জন্য প্রথম কেবল মাত্র সাহেবদের জন্য প্রেসিডেন্সি হাঁসপাতাল হাঁসপাতাল। ইহা কোন্ স্থানে ছিল তাহা জানা যায় না। নামে আর একটি হাঁসপাতালের উল্লেখ পাওয়া

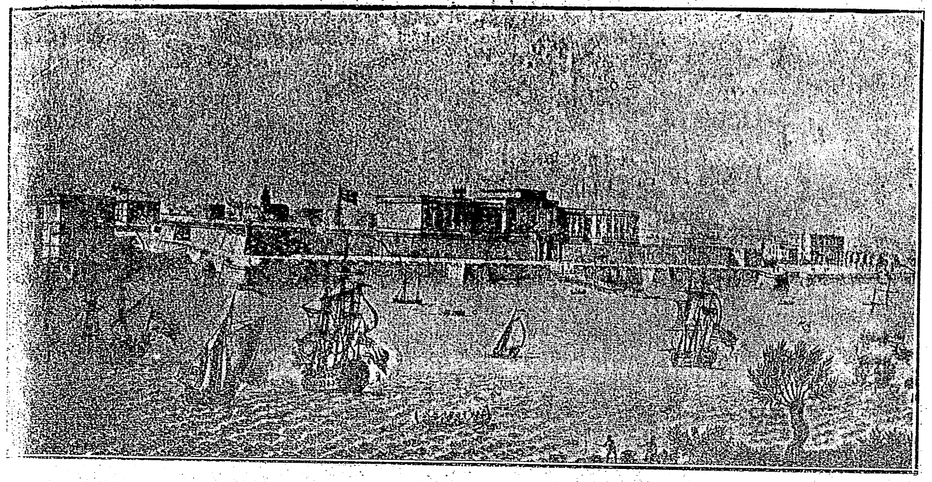

পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ

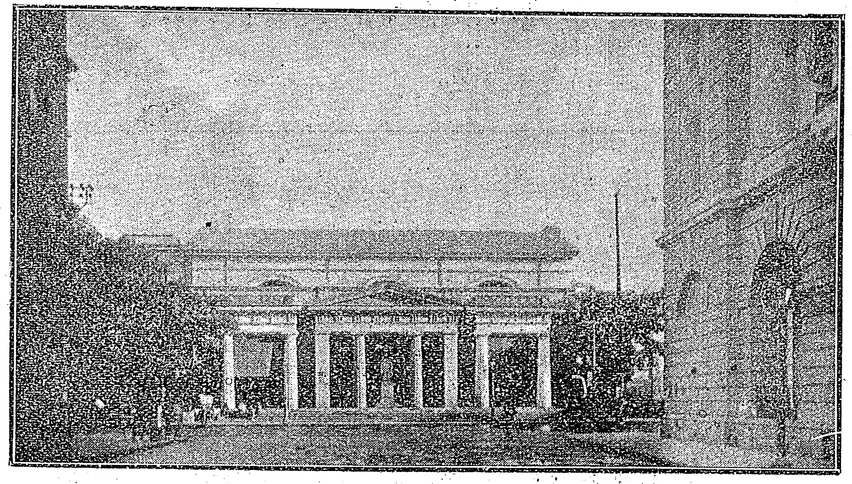

ডালহাউসি ইন্‌ষ্টিটিউট্

সাহেবদের জন্য প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতাল ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারও বহুকাল পূর্ব্বে ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে যায়। উহা বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি জেলের দক্ষিণে ছিল। (১৭)

ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ্ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কর্ম্মচারি-

(খ) The Early History and Growth of Calcutta.
(গ) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I.
(ঘ) সুবর্ণবণিক সমাচার—অগ্রহায়ণ ১৩২৯ সাল।

(১৭) প্রধানতঃ The Early History and Growth of Calcutta নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

দের বাঙ্গালা শিক্ষার সুবিধার জন্যই প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠিত ফ্রিচার্চ্চ অরফেনেজ্ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ৫টি ছাত্রী লইয়া হইয়াছিল।

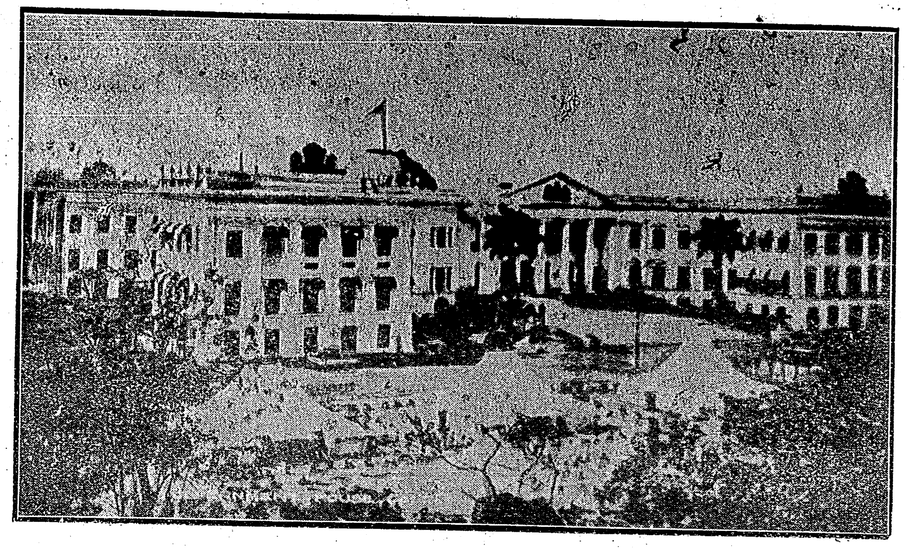

লাট সাহেবের বাড়ী

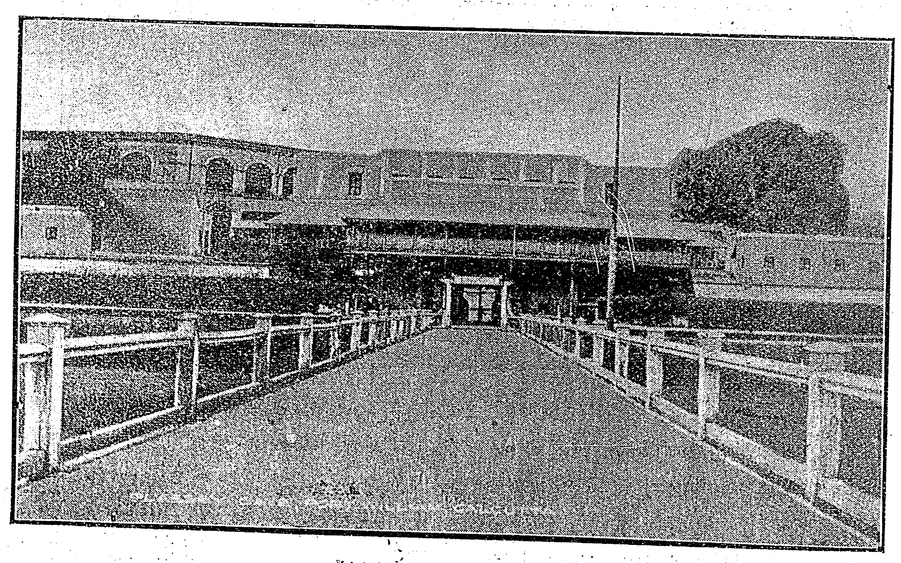

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ—পলাশি গেট

প্রথম আরম্ভ হয়। বসাক্ ষ্ট্রীট্, বৈঠকখানা এবং ইটালির

বর্ত্তমান রাইটার্স বিল্ডিং

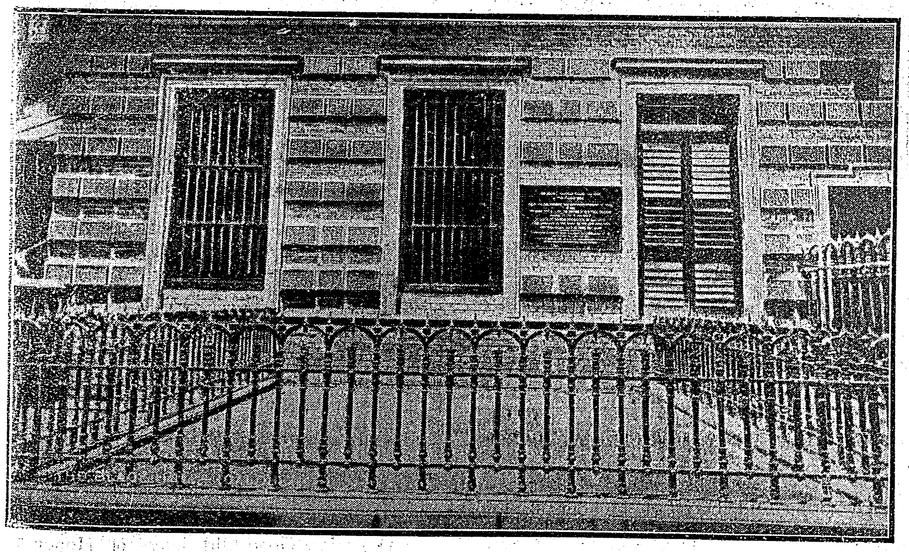

এইস্থানে পূর্ব্বে অন্ধকূপ-হত্যা ঘটিয়াছিল

ক্যানাল্ ষ্ট্রীটে এই স্কুলটি অনেক দিন অবস্থিতির পর, ১৮৭৪ সালে বিডন্ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উঠিয়া যায়। এই ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন স্যার জর্জ্জ ক্যাম্প্‌বেল্। (১৮)

বেথুন্ কলেজ, বেথুন্ (J. E. D. Bethune) সাহেব কর্ত্তৃক ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে স্থাপিত হয়। ডেপুটি গভর্ণর স্যার্ জন্ লিটলার্ (Hon'ble Sir John Littler) কর্ত্তৃক মহা ধুমধামের সহিত ভিত্তি প্রস্তর সংস্থাপিত হয়। (১৯)

আর্টস্কুল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম বৌবাজারে প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার প্রথম শিক্ষক ছিলেন মসিয়ে রিগড্ নামক (Mons. Rigaud) একজন ফরাসী ভদ্রলোক। এখানে চিত্রবিদ্যা,

টাউন হল

খোদাই ও ঢালাই শিক্ষা দেওয়া হইত। ১৮৬৩ সালে গভর্ণমেণ্ট উহার ভার গ্রহণ করেন। (২০)

কলিকাতার পুরাতন ও সুপ্রসিদ্ধ কলেজের কথা বলিতে হইলে, গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল্ সেমিনারি, রাম-মোহন রায়ের ইণ্ডিয়ান্ একাডেমি, মতিলাল শীলের শীল্‌স্ ফ্রী কলেজ, বিশপ্ কলেজ্ প্রভৃতি, অথবা হাঁসপাতালের কথায় ক্যাম্বেল্ হাঁসপাতাল, য়্যাল্‌বার্ট্ ভিক্টর হাঁসপাতাল্ প্রভৃতির প্রসিদ্ধি অল্প নহে। রাজধানীর শ্রীর হিসাবে কতকটা বাহ্যিক শোভার দিকে লক্ষ্য করিয়া বাহুল্য ভয়ে এ সবের বিবরণ দেওয়া হইল না।

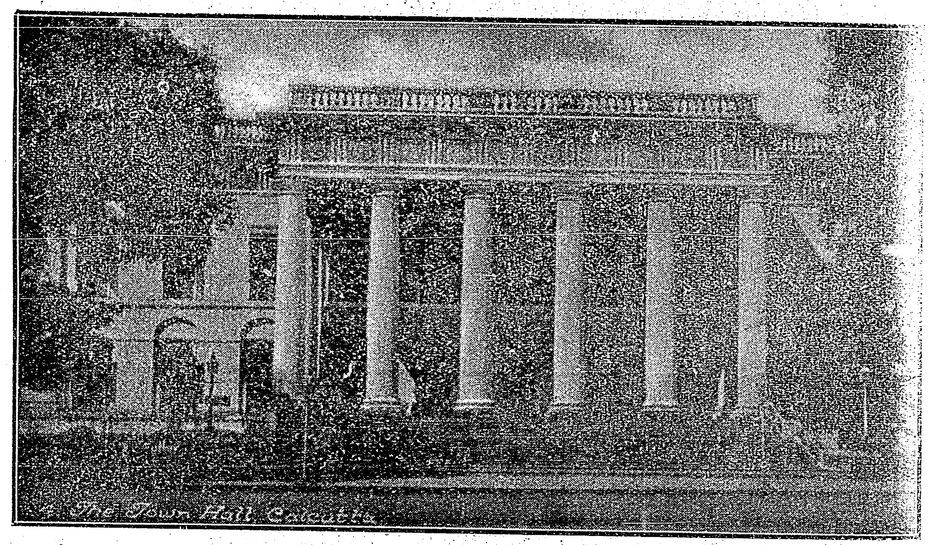

কলিকাতার অন্যতম সম্পদ অক্টারলনি মনুমেণ্ট স্যার ডেভিড্ অক্টারলনির (Sir David Ochterlony) স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে নির্ম্মিত। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইহার নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কথার সূত্রপাত হয়। উহার জন্য ৩০০০০৲ টাকা চাঁদা উঠিয়াছিল। এই স্মৃতিস্তম্ভের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য তলদেশে ৮২টা ১০ ইঞ্চ চৌকা ২০ ফুট্ লম্বা সালের চকোর প্রোথিত আছে। তদুপরি মোটা সেগুন কাষ্ঠের ফ্রেম্ আছে এবং তাহার উপর ৮ ফিট্ নিরেট গাঁথনির উপর স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছে। উহার উচ্চতা ১৬৫ ফিট। (২১)

বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট-হাউস্ নির্ম্মাণের পূর্ব্বে, ষ্ট্রাণ্ড্ রোডের উপর, যেখানে এক্ষণে বান্ হাউস্ আছে, ঐ স্থানে

(১৮) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I.

(১৯) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I.

(২০) The Farly History and Growth of Calcutta.

(২১) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I.

পূর্ব্বে গভর্ণরের বাড়ী ছিল। সিরাজ্ কর্ত্তৃক কলিকাতা আক্রমণের দ্বিতীয় রাত্রে উহা অগ্নিসাৎ হয়। তৎপরে যে স্থানে বর্ত্তমান লাট-প্রাসাদ অবস্থিত, তথায় একটি বাটী প্রস্তুত হয়।

বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট-হাউস্ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে মারকুইস্ অব্ ওয়েলেসলি প্রথম সঙ্কল্প স্থির করেন এবং কাপ্তেন ওয়াট্ (Captain Wyatt) স্থপতি নিযুক্ত হন। এই অট্টালিকার নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় ১৭৯৯এর ৫ই ফেব্রুয়ারি এবং সম্পূর্ণ রূপে শেষ হয় ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে। মোট ব্যয় হয় প্রায় ১৫০০০০ পাউণ্ড। জমি খরিদ করিতে ৮০০০০৲ টাকা লাগিয়াছিল। বাটীর আসবাবপত্র খরিদ করিতে অর্দ্ধলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। লাট-ভবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন মিঃ হিকি। ইং ১৮০৩ সালের জানুয়ারী মাসে লর্ড্ ভেলেনসিয়া (Lord Valentia) কলিকাতায় পদার্পণ করিলে তাঁহার সম্মানার্থ এই স্থানে প্রথম এক উৎসব ও বড় ভোজ হইয়াছিল। রাজার জন্মদিনের উৎসবও এ স্থানে সম্পাদিত হয়। ইহার পূর্ব্বে থিয়েটার ভবনে সরকারী উৎসব সকল সম্পন্ন হইত। (২২)

অন্ধকূপ-হত্যার ঘর (কাল্পনিক চিত্র); লোহার গরাদে দেওয়া জানলা দেখা যাইতেছে

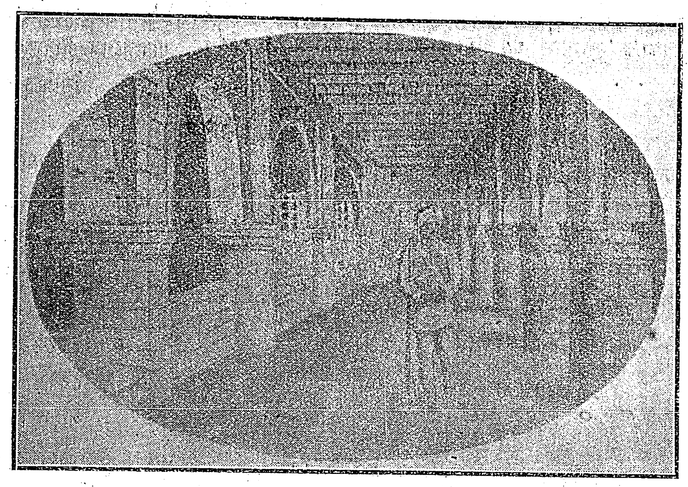

বর্ত্তমান টাউনহল নির্ম্মাণ হইবার পূর্ব্বে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওল্ড্ কোর্ট্ হাউসে টাউন্‌হল্ ছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অধিবাসীদের অর্থে সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমান টাউন্‌হল্ নির্ম্মিত হয়। পর বৎসর আরও ৪০০০০৲ টাকা ব্যয়ে কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়। উল্লিখিত অর্থের মধ্যে পাঁচলক্ষ সিক্কা টাকা লটারির দ্বারা তোলা হয়। এই লটারির জন্য ১৮০৫ সালের ১৮ই জুলাই গভর্ণমেণ্ট অনুমতি দিয়াছিলেন। ২৩)

মেট্‌কাফ্ হল্ স্যার চার্লস্ মেট্‌কাফের (Sir Charles Metcalfe) স্মৃতি রক্ষার্থ ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর মহাসমারোহের

দুর্গের নিকট হইতে কলিকাতার দৃশ্য

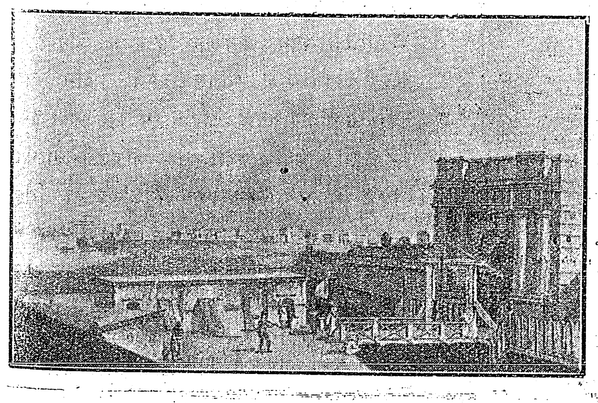

(২২) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I. ও The Early History and Growth of Calcutta নামক গ্রন্থ হইতেই প্রধানতঃ সংগৃহীত হইয়াছে।

(২৩) The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I.

সহিত আরম্ভ হয় এবং ১৮৪৪ সালে শেষ হয়। ইহা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এক সাধারণ সভার দ্বারা কলিকাতায় একটি সাধারণ পুস্তকাগার স্থাপনের কল্পনা স্থির হয়। পর বৎসর কতকগুলি ব্যক্তির উপহার প্রদত্ত পুস্তক ও গভর্ণমেণ্টের ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ হইতে প্রদত্ত বহু সংখ্যক মূল্যবান্ গ্রন্থ লইয়া উহার কার্য্য আরম্ভ হয়।

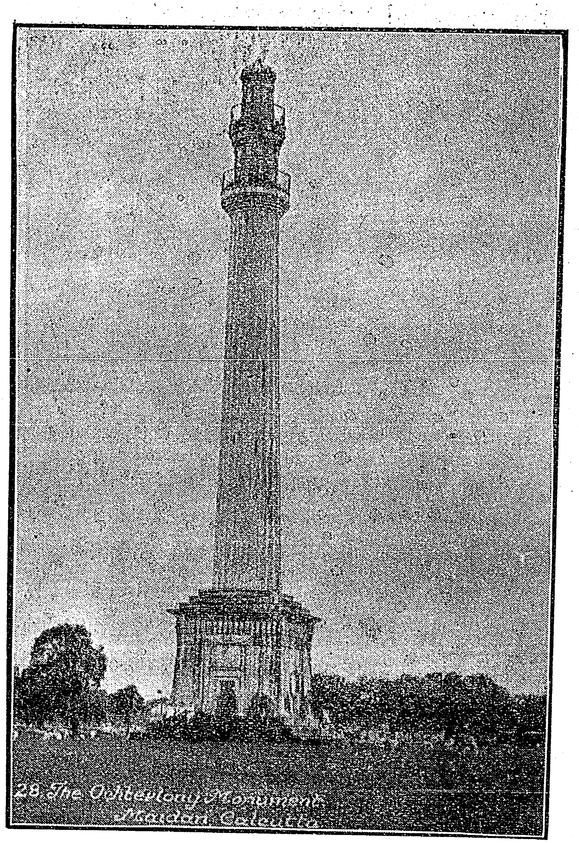

অক্টারলনি মনুমেণ্ট্

মেটকাফ্ হলের নক্সা প্রস্তুত করেন মিঃ রবিসন্ (C. K Robison) এবং বাটী নির্ম্মাণ করেন মেসার্স বার্ণ কোম্পানি। সাধারণের চাঁদা, এবং এগ্‌রিকালচারল্ ও হর্টিকালচারল্ সোসাইটির ও কলিকাতা পাব্‌লিক্ লাইব্রেরির তহবিল হইতে নির্ম্মাণের ব্যয় সম্পন্ন হয়। ইং ১৭৭০ অব্দে ফোর্ট উইলিয়মে একটি সাধারণ পুস্তকাগার ছিল। (২৪)

ডাল্‌হাউসি ইনষ্টিটিউটের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয় ৪ঠা মার্চ্চ ১৮৬৫। মহাসমারোহের সহিত এই কার্য্য হইয়াছিল। বাঙ্গলার তদানীন্তন গভর্ণর এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। সাধারণের চাঁদা ও অন্যান্য তহবিলের টাকা হইতে ইহা নির্ম্মিত হয়। এজন্য প্রথম ৩০০০০৲ টাকা চাঁদা উঠে। (২৫)

এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল্, স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্সের (Sir William Jones) দ্বারা ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তিনি যাদুঘরের কল্পনার কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। এখন হইতেই লোকের কাছ হইতে সময় সময় কৌতুকাবহ ও আশ্চর্য্য দ্রব্য সমূহ জমিতে থাকে। একটি স্বতন্ত্র বাড়ী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ সকল দ্রব্য রক্ষা করিবার কথা ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্থির হয় এবং চাঁদা তুলিবার চেষ্টা হয়। ১৮০৮এর আগে পর্য্যন্ত বলে কিছুই হয় নাই। পরে গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত জমিতে পার্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে একটি বাড়ী প্রস্তুত হয়। ছয় বৎসর পরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি ঠিকমত একটি মিউজিয়ম্ প্রতিষ্ঠার বিষয় স্থির হয় এবং ডাক্তার ওয়ালিচ্ (Dr. Nathianal Wallich) নামক একজন দিনেমার উদ্ভিদবেত্তার যত্নেই উহার কাজ আরম্ভ হয়। তিনি তাঁহার মূল্যবান সংগ্রহ সমস্ত প্রদান করেন এবং নিজে অবৈতনিক অধ্যক্ষ রূপে কাজ করিতে থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাকেই মিউজিয়মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। ওয়ালিচের পর বেতনভুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়। তাঁহার বেতন মাসিক ৫০৲ হইতে ২০০৲ পর্য্যন্ত ধার্য্য হয়। যাদুঘরের

(২৪,২৫) প্রধানতঃ The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I. হইতে গৃহীত।

দ্রষ্টব্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ কার্য্যে দেশীয় লোকদের মধ্যে রামকমল সেনের যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল। (২৬)

বর্ত্তমান টাঁকশাল্ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে সেণ্ট্ জর্জ্জ গির্জ্জার পশ্চিমে একটি টাঁকশাল ছিল। উহাতে প্রথম মুদ্রা প্রস্তুত হয় ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে। ১৭৭৩ সালের পূর্ব্বে তামার পয়সা প্রস্তুত হয় নাই। তখন এ দেশে কড়ি বিশেষ প্রচলিত ছিল। ১৭৮০সালে স্মিথ্ (Mr. Smith) নামক একজন বিশেষজ্ঞ বাৎসরিক ৬০ পাউণ্ড বেতনে টাঁকশালের অধ্যক্ষ রূপে বিলাত হইতে আগমন করেন।

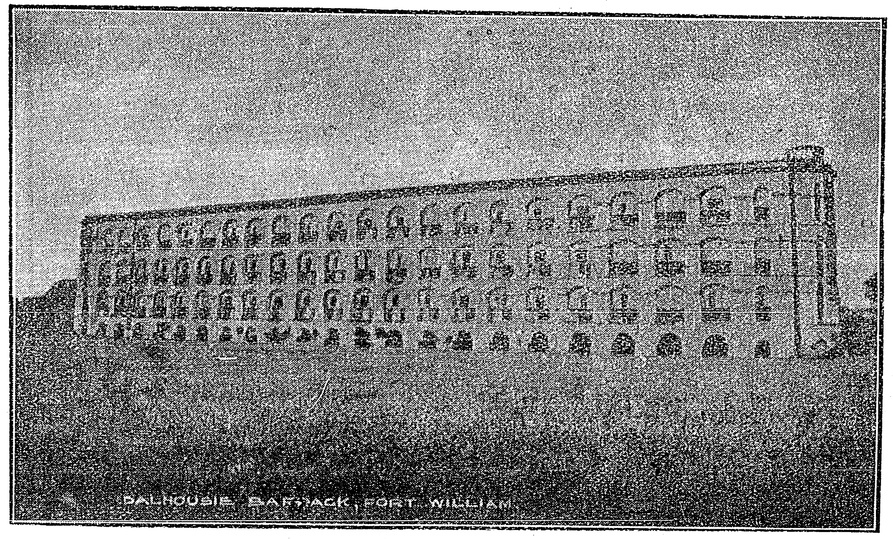

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের ডালহাউসি ব্যারাক্

বর্ত্তমান টাঁকশালের নির্ম্মাণ কার্য্য ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আরম্ভ হয়। মেজর্ ফরবেস্ (Major Forbes) উহার নক্সা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা নির্ম্মাণ করিতে এক লক্ষ ষাইট হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। উহাতে যে কলকারখানা বসান হয়, তাহার তখন মূল্য ১০০০০ পাউণ্ড ছিল। এই বাটীর মেজের ২৬ ফিট নীচে হইতে বনিয়াদ তোলা হইয়াছিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে টাকা, আধুলি ও সিকি, স্বুবর্ণ মুদ্রার মধ্যে মোহর, এবং তাম্র মুদ্রা প্রস্তুত হইত। দিনে ৭ ঘণ্টা কাজ করিয়া মোট ৩১০০০০ মুদ্রা উৎপন্ন হইত। কথিত আছে পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ টাঁকশাল। (২৭)

রাইটার্স্ বিল্ডিং নামক যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা এক্ষণে লালদীঘির উত্তর দিকে অবস্থিত রহিয়াছে, এই স্থানে পূর্ব্বেও এতাদৃশ একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা ছিল, কিন্তু তাহার বহিঃসৌন্দর্য্য অনেকাংশে হীন ছিল। লর্ড্ ওয়েলেস্‌লি যখন গভর্ণর জেনারেল ছিলেন, তখন তিনি সিবিলিয়ন যুবকদের প্রথম এদেশে আসার পর এক বৎসর ফোর্ট্ উইলিয়ম্ কলেজে উপযুক্ত পণ্ডিত ও মুন্‌সির নিকট ভারতীয় ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সকল সিবিলিয়ন যুবকদের সুখ সুবিধার জন্যই প্রথম এই ভবনগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। লর্ড্ উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্কের সময় ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে উক্ত ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। তখন স্থির হয়, সিবিলিয়ন্ ছাত্রগণ তাঁহাদের সুবিধা ও ইচ্ছামত অন্যত্র থাকিতে পারিবেন।

(২৬) The History of the Indian Museum—
The Calcutta Review 1914.

(২৭) The Early History and Growth of Calcutta
ও
The Good Old Days of Honourable John Company.

ইহার পর সাধারণের বাসগৃহ রূপে এবং গুদাম রূপে ব্যবহারের জন্য ঐ বাড়ী ভাড়া দেওয়া হয়। (২৮)

কলিকাতায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে সুপ্রীম্ কোর্ট নামে একটি আদালত ছিল। উহা ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ বুশিয়ে (Mr. Bouchier) নামক এক সওদাগরের বাটীতে এই আদালতের কার্য্য হইত। এই বাটীকেই কোর্ট হাউস বলিত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের জন্য স্বতন্ত্র বাড়ী প্রস্তুত হয়। পরে এই বাটী

জেনারেল পোষ্ট আফিস্

ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান হাইকোর্ট-ভবন প্রস্তুত করেন। ইপ্রেসের টাউনহল্ হইতে ইহার নক্সার পরিকল্পনা আইসে। সদর দেওয়ানি আদালত নামে দুর্গের দক্ষিণে আর একটি আদালত ছিল। ঐ বাটী এক্ষণে মিলিটারী হাঁসপাতাল রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। (২৯)

বর্ত্তমান কাষ্টম্ হাউস্ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। ঐ বৎসরের ১২ই ফেব্রুয়ারি মহা ধুমধামের সহিত বাটীর ভিত্তি-প্রস্তর বসান হয়। যে স্থানে এই বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা পুরাতন দুর্গের উত্তর সীমা। পূর্ব্বে দুর্গের দক্ষিণ সীমায় কয়লা ঘাটে কাষ্টম্ হাউস্ ছিল। (৩০)

সৌধসম্পদে কলিকাতা অতুলনীয় নগরী। পূর্ব্বে বর্ণিত স্কুল, কলেজ, চিকিৎসাগার, বিচারালয় ও অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলি ভিন্ন সেণ্ট্রাল্ টেলিগ্রাফ্ অফিষ, জেনারেল্ পোষ্ট অফিষ, ছোট আদালত, রেলওয়ে অফিষ প্রভৃতির অনেক উৎকৃষ্ট সৌধাদি কলিকাতায় বিদ্যমান আছে। এ সকলই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। গির্জ্জা, মন্দির বা মস্‌জিদ্ প্রভৃতির কথাও এ প্রবন্ধে বলা হয় নাই।

(২৮) The Good Old Days of Honourable John Company.

(২৯) The Early History and Growth of Calcutta.

(৩০) The Good Old Days of Honourable John Company.

লাখ টাকা

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

চরিত্র

ফক্কারাম চক্রবর্ত্তী ... দিলদরিয়া মেজাজের তরুণ যুবা
লক্কাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ফক্কারামের মাসতুতো ভাই
রক্তবীজ ... হুঁশিয়ার এটর্ণি
বেয়াক্কেলে ... ফক্কারামের পুরানো খানসামা
ধড়ীবাজ ... বেয়াক্কেলের ভ্রাতুষ্পুত্র
চঞ্চলা ... ফক্কারামের স্ত্রী
ভুজঙ্গিনী ... পতি-পাগলিনী বিরহিণী
জগাদাসী ... চঞ্চলার ঝা
খোজা মাসী ... নিঃসম্পর্কীয়া

পাওনাদারগণ, বিষ্কম্ভক

প্রস্তাবনা

নান্দী

ওগো টাকা, রূপোর টাকা···
কোন্ গহনের কোন্খানে গো,
কোন্ অতলের কোন্ তলে
হয় সে তোমার থাকা!
(মোর) চোদ্দ ভুবন ঘুরচি, শুধু ঘুরচি—যেন ঘানি গাছের চাকা!
কোন্ পাতালে আছিস রে তুই, কোন্ পাহাড়ে ঢাকা!
ওরে আমার টাকা!
চাকরি করে তোমায় ধরা···সে যে আশার বার!
(তাই) ডার্ব্বি খেলে তুলবো ঘরে, চাইছি সাগর-পার!
এধার ওধার ছিপ ফেলি,···হায়, দেখি রে সব ফাঁকা!
ওরে আমার মন-ভোলানো, ওরে আমার টাকা!
ফন্দী-ফিকির যতই আঁটি—সব সে মাটী, ভুয়ো!
যেমন দূরে তেমনি আছো...থাচ্ছি কেবল ছুয়ো!
ভার হলো যে, চোথ চেয়ে আর খালি স্বপন ছাখা!
ওরে আমার পারের খেয়া, ওরে আমার টাকা!

প্রথম অঙ্ক

[দৃশ্য—ফক্কারামের গৃহ; রোয়াক-সমেত উঠান দেখা যাইতেছে। দুইজন কাবুলী পাওনাদার ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে; বেয়াক্কেলে তাদের দ্বার অবধি অগ্রসর করিয়া দিল। কাবুলীরা চলিয়া গেলে পিছন দিক হইতে পা টিপিয়া সন্তর্পণে ফক্কারাম আসিয়া দাঁড়াইল, ও নেপথ্যের দিকে লক্ষ্য করিল; পরে বেয়াক্কেলের পিঠে মৃদু টোকা মারিল। বেয়াক্কেলে ফিরিল।]

ফক্কা। (নিম্নস্বরে) গেছে···?

বেয়া। গেছে।

ফক্কা। খুব ফিকির করে তাড়িয়েছিস, বটে!

বেয়া। তুমি যাও না—চুপ মেরে পড়ে থাকো গে। ওরা এখন এক হপ্তা আর এদিকে ঘেঁষচে না!

ফক্কা। (সখেদে) কিন্তু ওরা তো ঐ একটিই নয়! একেবারে পঙ্গপাল!···বেটারা কি ছোট লোক, বল্ দিকি! না হয়, কিছু ধারই করেচি,···তা বলে রোজ রোজ তাগাদা করবি!

বেয়া। পয়সা দেখেনি কখনো!···দু'পয়সা ধার দিয়েছিস্, বেশ তো দুদিন পায়ে পা দিয়ে বসে থাক্ না বাপু,—সুদে বাড়চে!···না, রোজ রোজ ঘ্যান্-ঘ্যান্!

ফক্কা। হ্যাঃ, একটু সুস্থির হতে দেবে না! আরে, পয়সার অভাব হয়েছিল বলেই না ধার করেছিলুম!

বেয়া। এই···! অভাব না হলে কি আর মানুষ ধার করে!

ফক্কা।···যথন পয়সা হবে, শুধে দেবো, ব্যস্! (একটু ভাবিয়া, আত্মগতভাবে) যদিও কি করে এ পয়সা হবে, তার কিছুই বুঝতে পারচি না!

বেয়া। কেন ভাবচো মিছে! তুমি যাও না, লেখাপড়া কি করছিলে, কর'গে···

ফক্কা। হ্যাঁ, যাই।...কিন্তু ছাথ্ বেয়াক্কেলে···

বেয়া। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) পালাও…(ফক্কা-রামকে ঠেলা দিল) পালাও…

ফক্কা। (ভীত ত্রস্তভাবে) কেন রে ?

বেয়া। ঐ আর একজন আসছে এদিকে…পাওনা-দারই বুঝি,…যাও, যাও, পালাও…

ফক্কা। তা একে কি বলবি ?

বেয়া। সে ঠিক বলবো'খন। আমার মাথা আছে বেশ। তুমি যাওনা…

ফক্কা। যাই। (প্রস্থান)

বেয়া। যাও—আবার একজন! সবাই যদি একসঙ্গে আসে তো একটা নুটীস দিয়েই সেরে দি,—তা তো আসবে না! সকাল থেকে কত নোককেই যে তাড়ালুম…

একজন পাওনাদারের প্রবেশ

পাওনাদার। কি হে, ফক্কারামবাবু বাড়ী আছেন ?… না, নেপালে গিয়েছেন কাঠের কড়ি-বরগা গুণে নিতে ? আজ কি জবাব আছে হে… ?

বেয়া। (হাস্য)

পাওনা। কি হে, হাসচো কেন ? হল্যো কি ! (বেয়া-ক্কেলের ভীষণ হাস্য) ইস্, হেসে যে গড়িয়ে পড়লে ! ব্যাপার কি ?

বেয়া। আপনার কি বুদ্ধি…(উচ্চ হাস্য)

পাওনা। হ্যাঁ বুদ্ধি…তা অত হাসি কেন ?…

বেয়া। (ভীষণ হাস্য)

পাওনা। ওতে আর চলবে না। আজকে সাফ জবাব চাই, সত্যি জবাব…আমার পাওনাটা মনে আছে ?

বেয়া। সেইতো, তিনশো সাঁইত্রিশ টাকা, এগারো আনা, সাত পাই…

পাওনা। না, ঠিক অতটা এখনো হয়নি। এই যে ফর্দ্দ, দেখে বলচি (পকেট হইতে ফর্দ্দ বাহির করিয়া দেখিয়া)…এই, ফক্কারাম চক্রবর্ত্তী…দুশো ঊনিশ টাকা, তিন আনা, দু'পাই…আজকের এই বেলা বারোটা অবধি সুদ কষে…

বেয়া। এঃ—তবে সামান্যই…! তা এর জন্যে এত হাঁটাহাঁটি নাগিয়েচো—আর বুঝি কোনো কাজ নেই ?

পাওনা। হ্যাঁ বাপু, সামান্য লোক, পাওনাটাকে এখনো অসামান্য করে তুলতে পারিনি ! তা, পাওনা তো শুনলে, …এখন জবাব ?

বেয়া। হ্যাঁ, তা বাবু এবার আপনার টাকাটা শুধে দেবেনই, ঠিক করে ফেলেচেন !

পাওনা। তোমার বাবুর অনুগ্রহ !

বেয়া। আজ্ঞে, তা আপনাদের অনুগ্রহর মত অতটা নয়। এ'ও ঐ সামান্যই…

পাওনা। বেশ, তা কবে শোধ দিয়ে এ অনুগ্রহটুকু প্রকাশ করবেন, শুনি…

বেয়া। আজ্ঞে, এই বল্‌চি। তা আপনার নামটা কি ছাই…

পাওনা। ছাই নয়…চশমখোর চাকলাদার। কবেবার ভুলে যাও কেন ?…নিত্যি আসচি যে হে…

বেয়া। কি করি, বলুন—আমার তো সবে এই একটি মাথা ! আপনাদের তো আর ঐ একটি নাম নয়, ও যে তেত্রিশ কোটী !

পাওনা। যাক বাবা, এখন জবাবটি দাও…

বেয়া। আজ্ঞে হ্যাঁ, জবাব এই যে বলি।…শুনুন… শুনলে অঙ্গ জল হয়ে যাবে একেবারে !…বাবু যে বহু সন্ধানে পোস্তা থেকে মশায়, তিন বস্তা তেঁতুল-বিচি কিনেচেন। কিনে লরী ভাড়া করে তাতে সেই বিচির বস্তা তুলে তিনি হোই সেই পাবনার ওধারে গেছেন সেই যে, যেখানে খুব বড়-বড় মাঠ আছে…বুঝচেন না ?

পাওনা। না, বুঝচি না…

বেয়া। এঃ, দেনদারের বাড়ী ছাড়া পিরথিমীর আর কোনো জায়গার খপরও রাখো না বুঝি !…আঃ, সে কি সব মাঠ…পেল্লায় পেল্লায় মাঠ—আর, সে যে কত বড় পেল্লায়—দাঁড়ান, তার কালি কষা হয়ে গেছে ! কি ভালো, কি ভালো…

পাওনা। মাঠের কালি রেখে তুমি খালি জবাবটুকু দাও, বাবা। তার পর, কি হবে, বল—

বেয়া। বেশ, তবে কালি রাখলুম। তা সেই সব মাঠ ঘুরে-ঘুরে ঘুরে-ঘুরে ঘুরে-ঘুরে…

পাওনা। ঘোরাটা একটু থামাও না বাপু, আমার মাথা-শুদ্ধু ঘুরে উঠচে যে তোমার ঘোরার চোটে…

বেয়া। আজ্ঞে, তা, সে-সব পেল্লায় পেল্লায় মাঠ

ঘুরতে মাথা ঘুরবে বৈ কি ! তা সেই সব মাঠ তো ঘুরে, জমি বেছে নিয়ে সেই জমিতে সেই সব বিচি তো তিনি পুঁতবেন। তার পর সেই বিচি থেকে গাছ হবে কত, ওঃ, ভাবুন একবার। আর সেই সব গাছে তেঁতুল, ওরে বাপ্‌রে, দেশ ছেয়ে যাবে তেঁতুলে, একেবারে। তার পর সেই তেঁতুল না গাছ থেকে পট্‌পট্ করে ছিঁড়ে লরি ভরে কল্‌কাতায় চালান্ ! আর কলকাতা থেকে সেই সব তেঁতুল চালান যাবে বিলেত, জার্ম্মান…এমনি সারা পিরথিমীময় ! ব্যস্, টাকা আসবে বস্তা, বস্তা ! আপনার টাকা মবলগ্ শোধ হয়ে যাবে দু'দিনের মধ্যে।

পাওনা। বাঃ—টাকা তাহলে এবার আমার ঘরে এসে পৌছুবে নিশ্চয়, এ্যাঁ ?

বেয়া। পৌছুবে কি ! পৌছে গেছে, ধরে নিন্। কর্‌কর ঝন্‌ঝনে টাকা ! নোট চান্ নোট, টাকা চান্ টাকা, মোহর চান্ মোহরই,—অর্থাৎ যা চাইবে। সত্যি, বাবুও তিতিবিরক্তি হয়ে গেছে। নিত্যি এই পাওনাদারের তাগাদা ! তিনি বলেছেন, কারো পাই-পয়সা তিনি আর বাকী রাখবেন না ! নিত্যি যে তাঁর দরজায় এসে তোমরা কুকুরের মত ঘেউ-ঘেউ করবে, সে জোটি আর থাকবে না। তাঁর দিগদারী ধরে গেছে বেজায় !

পাওনা। তুমি তো খাসা বুঝিয়ে দিলে ! তেঁতুলবিচি, পাবনা, পেল্লায় মাঠ, লরি, বিলেত, জার্ম্মানি, হস্তক কুকুর বলে কাল অবধি বাদ রাখলে না ! তা, ও-সবে ভুলচিনে আমি। আমি জবাব চাই, সাফ জবাব !

বেয়া। আজ্ঞে, জবাব চাও, তা মস্ত জবাবও তো দিলুম এই !… হাঁ করে ভাবচেন কি ? টাকাটা কি করে নিয়ে যাবেন ? তা ভাবনা কি ? আপনি যাও না, থলে জোগাড় করে আনো না ! ঐ আবার কারা আসচে, দেখি ! বাড়ী খুঁজচে !…এরা নতুন লোক, তাগাদা সবে সুরু করেচে ! বাড়ীটা এখনো ঠিক সড়গড় হয়নি ! তা আপনি যাও,—আর ঝামেলা বাড়িয়ো না। এরাও পাঁচজন ভদ্দর নোক আশা করে আসচে তো ! এরাও জবাব চাইবে এখনি।

পাঁচজন পাওনাদারের প্রবেশ

২। এইটেই তো…৩৭ নম্বর বাড়ী ?

৩। ঠিক তো ? দেখেচো ঠিক ? শেষে যেন আর কার বাড়ী ঢুকে ট্রেশপাশের চার্জ্জে না পড়তে হয়। থানা-পুলিশকে হুঁসিয়ার !

৪। এই যে, কে দাঁড়িয়ে ! হ্যাঁ হে, ফক্কারাম চক্রবর্ত্তীর বাড়ী তো এইটে ?

৫। ডাকা যাক্ না ! (উচ্চৈঃস্বরে) ফক্কারাম বাবু বাড়ী আছেন ? বলি, ও মশায়, ও ফক্কাবাবু…

বেয়া। আজ্ঞে, আপনারা…?

২। পাওনাদার।

বেয়া। এই এতগুনি…সব্বাই… ?

৩। হ্যাঁ, সব্বাই।

বেয়া। ও বাবা,—দলে যে বেশ পুরুষ্টু আপনারা…তা…

৪। এই তো সেই হ্যাকা চাকরটা ! চেনোনা বাপু, সাতশো দিন ভাঁড়িয়ে আসচো—কাল, কাল, কাল ! আজ এই দোর চেপে বসলুম,…ঘাল না হলে নড়চি না ! (বসিল)

৫। আমারো ঐ কথা !…(বসিল)

১। বাবা, লেওনস্য কালে মিষ্ট-মধু বাণী…আর দেওনস্য কালে বড্ড টানাটানি…! ও আর চলছে না !

৬। শুধু বসে থাকলেও চলবে না ! চ্যাচাও, দারুণ বিভীষিকা জাগিয়ে তোলো,…গগনভেদী চীৎকার তোলো… (উচ্চৈঃস্বরে) ফক্কারামবাবু, বলি ও ফক্কারামবাবু, ও মশায়, হয় বেরিয়ে আসুন, নয় সাড়া দিয়ে বলুন যে, বাড়ীতে নেই… বুঝলেন ?

বেয়া। আজ্ঞে, তা আমি থাকতে আপনারা গলা ফাটাফাটি করে মরচো কেন ?

২। তুমি কে ?

বেয়া। আজ্ঞে, আমিই সব। তার মানে, আমার হাতেই আপনাদের, তোমাদের জীয়ন্-কাঠি, মরণ-কাঠি !

সকলে। (মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া) এ বলে কি হে ?

৪। শোনাই যাক্…

বেয়া। বলি, আপনারা তো ট্যাকা পাবে ?

৩। হ্যাঁ,…

১। বাবা, লেওনস্য কালে মিষ্ট-মধু বাণী…আর দেওনস্য কালে বড্ড টানাটানি,—চলবে না, আগেই বলে রাখচি।

২। আঃ, থামো না, ওকে বলতে দাও…

বেয়া। তা, আমার দস্তরী ?

৪। দস্তরী কিসের ?

৫। হ্যাঁ, কিসের ?

বেয়া। মুবলগ্ টাকা পাবে, আর দস্তুরী ছাড়বে না ?

৪। যা বলেচো !···এ কি ছেলের হাতে মোয়া !

৫। টাকাটা খোলামকুচি··· !

৩। না, তার কোনো দাম নেই !

বেয়া। তবে চ্যাঁচাও বাবুরা। আজ চ্যাঁচাও, কাল চ্যাঁচাও, পরশু চ্যাঁচাও, রোজ রোজ ঐ অমনি করে চ্যাঁচাও !·· টাকা আমার এই ট্যাঁকে ! (গমনোদ্যত)

সকলে। (মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া) কি হে ? কি বল ?

২। পাগল !

১। বাবা, লেওনস্থ কালে মিষ্টমধু বাণী···আর দেওনস্থ কালে বড্ড টানাটানি · বটে !

৩। নগদ গুণে দিয়েছি, বাবা, কাটছাঁট বাদ রাখিনি...

বেয়া। তাহলে বসে বসে এখন সে নগদের সুদ গোণো গে। পরাণটা ঠাণ্ডা থাকবে। চাই কি, শুভঙ্করীটেও রপ্ত হতে পারে। আমি তাহলে আসি,···চ্যান করবার সময় হলো ! (পুনরায় গমনোদ্যত)

সকলে। (বেয়াক্কেলেকে ধরিল) ব্যাপারখানা খুলে বল দিকি বাপু···

বেয়া। তবে শুনবে ?

সকলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ,···নিশ্চয় শুনবো, আলবৎ শুনবো !

বেয়া। তবে শোনো বাবুর সম্বন্ধীর খুড়শ্বশুরের সেই ভায়রাভাই আছে না...? সেই যে...

সকলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ····

বেয়া। তা তেনার ছেলেপিলে নেই কি না ! তাই পুষ্যিপুত্তুরের নুটীশ ছাপিয়ে দেছে, বাবু সেই পুষ্যিপুত্তুরী চাকরি নেবার জন্যে দরখাস্ত পাঠিয়েছে। সেইটে পেলেই··· ব্যস্···আপনারা এসে একেবারে গঙ্গামণ্ডল তালুকখানায় চেপে বসবে—আর সুদে-আসলে সব চুকিয়ে নিয়ে যাবে।··· চাই কি, কারবার ফ্যালাও করতে আরো দশ-বিশ হাজার চাও সব তো তাও পেয়ে যাবে !···কেমন, এবার নিশ্চিন্তি হলে তো ? যাও···হাসিমুখে এখন বাড়ী ফিরে যাও···। আমি এবার চ্যানে চললুম···(গমনোদ্যত)

আরো তিনজন পাওনাদারের প্রবেশ

নূতন দলের ১। যেয়ো না বাবা, যেয়ো না...আমাদের কথাটা···

বেয়া। আজ আর সময় নেই,—হবে না বাবুরা। দেরী করে ফেলেচো ! এঁরা আগে এসেচে— নিজেদের সব বুঝে নিয়ে কেমন হাসি-মুখে ফিরচে !···একটু আগে আসতে হয় !

নূতন দলের ২। তা বাবা, একটু দয়া কর—নিদেন একটু আশা···

বেয়া। ও ! আপনারা আশা চাও···বড্ড নচ্ছার,... না ? তা আশা দিচ্ছি···পাবে, গো ট্যাকা সব পাবে···এই মাসকাবারে···

নূতন ৩। ও কথা শুনেচি বাপু···

বেয়া। ওঃ, এটা পুরোনো কথা ! তা কি করবো, বাবু ! আজ ক্রেমাগত নতুন কথা এত বলেচি যে নতুন আর বাকী নেই ! আর একদিন সকাল-সকাল এসো,··· বেশ মনের মত নতুন কথা শোনাবো'খন !···আমার এখন খিদে-তেষ্টার সময়, আর জ্বালিয়ো না।

নূতন ১। বাবা, আজ ছ'মাস হাঁটাহাঁটি করচি···এক জোড়া নতুন জুতোই হাঁটাহাঁটির চোটে ছিঁড়ে গেল !

বেয়া। তাই না কি ! তা এমন কাজও করে ! ধার-দেওয়া টাকা আদায় করতে তাগাদায় আসে মানুষ নতুন জুতো পায়ে দিয়ে !...সে তো ছিঁড়বেই। শুনুন, কথায় বলে, বড় নোকের বাড়ী নেমন্তন্ন যেতে আর টাকার তাগাদা করতে নতুন জুতো পায়ে দিয়ে কখনো বেরুবে না··· বেরুলেই পস্তাতে হবে !

নূতন ২। ভারী মজার লোক তো !···খালি বাজে গল্প···

বেয়া। আপনাদের দেখে একটা পুরোনো গল্প মনে পড়চে···

৫। থামো, তোমার গল্প শোনবার আমাদের সময় নেই···

বেয়া। আজ্ঞে, তা যদি বললেন তো ভালো কথাই বললেন। আমারো আর গল্প বলার ক্ষ্যামতা নেই—পেটের ক্ষিধে বড্ড জানান্ দিচ্ছে ! তোমাদের নাবার-খাবার টাইম না থাকতে পারে, আমার আছে।···এখন বেরোও দিকি··· মানুষের সহ্যি করবারো একটা সীমা আছে !...

সকলে। এসো হে, চলে এসো···আর তাগাদা নয়···

৫। একদিন পথে পাই তো গলায় গামছা দিয়ে ধরি...

৩। উঁহুহু—শেষে পুলিশ-কেশে পড়বো···

২। চলে এসো···একটা যা হয় কিছু করা যাবে !

১। বাবা, লেওনস্থ কালে মিষ্ট-মধু বাণী...আর দেওনস্থ কালে বড্ড টানাটানি !

(সকলের প্রস্থান)

বেয়া। আপদগুলো গেছে। বারোটাও বাজে ! এখন আর কোনো ভদ্দর নোক তাগাদায় আসবে না ! আজকের মত পালা শেষ হলো। যাই, এবার চ্যানের যোগাড় দেখি গে !···সদরে খিলটা দিয়ে যাই !

(প্রস্থান)

অধীরভাবে চঞ্চলার প্রবেশ ; পিছনে ফক্কারাম

ফক্কা। প্রিয়ে চঞ্চলে, আর রাগ করো না, ধরি অঞ্চলে !

চঞ্চ। সত্যি, ভালো লাগে না নিত্যি এই পাওনাদারের তাগাদা···

ফক্কা। তাই তো বলচি, তার ওপর তুমি যদি রাগে চঞ্চলা হও, তাহলে গরিব আমার যে দিন চলা ভার হয়ে ওঠে !

চঞ্চ। খালি কথা ! কথার ভটচায্যি !

ফক্কা। দোহাই তোমার, ভটচায্যি নই,···চক্করবর্ত্তী।

চঞ্চ। একটা কিছু উপায় কর—

ফক্কা। সেই চেষ্টাই তো করচি।

চঞ্চ। ছাই করচো !

ফক্কা। নয় ? ছাখো, প্রথম সুরু হলো হোটেল খোলা···

চঞ্চ। নিজে আর পাঁচটা বন্ধুতে মিলে তার হাড়-কাঁটা-গুলো অবধি চিবিয়ে খেলে !

ফক্কা। তা খদ্দের আসছিল না, খাবারগুলো পাছে নষ্ট হয়, কাজেই—

চঞ্চলা। কাজেই !—রাগ ধরে, হাসিও পায় !

ফক্কা। কি বলবো প্রেয়সী, চেঁচিয়ে তোড়ে হাসতে পারচি না—ব্যাটারা যদি এখনো কাছাকাছি থাকে ! আমি যে এখন বাড়ী নেই !

চঞ্চ। বাড়ী নেই কি রকম ?

ফক্কা। বেয়াক্কেলে এক-পাল পাওনাদারকে তাই বলে এইমাত্র তাড়ালে না !

চঞ্চ। সং !

ফক্কা। তারপর ধর,—নিখিল-মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ! জয়নগর থেকে মোয়া, কেষ্টনগর থেকে সরভাজা-সরপুরিয়া, বর্দ্ধমান থেকে সীতাভোগ মিহিদানা, নাটোর থেকে রাঘবসাই, মানকর থেকে খাজা, কাশী থেকে বালুশাই, মিহিজাম থেকে জিলিপী-বোঁদে—ওঃ, কি দোকানই ফাঁদলুম···

চঞ্চ। তা'ও তো ঐ নিজের আর বন্ধুদের পেটেই গেল !

ফক্কা। ঐ এক কারণ ! খদ্দেরের অভাব ! যত লোক সব ছোলাভাজার কাঙাল ! এক পয়সার ছোলা-মটর আর এক পয়সার এক পেয়ালা শুক্‌নো পাতা-সেদ্ধ চা—এই তো সব জলখাবার ! ও-সব মিষ্টান্নের দিকে নজর উঠবে কেন ?··· তার পর ঐ এক পয়সা দামের থিয়েটার বলে সাপ্তাহিক কাগজখানা বার করলুম—

চঞ্চ। তার ফলে রাতে বাড়ী ফেরা নেই ! মিনি পয়সায় থিয়েটার দেখা আর তাদের ধামা ধরায় তো ভারী লাভ ! ছাপাখানার বিল শুধলুম্ এতগুলি !

ফক্কা। বরাত ! লক্ষ্মীকে বাঁধবার জন্য কসরৎটা কি কম করেচি ! তিনি ধরাই দিতে চান্‌না, তা বাঁধবো কি !··· তা, এর মানেও বুঝেচি !

চঞ্চ। কি মানে, শুনি ?

ফক্কা। কথায় বলে, স্ত্রীভাগ্যে ধন ! অর্থাৎ স্ত্রীই লক্ষ্মী ! তা লক্ষ্মী তো চঞ্চলাই, তার উপর তুমিও নামে চঞ্চলা—কাজেই এই দুই চঞ্চলার মাঝে পড়ে আমি একদম্ স্থলদঞ্চলা হয়ে গেলুম। তাই ভাবচি, এবার এমন ব্যবসা ফাঁদবো···

চঞ্চ। ওগো, ব্যবসা ছাড়ো দিকি। বামুনের কপালে ব্যবসা ফলে না। তার চেয়ে একটা চাকরির চেষ্টা ছাখো···। সত্যি, নিত্যি এই পাওনাদারের কথা সয়ে আর থাকাও যায় না ! কোনো সুখ নেই !

ফক্কা। দুঃখটাই বা কি !···শুধু তো কথা···গায়ে ফোস্কাও পড়ে না, চোটও লাগে না। এক কাণ দিয়ে শোনো, আর-কাণ দিয়ে বার করে দাও—পয়সা-খরচ নেই ! ...তবে হ্যাঁ, রোজ রোজ ওদের সঙ্গে কাঁহাতক এক কথা কই, তাই আর কি নিজে গা ঢেকে থেকে বেয়াক্কেলেকে সামনে ধরে দি। তা, ও ব্যাটা খুব চালাক আছে...যা ভণিতে দিয়ে কথা কয় !...তার পর এ তাগাদাও এই বেলা বারোটা অবধি···বড় জোর সাড়ে বারোটা ! ঐ সময়টা

পর্দ্দানশীন হয়ে থাকা—তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে তারাও গিয়ে বিশ্রাম করে, আমারো তাই!

চঞ্চ। কিন্তু পেট চালাবার পয়সা ত চাই! এমনি নিত্যি হাত পেতে ধার করা…

ফক্কা। তাতেও সুবিধা বৈ অসুবিধা দেখিনে তো! হাত পেতে ঐ ধার করা—শুধতে ঘাড় কাৎ করতে হবে না…

চঞ্চ। কিন্তু নিত্যি ধার দেবে কে, বল তো…? চাল-ডাল, নুন-তেল এগুলোও তো চাই!

ফক্কা। হায় রে,—ধার দেবে কে?

ধরণী বিপুল প্রিয়ে, মূর্খ কত লোক…
মুখের চটুল বাণী,—স্তব আর স্তোক,
প্রচণ্ড সুদের মোহ,—গেঁজিয়াটি খুলি
অকাতরে দেবে অর্থ ধার বলে' তুলি!

তার পর চাল-ডাল নুন-তেল—এটা স্রেফ economics-এর কথা—এসো, বুঝিয়ে দি। এই সহর কলকাতা তার বিশাল দেহ নিয়ে পড়ে আছে, আর আমার মত পোড় খায়নি এমন বহু লোক নিত্যি কারবারের ফাঁদে রূপচাঁদ পাবার আশায় কত ব্যবসাই ফাঁদছে। কিন্তু পুরোনো যারা বাজারে আছে, তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে তো! কাজেই গোড়ায় তারা ধারে জিনিষ দেবার জাল পেতে খদ্দের ধরবার জোগাড় করে। তোমার জমাদার্ণীকে সে হদিশও বাৎলে দিছি। এমন সুখ আর কোথাও নেই! ঘী-ময়দা চাল-ডাল নুন-তেল যা চাই, নতুন দোকানে যাও, হাতচিঠি ফ্যালো আর আনো। তারা ভাবচে, খদ্দের পাকড়েচি, টপাটপ জিনিষ দেবে। খদ্দের ভাবচে, কি দাঁওই মারচি!…তার সঙ্গে কষে দিন-কতক কারবার চললো, তার পর যেমনি সে জোর তাগাদা সুরু করবে, বলবে, টাকা না পেলে জিনিষ দেবো না,—ব্যস্, চলে যাও আর-এক দোকানে হাতচিঠি নিয়ে…

চঞ্চ। যা বলেচো! তার পর চারদিকে সব নালিশ করে ছেঁকে ধরুক!

ফক্কা। ক্ষেপেচো প্রিয়ে,—কত লোকের নামে তারা নালিশ করবে! তুমি ভাবচো, তুমি একা এই হাতচিঠির খদ্দের! রামচন্দ্র! ঘর-ঘর, ঘর-ঘর! আর এ না করলে চলে কি করে, বল? নিত্যি বাজারের দর চড়ছে…মানুষ পারবে কি করে? কাজেই, এই শেয়ানে-শেয়ানে কোলাকুলি দোকানদারও বোঝে। বুঝে তারা ঐ নগদ খদ্দেরদের ওপর দিয়ে এই সব হাতচিঠির খদ্দেরের পাওনা পুরোপুরি আদায় করে নেয়। ফুর্ত্তি আমাদেরই…মরতে মরে ঐ আহাম্মক নগদ-খদ্দেরের দল!

চঞ্চ। তা এখন কি করবে, ঠাওরেচো?

ফক্কা। ভাবচি, এবার বই লিখবো। ঘর থেকে টাকা বার করা নয়…স্রেফ ফাঁকির মূলধন নিয়ে কারবার! এ ব্যবসাটাই এখন চলছে খুব। চারিদিকে নতুন নতুন পাবলিশার গজাচ্ছে। লোকে দেখি ভারী পণ্ডিত হয়ে উঠেচে! সবাই বই পড়চে, বই কিনচে খুব—

চঞ্চ। তুমি বই লিখবে কি গো?

ফক্কা। হ্যাঁ, আমিই বই লিখবো। কেন লিখবো না? আমাদের সেই পরীক্ষিৎ কর্ম্মকার,—জানো না…সেই যে পথে পথে ঘুরে বেড়াতো, 'তালা-চাবি সারানো' বলে হেঁকে ফিরতো, তা সে এখন সেই তারে-বাঁধা চাবির তাড়া ফেলে রাশ-রাশ বই লিখচে, আর কশাইটোলার সাহিত্য-সংহার-মন্দির রঙ-বেরঙের ছবি দিয়ে সেই সব বই ছেপে নগদ এক টাকা মূল্যে বিক্রী করচে!…ট্রামে চড়, রেলে যাও, দেখবে, ঐ কশাইটোলার লোক সেই বই নিয়ে ছেঁকে ধরবে।

চঞ্চ। সত্যি…?

ফক্কা। সত্যি না তো কি মিছে!…আমার সেই ছেলে-বেলার লেখা কবিতাগুলো নিয়ে বাজারেও একবার আমি ঘুরে এসেচি।…একজায়গায় এক মোটা বাবু চেয়ার ঠেসে বসে আছে—গুমোরে কথাই কইলে না,…তারপর গেলুম, আর এক দোরে…এক বেঁটে মটকু ছোকরা বসে আছে। সে হেসেই উড়িয়ে দিলে, বল্লে, রাবিশ ঘাঁটবার তাদের ফুরসৎ নেই। তার পর তেসরা দরজায়…তারা বললে, নামজাদা লিখিয়ে নইলে তারা বই ছাপে না কারো।… তখন শেষ গেলুম সেই কশাইটোলার সাহিত্য-সংহার-মন্দিরে। হ্যাঁ, ভদ্দর লোক, সিগারেট দিলে, পাণ খাওয়ালে…আর বললে, এ-সব ছেড়ে খুব বিদিকিচ্ছি গোছের একখানা অপিন্যাস লিখে দিন দিকি…

চঞ্চ। অপিন্যাস?

ফক্কা। ঐ আমরা যাকে উপন্যাস বলি, তাকেই তারা

বলে, অপিন্যাস!…সাহিত্য-সংহার-মন্দির যে…তারা বললে, অপিন্যাসটা আজকাল চলছে খুব।

শশব্যস্তে জমাদার্ণীর প্রবেশ

জমাদার্ণী। (বিষম অঙ্গভঙ্গী-সহকারে) নচ্ছার ব্যাটা, পাজী মিন্সে, হাড়হাবাতে, ড্যাকরা, হারামজাদা…

চঞ্চ। কি রে? কি হয়েচে?

জমাদার্ণী। বিট্‌লে, ইল্লৎ মিন্সে, অলপ্পেয়ে, পোড়ারমুখো…

ফক্কা। ব্যাপার কি রে জমাদার্ণী…?

জমাদার্ণী। থামো, আগে আমায় রাগ সামলাতে দাও। …লক্ষ্মীছাড়া, অনামুখো, হতচ্ছাড়া…মার কোল্ খালি কর্,—নিপাত যা, নিপাত যা…শ্যাল-শকুনে দুই চোখ তোর খুবলে থাক! হতচ্ছাড়া মিন্সে…তোর ভিটেয় ঘুঘু চরুক, ব্যবসায় ছারপোকা নাগুক্, প্যাঁচা চ্যাঁচাক, সর্ষের ক্ষেত বোন্ হতভাগা…

চঞ্চ। কি রে জমাদার্ণী…কি হয়েচে?

জমাদার্ণী। বলে কি না, সেদিনের নুনের দাম তিন পয়সা না পেলে ধারে জিনিষ দেবে না আর…

ফক্কা। কে রে? কার এ দুর্বুদ্ধি হলো?

জমাদার্ণী। কার আবার!…ঐ যে চিঁড়ের মত চ্যাপ্‌টা মুখখানা…ঐ যে কাটা ধানের গোড়ার মত খোঁচা গোঁফ…কি বাহারই মরি, মরি!…হ্যাথাপড়ার পাশ সেরে মুদির দোকান খুলেচে! নিপাত যা, নিপাত যা… তোর চালের বস্তায় উই ধরুক্, তোর চিনির থলে জলে গলে যাক্, উনুনমুখো মিন্সে… আমি হনু জমাদার্ণী…হাবু জমাদারের বোন্! আমায় চিনিস্ নে, বেরাল-চোখো মিন্সে…? [প্রস্থান

[ফক্কারাম ও চঞ্চলা কৌতুক-ভঙ্গী করিল। ফক্করাম তারপর কি ভাবিতে-ভাবিতে পরিক্রমণ করিতে লাগিল। হঠাৎ জানলা দিয়ে বাহিরে পথে চোখ পড়িতেই সে শিহরিয়া থামিল; পরে কম্পিত কলেবরে চঞ্চলার কাছে আসিয়া তার আঁচল চাপিয়া ধরিল।]

ফক্কা। প্রিয়ে চঞ্চলে…

চঞ্চ। কি হলো?

ফক্কা। একটা মোটা-সোটা ভব্যিযুক্ত লোক…এদিকেই আসচে। বোধ হয়, অনেক টাকা পাবে। পোষাক আর হোঁৎকা চেহারা দেখে তাই মনে হচ্ছে।…এদিক-পানে তাকাতে-তাকাতে আসচে। বেয়াক্কেলে তো চান্ করতে গেছে…তা একে হঠায় কে এখন?

চঞ্চ। তাই তো!…এ কি রকম মানুষ! বেলা বারোটার পরও তাগাদায় আসে! ভদ্দর লোক…?

ফক্কা। চেহারায় তাই মনে হচ্ছে বটে!…ব্যবহারে নয়। তা শোনো,…তোমার জমাদার্ণীকে একবার তোয়াজ করে পাঠাও।…আমার অসুখ, ভারী অসুখ…নাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে। ওরে বাবা, হি-হি-হি-হি…(কম্পিতভাবে গিয়া একটা লেপ টানিয়া মুড়ি দিয়া) আমি সরে পড়লুম, তুমি উপায় ছাখো…

[প্রস্থান

চঞ্চ। তাই তো, রোজ রোজ হরঘড়ি আর পারাও যায় না!…দেখি,…ওরে, ও জমাদার্ণী…

(নেপথ্যে জমাদার্ণী। কেন?…)

চঞ্চ। একবার শুনে যা ভাই, লক্ষ্মীটি, দিদিটি…

জমাদার্ণীর প্রবেশ

জমা। কেন? ডাকচো কেন?

চঞ্চ। একজন পাওনাদার আসচে।…তা বেয়াক্কেলে তো নাইতে গেছে,…তুই ওকে তাড়া…

জমা। কেন? আমি কেন তাড়াবো!…এ তো বেয়াক্কেলের কাজ।

চঞ্চ। ওরে, এ তার ক্ষ্যামতায় কুলোবে না…এ মোটা-সোটা বিদিকিচ্ছি মানুষ…তুই না হলে হবে না।

জমা। ও,—শক্ত নোক, সে পারবে না?…তা আচ্ছা, আমি দেখচি…আমার নাম বলে,…জমাদার্ণী, হাবু জমাদারের বোন্…আমার হাঁকে বলে, হ্যাঁ… [প্রস্থান

চঞ্চ। …দেখি, এখন কি করে তাড়ায়!…(নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) কি গো তুমি শুয়েচো…? হি-হি-হি-হি-হি… বড় অসুখ, উহুহু! (হাস্য) না?

[নেপথ্যে জমাদার্ণীর আর্ত্তনাদ; ও পরমুহূর্ত্তে নেপথ্যের দিকে সক্রোধ দৃষ্টিতে চাহিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তে উত্তেজিতভাবে স্থূল বপু লইয়া রক্তবীজের প্রবেশ। তার হাতে লাল ফিতায় বাঁধা নানা কাগজ; পিছনে উড়িয়া বয়ের হাতে ব্রীফ-ব্যাগ, জলের কুঁজা গ্লাস প্রভৃতি]

নেপথ্যে জমাদার্ণী। নিকালো মিন্সে…

রক্তবীজ। চোপরাও মাগী…(রক্তবীজকে দেখিয়া চঞ্চলা

দ্রুত পদক্ষেপে পলায়নোদ্যত ; রক্তবীজ ফিরিয়া দেখিবামাত্র সাশ্চর্য্যে কহিল) —কে···? খেঁদি !

চঞ্চলা। (থমকিয়া ফিরিল ; পরে বিস্ময়ে হাসিয়া) পিসেমশায়···

রক্তবীজ। তুই···এখেনে···?

চঞ্চ। এই তো আমার বাড়ী।

রক্ত। তাহলে ফক্কারাম চক্রবর্ত্তী···?

চঞ্চ। আমার স্বামী।

রক্ত। বটে,—তা বেশ, বেশ !

জমাদার্ণীর প্রবেশ

জমা। তবে রে মিন্সে !···আমি বন্নু, বাবুর ভারী ব্যামো, বুঝি মরে !···আর তুই আমায় চুঁস্‌নি মেরে ফেলে দিয়ে ঘরে ঢুকলি !···(আক্রমণোদ্যত)

রক্ত। চোপরাও, চোপরাও...(ঘুষি বাগাইতে লাগিল)

চঞ্চ। করিস্ কি জমাদার্ণী···ন্যাকা মাগী ! (তাকে ধরিল) এ যে পিসেমশায় রে···

জমা। কে···পিসেমশায় ?

চঞ্চ। ঘটী দিদির বাপ···

জমা।···ও···আমার জালা পিসিমার পিসেমশায় !

চঞ্চ। আঃ, কি যে বলিস্ !

জমা। বুঝেচি, বুঝেচি, আর বলবো না।···তা পিসেমশায়, কিছু মনে করোনা গো, চিন্‌তে পারিনি। যে দুশ্‌মন্ চেহারা করেচো বাপু !···তা গড় করি গো···(প্রণাম ও প্রস্থান)

রক্ত। একখানা চেয়ার আনিয়ে দে রে—মোটা মানুষ ! দাঁড়িয়ে থাক্‌লে হাঁফ ধরে। (চেয়ার আনাইয়া দিলে বসিল) ফক্কারামের ভারী অসুখ···?

চঞ্চ। (কাঁচুমাচু ভাবে) বড্ড। দিন কাটে তো রাত কাটে না পিসেমশায়,···রাত্ কাটে তো দিন কাটে না।

রক্ত। ···তাইতো, তাহলে তার সঙ্গে আর দেখা করবো না। আমার আবার তাড়া আছে। (ঘড়ি দেখিয়া) বেলা দুটোয় আসবে কিরমিলাল, স'দুটোয় মশারাম, আর ঠিক আড়াইটেয় আস্‌বে দালাল ব্লডহাউণ্ড সাহেব।...তা, আমি যে একটা টাকার ব্যাপারে এসেছিলুম রে খেঁদি···

চঞ্চ। (দুঃখিত ভাব দেখাইয়া) ওঁর বড় অসুখ, পিসেমশায়,···বড় অসুখ ! কি যে হবে ! (দীর্ঘশ্বাস)

রক্ত। হুঁ।···তা কে দেখচে ?

চঞ্চ। ...অমন যে বিশ্বরাজ ডাক্তার, তা সে'ও কিছু করতে পারলে না, ফেলে রেখে গেল। এখন দেখচে ঐ নিমতলার কৃতান্ত কবিরাজ।

রক্ত। তা, কৃতান্ত কবিরাজের হাতযশ আছে।··· নিমতলাটা তারি জোরে জাঁকিয়ে আছে।...তা, তোকেই তবে বলি, মন দিয়ে শোন্। টাকার ব্যাপার কি না··· জরুরি ব্যাপার, নিজেই তাই এলুম।···তা ভালোই হলো··· তোকে দেখতে পেলুম।...

চঞ্চ। (প্রসন্নভাবে চারিধারে চাহিল)

রক্ত। (কাগজের বাণ্ডিল খুলিতে খুলিতে) ঘুঘুরাম চক্রবর্ত্তীর নাম শুনেচিস্ ?···শুনিস্ নি···? আমার এক মক্কেল, ভারী-ঈ মক্কেল, মস্ত পয়সাওলা মক্কেল !

[চঞ্চলা অবাক হইয়া রক্তবীজের পানে চাহিল ; অদূরে দ্বারপ্রান্তে অন্তরালে লেপ মুড়ি দিয়া ফক্কারাম উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। চঞ্চলা তার পানে চাহিয়া একটা বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল]

রক্ত।···তা সে আবার তোর এই ফক্কারামের কি-রকম সম্পর্কে দাদামশায় হতো। অর্থাৎ ফক্কারামের মাতামোর পিসতুতো সম্বন্ধীর ভায়রাভাই···

চঞ্চ। (কৌতূহলীভাবে মাথা নাড়িতে লাগিল) তাহলে খুব নিকট-সম্পর্ক, বল পিসেমশায় !

রক্ত। হ্যাঁ,—তা সে তো এখানে নানান্ জ্বালায় জ্বলে একদিন দুত্তোর বলে চলে গেল, একেবারে সেই কাবুল···

চঞ্চ। কা—বু—ল ! ওরে বাবা···

ফক্কা। (বিস্ফারিত চক্ষে বিস্ময়ের ভঙ্গী প্রকাশ করিল)

রক্ত।...সেখানে গিয়ে সে অমন মস্ত একটা পাহাড়ই ইজারা নিয়ে ফেল্‌লে। তারপর সেই পাহাড় কেটে দিব্যি মাখমের মত নরম জমি বার করে তাতে সব বীচি ছড়িয়ে দিলে,···কিসের, জানিস্···? ইয়া-ইয়া বাদাম-পেস্তা-আখ-রোটের,···ইয়া-ইয়া আপেল, নাশপাতি, আঙুর, খেজুর, আর চীনের বাদাম !···তাতে ফসল যা ফল্‌লো, ওঃ, সারা কাবুল তা দেখে একেবারে চুল্‌বুল্ করে উঠলো !...আর সেই ফসল দেশ-বিদেশে সে চালান্ দিতে লাগলো। এই করে পাঁচ বছরে সে কত টাকা কর্‌লে, জানিস্···? (কাগজ

দেখিয়া) চার কোটী বিয়াল্লিশ লক্ষ সাতান্নো হাজার ন'শো বাইশ !

চঞ্চ। ওরে বাবাঃ !

(ফক্কারাম বিস্ময়ে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিল ; চঞ্চলা তার পানে কটমট্ করিয়া চাহিল)

চঞ্চ।···তাই বুঝি পিসেমশায়, এঁদেরও ঐ ব্যবসার দিকে এত ঝোঁক ! ইনিও তো সেই সেদিন তেঁতুলবীচি কেনবার মতলব করছিলেন।

রক্ত। তাই না কি ?

চঞ্চ। তা না তো কি ! আর সেই তেঁতুলবীচির জন্যে পোস্তায় ঘুরে ঘুরেই না এই বিদিকিচ্ছি ব্যামো···

রক্ত। বটে ! তা ভালো !···বুঝলি, ব্যবসাতেই লক্ষ্মী ! তারপর যা বল্‌ছিলুম···তা ঘুঘুরাম বেচারী অল্পভোগী···ভোগ করতে পেলে না !···

চঞ্চ। কেন ?

রক্ত। আর কেন !···যত ব্যাটা গোঁয়ার কাবুলী-পেশোয়ারীর চোখ টাটালো ! তারা মামলা করে তার সে মাখমের জমিটুকু ছিনিয়ে নিলে ! সতেরো বচ্ছর সেখানে সতেজে মামলা চালিয়ে হেরে দেশে আসবে বলে ঘুঘুরাম কড়ি গুণে দেখে, ঠিক একলাখ চারশো তিপ্পান্ন টাকা সাড়ে বারো আনা বাকী পুজি।···তা, চারশো তিপ্পান্ন টাকা সাড়ে বারো আনা পথের খরচ বলে আলাদা ব্যাগে রেখে লাখ টাকাটা গেঁজেয় ভরে সে তো দেশে ফিরছিল···

চঞ্চ। তারপর···?

রক্ত। (ঘড়ি দেখিয়া) তাড়াতাড়ি সারতে হবে রে খেঁদি।...বেচারী এলো লাহোর অবধি···এসে এক চটিতে উঠলো—সেখেনে হলো তার অসুখ !···তাড়াতাড়ি লাখ টাকাটা ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে সে তো এক উইল করলে। উইলটি করা, আর হার্টটি ফেল্ করে মরা !···এই সে উইল···

চঞ্চ। তা এ উইল···আমি···তা···

[বেয়ারার প্রবেশ ; সে একধারে দাঁড়াইয়া রহিল]

রক্ত। আরে এই সে উইল—খেঁদি। এই ছাখ্,—বাঙলায় লেখা···(উইল পাঠ)···কস্য উইলপত্র কার্য্যঞ্চাগে আমি শ্রীঘুঘুরাম চক্রবর্ত্তী, পিতার নাম ৺গ্যাঁড়ারাম চক্রবর্ত্তী··· এ সব বাঁধি গৎ···তা (কাগজে হাত বুলাইতে বুলাইতে) — এ'ও ঐ বাঁধি গৎ, এ'ও বাঁধি, বাঁধি, বাঁধি, বাঁধি···আসল কথা—এই যে···(পাঠ) আমার অবর্ত্তমানে এই লাখ টাকা আমার জ্ঞাতিভ্রাতা বকাসুর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা কান্যকুব্জা দেবীর পুত্র আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ ফক্কারাম চক্রবর্ত্তীকে···(ফক্কারাম "এ্যাঃ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল)···কে ?

চঞ্চ। (অপ্রতিভ হইল ; ফক্কারামের পানে ভৎর্সনাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল) ও কলতলায় কে চ্যাঁচালে !

রক্ত। তাই ভালো।···আমি চম্‌কে উঠেছিলুম। তার পর শোন্ (উইল দেখিয়া) এই যে,—ফক্কারাম চক্রবর্ত্তীকে তার জীবিত-কাল অবধি এই মর্ম্মে দিলাম যে আসল টাকার উপর তার কোন অধিকার থাকিবে না, এই টাকার সুদমাত্র সে যথেচ্ছা ভোগ করিবে। তাহার অবর্ত্তমানে এবং শুধু অবর্ত্তমানে মাত্র এই লাখটাকার নির্ব্যূঢ় সত্ত্বে ষোল আনার মালিক হইবে, উক্ত ৺বকাসুর চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠা কন্যা বঙ্গ-সুন্দরীর পুত্র শ্রীমান্ লক্ষাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। (উইল রাখিয়া) অর্থাৎ বুঝলি—ফক্কারাম যতদিন বেঁচে থাক্‌বে, ঐ লাখ টাকার সুদ সে পাবে, আর যে-ভাবে খুশী, সেই সুদ সে খরচ করবে ! আর সে বেঁচে থাক্‌তে এ লাখ টাকায় বা তার এক পাই সুদে লক্ষাচন্দ্রর কোনো অধিকার থাকবে না। তবে ফক্কারাম মারা গেলে ঐ লাখ টাকাটা পুরোপুরিই পাবে লক্ষাচন্দ্র।···তা ফক্কার যে-রকম অসুখ···এখানে দেরী করে কাজও হবে না কিছু। লক্ষাচন্দ্রর খোঁজ করা দরকার— আমার প্রোফেসন্ তাই বলে। শুনচি নাকি, আসামের ওদিকে চেরাপঞ্জিতে লক্ষাচন্দর কমলানেবুর ক্ষেত করেছিল, তার পর নাকি আসামী মেয়ে বিয়েও করেছিল। দু'জনে বন্‌তো না। একদিন ঝগড়ার মুখে সেই স্ত্রী লক্ষাচন্দরের মাথায় কষে লাঠি মারে, তাতেই সে মরে গেছে।···তবু খোঁজটা একবার নেওয়া দরকার। কাগজে-কাগজে নোটীশ ছাপিয়ে···(ফক্কারাম রক্তবীজের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল ; রক্তবীজ দেখিল, দেখিয়া চমকিয়া উঠিল)···এ কি ! এ···?

ফক্কা। আজ্ঞে আমিই···

রক্ত। তুমিই···?

ফক্কা। ফক্কারাম চক্রবর্ত্তী।

রক্ত। তবে যে শুনলুম, তোমার খুব অসুখ, নাড়ী ছাড়ে-ছাড়ে···

ফক্কা। আজ্ঞে হ্যাঁ, ছাড়ছিল বটে, তবে সম্প্রতি নাড়ী

আবার ঠিক এঁটে গেছে...(লেপ ফেলিয়া দিল) বলেন কি, মশায়, আঁটবে না ? ওঃ, লাখ টাকা...ওরে রাস্‌রে ..

রক্ত। কিন্তু লাখ টাকা তো তোমার নয়, বাপু...তুমি তো পাবে শুধু সুদ...

ফক্কা। তাই কি কম না কি! দেয় কে, মশায় ?... ওরে বাবা, লাখ টাকার সুদ!

রক্ত। (ঘড়ি দেখিয়া) তাহলে আসি। আর এক সময় আসবো রে খেঁদি—professional man...ভারী busy. (প্রস্থান)

ফক্কা। প্রিয়ে...

চঞ্চ। নাথ...

বেয়া। বাবু ..

ফক্কা। চোপ্ ব্যাটা—যাঃ, ফাজিল কোথাকার! (বেয়াক্কেলের প্রস্থান) প্রিয়ে...

চঞ্চ। ওরে বাবা, লাখ টাকা...

ফক্কা। ভাবো একবার...ডার্বিতে নয়, উইলে...

চঞ্চ। দেনাগুলো এইবার শুধে দাও...আপদের শান্তি হোক্!

ফক্কা। ক্ষেপেচো! দেনা শুধবো কি!

চঞ্চ। কেন...?

ফক্কা। রাম বল! দেনা কি মানুষ করে শোধবার জন্যে না কি ?

চঞ্চ। এ্যাঁ...!

ফক্কা। তাই। ওটা ভাবচি, উইল করে যাবো। কোথায় কে ওয়ারীশন বসে আছে, কত আশা করে! তা কিছুই পাবে না ? এই দেনাগুলি উইল করে তাকেই দিয়ে যাবো। বেচারী তবু নেড়ে-চেড়ে খাবে, আর দু'বেলা নাম করবে!...

চঞ্চ। হ্যাঁ গা, তা এই লাখ টাকার সুদ—এ কবে পাবে ?

ফক্কা। যেদিনই পাই...লাখ টাকা, বাবা, লাখ টাকা! ওঃ...

গান

লাখ টাকা, বাবা, লাখ টাকা!
চঞ্চ। দায় হলো যে গো ভার তারি আর সয়ে থাকা!
কতগুলি...? ও সে কতগুলি...? ওগো কতগুলি ?

ফক্কা। চুপ, ওরে চুপ, চুপ চুপ চুপ। বাক্স, ব্যাগ, কি ভরি থলি ?

চঞ্চ। যদি চুরি যায়...! যদি উড়ে যায়! খুব সাবধানে চাই রাখা।

ফক্কা। পথ জুড়ে আছে হতভাগা পাজী যত ব্যাটা ছোটলোক—
পাওনাদারের মস্ত হস্ত, অতীব ক্ষুদ্র চোখ!

চঞ্চ। বলে, শুধে দাও...টাকা শুধে দাও!

ফক্কা। ...ইস্, তাই নাকি! নই আমি হ্যাকা!

ফক্কা। (মহাহর্ষে) লাখ টাকা, বাবা, লাখ টাকা, বাবা, লাখ টাকা!...(পরিক্রমণ)

চঞ্চ। (হঠাৎ চিন্তায় মলিন হইল) ওগো...

ফক্কা। (অধীরভাবে) লাখ টাকা, লাখ টাকা, লাখ টাকা...

চঞ্চ। আঃ, কি ছেলেমানুষের মত নাচছো গা?... শুনচো...?

ফক্কা। কি...?

চঞ্চ। তুমি লাফাচ্ছো কি মিছিমিছি! লাখ তো লক্কার, তোমার মাসতুতো ভাইয়ের—তোমার তো শুধু সুদ!...মাছ তার, কাঁটাখানা শুধু তোমার...

ফক্কা। এ্যাঁ!...তাই নাকি? লক্কা লাখ, আর ফক্কা...ফাঁক!

চঞ্চ। হ্যাঁ। ওগো, লক্কাই যে...

ফক্কা। ...শা...লা...

চঞ্চ। তুমি কি পাগল হলে! কাকে কি বলচো?... সে যে তোমার ভাই...

ফক্কা। কভি নেহি।...সে শালা...

চঞ্চ। আহা, তুমি যদি লক্কা হতে গো...

ফক্কা। লক্কা আবার কে! আমিই লক্কা, আমিই ফক্কা...

চঞ্চ। আহা, তা যদি হতো গো...

ফক্কা। সে তো মরে গেছে আসামের জঙ্গলে...

চঞ্চ। ওগো, ঠিক, ঠিক, ঠিক...

ফক্কা। কি ঠিক ?

চঞ্চ। এ লাখ টাকা তুমিই পাবে, যদি এক কাজ কর...

ফক্কা। কি কাজ ?

চঞ্চ। তুমি মর...

ফক্কা। (চমকিয়া) মরবো কি রকম ?...মরবো কি! মরে আবার টাকা পাবো—বাঃ!

চঞ্চ। হ্যাঁ গো, মরেই টাকা পাবে। তুমি মর...মর গো মর তোমার পায়ে পড়ি, তুমি মর...

ফক্কা। বাঃ, তুমি তো খাসা স্ত্রী! আমি মরবো! বাঃ! জলজ্যান্ত বেঁচে আছি, অমনি মরবো...ব্যামো না, কিছু না...বাঃ!

চঞ্চ। হ্যাঁগো হ্যাঁ, তোমায় মরতেই হবে! মরা ছাড়া কোন উপায়ও তোমার দেখচি না!...ওঃ, আমার মাথায় মতলব যা এসেচে! তুমি মরবে, কি রকম জাঁকিয়ে আমি শ্রাদ্ধ করবো, কেত্তন দেবো, কত লোক যে খাওয়াবো—আঃ! তুমি মরগো, মর...লক্ষ্মীটি!

ফক্কা। (শিহরিয়া স্তম্ভিত হইল) এই তোমার ভালোবাসা, প্রেয়সী!...আমি মরবো, আর তুমি? ওঃ, বুঝেচি, লক্কাচন্দ্র আর লাখ টাকা...

চঞ্চ। ওগো, তা কেন! আমি সে মরা মরতে বলচি না,—যাতে দাঁত-মুখ সিঁটকে মড়া হয়ে লোকের কাঁধে চড়ে পুড়তে যেতে হয়, 'হরিবোল' বোলে—সে মরা নয় গো, সে মরা নয়...

ফক্কা। তবে আবার কি রকম মরা...?

চঞ্চ। ওগো লোকের চোখে ধূলো দিয়ে মরা। আহা, বুঝচো না ?

ফক্কা। না!

চঞ্চ। অর্থাৎ এই,...এই...তুমি মরবে...

ফক্কা। হ্যাঁ। আর তুমি...?

চঞ্চ। আমি? আমি খুব কাঁদবো, তারপর কাঁদতে কাঁদতে তোমার শ্রাদ্ধর জোগাড় করবো, তারপর মাছ খাবো না, একাদশী করবো...

ফক্কা। উঃ, থামো, থামো। অমন করে বলোনা প্রিয়ে...আমি যে আঁৎকে উঠচি। এক একবার মনেও হচ্ছে, বুঝি, মরে গেছি! আমার দম্ বন্ধ হয়ে আসছে যেন!

চঞ্চ। উঃ, কত লোক খাবে, কেত্তন যা দেবো...আমি যেন চোখে দেখতে পাচ্ছি...

ফক্কা। আর আমি ?

চঞ্চ।...তারপর শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকলে, পনেরো-কুড়ি দিন পরে তুমি বাড়ী আসবে লক্কাচন্দর হয়ে। এসে লাখ টাকার মালিক হবে পুরোপুরি রকমে। তোমার পাওনাদারের দলও সঙ্গে সঙ্গে ফর্সা...কেমন হবে, বল দিকি ?

ফক্কা। বুঝেচি, বুঝেচি। বাঃ, খাসা মতলব বার করেচো, প্রিয়ে! অর্থাৎ আমি যেন মরেচি, লোকে জানবে। আমি গা-ঢাকা হয়ে থাকবো। তারপর সব চুকলে লক্কা সেজে আসবো। বাঃ, বাঃ—চমৎকার মতলব ঠিক করেচো।... কিন্তু তুমি...?

চঞ্চ। আমার জন্যে ভেবো না...

ফক্কা। ভাববো না কি রকম?...তুমি হবে বিধবা ভাজ, আর আমি মাসতুতো ভাশুর,...তাহলে কি আমাদের মধ্যে ফারখৎ হয়ে যাবে ?

চঞ্চ। হ্যাকা! তা কেন? আমি অবীরা, শোকে অধীরা, নয়ন-জলে সসেমিরা...তুমি হালের মতে বিধবা-বিবাহ করবে আমায়। লাখ টাকার জোর থাকলে সব চলে যাবে স্বচ্ছন্দে...কিছু ভেবো না।

ফক্কা। ঠিক বলেচো! সাবাস্! বরাত তাহলে এবার খুললো, দেখচি। চঞ্চলা, মন-চলা, প্রাণ-টলা প্রেয়সী আমার...কি বুদ্ধি তোমার!...তা, এখন মরা যায় কি করে বল দিকি? (পরিক্রমণ)

চঞ্চ। কেন...বিষ খেয়ে...

ফক্কা। ওরে বাবা...যদি সত্যি মরে যাই!...তা ছাড়া তাতে পোষ্ট-মর্টেম না হলে মরা তো সাব্যস্তই হবে না!

চঞ্চ। মোটর গাড়ী চাপা...

ফক্কা। উঁহু! হাত-পা ভাংবে, চেহারার দফা গয়া হয়ে যাবে একেবারে! তার ওপর মোটরের ঘা খেয়েও যদি-বা প্রাণটা বেঁচে থাকে, তা ঐ পুলিশ কোর্টে সাক্ষী আর জেরার গুতোয় মোচ্‌কে বেরিয়ে যাবে।

চঞ্চ। তাহলে জলে ডুবে...

ফক্কা। ওরে বাবা, পেট ফুলে জয়ঢাক হয়ে উঠবে, দম্ বন্ধ হয়ে যাবে—হাঁপিয়েই মারা যাবো।

চঞ্চ। এ নয়, ও নয়, তবে মরবে কিসে ?

ফক্কা। তাইতো! এ যে দিশেহারা হয়ে উঠচি।...তা, বিছানায় শুয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে দিব্যি নাক ডাকাতে ডাকাতে মলে হয় না ?

চঞ্চ। না। তুমি ক্ষেপেচো! বিছানায় শুয়ে মলে পাঁচটা পাড়ার লোক জুটে খাটে করে তুলে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে তবে ছাড়বে!

ফক্কা। ওরে বাবা, তাহলেই তো গেছি।...কি করা

য়ায় তবে? কি করে মরি...? আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?

চঞ্চ। কি···?

ফক্কা। এই রেলে চড়ে পশ্চিমে যাচ্ছি বলে বেরুবো—বেয়াক্কেলে সঙ্গে যাবে। তার পর একটা ষ্টেশনে নেমে জামা-কাপড় ছেড়ে দেবো—বেয়াক্কেলে নিয়ে এসে বলবে যে বাবু রেলে কাটা পড়ে মরে গেছে!

চঞ্চ। কি যে বল! এ মরার ব্যাপারে আর কেউ সাক্ষী থাকবে না, অর্থাৎ কেউ ভেতরের আসল কথাটা জানবে না। শুধু তুমি আর আমি! ব্যস্!···এ কি পাঁচ কাণ করে! বলে, বেয়াক্কেলে! শেষ আজীবন তাকে ঘুষ দিয়ে মরি—পাছে সে ফাঁস করে!

ফক্কা। ওঃ—ঠিক বলেচো! কি বুদ্ধি তোমার, প্রেয়সী! শুধু তোমার বুদ্ধিতেই টেঁকে আছি। না হলে এত দেনা করে এমন আয়েসে থাকতে পারতুম!···এক এক সময় ভাবি, চারিদিকে এত দেনা এর মধ্যে করে তুললুম কি করে! আশ্চয্যি হয়ে যাই!

চঞ্চ। বুদ্ধি হবে না? আমি যে উকিলের মেয়ে! পাবনার মাঠে তেঁতুলবিচি-পোঁতা কি কাবুলের পাহাড়ে মেওয়া-চাষের বংশ নয় তো!

ফক্কা। যাক—তাহলে মরি কি করে, এখন তাই বল! ওরে বাবা, লাখ টাকা, লাখ টাকা···ও যে পুরোপুরি চাই আমার!...এ্যাঁ···

চঞ্চ। ছাখো, আমি ঠাওরেচি···ঐ জলে ডোবাই ঠিক! ওতে লাস না পেলেও চলে—ভাববে, লাস ভেসে গেছে!···কালই চল, দু'জনে গঙ্গায় নাইতে যাচ্ছি বলে বেরুই। তারপর আমি হাউ-হাউ করে কেঁদে ফিরবো, ফিরে বলবো, ঐ যেমনি তুমি ডুবটি দেছ, অমনি কোথায় যে তলিয়ে গেলে—কাঁদবো আর মুর্চ্ছা যাবো···সেরা প্রমাণ হয়ে যাবে।

ফক্কা। আর আমি...? থাকবো কোথায়? খাবো কি?

চঞ্চ। দিনের বেলাটা ঘুরে গা ঢেকে থাকবে কোন-মতে। তারপর রাত্রে সব নিশুতি হলে এসে দোরে তিনটি টোকা মারবে। আমি গিয়ে দোর খুলে দেবো। তুমি এসে উঠবে একেবারে ছাদের কোণে ঐ চিলের ঘরে! সে সব বন্দোবস্ত করে রাখবো'খন।···সব পারে, প্রিয়ার অধর-সুধাটুকুও বাদ যাবে না!···এমন মরণ মরেচে কেউ! খাওয়া-দাওয়ারো কোন কষ্ট হবে না। সব আমি চালিয়ে যাবো। তবে হ্যাঁ, খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে। কোনো দিকে উঁকিটি পাড়বে না···বুঝলে!

ফক্কা। বুঝেচি, বুঝেচি, খুব বুঝেচি!···কি আর বলবো প্রিয়ে,···এ যে মেরে আমায় বাঁচালে তুমি! তোমার গুণে সত্যিই আমার মরতে সাধ হচ্ছে।

চঞ্চ। এখন এসো দিকি—আরো ঢের কথা আছে। আগে খাওয়া-দাওয়া সারো···

ফক্কা। চল, চল···

[উভয়ের প্রস্থান

বিষ্কম্ভক

গান

এ পথে, ঐ পথে গো,
চলেছি নিয়ে জাল এ···
যদি ঐ লাখ টাকাটা
মিলে যায় এই কপালে!
চেয়ে থাকি রাত্রি-দিবা—
লাখ টাকাটা পাই-যদি-বা!
ছুটে যাই চাঁদের পানে,
যদি পাই হাত বাড়ালে!
চুরি হোক্, জুয়োচুরি হোক্
কিছুতেই ভয় করি না!
ধরি মাছ ডাঙায় থেকে···
গায়ে জল, তা'ও ডরি না!
যত সব বোকা গাধা
টাকা পায় গাদা-গাদা...
চোখে সব লাগিয়ে ধাঁধা,···
পাই যদি সে এ ফাঁকতালে!

পাওনাদারগণের প্রবেশ

১। তাইতো, মরে ফাঁকি দিয়ে গেল!

২। এখন কি ধরে নেবে?

৩। কেন, ঐ লাখ টাকা···

২। সে তো লক্কার—ও তো শুধু সুদটকু পেয়েছিল···

৩। এই বাড়ীখানা! সবাই মিলে ডিক্রী নিয়ে ক্রোক দি যদি?

১। হুঃ! বাড়ী তো ওর পরিবারের নামে। না হলে আর ভাবনা কি ছিল!

৪। আমাদের বরাতেই গেল! নাহলে দু'দিন বেঁচে টাকাটা পেলে হয়তো কিছু আদায় হতো!

৫। আশ্চয্যি মরণ! গঙ্গায় নাইতে গেল, অমনি টুপ্ করে ডুবে তলিয়ে গেল!

৩। ঠিক যখন ঐ কোন্ মাতামোর উইলে টাকাটি পেলে।

২। মোদ্দা, কথায় যে বলে, ধারে কাটে···তা এ ঐ ধার করেই জীবনটা কাটিয়ে গেল, বেশ!

বেয়াক্কেলের প্রবেশ

বেয়া। কি গো বাবুরা? এখনো জবাব চাই? এখন জবাব পেতে হলে অন্য জায়গায় যেতে হবে।···দেখুন··· রাজী আছেন? (সকলে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিল) তা তো নন্···? তবে আর এখানে ঝামেলা করেন কেন?··· তাগাদার চোটে জলজ্যান্ত মানুষটাকে মারলেন···আপনাদের ক্ষ্যামতা বটে, খুব! তা, এখন মশায়রা বাড়ী যাও···

১। এসো হে, চলে এসো···

২। যাবো না তো আর দাঁড়িয়ে থাকবো কি আশায়?···তবে বিপদের কথা শুনলুম,···তাই এসেছিলুম আর কি!

৩। তা হ্যাঁ হে বাপু, একটা সত্যি কথা বলবে?

বেয়া। আজ্ঞে, সত্যি কথাই আমি কই চিরদিন, তবে আপনাদের কেমন বেয়াড়া কাণ—তা মিথ্যে হয়ে বাজে!

৩। তবে যে তুমি বলছিলে, বাবু তেঁতুল-বিচির বস্তা নিয়ে পাবনায় গেছেন চাষ করতে···

বেয়া। আজ্ঞে, আর তেঁতুলবিচি নিয়ে মিছিমিছি কিচিমিচি করেন কেন! যিনি চাষ করতেন, তিনি তো··· লাস হয়ে ভেসে গেছেন!

৪। হ্যাঁ হে, এ গঙ্গায় ডোবাটা ঠিক তো? না, চুনারে যাওয়ার মত···?

বেয়া। আজ্ঞে, বিশ্বেস না হয়, গঙ্গায় গিয়ে দেখতে পারো···

৫। সত্যিই তিনি মারা গেছেন?

বেয়া। আরে মশায়, তাঁর বাঁচবার জো কি আর আপনারা রেখেছিলে!···যে রকম কড়া তাগাদা, এতে গঙ্গায় কি, মানুষ যে নর্দ্দামায় ডুবে মারা যায়!···এখন, যাও বাবুরা···

[সকলের প্রস্থান

[চঞ্চলা ও আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত ফক্কারামের প্রবেশ; চঞ্চলার বাম মণিবন্ধে রুমাল বাঁধা]

ফক্কা। মশার কামড় সয়ে চিলকোঠায় আর তো পড়ে থাকতে পারি না, প্রিয়ে···

চঞ্চ। আমাকেও কত সাবধানে সব দিক বজায় রেখে চলতে হচ্ছে, জানো? ওপরে চিলকোঠায় যাই, জমাদার্ণী কেবলি মানা করে,—ওগো সোঁদা বিধবা তুমি, একা যেয়ো না।···তা আমি বলি, ওরে, আমায় নিশ্চিন্তি হয়ে তোরা একটু কাঁদতে দে···আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েচে, তা তোরা কি বুঝবি!

ফক্কা। তোমার হাতে ও হলো কি? পটি বেঁধেচো যে!

চঞ্চ। কি আবার হবে! নোয়াগাছটা ওরা দেখবে যে, তাই। জমাদার্ণী জিজ্ঞাসা করছিল, কি হলো? আমি বললুম, টিন থেকে ঘী বার করতে কেটে গেছে!

ফক্কা। তা, এবার লক্কা হয়ে বেরুলেই তো হয়।··· শ্রাদ্ধট্রাদ্ধ চুকে গেল—মরা তো প্রমাণ হয়ে গেছে দস্তুরমত!

চঞ্চ। তাই করতে হবে। বেশ,···তাহলে আজই ঠিক করে ফেলা যাক।···সত্যি, আমিও ঠিক সামঞ্জস্য রেখে চলতে পারচি না।···কাল ভুলে জমাদার্ণীকে বললুম কি, জানো? বললুম, ওরে বাজার থেকে একটা ভেট্‌কি মাছ আর দুটো ডিম আনিস তো!···সে তো হাঁ করে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো আমার পানে চেয়ে।···আমি তাড়াতাড়ি জিভ্ কেটে বললুম, এ দশা যে হয়েচে আমার, তা মনেও থাকে না রে! বলে দু' চোখ রগড়ে জল বার করলুম। জমাদার্ণী ডুকরে উঠলো, তুমি মাছ খেতে পাবে না, এ'ও আমায় দেখতে হলো! আমি বললুম, চুপ, চুপ! হিঁদুর ঘরের বিধবা আমি···আমার সামনে মাছের নামও করিস্ নে—জাত যাবে।

ফক্কা। ওরে বাস্‌রে—তুমি মাছ খাচ্ছ না, তাহলে?

চঞ্চ। কি করে খাবো, নাথ? আমি যে হিঁদুর ঘরের বিধবা! মাছ খেলে কি চলে!···তোমার খাবারটা যে কি করে জোগাড় করি!···ওদের বলি, বিধবা হয়ে আমার

এত খিদে বাড়্‌লো কি করে রে জমাদার্ণী···দুটী লোকের খোরাক না হলে চলে না! তাই নিয়ে বসে ওদের বলি, তোরা দোতলা থেকে যা···তোরা শুদ্দুর, আমি বামুনের বিধবা···আমার খাবার সময় দোতলায় আসিস্ নে! ছোঁয়া-দোষ লাগবে শেষে!···তারপর টিফিন-বাক্সে তোমার খাবার ভরে এককোণে রাখি, রেখে নিজে খেয়ে নি। ওরা খেতে বসলে তখন আমি তোমার খাবার নিয়ে ওপরের ঘরে আসি।

ফক্কা। কিন্তু আমি তো মাছ খাই···

চঞ্চ। সে যে কি করে আনি!···ওদের ভাগের মাছ··· চুরি করি। ওরা চ্যাঁচালে, আমি বকি, বলি, বেরালকে দিয়ে রোজ রোজ মাছ খাওয়াবি? বেরাল তাড়াতে পারিস্ না?···সত্যি, এভাবে কাঁহাতক আর চলে, বল! তাই বলচি, আজ তুমি সরে পড় সন্ধ্যার সময়, তারপর কাল একেবারে লক্কা হয়ে এসো!···

ফক্কা। বেশ···

চঞ্চ। কিন্তু একখানা চিঠি চাই তার আগে···কার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি—তুমি পালাও, পালাও···কে আসচে, বুঝি! আমি কাগজ আর দোয়াত-কলম নিয়ে যাবো'খন একটু পরে।···পালাও শীগগির···

[চঞ্চলার প্রস্থান

[ফক্কারাম গমনোদ্যত, জমাদার্ণীর বাসন লইয়া প্রবেশ-উদ্যোগ—দুজনে চোখোচোখি। ফক্কা দ্রুত অন্তর্হিত; জমাদার্ণীর হাত হইতে বাসন পড়িয়া গেল; সে কাঁপিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল]

চঞ্চলার প্রবেশ

চঞ্চ। কি রে···কি হয়েচে?

জমা। দিদিমণি গো···(কম্পন)

চঞ্চ। কি রে...?

জমা। দাঁড়াও গো, দম্ নিতে দ্যাও! এখনো দাঁতে দাঁতে নেগে আছে! (কম্পন)

চঞ্চ। মর্ বুড়ো মাগী। তবু কাঁপে!···বলি, হয়েচে কি?

জমা। জা—মা—ই—বা—বু..

চঞ্চ। (বিচলিত হইল) এ্যাঁ···?

জমা। সত্যি গো দিদিমণি, সত্যি! কোন্ গতরখাকী মিথ্যে বলচে!

চঞ্চ। জামাইবাবু···! ইনি !

জমা। হ্যাঁ গো দিদিমণি!···তোমার বাসনগুলো মেজে নিয়ে আসচি, আর দেখি···ও বাবা...

চঞ্চ। এ্যাঁ···?

জমা। সত্যি দিদিমণি, সত্যি! দেখি, জামাইবাবু... সাদা চাদর মুড়ি দেওয়া···শুধু মুখটি খোলা···অমন যে চোখদুটী, তা হাঙরে খুবলে খেয়েছে···এমনি এমনি গর্ত্ত...তোমার ঘরের দিকে উঁকি না মেরে ঝট্ করে ঐ ছাতের সিঁড়ির বাগে চলে গেল!...উঃ,...এই ছাখো, দিদিমণি, এখনো আমি কাঁপচি—গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেচে। এতখানি বয়স হলো তো—কত রেত-বিরেতে পাড়াগাঁয়ে মাঠে-ঘাটে বেড়িয়েচিও...এমনটি কখনো হয়নি গো! সত্যি দিদিমণি,···এই তোমার গা ছুঁয়ে বলচি গো, সত্যি···

চঞ্চ। (ভাবিত হইল)

জমা। তাহলে বলি দিদিমণি···ঐ নোক-খাওয়ানোর দিন...ভাঁড়ারে এ্যাত লুচি বেঁচেছিল না? তা ভাবনু, বেয়াক্কেলে মুখপোড়া এখনি চুরি করে খাবে...তা মরুক গে, বাঁচাই তার হাত থেকে—তাই সেগুলি ছাদে নিয়ে গিয়ে ঐ চিলকোঠায়...

চঞ্চ। (সভয়ে) চিলকোঠা...?

জমা। হ্যাঁ গো—বেশ নিরিবিলি, না? তা ঐ চিলকোঠায় রাখবো ভেবে যেমনি তার চৌকাঠে পা দিছি··· অমনি, বললে না পেত্যয় যাবে গো দিদিমণি...অমনি শুনলুম্, ঘরের মধ্যে জামাইবাবুর গলা...গুণ-গুণ করে গান গাইচে! আমি তো লুচিমুচি ফেলে পড়ি তো মরি, দে ছুট্!···তার পরে, এই তোমার গা ছুঁয়ে বলচি গো দিদিমণি, ঘণ্টাখানেক পরে চুপিসেড়ে গিয়ে দেখি, সিঁড়ির ওপর শুধু কলাপাতখানা পড়ে আছে...আর সেই দশ-বারো গণ্ডা লুচি আর পাঁচ গণ্ডা সন্দেশ তার চিহ্নও নেই! এ কি মানুষের কাজ! সেই অবধি আর ছাতের দিকেও ঘেঁষি না!...সাধে তোমায় বারণ করি ছাতের দিকে যেতে!

চঞ্চ। তোর ও মিছে ভয়!···দূর, এ'ও কি হয়, কখনো!

জমা। না গো দিদিমণি,···মিছে বলচি নে। আমি

হনু জমাদার্ণী, হাবু জমাদারের বোন্। সত্যি-ভয়ে পেছ্-পা হই না—আর মিছে ভয়ে হঠ্‌বো আমি।···তা বাপু, আশ্চয্যিও তো নয়। বলে, অপঘাতে মরণ···

চঞ্চ। আচ্ছা, যা তুই দিকি!···কিন্তু তোর কথা শুনে চিলকোঠায় যেতে আমার ভারী সাধ হচ্ছে রে! যদি দেখা পাই! যাবি?

জমা। ওরে বাবা, মেরে ফেললেও নয়!

চঞ্চ। তবে আমিই একবার যাই...

জমা। অমন কথা বলুনি দিদিমণি—এমন কাজও করে! বলে, জ্যান্তে যত ভালোবাসাই থাক্, এখন পেলেই ঘাড়টি মট্‌কে দেবে!

চঞ্চ। তাতেও আমার কি সুখ, তা তুই কি বুঝ্‌বি, জমাদার্ণী!

জমা। অমন কাজ করুনি, দিদিমণি, অমন কাজ করুনি গো···আঁড় হয়েছ, তাতে কি! ঐ মাছটা খেতে পাবে না, এই তো···! তা, লুকিয়ে খাও না, কেউ না জান্‌লেই হলো!···তাছাড়া এতে যে স্বাধীন বেপরোয়া হয়েচা...নিজেই নিজের কর্ত্তা!

চঞ্চ। তুই আর জ্বালাস্ নে, বাপু···আমি যাই ছাদে, যদি দেখা পাই···(দীর্ঘশ্বাস)

জমা। তুমি শুনবে না···? তা দাঁড়াও, আমি আগে নীচে পালাই!···বাপ্‌রে, কি দুজ্জয় গোঁ, একটা বিদিকিচ্ছি কাণ্ড না করে আর তুমি ছাড়বে না, দেখ্‌চি···

(উভয়ের প্রস্থান)

বেয়াক্কেলে ও ধড়ীবাজের প্রবেশ

বেয়া। বরাত আর কাকে বলে, বল্! লাখ টাকা পাবে, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আরামে ভোগ করবে, না, জলে ডুবে মারা গেল!

ধড়ী। কিন্তু তোমার ঐ লক্কা দাদাবাবু লাখ টাকা পাবে, বলছিলে না?

বেয়া। তাতে কি! উকিলবাবু বললে যে, উইলে আছে, ফক্কাদাদাবাবু মারা গেলে লক্কাদাদাবাবু লাখ টাকা পাবে। তা তার তো কোনো পাত্তাই নেই—আজ দশ বচ্ছর দেশছাড়া। উকিলে এ্যাও বললে, আসামের জঙ্গলে সে মারা গেছে।

ধড়ী। (আগ্রহান্বিতভাবে) মারা গেছে?

বেয়া। নিঃযুশ মারা গেছে। উকিলের কথা কি মিথ্যে হয়? আইনের ব্যাপার যে রে। তাই ভাবচি, কি বিদিকিচ্ছি কাণ্ডই না হলো! লাখ টাকা এলো, আর দু'দুটো ভাইই গেল।···ভালো কথা, তুই আজই চললি? দু'দিন আরো থেকে গেলে পারতিস্!

ধড়ী। না খুড়ো, আজই যেতে হবে। দেশে চাষ-বাসের কি যে হলো,—না দেখলে নয়।

বেয়া। কলকাতায় আর থাকবিনে তাহলে?···তোর সে কারবার?

ধড়ী। ঐ এলাচি খেলা! না, পুলিশ যে রকম পেছনে লেগেছে, ও আর বেশীদিন চল্‌ছে না। শেষে কি জেলে যাবো?...তা তোমার লক্কাদাদাবাবু ঠিক মরেচে তো খুড়ো? দেখো, শেষ—

বেয়া। হ্যাঁরে, হ্যাঁ, মরেচে।...তা তোর সে খোঁজে এত কি দরকার?

ধড়ী। না, দরকার নয়। তবে বলছিলুম, লাখ টাকাটা পেতো—আহা!

বেয়া। বরাত! ঐ লাখ টাকা এখন কার বরাতে নাচছে—কে জানে!

ধড়ী। তাইতো খুড়ো...না,...ভালো কথা, তোমার ঘরে আমার ছাতাটা আছে—আমায় এখনি বেরুতে হবে, না হলে ট্রেন পাবো না···

বেয়া। ঘরে চাবি দিয়ে এসেচি—দাঁড়া, এনে দিচ্ছি। (প্রস্থান)

ধড়ী। বলে, লাখ টাকাটা কার বরাতে নাচছে!—হুঁঃ, ও এই আমার বরাতে নাচছে।···এ্যামেচার থিয়েটারে রাজা-উজীর সেজে কত পালাই এ্যাক্ট করেচি—তার উপর এলাচি খেলায় জমিদার সেজে কত বাছাধনকে ঘাল করলুম! আর এই লক্কাদাদাবাবু সেজে নিজেকে চালিয়ে দিতে পারবো না! তাই করা যাক্—লক্কাদাদাবাবু সেজেই এসে বসা যাক্।···একটা গালপাট্টা দাড়ী আর সাজ-পোষাক!···মারি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার! একদম লাখোপতি! সেই ভালো। আসাম?···বহুৎ আচ্ছা!···এই যে খুড়ো...

ছাতা হাতে বেয়াক্কেলের প্রবেশ

হ্যাঁ, এই ছাতাটাই। তা'হলে চললুম খুড়ো।

বেয়া। চ', আমিও মোড় অবধি যাবো। বিড়ি ফুরিয়ে গেছে, আন্‌তে হবে। (উভয়ের প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক

গান

ওগো, সুখের দিনের আমরা সাথী যে, নাচি খেলি কত রঙ্গে !
ফাগুনের অলি, মধু দেখে ঢলি, গুঞ্জনে লীলা-ভঙ্গে !
সুখে মাতামাতি, করি কোলাকুলি, জড়াজড়ি সুখ-স্বপনে—
কত সে কালের প্রাণের দোসর—আঠা দিয়ে সাঁটা জীবনে !
সুখপাখী যেই উড়ে চলে যায়,—মোরা চলে যাই সঙ্গে !
সুখের দিনেতে কোথা থেকে আসি, ঘিরে থাকি সারা চিত্ত…
প্রেয়সী, বঁধুয়া, বন্ধু, সাথী গো—ভালোবাসি বড় বিত্ত !
দুখ-দুর্দ্দিনে ছায়ায় মিলাই—ডাকিলে পাবে না বঙ্গে !

চঞ্চলার প্রবেশ

চঞ্চ। এধারকার পরামর্শ তো চুকলো!…মোদ্দা, অবাক হচ্ছি—ঐ অতগুলি লুচি আর মিষ্টি একনিমেষে শেষ করে দিলে!…ভাগ্যিস্, অসুখ-বিসুখ হয় নি, তা'হলেই মুস্কিল বেধে যেতো আর কি ! ভূতকে দেখাবার জন্যে তো আর ডাক্তার আনাতে পারতুম না !…

জমাদার্ণী ও খোন্তা মাসীর প্রবেশ

জমা। এই ন্যাও গো, তোমাদের খোন্তা মাসী এসেছেন কোথা থেকে…

চঞ্চ। খোন্তা মাসী… !

খোন্তা। চিন্‌তে পার্‌চো না, বৌমা ?…আমার অদেষ্ট! না'হলে তোমার এই দশা দেখতে আসি !… উদ্দেশ তো নিলি না মা, কোনোদিন !…আমার প্রাণ যে কেঁদে উঠলো !..থাকতে পারলুম না . কিন্তু এসে এ কি শুন্‌লুম ! ও বাবা ফক্কারে…ফক্কা…ও বাবা, এ কি করে গেলি বাবা…(কান্না ও কথার মধ্যে ক্রমাগত নাক-ঝাড়া) এমন সীতে ছেড়ে কোথায় গেলি বাবা…

চঞ্চ। থামো গো, থামো…

খোন্তা। থামবো কি বাছা! তুমি ইস্তিরী, পরের মেয়ে বৈ তো না ! দু'দিন শুধু ঘর করেচো ! তোমার কি নাগবে এত বাছা ! আমার যে সে নাড়ী-ছেঁড়া ধন, আমার যে বোন্‌পো ! বলে, মা-মাসীর তুল্যি আর আছে কেউ ! আমি সেই মাসী !…ওরে, আমায় কাঁদতে দে বাছা, কাঁদতে দে ! ও ফক্কা, ফক্কা বাবা, কোথায় গেলি বাবা !… এ মাসীকে কাঁদিয়ে, কোথায় গেলি বাবা ! আমার এ কি করে গেলি রে…(বিনাইয়া ক্রন্দন ও নাকঝাড়া)

চঞ্চ। আঃ, থামো না মাসী ! কাঁদলে কি ফিরবে ?

খোন্তা। তা তো জানি রে বাছা। তা বলে কাঁদবো না ? এ যে আমাদের চিরকেলে রীত, বৌমা, এ যে শাস্তর ! মলে ডাক ছেড়ে কেঁদে যে পাড়ায় জানান্ দিতে হয় ! নাহলে মরাই যে মিথ্যে মা ! একালে সহরে থেকে তোমরা বাঙালীর শাস্তর ভুলে গ্যাচো মা ! আমরা সেকেলে মানুষ—মড়া-কান্না কি ভুল্‌তে পারি ! ও যে চাই আমাদের ! ও বাবা ফক্কারে, বাবা আমার…কোথায় গেলি রে…(কাঁদিতে কাঁদিতে কথা ; কথার সঙ্গে নাকঝাড়া ; চঞ্চলার নানা ভঙ্গীতে কখনো নিষেধ, কখনো বিস্ময়, কখনো বিরক্তি, কখনো-বা কৌতুক প্রকাশ) তা কিছু কি রেখে গেছিস্ বাবা, তোর গরিব মাসীর জন্যে ? হ্যাঁ বৌমা, মাসহরা-টরা, ছেঁড়া কাপড় ? শাল ? আমার ভাশুরপো একটা ফ্যালানালের জামা চেয়েছিল যে—তা কিছু না ? ও বাবা ফক্কারে…(জমাদার্ণী বিরক্তভাবে চলিয়া গেল) সেই এতটুকুটি তোকে কোলে করে মানুষ করেচি যে বাবা ! তা গরিব মাসীকে মরার সময় ভুলে গেলি বাবা ! ছ্যাদ্দট্যাদ্দ সব চুকে গেছে বৌমা ? নোক খাওয়ানো ? সব চুকে গেছে ? ও বাবা ! গেঁত-ভোজন অবধি ?—ওরে, আমায় ছোলার ডাল খাওয়াবি, এ যে তোর বড় সখ ছিল, বাবা ! হ্যাঁ বৌমা, আমায় কি নোক-খাওয়ানোর সময়ও খপর দিতে নেই ? ওগো, ছ্যাদ্দবাড়ীর লুচি, ছোলার ডাল আর ছক্কা খেতে যে আমি বড় ভালোবাসি ! ও বাবা ফক্কারে, তা সব দিকেই মাসীকে ফাঁকি দিলি !

জমাদার্ণীর প্রবেশ

জমা। ভালো কথা, তুমি কে গো বাছা ! খোন্তা মাসী না নোন্তা পিশি,—গাওয়া ঘী তো কোনো দোকানে পেলুম না বাপু…

চঞ্চ। গাওয়া ঘী কি হবে ?

জমা। কেন, উনি যে বাড়ীতে পা দিয়েই লুটীশ দিয়েচেন, বেলা তিনটে বাজলেই ওঁর লুচি চাই। তা'ও আবার ভয়সা ঘীয়ে ভাজা লুচি উনি খাবেন না—খেলে অম্বল

অবলম্বন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রকাশিত।

[Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

হয়। গাওয়া ঘীয়ে ভাজা লুচি না হলে ওঁর খাওয়াই হবে না।

খোন্তা। তা ত্থাখো বৌমা, কেমন অভ্যেস হয়ে গেছে মা! গাওয়া ঘীটুকু আমার চাইই!—ভয়সা ঘী···মাগো, সে নাকি আবার মানুষে খায়!···ওয়াক্!...

চঞ্চ। একেবারে বনেদি চাল!

খোন্তা। হ্যাঁ মা, চুলো গেলেও এই চালটুকু বজায় রেখেই কোনমতে টেঁকে আছি।

চঞ্চ। (আত্মগত) নাঃ, যে রকম মাসী-পিসা আসতে সুরু হলো—লক্কা না এলে আর চলছে না!

জমা। তা হ্যাঁ গা, ও নোন্তা পিশি,···না, না, খোন্তা মাসী,···তা গাওয়া ঘী যদি না পাই, খাঁটি গোবরে চলবে না? সে'ও তো গব্যি, আর শুরুদ্ধু খুব···এ্যাঁ?

(চঞ্চলা ও জমাদার্ণী চুপি-চুপি কি কথা কহিতে লাগিল)

খোন্তা। এরা কি সন্দ করচে!···কেমন করে করবে! এতকাল তো এই মাসী-পিসি হয়েই কাটিয়ে এলুম। কি করি, বয়স গেছে, এর বেশী হতেও যে ছাই পারি না!...নাহলে... বৌটো যেন কেমন-কেমন! সন্ত রাঁড় হয়েছিস, নাকের জলে চোখের জলে মুখ গুঁজে পড়ে থাক্—ভাঁড়ারের চাবিটে আঁচলে তুলি! তা না, ভারী টোন্‌কো!

[জমাদার্ণীর প্রস্থান]

তা হ্যাঁ বৌমা···যা শুনচি, তা কি সত্যি?

চঞ্চ। কি?

খোন্তা। কর্ত্তাদের কি না কি উইল বেরিয়েচে—আমার ফক্কা বাবা মারা গেলেও দুঃখু নেই—যা কিছু পাবে, আমার নক্কা বাবা···?

চঞ্চ। শুনচি তো!

খোন্তা। তা আমার নক্কা-ফক্কা কি আলাদা, মা! আমার যে দুই সমান, দুইয়েই যে আমি এক দেখি!···তা, তোমার তো এখন উচিত বৌমা,···তোমার যা-হোক চুকে বুকে গেল তো সব—আমার নক্কাকে এনে থিতু করা...আর কেন মা...আসল যা, তাই যখন গেল, তখন আর এ মাটি কামড়ে পড়ে থাকা কেন! আমার নক্কা বাবাকে এনে সব বুঝিয়ে দিয়ে তুমি কাশী যাও, রামেশ্বর যাও, কি মগের মুল্লুক যাও···যাবার সময় ভাঁড়ারের চাবিটি মোদ্দা দিয়ে যেয়ো। আমি মাসী আছি, তোমার কোনো ভাবনা নেই···

চঞ্চ। মাসী···!

খোন্তা। আমি নেহ্ কথাই বলচি মা!···আহা, নক্কাকে আমি হাতে করে মানুষ করেচি, তার মা তো ঐ বিইয়েই খালাস!...আমার নক্কা-ফক্কা কত সাধের ধন, যেন এক কাঁদির দুটী কলা!...

চঞ্চ। তা সে'ও তো মারা গেছে··

খোন্তা। অমন অলুক্ষুণে কথা বলুনি বাছা!···কলির বৌ, পরের মেয়ে আর কাকে বলে!···ছ্যা, একেলে কি সবই আলাদা!···আমি কোথায় ভরসা করে এনু যে, আমার ফক্কা গেছে, যাক্—আমার নক্কা তো আছে!

জমাদার্ণীর প্রবেশ

জমা। ন্যাও, আবার একজন!

চঞ্চ। কে রে?···

জমা। একটি মেয়ে-নোক···একটা গাড়ী করে এসেচে! গাড়ীর মাথায় বাক্স-বিছানা ··

খোন্তা। কোনো আপন-জন!

চঞ্চ। তোমার সঙ্গে এসেচে না কি···?

খোন্তা। না মা! আমি একলা মানুষ, কোথায় কাকে পাবো? হেঁটেই এসেচি···গাড়ীই বা কোথায় পাবো, বল?

চঞ্চ। তবে?

জমা। ওগো, খিষ্টেনী রকমের কাপড় পরা, পায়ে জুতো! এসেই কলঘরে ঢুকলো! আমি বলি, এ ম্যাষ্টার্ণী আবার এলো কোত্থেকে! কলঘরে ঢুক্‌চে, ছিষ্টি ছোঁবে! তা বললে, খিষ্টেন্‌নীও নয়, ম্যাষ্টার্ণীও নয়, আপনার জন!··· ন্যাও, এখন সামলাও!—এ যে দেখচি, জামাই বাবু একা মরেন নি, সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে মারলেন! কোথা থেকে এ পাল-পাল আপনার নোক আসতে নাগলো গো·· এ্যাদ্দিন সব ছেলো কোথায়!···তা এর গাড়ী ভাড়া দিতে হবে গো, পাঁচ সিকে। ঐ বেয়াক্কেলের মাথায় বাক্স চাপিয়ে আসচে!···সব শুনবে'খন। আমি যাই বাপু, কাজ পড়ে রয়েচে!

[প্রস্থান

খোন্তা। ঝীটি মা তোমার একটু মুখোলো...

চঞ্চ। হ্যাঁ, মুখের ওপর সত্যি কথা কয়—ঐ কেমন ওর দোষ! মোদ্দা, কে এলো?···

খোন্তা। যাক্—এখন একটু কাঁদি তা হলে...কে আবার এলো...তাকে তো মায়াটা জানান্ দেওয়া চাই। ও বাবা ফক্কা আমার...আমায় ফেলে কোথায় তুমি গেলে বাবা...(ক্রন্দন ও নাকঝাড়া)

ট্রাঙ্ক-মাথায় বেয়াক্কেলের ও সেই সঙ্গে
ভুজঙ্গিনীর প্রবেশ

চঞ্চ। কে? (ভুজঙ্গিনী আকুল নেত্রে চাহিল; চঞ্চলার বিস্ময়ে নির্ব্বাক ভাব)

দ্বিতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য—ফক্কারামের গৃহ]

চঞ্চলা, ভুজঙ্গিনী, খোন্তামাসী ও বেয়াক্কেলে।

বেয়া। গাড়ীর ভাড়াটা বৌদি, পাঁচসিকে—

ভুজ। আর দু' আনা বখশিস সেই সঙ্গে...ওকে আশা দিয়েচি!

চঞ্চ। কে...?

ভুজ। কে!...

গান

সই কি আর বলিব আমি!
নাথের লাগিয়া ঘুরি পাগলিনী
অকুলা দিবস-যামি!
এ-ঘরে ও-ঘরে যে-ঘরে তাকাই,
নাথ সে সবারি আছে!
আমার কপালে বজর পড়িল,
নাথ না আইল কাছে!
সই, কি মোর কপালে লেখ!
এ-পথে ও-পথে কত পথে ঘুরি,
নাথ না মিলিল এক!
(ঐ, যে-নাথ নারীরে জোগায় গহনা
ব্লাউশ-শাড়ী সে দামী!)
মোটরে-টেরামে চলিছে কত-না,
পথে কত জনা চলে!
এ রূপ-মাধুরী যৌবন হেরি
কারো না মানস টলে!
সখি, মিলাও আমারে স্বামী...
মিলাও, মিলাও, মিলাও গো,
নারীর পিয়াসা-তিয়াষা-হরা মিলাও, একটি স্বামী!

চঞ্চ। কে আপনি?

ভুজ। কে আমি! ওঃ (দীর্ঘশ্বাস) কি আর বলবো বোন্...আমি চির-অভাগিনী...

চঞ্চ। তার মানে?

বেয়া। বুঝচো না বৌদি? বহুরূপী সেজে এসেচে।

ভুজ। আমি বহুরূপী নই! আমি...আমি নাথ-হীনা, অতি-দীনা...

চঞ্চ। আপনার নাম?

ভুজ। কি আর বলবো দিদি? সে যে দীর্ঘ কাহিনী, প্রকাণ্ড দীর্ঘ-নিশ্বাসে ভরা। তা শোনার ধৈর্য্য আছে? শুনবে?...সে কাহিনী শুনলে তোমার চোখে অশ্রুর সাগর উথলে উঠবে, বুকের মাঝে বেদনার হিমালয় মাথা ঠেলে দাঁড়াবে, শিরার প্রতি রক্তবিন্দু তুষার কণায় পরিণত হবে! সে কাহিনী এমনি দীর্ঘনিশ্বাসে ফুলে ফেঁপে আছে যে তা ছেপে বার করলে যে-কোনো পাবলিশার চার টাকা মূল্যে হাজার হাজার কাপি বেচে ফেঁপে উঠবে!

বেয়া। আহা, ভদ্দর নোকের মেয়ে পাগল হয়ে গেছে গো বৌদি!

ভুজ। পাগল! হ্যাঁ, পাগলই আমি হয়েচি বোন্।

খোন্তা। তা ভয় নেই, বাছা। আমার শ্বশুর-বাড়ীর দেশে আশ্চয্যি শেকড় আছে, সে ছুঁলেই পাগলামি সেরে যায়। বললে না পেত্যয় যাবে গো—একটা ক্ষ্যাপা কুকুর রাজ্যির নোককে কামড়ে বেড়াচ্ছিল—একদিন তাড়া পেয়ে কোথা দে গিয়ে সেই শেকড়ে যেমন পা দিয়েচে, অমনি দিব্যি ধপধপে এক বিলিতি কুকুর হয়ে গেল। নিজের চোখে দেখা মা...আর নাটসাহেবের মেম না নিজে এসে তাকে বুকে তুলে নিয়ে গেল!

বেয়া। আর যাদের যাদের কামড়েছিল?

খোন্তা। তারা দল বেঁধে ঐ গোঁদল-পাড়ায় যাচ্ছিল না—তা তারা অমনি পথ থেকেই সেরে হুমকি-দুমকি হয়ে দেশে ফিরে এল!

বেয়া। তা' তোমাকে পাগলা কুকুরে কামড়েচে নাকি গো? সেই শেকড় ছোঁয়াও শীগগির। দেশ-দুঁই ছেড়ে এই যে থার্ড কেলাশ গাড়ীতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, সে গাড়ী ছেড়ে নিজের বাড়ী ফিরে বাঁচবে।

চঞ্চ। ও সব কথা থাক্! আসল কথাটা কি বল দিকি? কে তুমি? কি চাও?

ভুজ। কি চাই! (সুরে) আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী!

চঞ্চলা (বাধা দিয়া) আসল কথা?

ভুজ। (দীর্ঘশ্বাস) আসল কথা তবে বলি, শোনো...তুমি বোধ হয়, ফক্কারাম বাবুর স্ত্রী? যিনি উইলে লাখ টাকার সুদমাত্র পাবেন শুনে বিপুল সুখে গঙ্গায় ডুবে মারা গেছেন?

চঞ্চ। হ্যাঁ। আর তুমি?

ভুজ। আমি হচ্ছি সেই লাখ টাকার আসল মালিক লক্কাচন্দ্রর স্ত্রী...

চঞ্চ। লক্কাচন্দ্রর স্ত্রী? তবে যে শুনেচি, লক্কাঠাকুরপো আসামী বিয়ে করেছিল! তা এতদিন আসো নি যে?

ভুজ। দরকার বুঝিনি, বোন্...

চঞ্চ। বটে, তা আজ দরকারটা কি, শুনি?

ভুজ। উইলে তার পরের কথাটা জানতে এসেচি।

চঞ্চ। তার পরের?

ভুজ। এঁরা দুজনেই যদি মারা যান্, তাহলে আমরা দুই বোনে ঐ লাখ টাকা পাবো কি না...

চঞ্চ। ওঃ!...তা কৈ, পরের কথা তো জানি না কিছু...

ভুজ। জানো না?...তা উইলের লেখক কি এমন নিষ্ঠুর হবেন!

জমাদার্ণীর প্রবেশ

জমা। তোমার নক্কার ছাওর এসেচে গো দিদিমণি...

চঞ্চ। এসেচে! লক্কাঠাকুরপো এসেচে!...চ'রে চ বেয়াক্কেলে, ওলো জমাদার্ণী...

[বেয়াক্কেলের প্রস্থান

(চঞ্চলা দ্বার অবধি গিয়া ফিরিল)

জমা। লাখ টাকার গন্ধ কি সহজ গা—কত মড়া এখন বেঁচে ওঠে, ছাখো...

[জমাদার্ণীর প্রস্থান

ভুজ। (স্বগত) তবে যে শুনেছিলুম, লক্কাচন্দ্রও মারা গেছে। তাই তো! না, যখন এসেচি, তখন পেছুনো নয়। লাখ টাকা! একবার ভালো করেই দেখতে হবে। এ'ও যদি ঐ লাখ টাকার গন্ধ পেয়ে এসে থাকে! হাল ছাড়চিনে...কিছুতে না। (প্রকাশ্যে) এসেচেন! তিনি এসেচেন! এ অসহ্য আনন্দে যে আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দিদি, দিদি, ধর, আমায় ধর...

খোন্তা। ও বাবা নক্কারে, এলি বাবা...

চঞ্চ। থামো মাসী...লোকটা কতদুর থেকে তেতে-পুড়ে আসচে।

খোন্তা। হ্যাঁ ছাখো বৌমা, তোমার দরদ একটু কমাও তো বাছা! ও হলো আমার পেটের বোন্পো! কোথাকার কে পরের মেয়ে তো তুমি বাছা...

ভুজ। প্রিয়তম, আমার প্রিয়তম...তুমি এসেচো! আঃ—(মূর্চ্ছার ভাবাভিনয়)

ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লক্কাবেণী ফক্কারামের প্রবেশ

ফক্কা। হাল্লো বৌদি...তারপর, আছো কেমন?

(দ্রুত আসিয়া শেক্-হ্যাণ্ড করিল)

চঞ্চ। এই যে মাই-ডিয়ার ঠাকুরপো...এলে ভাই!

ফক্কা। এলুম বৌদি...তা ছাখো, এলুম বটে! কিন্তু ফক্কা দাদার জন্যে প্রাণটা আমার ফেটে যাচ্ছে! কি আমুদেই ছিল! তা ছাড়া দাদা আমার লক্কা বল্‌তে অজ্ঞান হতো! আরো তো ঢের মাসতুতো ভাই ছিল আমাদের—টক্কাচরণ, মক্কানাথ, অক্কাকান্ত, হিক্কারাম, ছক্কালাল—তা দাদা চাইতো খালি এই লক্কাকে!—আমি ভাবচি, দাদার একটা মস্ত মার্ব্বল্-ষ্ট্যাচু করে এই বাড়ীর ফটকে বসাবো। তার অর্ডারও দিয়ে এলুম...একটু দেরী হয়ে গেল তাই! আর এ-বাড়ীর নাম রাখবো, ফক্কা-ধাম।

চঞ্চ। তা তুমি তো এলে—তোমার জিনিষ-পত্তর?

ফক্কা। জিনিষ-পত্তর! সে যে এক গঙ্গা, বৌদি। আনতে একটা পুরো গুড্‌স্ ট্রেণ লেগেছে—তা কলকাতার বাড়ী, এতে ধরবে কি না এই ভেবে, গ্রেট্ ইষ্টার্ণ হোটেলের দোতালাটাই আড়াগোড়া ভাড়া নিয়ে সেইখানে রেখে আসছি!...

চঞ্চ। তা সেখান থেকে কি আনলে ভাই, আমাদের জন্যে? শুনেচি, তোমার কমলা নেবুর ব্যবসা ভারী জমে উঠেচে।

ফক্কা। একেবারে কুলপী বরফ!—লেবুটি গাছে ধরেছে কি অমনি কুলপী বরফ!...

চঞ্চ। বল কি, ঠাকুরপো?

ফক্কা। আর বলা!—পুঁতলুম তো লেবুর গাছ—ইয়া তেঁতুল গাছের মত খাড়া উঠে গেল—তারপর দেখা দিলে, সবুজ লেবু—যেমনি দেখা দেওয়া, অমনি পরের দিন সকালে গিয়ে দেখবে, ধপ্ ধপে সাদা মালাইয়ের কুলপী!

চঞ্চ। তা ভাই, পাঠাতে হয় আমাদের কিছু—

ফক্কা। পাঠাবো কিসে, বৌদি! সে কি এখেনে!—অর্থাৎ গাড়ী কি ছাই মেলে?—যদিও বা মেলে, রেলে চুরি! পাঠালুম লেবু—এখানে পৌঁছুলে দেখবে, ঝুড়ি ঠিক আছে, লেবু নেই—তার বদলে শুধু চিবুনো ছিবড়েগুলো! খোলা-বিচি অবধি চুরি হয়!···হবেই তো! খোলাগুলো যে আজকাল বিলেতে পড়তে পায় না—মেমেদের পমেটম তৈরী হয়! আর বিচি যায় জার্ম্মাণীতে—তা থেকে তারা মুক্তো তৈরী করচে!—(খোস্তা ও ভুজঙ্গিনীকে দেখিয়া) এঁরা···? চেনা বলে তো মনে হচ্ছে না!

ভুজ। (প্রেম-ভাব-অভিনয়)

খোস্তা। (ফোক্‌লা দাঁতে হাস্য বিকাশ করিল)

ফক্কা। বাঃ—(আশ্চর্য্য হইল)

চঞ্চ। ওঁরা কে, তা ওঁদের মুখেই এখনি ব্যক্ত হবে'খন।···ইটি তোমার স্ত্রী···

ফক্কা। স্ত্রী···?

চঞ্চ। স্ত্রীই তো! আর ইনি তোমাদের খোস্তা মাসী।

ফক্কা। খোস্তা মাসী! খোস্তা মাসী আবার কে?··· ধেৎ, খোস্তা মাসী বলে আমাদের কস্মিন কালেও কেউ ছিল না!

খোস্তা। ও কি, ও কথা বলো না নক্কা-ধন! তুমি যে আমার কোলেই মানুষ, বাবা···আমি না খাইয়ে দিলে খেতে না! আর মনে নেই, সেই কাগা-বগার গপ্প, সেই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গপ্প? যতক্ষণ না সে গপ্প শুনবে, ততক্ষণ ঘুমোবে না! তার পর সেই নাউ-নাটা!···তা, আমার বরাত বাবা—না হলে তুমি সে নাউনাটা ভুলে গেলে! খোস্তা মাসীকে মনে পড়ে না!

ফক্কা। খোস্তা মাসী! খোস্তা মাসী!—না, খোস্তা মাসী কেউ ছিল না,—বরং···

চঞ্চ। নোস্তা পিশির কথাই তো জানি! কতবার এসেছেন-গেছেন! আর এলেই চোখে নোনা পাণি বার করে কি দরদ না দেখিয়েছেন!

ফক্কা। এই!···নোস্তা পিশিই বটে, ছিল এককালে···

খোস্তা। ও বাবা, সেই রে বাবা, সেই! ঐ খোস্তা মাসিও যে, নোস্তা পিশিও সে-ই! কথায় বলে, মাসি-পিশি··· তা ও একই কথা, বাবা!

ফক্কা। বটে! তা সে নোস্তা পিশি তো সে-বছর মারা গেছে! সেই যে, যেবার নুনের ওপর টেক্স বসলো! নুনের দর চড়বে এই ভেবে ভেবে নোস্তা পিশি জোরে মরে গেল—সেই যে বৌদি, মনে নেই? যেবার চাটগাঁয় ইলিস মাছের মড়ক লাগলো—আঃ, খপরের কাগজে পড়ো নি?

চঞ্চ। বটে, বটে—ঠিকই তো।

খোস্তা। হ্যাঁ বাবা নক্কা···

ফক্কা। থামো, পরে ভেবে দেখা যাবে। বংশ-তালিকা আছে তোমার? দেখিয়ো, প্রমাণ করো···এখন সর, সর···

[খোস্তার প্রস্থান

তার পর তুমি? (ভুজঙ্গিনীর পানে চাহিল) তুমি কে, বাপু? চেহারা তো খুব চটকদার করে তোলবার চেষ্টা করেচো, দেখচি···

ভুজ। (ভঙ্গী-সহকারে) আমায় চিন্‌তে পারলে না? (দীর্ঘশ্বাস) সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, সেই কণ্ঠ!··· আমায় চিনছো না?

ফক্কা। না!

ভুজ। আমি যে তোমার চিরপ্রিয়া ভুজঙ্গিনী! মনে পড়ে না নাথ, সেই নির্ম্মল নীল আকাশ, সেই ফাগুনে ফুলের বনে কোকিলের ঝঙ্কার, সেই থরথর-কম্পিত বিদায়ের মুহূর্ত্ত, সেই নয়নের বিগলিত ধারা···? আমি তোমার সেই পতি-পাগলিনী, বিরহিণী···

ফক্কা। বাবা (সবিস্ময়ে একবার ভুজঙ্গিনীর পানে, পরক্ষণে চঞ্চলার পানে চাহিল)

ভুজ। গান

বসন্তে এই চিত্ত-বনে
ফুলের মেলার মাঝখানে
সেই যে এলে···! মাধবী-রাত
উঠলো ভরে কী গানে!
সেই যে কত স্বপন বোনা,
কত কথার আনাগোনা···
মধুর ফাগুন-সমীরণে

কি সুখ দোলা দেয় প্রাণে!
হায় বঁধু, সব গেলে ভুলে!
ফক্কা। ···ছেঁদো কথা রাখো তুলে···
চলবে না চাঁদ, ও চাল। যাও,—
চলছে যেথা···সেইখানে!

ভুজ। তুমি যে আমায় অবাক করে দিলে, প্রিয়তম! আমি তোমার স্ত্রী···

ফক্কা। স্ত্রী! তা, তা···তা (চঞ্চলার পানে চাহিল; চঞ্চলার বিস্ময়ের ভাব)

ভুজ। হ্যাঁ, চেয়ে ছাখো দিকি এই মুখের পানে···এই চোখ, এই কেশের রাশি, এই বাহু···মনে পড়ে না?

ফক্কা। (মৃদু হাসিয়া) মনে···মনে পড়চে বটে! তা, তা, তাই তো প্রিয়তমে, তুমি এত বড় হয়েচো! বাঃ!

ভুজ। এই যে চিনতে পেরেচো···তোমার সেই ভুজঙ্গিনী···

ফক্কা। ভুজঙ্গিনী! আরে, বাস্‌রে! তা, তুমি এখন কি চাও ভুজঙ্গিনী?

ভুজ। ঐ কণ্ঠ···বাহুর বাঁধনে ঘিরতে চাই, প্রিয়তম, (অগ্রসর হইল) লতা যেমন সহকারকে বেষ্টন করে!

চঞ্চ। (বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিল)

ফক্কা। এ্যাঁ! অর্থাৎ?

ভুজ। এ অর্থাৎ নয়, নাথ, এ নির্ঘাৎ! (সুরে)
বঁধু, মিটাবো মিলন-আশা!
প্রাণের প্রিয় হে কেটেচে বিরহে
দীরঘ বরষ-মাসা! (কণ্ঠালিঙ্গন)

চঞ্চ। কিন্তু···(সরোষ ভঙ্গীতে অগ্রসর হইয়া থমকিয়া থামিল)

ফক্কা। বৌদি, এ যে বিপদে পড়লুম এখানে এসে···

ভুজ। বিপদ কি, নাথ! মনে নেই, জ্যোৎস্না-রাত্রে মিলনের সেই নিবিড় রাগিণী, সেই অফুরাণ, অহরহ···

ফক্কা। অহহ! অহহ! বৌদি, বাঁচাও, আমায় বাঁচাও বৌদি, অনেক দূর থেকে তেতে-পুড়ে আসচি। এখনো জিরুতে পাইনি!

চঞ্চ। (চিন্তিতভাবে চাহিল; পরে হাসিয়া) কিন্তু এ যে প্রেমের বন্ধন, ঠাকুরপো! এ বন্ধনে ক্রন্দন তো সাজে না, আনন্দ কর। ছি!···এই যে, পিসেমশায়···

রক্তবীজের প্রবেশ

ইনিই আমার পিসেমশায়—সেই এটর্ণি বাবু···

রক্ত। আমারি নাম রক্তবীজ! তা খেঁদি, একখানা চেয়ার এগিয়ে দে রে—মোটা মানুষ, দাঁড়াতে পারি না—হাঁফ ধরে! (চঞ্চলার কথাবৎ কার্য্য) ইনি?

চঞ্চ। আমার মাসতুতো ভাওর—শ্রীমান্ লক্কাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রক্ত। তুমিই লক্কাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী? তা বেশ, বেশ··· উইলের খপর জানো?

ফক্কা। (রক্তবীজকে নিরীক্ষণ করিতেছিল; উঠিয়া তার কাছে গিয়া রক্তবীজের হাত টিপিল, গা টিপিল) আপনার শরীরে তাহলে হাড়-মাষ আছে! নাম শুনে আমি ভেবেছিলুম, জোঁকের মত একটা জীব হবেন, ভেতরটা খালি মক্কেলের রক্তে ভরে ফেঁপসে ফুলে উঠেচে!

রক্ত। (অপ্রতিভ ভাবে হাসিল)

চঞ্চ। আঃ, কি বল ঠাকুরপো! উনি আমার পূজ্যপাদ পিসেমশায় যে, গুরুজন, প্রণাম কর।

ফক্কা। ওঃ—(প্রণাম করিল)

রক্ত। তারপর? তুমি তাহলে মর নি! তবে যে শুনেছিলুম, তোমার আসামী স্ত্রী একটি লাঠির ঘায় তোমার পিত্তি ছরকুটে মেরে ফেলেচে।

ফক্কা। আজ্ঞে, আসামী স্ত্রীরা তাই করেন বটে, তবে আমি বেঁচে গেছি কোনমতে। মরে ছিলুম বৈ কি! জীবনে মানুষকে দরকার হলে অমন ঢের মরতে হয়, মশায়! তবে কাজ পড়লে আবার বাঁচাও চাই তেমনি!

চঞ্চ। সব-সময়ে তোমার মস্করা, ঠাকুরপো!—স্বভাব আর গ্যালো না! আহা পিসেমশায়, এইটিই এখন আমাদের শিবরাত্রির সল্‌তে! এটি যে আছে, ভাগ্যি বলতে হবে!··· না হলে উইলের লাখ টাকার কি যে গতি হতো!

রক্ত। তা ভয় ছিল না! উইলে আছে, এই ছাখ্ না—(উইল বাহির করিয়া দেখাইল) লক্কাচন্দ্রর অবর্ত্তমানে, প্রিয় দৌহিত্র ফক্কারাম যদি বিবাহ করিয়া মরিয়া থাকে, তাহা হইলে তার সেই স্ত্রী—বিধবা বা পুত্রহীনা হইলেও—এই লাখ টাকার মালিক হইবে, ষোল আনা মালিকানি-সত্ত্বে, সর্ব্ব-প্রকারে সত্ত্ববতী হইয়া·····

ফক্কা। এ্যাঃ! (চীৎকার-শব্দে লাফাইয়া উঠিল)

চঞ্চ। (চীৎকার করিয়া) পিসেমশায়···

রক্ত। কি রে খেঁদি—তোরা চেঁচিয়ে উঠলি কেন, দু'জনে!

চঞ্চ। এ কথা আগে বলতে হয়! দেখ দিকি, এত কাণ্ড…

ফক্কা। জ্যান্তে মরা…

রক্ত। কি রে, জ্যান্তে মরা…কাণ্ড…এ-সব কি কথা রে!

চঞ্চ। না, তাই বলছিলুম, তাহলে এঁর ছ্যাদ্দটা আরো একটু জাঁকিয়ে করতুম! আমুদে মানুষ ছিল…লাখ টাকার বলটা পেতুম কি না!

ফক্কা। বটেই তো! তা যাক্ গে, মরুক্ গে, আমার টাকাটা কবে পাচ্ছি, বলুন তো?

রক্ত। এই যে লাহোরের চীফ কোর্ট থেকে প্রোবেট বার করতে হবে কিনা…তোমার একটা সই চাই! প্রোবেট না হলে তো টাকা বেরুবে না!…তা টাকাটা বেরুবো-বেরুবো হয়েছে! আমি টেলিগ্রামে দরখাস্ত পাঠাচ্ছি যে!

চঞ্চ। এ্যাঁ, টাকাটা এখনি পাবে না! আহা, ঠাকুরপো কত আশা করে এলো…

ফক্কা। বাসা-টাসা তুলে…

রক্ত। এ যে আইন রে খেঁদি—আদালতের ব্যাপার যে! এতে চট্‌পট্ কিছু হয় না। এক-পুরুষ দরখাস্ত পেশ করে, তার পর তার ছেলেরা তদ্বির চালায়, তার পর নাতিরা এসে মামলার পাকা ফলটি হাতে পায়!

ফক্কা। তাই তো, তা এখন খরচ-পত্তর চালাবো কি করে? আমি যে আসবার সময় আমার ক্ষেতটেত, মায় কমলালেবুর কচি ফুলগুলো পর্য্যন্ত সেখানে দান-পত্তর করে দিয়ে এলুম…

রক্ত। দান-পত্তর?

ফক্কা। আজ্ঞে হ্যাঁ।…সে বড় ঝক্কি, মশায়…

রক্ত। কেন, সে তো খুব ফ্যালাও লাভের কারবার শুনেচি…

ফক্কা। তা ঠিকই শুনেচেন! লাভ ষোল আনাই—তবে ঐ যা বললুম,—ঝক্কি ঢের! অত গাছ থেকে একটি একটি করে লেবু পাড়া,—হাতে কাঁটা না ফোটে! ওঃ! তারপর সে-সব লেবু রাখি কোথায়, বলুন! অত-বড় ঝুড়িও কোনো মুল্লুকে পাওয়া যায় না!

রক্ত। কেন, গোলা-গুদোম—

ফক্কা। তা আর নেই! বলে, সমস্ত আসামটাই গোলা আর গুদোমে ভরিয়ে দিছি—এক একটা যেন লাটসাহেবের বাড়ীর মত…ইয়া কমলালেবু রঙের নিশেন উড়চে! কিন্তু তাহলে হবে কি—ইঁদুরের উৎপাত ভয়ঙ্কর!

রক্ত। কেন, ইঁদুর-মারা কল,—

ফক্কা। তা আর নেই! বলে, বিলেত থেকে সাত লাখ ইঁদুর-মারা কল আনিয়েচি, মশায়।

রক্ত। তবে?

ফক্কা। (হতাশভাবে) সে আপনারা বুঝবেন না, মশায়। আসামের ইঁদুর—বিশেষ চেরাপঞ্জির ইঁদুর! বলে, দু'মাস যদি শ্রেফ ভালো ছোলা খাইয়ে রাখতে পারেন, আর-কিছুতে মুখ দেবে না, তাহলে ইয়া-ইয়া ওয়েলার ঘোড়া হয়ে ওঠে!… লাল হয়ে যাবেন। তা পারা যায় না—ব্যাটারা ভারী চঞ্চল! পড়েন নি ছেলে-বেলায়? উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার, যাহা পায় তাই কেটে করে ছারখার! লাগাম লাগাবেন কি—কেটে ছারখার করে দেবে!

রক্ত। বল কি হে!

ফক্কা। আর বলি কি! একবার যাবেন, যাবেন, বেড়িয়ে আসবেন। আমি একবার নিয়ে যাবো সকলকে। কাজ চুকুক্ না! হুঁঃ—

রক্ত। তাহলে আজ উঠি বাবা…আসি রে খেঁদি। Professional man, ভারী busy! ওদিকে আবার মক্কেল ক্যাক্যাহুয়া-জী এসে আপিসে বসে আছে—তার বৌয়ের ব্রত আছে, আমায় ফর্দ্দ করে বাজার করে দিতে হবে—আমি তার একেবারে constituted attorney কি না!—(ঘড়ি দেখিয়া) তা এঁরা? এঁদের তো নতুন দেখচি। তোমার সঙ্গে এসেচেন না কি?

ফক্কা। আজ্ঞে না,—আমিও এই এসে দেখচি!

চঞ্চ। ওঁরা এঁর আসার আগেই এসেচেন—যেমন ফাগুন আসবার আগেই প্লেগ-বসন্ত আসে না!

রক্ত। তা?

ভুজ। (হাবভাব-সহকারে) আমি এঁরই।…

রক্ত। এঁরই…?

ভুজ। প্রাণ-কান্তা!

রক্ত। তবে যে তোমার আসামী স্ত্রীর কথা শুনেছিলুম…

ফক্কা। আজ্ঞে, আমিও তাই জানতুম—তা এসে দেখচি, তিনি ফরিয়াদী হয়ে উঠেচেন।

রক্ত। তা, ভদ্দর লোকের মেয়ে—কেতা-মাফিক্ কাপড়-চোপড়ও পরতে জানেন—ওঁর মনে কষ্ট দিয়ো না হে! নিয়ে নাও, বাবাজী। আসামীর লাঠি সামলানো একটু শক্ত হয়…তা স্ত্রী-রত্ন…ফেলতে নেই! তাহলে আসি রে খেঁদি—(গমনোদ্যত)

ফক্কা। ও মশায়, শুনুন! বিজ্ঞাপন দিয়ে আমায় যে আনালেন…আমিও তাড়াতাড়ি চলে এলুম—তা আমার টাকাকড়ি তো সেই চেরাপঞ্জি ব্যাঙ্কে—খরচ-পত্র চলে কি করে? আমি আবার একটু ষ্টাইলে থাকি।

রক্ত। ভাবনা কি! আমি এটর্ণী আছি, যখন যা দরকার হবে, দেবো—পাঁচশো, সাতশো, হাজার! লাখ টাকাটা তো আমার হাতে দিয়েই আসবে—তখন ফর্দ্দ মাফিক কেটে নেবো। তোমায়-আমায় সম্পর্কটা যে ভারী মধুর হে—attorney client তার জন্যে ভেবো না, আমরা এটর্নি মানুষ—টাকা পাঠাতেও যেমন পারি, গুটোতেও তেমনি। (প্রস্থান)

চঞ্চ। তাহলে এসো ঠাকুরপো ওপরের ঘরে! কত বছর নিরুদ্দেশ—আমার আদরের ঠাকুরপোটি! এসো।—ওরে বেয়াক্কেলে, তোর লক্কাদাদাবাবুর বিছানা-পত্তর যা এসেচে, তা দোতলায় আমার পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখবি—বুঝলি?

ভুজ। তাহলে আমার বিছানাটাও সেই ঘরে নিয়ে যাও…

(ফক্কারাম বিস্মিতভাবে চঞ্চলার পানে চাহিল; চঞ্চলাও সেইভাবে ফক্কারামের পানে চাহিল)

এসো নাথ, দীর্ঘ বিরহ-অবসানে (ধরিল)

ফক্কা। ও বৌদি—এ যে টানে!

চঞ্চ। কি করচো—আমার আদরের ছাওর…

ভুজ। আমার প্রিয়তম নাথ…

ফক্কা। এ যে মুস্কিলে পড়লুম!

খোন্তা মাসীর প্রবেশ

খোন্তা। ও বাবা, নক্কা—আমার ঘরে এসো বাবা—বাতাসা ভিজিয়ে রেখেচি…এসো বাবা—

ফক্কা। আঃ! করি কি!

চঞ্চ। এসো, জিরুবে এসো—(টানিয়া ফক্কাকে লইয়া প্রস্থান)

ভুজ। প্রিয়তম… (প্রস্থান)

খোন্তা। ও বাবা নক্কা রে…(প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক

গান

ঐ টাকা…যেমনি সে আসে, মোরা তারি সাথে আসি!
রামী-বামী..খুড়ী-জেঠি…আর পিসি-মাসি!
আমরা জেঠাই, কোথা কিবা পাই! হাই তুলি, আর কেবলি ঘুমাই…
পিসি মাসি মোরা…ঐ আহারে রুচি…শুধু খেতেই ভালোবাসি।
(ক্ষীর সর ননী ছানা!)
আমরা খুড়ী দিয়ে তুড়ি, যাহা কিছু পাই, মোরা ফাঁকতালে সরাই!
রামী-বামী মোরা এসে দুঃখ বিলাই—মোরা তামাকু-পিয়াসী!
মোরা খুসী হতে জানিনেকো, চটিয়া আছি।
যখন যাহা পাই, তাহা লুটিলে বাঁচি!
জানিনে আশীষ, সদা দিই গালি-বিষ—
তারি চোটে ভিটে-মাটী সকলি নাশি!

ফক্কারামের প্রবেশ

ফক্কা। বিপদে পড়া গেল, দেখচি। ভাবলুম, ফক্কা-জন্ম ঘুচিয়ে লক্কা হয়ে লাখ টাকার গদিতে চেপে প্রিয়ে চঞ্চলার সঙ্গে আরামে জীবনটা কাটানো যাবে, তা না, এ আবার কোথা থেকে এক স্ত্রী-রত্ন এসে উদয় হলো! অধিকন্তু ন দোষায় কথাটা স্ত্রীর সম্বন্ধে মিঠে লাগলেও, সম্প্রতি তার লক্ষণ কিছু বোঝা যাচ্ছে না! এ স্ত্রীটি চব্বিশ ঘণ্টা পিঠে-সেঁটে থাকতে চান্—তাতে আমারো যে দম বন্ধ হয়ে আসবার জো হয়! তার ওপর এঁর এই সৃষ্টিছাড়া অনুরাগ আর অন্তরঙ্গতায় প্রেয়সী চঞ্চলার অঙ্গ যে রকম রেগে তেতে ওঠে, তা তাঁর চোখের ভ্রূকুটি-ভঙ্গিই দেখতে পাচ্ছি! তা ছাড়া প্রেয়সী চঞ্চলাকে বক্ষলগ্ন করতে প্রাণ আমার কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠচে—সদ্য বিধবার বেশে প্রেয়সীর এমন পাগল-করা রূপ ফুটেচে! কিন্তু এই ভুজঙ্গিনী, কাল-ভুজঙ্গিনীর মত ঘিরে আছে। কে জানে, কে এই ভুজঙ্গিনী! হয়তো লক্কা এই ভুজঙ্গিনীর আলিঙ্গনের নিবিড় আঘাতেই অক্কা-লাভ করেচে—কিম্বা এও ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়েচে! নিজে জাল বলে পরকে জাল বলে উড়িয়ে দিতে পাচ্ছিনে! কি জানি, হয়তো একে জাল বলে উড়িয়ে দিতে গেলে নিজেই

জাল ছিঁড়ে উড়ে যাবো!—এ যে বিষম সমস্যায় পড়া গেল! মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই! অথচ চঞ্চলা বলচে, এই-খানটাতেই তার বাধচে ভারী। এই যে ভুজঙ্গিনী-প্রিয়া আসচেন—খুব তালে সয়ে যেতে হবে! কি করি, উপায় যখন নেই…

ভুজঙ্গিনীর প্রবেশ

ভুজ। নিষ্ঠুর—(বাঁপাইয়া আসিয়া ধরিল)

ফক্কা। উঃ, গেচি, গেচি—বাস্‌রে—

ভুজ। কি হয়েচে?

ফক্কা। লেগেচে—হাতখানা ঝনঝনিয়ে উঠলো! কি জানো, অর্থাৎ এই অনেক দিনের অনভ্যাস কি না, তোমার প্রেম আর আদরটা একটু সইয়ে নিতে হবে!

ভুজ। প্রিয়ার প্রেমে অনভ্যাস!

ফক্কা। অর্থাৎ কি জানো, চাষাভুষোর সঙ্গে বড্ড মেলা-মেশা করা গেছে কি না—তাই থেকে-থেকে তোমায় কেমন পর-স্ত্রী, পর-স্ত্রী বলে মনে হচ্ছে—এই আর কি! তা ও নাইতে-খেতে ক্রমেই বরদাস্ত হয়ে যাবে—বুঝলে কি না! তা, বৌদি কোথা গেল?—আমার আদরিণী চঞ্চলা বৌদি?

ভুজ। আমি তোমার কেউ নই?—বৌদিই সব?

ফক্কা। আহা, কি জানো, বৌদি…তায় সদ্য বৈধব্য-যাতনায়-কাতরা, পতিহারা—

ভুজ। আর আমি…!

ফক্কা। তারি চোখের সামনে পতিকে ফিরে পেয়েছ! এতে তাঁর মনে বেদনাটা একটু বেশীই লাগবে না? বিশেষ তাঁর পতি না মারা গেলে তো আর তোমার পতি ফিরে আসতো না!

ভুজ। নাথ..

ফক্কা। আহা, বুঝচো না, ফক্কাদাদা না মারা গেলে তো আর তোমার লক্কা এ লাখ টাকা পেতো না!

ভুজ। তুচ্ছ টাকার কথা তুলে আমার এ তৃষিত পিয়াসী প্রেমের অপমান কর!

ফক্কা। টাকায় প্রেমের অপমান! আহা, তুমি তাহলে কিছুই বোঝো না, ভুজঙ্গিনী-প্রিয়া! টাকায় প্রেম উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—টাকার ঝন্‌ঝনির মাঝে প্রেম যেন খঞ্জনীর তালে নৃত্য করতে থাকে!—টাকা না থাকলে প্রেম! সে যেন, যেন…পেট-রোগা ছেলের সাম্‌নে মাংসর বাটী!

ভুজ। ওগো, এসো, আমার দীর্ঘ দিনের পথ-চাওয়া অতিথি, আমার তপ্ত চিত্তের শ্রান্তি-হরা ওগো—(টানিল)

ফক্কা। টেনোনা, টেনোনা,—পড়ে যাবো। আমার দুই পায়ে বাত—চেরাপঞ্জির বাত! কোনমতে এই উইলের মালিশে খাড়া আছে—টানাটানি করলে, এখনি মচকাবে!

ভুজ। এই বাহুর মালা তোমার গলায় পরিয়ে, তোমারি মুখের পানে চেয়ে বসে থাকবো নাথ সারা দিন, সারা রাত! (কণ্ঠালিঙ্গন)

ফক্কা। ওঃ—ওরে বাবা…

চঞ্চলার প্রবেশ

চঞ্চ। ঠাকুরপো…

ফক্কা। ছাড়ো, ছাড়ো—বৌদি। (ছাড়াইয়া চঞ্চলার কাছে আসিল) এসেচো বৌদি—আঃ!

চঞ্চ। এতদিন পরে স্বামী এলো, তা খালি এই আলিঙ্গন আর চুম্বন পেয়ে ও বাঁচবে কেন, বোন্? জলখাবার, পাণ, এ-সব আনো—নিজের হাতে খাওয়াও—তবে তো বাঁধন-কাটা দুর্দ্দান্ত স্বামী আবার বশে আসবে। যাও…

ভুজ। যাই। ওঃ (দীর্ঘশ্বাস) (প্রস্থান)

চঞ্চ। কি, এ তো ঐ বিরহিণী পতি-পাগলিনীর প্রেম-সমুদ্রের ছোট্ট একটি মৃদু ঢেউ…

ফক্কা। তাহলে উত্তাল তরঙ্গও আছে? এ্যাঁ! প্রিয়ে চঞ্চলে, আদরিণী বৌদি,—আমায় রক্ষা কর! (চঞ্চলার হাত ধরিল)

চঞ্চ। হুঁ!

ফক্কা। লাখ টাকার লোভে লক্কা সেজে এসে এ যে সত্যি এবার অক্কা পেতে হবে, প্রিয়ে! তোমার চোখের সামনে, তুমি স্ত্রী হয়ে এই প্রেমোচ্ছ্বাস স্থির হয়ে দেখবে! তুমি কি সত্যিই এমন পাষাণী?

চঞ্চ। না,—এ আমি সহ্য করবো না, সহ্য করতে পারবো না। আমিও নারী—লাখ ছেড়ে কোটী টাকার জন্যেও না!

ফক্কা। তাহলে উপায়? আমার যে মুস্কিল হলো, দেখচি! লাখ টাকা রাখতে হলে একেও নিতে হয় তোমায় ছেড়ে আর একে ছাড়তে হলে, এর সঙ্গে সঙ্গে লাখও ফস্‌কায় যে!

চঞ্চ। তা ফসকায়! তারপর সঙ্গীন মুহূর্ত্তও আসচে। সামনে রাত্রি…

ফক্কা। ওরে বাবা,—তাই নাকি! তবেই গেছি! মেয়ে-মানুষের বুদ্ধিতে এ কি বিপদ ডেকে আনলুম, বল তো! তুমি কোন্ খপরটা দিয়েছিলে…তাহলে যে লক্কা গেরুয়া পরে বাড়ী আসতো। ইনি কাছে ঘেঁষতে এলে বলতুম, আমি সন্ন্যাসী, স্ত্রীলোক স্পর্শ করি না!

চঞ্চ। ও এমন অসময়ে এলো যে, খপর দেবার সময় পেলুম কৈ!

ফক্কা। তাহলে…

চঞ্চ। কিন্তু লক্কাই থাকতে হবে তোমায়, নাহলে লাখ টাকা ফস্কায়! হাতের কাছে এসেচে—

ফক্কা। তা তো ঠিক! আমিও তাই ভাবছিলুম

চঞ্চ। কিন্তু আমি…?

ফক্কা। তুমি! ওগো, আমি তাও ভাবছিলুম। তোমার জন্যেই তো ভাবনা! নাহলে আমার কি—একরকম পুষিয়ে যেতো…

চঞ্চ। কি? (রাগত-ভাব)

ফক্কা। ঐ তো, ঐখানেই তো আমারো বাধচে! এক সঙ্গে এতদিন দুটীতে ঘর করে এলুম, তারপর তোমারি বুদ্ধিতে মরে লক্কা হয়ে টাকা পাচ্ছি—তার উপর স্ত্রী নিয়ে মনের আনন্দে দিন কাটাবো, আর তুমি বেচারী পতি-বিরহে নির্জ্জনে বসে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলবে! উঃ, এ কথা মনে হলে যে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই!

চঞ্চ। শুধু তাই!—আমার চোখের সামনে আর এক-জনকে নিয়ে এ আনন্দ!

ফক্কা। আরে ব্যস্ রে—তা কি হয়!—তাহলে, তাহলে—

চঞ্চ। একটা উপায় কর গো…আমি মেয়েমানুষ, আগে এত বুঝিনি! তোমায় আমি পরের হাতে এমন করে বিলিয়ে দিতে পারবো না,…প্রাণ গেলেও না…(চোখ আর্দ্র হইল)

ফক্কা। কেঁদো না, প্রিয়ে! আহা, ভেবেছিলুম, টাকা পাবো, পেয়ে তোমায় বিধবা বিবাহ করবো…তা আমিও যে কোন উপায় দেখচি নে, প্রিয়ে ওদিকে নইলে যে লাখে ফাঁক!

চঞ্চ। (সজল চোখে ফক্কার গায়ে ঢলিয়া পড়িল)

জলখাবারের রেকাবি-হস্তে ভুজঙ্গিনীর প্রবেশ

ভুজঙ্গিনী। (হতাশ দৃষ্টিতে উভয়ের পানে চাহিল; তার হাত হইতে রেকাবি পড়িয়া গেল। সে-শব্দে চঞ্চলা ও ফক্কা চমকিয়া চাহিল ও সরিয়া দাঁড়াইল) নাথ… নির্দ্দয়…

(পতন ও মূর্চ্ছা)

ফক্কা। আঃ, জল, ওগো, জল আনো…

(চঞ্চলার প্রস্থান)

বেয়াক্কেলের প্রবেশ

তাই তো, কি করি! মরে গেল না কি রে, বাবা! হাতে দড়ি পড়বে না কি…!

[বেয়াক্কেলে প্রথমে দূর হইতে ফক্কারামকে নিরীক্ষণ করিল; পরে কাছে আসিয়া নিরীক্ষণ; ফক্কা তীব্র দৃষ্টিতে চাহিল, কিন্তু সে নড়িল না]

ফক্কা। (গালে চড় মারিয়া) ব্যাটা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখচিস্! যা'না ব্যাটা, দেখচিস্ নে? এখানে মেয়েমানুষ একটা…খুড়ি বৌঠাকরুণ, বৌঠাকরুণ, বৌঠাকরুণ মূর্চ্ছা গেছে…জল নিয়ে আয়—শীগগির!

বেয়া। (হতাশভাবে চাহিয়া প্রস্থান)

ফক্কা। (ভুজঙ্গিনীর পানে উঁকি মারিয়া অধীরভাবে পরিক্রমণ করিতে লাগিল)

ভুজঙ্গিনী ধীরে-ধীরে চক্ষু মেলিল।

ভুজ। (দুই হাত ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া) নাথ…

ফক্কা। জেগেচে, জেগেচে, কথা কয়েচে! প্রিয়ে (জিভ্ কাটিয়া) বৌদি…

ভুজ। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফক্কার কাঁধে ভর দিল; পরে তার বুকে মাথা রাখিয়া) প্রিয়তম…(ফক্কা আড়ষ্ট)

(জল লইয়া চঞ্চলার প্রবেশ। সে-দৃশ্য দেখিয়া তার হাত হইতে জলের গ্লাস পড়িয়া গেল।

চঞ্চলা মূর্চ্ছিতা হইল)

ফক্কা। জল, জল, জল—আঃ, জল গো…(চঞ্চলাকে তুলিয়া ধরিয়া নিজের হাতে রক্ষা করিল)

ভুজ। (আঁটিয়া ফক্কাকে ধরিল) না…

চঞ্চ। আঃ! (ফক্কার বক্ষলগ্ন হইয়া তার পানে চাহিল)

ভুজ। না…(ফক্কাকে ধরিল)

চঞ্চ। ছাড়ো. (ভুজঙ্গিনীর হাত ছাড়াইয়া ফক্কাকে বেড়িয়া ধরিল)

ভুজ। না। আমার স্বামী..(আঁকড়াইয়া ধরিল)

ফক্কা। হ্যাঁ, স্বামী···(হেলিল)

চঞ্চ। আমার দ্যাওর···(ফক্কার হাত ধরিল)

ফক্কা। হ্যাঁ, ছাওরই তো...(হেলিল)

ভুজ। স্বামী...

চঞ্চ। ছাওর...

ভুজ। কতদিন পরে স্বামীকে পেয়েচি! আমার স্বামী···

চঞ্চ। কতদিন পরে ছাওরকে পেয়েচি—আমার ছাওর...

ফক্কা। ভালো জ্বালা! ধেৎ তেরি! [আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া সবেগে প্রস্থান; চঞ্চলা ও ভুজঙ্গিনী অবাক হইয়া পরস্পরের পানে চাহিল, অত্যন্ত হতাশভাবে। পরে

গান

উভয়ে। ঐ যাঃ!
পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে, পালিয়ে গেছে রে!

ভুজ। আমার স্বামী···

চঞ্চ। ··· ···আমার ছাওর...

ভুজ। আমার...

চঞ্চ। ... ... ···আমার সে!

উভয়ে। আকুল দুটী নয়নে হায়, আমায় চেয়েছে!

ভুজ। কতদিনের আশার মুকুল ফুটিয়ে তুলেচি!

চঞ্চ। সদ্য-পতি-মরার জ্বালা হায় গো, ভুলেচি!

ভুজ। তোমার তরে...

চঞ্চ। ... তোমার তরে

উভয়ে। ... (পাখী) শেকল কেটেচে!

ভুজ। যৌবনেরি সাথী আমার, তরুণ পথিক ও...

চঞ্চ। কনে-বোয়ের বন্ধু, ছাওর, ভাই প্রাণাধিক গো...

উভয়ে। দোটানাতে পড়ে কোথায় ভেসেছে সে রে!

[উভয়ে উভয়ের পানে সাভিমানে চাহিল; পরে উভয়েই প্রস্থান করিল]

বিষ্কম্ভক

গান

পকেট যখন ভর্ত্তি থাকে, ফুর্ত্তি তখন ভারী—
রঙীন সারা দুনিয়াটা, বেজায় মনোহারী!
কুহুমে পাই মধুগন্ধ, ঝরে পাখীর গানে ছন্দ,
প্রিয়ার মেজাজ খাসা মিঠে, কথা সরস তাঁরি!
সদাই বহে বসন্ত-বায়, সবাই সেলাম জোগায় এ পায়···
ধরণী হয় শুধু সুখের, বন্ধুরা দেন সারি—
পকেট যখন ভর্ত্তি থাকে ফুর্ত্তি তখন ভারী!

পকেট যখন হা-হা করেন, একেবারেই খালি...
ফাগুনে হায়, জষ্টি আসে, চাঁদে ঢালা কালি!
মেজাজ ভারী তিক্ত... পকেট যখন রিক্ত...
প্রিয়া খোঁজে আছেন, তাঁর কথায় ঝরে গালি!
বন্ধুহীন গেহ, হায়, কোথাও নাই কেহ!
বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে শুধুই ভস্মে ঘী ঢালি!
পকেট যখন হা-হা করেন, একেবারেই খালি!

একখানি চিঠি হস্তে চঞ্চলার প্রবেশ

চঞ্চ। চিঠি কার এলো আবার! ইংরিজীতে ঠিকানা লেখা। আমার নামে! খাম! দেখি···

লক্কাবেশী ফক্কারামের প্রবেশ

ফক্কা। রাত্তিরটা তাহলে কি পথে-পথেই কাটাতে হবে?

চঞ্চ। তা কেন! তুমি ওর সামনে যেমন বললে, বায়োস্কোপে যাচ্ছ, তেমনি বায়োস্কোপ দেখবার নাম করেই বেরোও; তারপর আমি ওর সঙ্গে বিনিয়ে বিনিয়ে কথা কয়ে একধারে ওকে আটকে রাখবো'খন। সেই ফাঁকে তুমি এসে চিলকোঠাতে উঠো...তারপর অবসর বুঝে আমি তোমায় ঐ-ঘরে নিয়ে আসবো।

ফক্কা। এমন করে কতদিন চালাবো?

চঞ্চ। ঐ টাকাটা যতদিন না হাতে আসে!

ফক্কা। যাক্, মিছে আর মাথা ঘামাই কেন! তাহলে যাত্রাই করি। ও চিঠি কার, তোমার হাতে?

চঞ্চ। পড়িনি। দেখি...(পত্র পাঠ; পাঠান্তে চিন্তায় শিহরিয়া উঠিল)

ফক্কা। কি গো? আঁৎকে উঠলে যে!

চঞ্চ। পড়ে ছাখো! এ যে সর্ব্বনাশে চিঠি! এঁ্যা, কি হবে এখন?

ফক্কা। তুমিই পড়—আমি শুনি।

চঞ্চ। তবে শোনো···(পত্র-পাঠ)

"শ্রীচরণেষু,—বৌদি-ঠাকুরাণী, অতঃপর ফক্কাদাদার অকস্মাৎ এই অক্কালাভের সংবাদ পাইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। কিন্তু তবু একটা আনন্দের কথা এই যে দাদার আমার সজ্ঞানে ও সশরীরে গঙ্গালাভ হওয়ায় সদ্গতি হইয়াছে। তা, আপনার এই দুঃখে কি বলিয়া আর সান্ত্বনা দিব! শীঘ্রই আপনার শ্রীচরণে উপস্থিত হইতেছি। চেরা-পঞ্জিতে ভয়ানক শীত পড়িয়াছে। ইতি আপনার স্নেহের লক্ষণ-ছাওর শ্রীলক্কাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

ফক্কা। এঁ্যা...

চঞ্চ। এখন উপায়?

ফক্কা। খেয়েচে! তাহলে তো এ-লক্কার বায়োস্কোপ থেকে আর ফেরা চললো না! এই নাও প্রিয়ে, তোমার দাড়ি আর গোঁফ! (কৃত্রিম দাড়ি-গোঁফ খুলিয়া চঞ্চলার হাতে দিল)

চঞ্চ। এখনি না···পর গো পর। কেউ যদি এসে পড়ে! (ফক্কাকে দাড়ি-গোঁফ প্রত্যর্পণ)

ফক্কা। (দাড়ি-গোঁফ আঁটিয়া) এখন আমার উপায় কি হবে, শুনি? কোথায় যাবো, কি যে করবো, কিছুই বুঝতে পারচিনে।

চঞ্চ। কেন, তুমি এতে ভড়কাচ্ছো কেন! তুমি যেমন লক্কা আছ, তেমনিই থাকো। যে-লক্কা আসচে, আসুক সে! আমরা বলবো, সে জাল, এ-ই আসল।

ফক্কা। তা অমনি বললেই হলো! ভুজঙ্গিনী-বৌ রয়েছে···

চঞ্চ। তা...(চিন্তা) ছাখো, ওকে আমি চিনে নিয়েছি। ওকে তাহলে দলে নিতে হবে। তুমি ওর সঙ্গে মেশো, একটু মাখামাখি কর! আমার একটু বাজবে, তা বাজুক গে! কি আর হবে! লোকে যে সতীন নিয়ে ঘর করে—আমারো নয় তাই...ভাববো! তবু এ তো চিরকালের জন্যে নয়!

ফক্কা। যা বলেচো! তোমরা আনন্দ কর, মরতে হয় মরি আমি! একদিকে ঐ ভুজঙ্গিনী-স্ত্রী, আর একদিকে জাল-জালিয়াতির ব্যাপারে আদালত, পুলিশ! গেছি আর কি! ডাইনে-বাঁয়ে খালি ছোবল!..মোদ্দা, তুমি কি করলে বল দিকি! দুদিন না দেখে শুনে একেবারে টুপ্ করে আমায় গঙ্গায় ডুবিয়ে মারলে! তার ওপর শ্রাদ্ধ-শান্তি সেরে দিয়েচো, বাঁচবার আশাটিও রাখো নি! সাধে বলে, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী!

চঞ্চ। আহা, ব্যস্ত হচ্ছো কেন! দাঁড়াও না—মতলব একটা ঠাউরে ঠিক করচি এখনি···

ফক্কা। ঠাওরাও, ঠাওরাও, শীগগির ঠাওরাও...আমার তো হার্ড়ে অবধি কাঁপুনি ধরেচে!

চঞ্চ। (চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক!

ফক্কা। কি ঠিক?

চঞ্চ। তুমি মর...

ফক্কা। মরবো! বেশ, নয় মলুম আবার! মরে এবার কি হবো, শুনি? লক্কার সেই কাবুল-ফেরৎ ঠাকুর্দ্দা?

চঞ্চ। হলে মন্দ হয় না···কিন্তু এটর্ণির চোখে ধরা পড়ে যাবে।

ফক্কা। তবে? একটু ভেবে-চিন্তে ঠাওরাও প্রিয়ে, ফস্ করে একটা-কেউ হইয়ে দিয়ো না এবার।

চঞ্চ। (চিন্তা করিয়া) না, ও যেমন লক্কা আছো, তেমনি থাকো। একটা ফ্যাসাদ দেখলে সে-ও তো রফা করতে পারে। পড়ে-পাওয়া লাখ টাকা বৈ তো না!

ফক্কা। না প্রিয়ে, আমি ঐ আদালত-ফাদালতকে ভারী ভয় করি। ভূত হয়েও মাঝে মাঝে গা ছম্-ছম্ করতো ঐ পুলিশের ভয়ে—ভূত আছে শুনে যদি কোনোদিন খোঁচাতে আসে!...তা ভূত হয়ে তবু একটা আরাম কি জানো?

চঞ্চ। কি?

ফক্কা। ভুজঙ্গিনীর ভুজ-দংশন থেকে মুক্তি পেতুম···

চঞ্চ। তা বটে! আহা, বেচারী! যে-ভাবে তোমায় ও গ্রাস করে, দেখলে দুঃখ হয়, বটে! তা ছাড়া ঐ সময়টায় আমার মনও যেন জ্বলতে থাকে! নাঃ, চারি ধারেই সমস্যা!

ফক্কা। এর আর মীমাংসা নেই।

চঞ্চ। হাসিও পায়! ভুজঙ্গিনী যদি সত্যিই লক্কার স্ত্রী হবে, তো তোমায় দেখে একেবারে ধেই-ধেই করে নেচে ওঠে কি বলে?—এঁ্যা! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, সেই কণ্ঠ! সাবাস্ মেয়ে বটে!

ফক্কা। ইংরীজিতে একটা সেই কথা আছে না... any port in storm, অর্থাৎ ঝড়ের সময় যেখানে পাই ঢুকে আশ্রয় নি,—তাই আর কি! কতকাল স্বামী-বিরহে জোরে আছে, এখন দ্বিধা কি সন্দেহের কথা তুললে যদি

এ্যাও ফস্কায়—কাজেই যে আসে, তাকেই নি! এই আর কি মোদ্দা কথাটা!

চঞ্চ। কার পায়ের শব্দ···না? ঐ যে সুর-ভুজঙ্গিনী আসচেন। পালাও, পালাও তুমি বায়োস্কোপে গেছ যে! তারপর ফাঁকতালে আমার ঘরে গিয়ে থেকো···এর পরে কথা কওয়া যাবে···(ফক্কারামের প্রস্থান)

নেপথ্যে ভুজঙ্গিনী। (সুরে) ও আমার তরুণ পথিক,
ও আমার প্রাণের আলো···

ভুজঙ্গিনীর প্রবেশ

ভুজ। বায়োস্কোপ কখন ভাঙ্গবে, দিদি?

চঞ্চ। কি জানি, বোন্! তবে শুনছিলুম, আজ কি না কি পরব আছে, সারা রাতই বায়োস্কোপ চলবে!

ভুজ। এ্যাঁ!···তাহলে আজ রাত্রে আর জ্যোৎস্না উঠবে না, কোকিল গাইবে না, প্রাণ জাগবে না!···যাবার বেলায় বিদায় নিয়েও গেল না, দিদি! নির্ম্মম, অকরুণ

চঞ্চ। কিন্তু সে কি আর ফিরবে?

ভুজ। দিদি···(তীব্র দৃষ্টিতে চাহিল)

চঞ্চ। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে, ভাই।···নাহলে এত দিন পরে বিদেশ থেকে এলো, আকুলা স্ত্রীকে একাকিনী ফেলে মানুষ বায়োস্কোপে যেতে পারে কখনো!···

ভুজ। দিদি, আমি চির-অভাগিনী, পতি-পাগলিনী, বিরহিণী...

চঞ্চ। সে জাল, নির্ঘাৎ জাল। ধরা পড়ার ভয়ে বায়োস্কোপের নাম করে সরে পড়েছে।

ভুজ। না, না,—সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, সেই কণ্ঠ!···অমন নিষ্ঠুর কথা বলো না! তুমি পতিহারা বলে···

চঞ্চ। তা নয়, ভাই। এই ছাখো চিঠি...

ভুজ। কি হবে দিদি? পেয়ে নিধি আবার হারালুম!

চঞ্চ। আহা, চিঠিখানা পড়োই না···(পত্র প্রদান)

ভুজ। (পত্র পাঠ; চঞ্চলা তাকে নিবিষ্টভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল; চিঠি পড়িয়া স্বগতঃ) যা ভেবেছিলুম, জালই সে! এখন আবার একজন! আর এক পর্ব্ব!···এই চালেই—চলবো···ভড়কালে, হবে না। লাগে তাক, না, লাগে তুক্। (প্রকাশ্যে) দিদি····

চঞ্চ। কি?

ভুজ। এ যে আমারি প্রিয়তম! এ যে তাঁরই মূর্ত্তি জ্বল্-জ্বল্ করে ফুটে উঠচে, চিঠির এই কালো অক্ষরগুলোর মধ্য থেকে!

চঞ্চ। হাতের লেখা, নাম-সই···?

ভুজ। সব ঠিক—সব ঠিক, দিদি! এ যে, এ আমার বুকের নিধি···(পত্র বক্ষে স্পর্শ করিল ও পত্রচুম্বন)

চঞ্চ। তুমি অবাক করলে, বোন্···

ভুজ। কেন?

চঞ্চ। এই যদি আসল, তাহলে যে এসেচে···?

ভুজ। জাল, সে জাল!···না হলে ছাখোনি, আমি যত কাছে কাছে ফিরি, সে তত দূরে দূরে সরে? তখনি আমি বুঝেচি, এ তিনি নন্! নাহলে বায়োস্কোপের নাম করে সরে!

চঞ্চ। আর—সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, সেই কণ্ঠ,...তা···?

ভুজ। ভুল, মোহ!

চঞ্চ। আর তার পেছনে পেছনে ঘুরে তার গায়ে সেঁটে ন্যাপটানো···?

ভুজ। কি করবো, দিদি! আমি যে পতি-পাগলিনী, চির-বিরহিণী···

চঞ্চ। বাঃ, বেশ!

ভুজ। আর জাল নয়, আর ভুল নয়! পেয়েচি, আমার তাকে পেয়েচি! ওগো বঁধু, ওগো আমার প্রিয়তম, নাথ, হৃদয়-বল্লভ, ছোট্ট চিঠির হাতের লেখা···(পত্র বুকে লইয়া) এ তো চিঠি নয়!

গান

এ যে প্রাণের দ্বারে পাখী রে!
এই যে গোটা হরফ ক'টা
এ যে তারি আঁখি রে!
লিখেচে সে কোন্ বিদেশে,—
কালির আখর! চিঠির শেষে
এই যে তারি নাম লেখাটি—
এইটি বুকে রাখি রে!
ওরে আমার চিঠির লেখা,
মূর্ত্তি হয়ে দাও গো দেখা!
আমার প্রাণে স্বপন-রেখা
হাসির ছাঁচে আঁকি রে!

গাতশেষে লক্কাবেশী ধড়ীবাজ প্রবেশ করিল।

ভুজ। এসো, এসো প্রিয়তম··· (পরে বিহ্বলভাবে দুই হাত অভ্যর্থনাচ্ছলে প্রসারিত করিয়া দিল; ধড়ী ভড়কাইয়া সরিয়া গেল)

ধড়ী। এ আবার কি! (চঞ্চলার দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত)

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—ফক্কারামের ঘর

[লক্কাবেশী ধড়ীবাজ; তার গায়ের কামিজ খুব লম্বা ও বড় মাপের; কামিজের উপর গলা-খোলা কোট, অত্যন্ত টাইট্ ছিল; পেটের বোতাম সে কষিয়া আঁটিতেছিল;

এবং ধড়ীবাজের পিছনে ট্রাঙ্ক ও বিছানার মোট মাথায় বেয়াক্কেলে; চঞ্চলার সন্দেহ-কৌতূহলে-ভরা দৃষ্টিতে ধড়ীবাজকে নিরীক্ষণ। ভুজঙ্গিনী থমকিয়া স্থির দৃষ্টিতে ধড়ীর পানে কিছুক্ষণ চাহিল; পরে বিহ্বল হইল; এবং পরক্ষণে একেবারে ঝাঁপাইয়া গিয়া ধড়ীর বক্ষে পড়িল। ধড়ী উৎফুল্ল। বেয়াক্কেলে হতভম্ব]

ভুজ। নাথ···প্রিয়তম...দয়িত···

ধড়ী। (একবার ফন্দী-ভরা দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল; তার পর মৃদু হাসিয়া)···এই যে জীবিতেশ্বরী, নাথ তোমার হৃদয়-তলে!—"হৃদয়ের হার তুমি লো আমার,
প্রেমে তব বাঁধা রব চিরদিন!
চন্দ্রাননি,
বদন তুলিয়ে হেসে কথা কয়ে
প্রবীরের জুড়াও তাপিত প্রাণ।"
আচ্ছা, তারপর আরো শোনো, প্রিয়তমে,—
"কর লো প্রত্যয়,
তোমা বিনা আমি কারু নয়!
চোখে চোখে রব, তোমারে দেখিব,
কারু পানে ফিরে নাহি চাব।
হৃদি-সিংহাসনে
যতনে তোমারে দিব স্থান।
যা আছে আমার, সকলি তোমার,
আমি লো তোমার, ধনি!"

চঞ্চ। (বিস্ময়ে নির্ব্বাক ভঙ্গীতে চাহিয়া রহিল)

ভুজ। (হর্ষোৎফুল্ল ভাবে) এতদিনে মনে পড়লো···?

ধড়ী। শুন প্রিয়ে, নহি অপরাধী,
কাজের তাড়নে বরাননে
ঘরে ফেলে পলাইনু।
জানো তুমি,—
স্বেচ্ছায় কি যেতে পারি তোমা ছেড়ে?
ওয়ারীশন-বেশে ফিরিয়াছি দেশে,
তোমারে দেখিতে প্রিয়ে..

ভুজ। কি দারুণ বিরহে—

ধড়ী। এ তনু কি দহে···
বলো না, বলো না আর!

ভুজ। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, সেই কণ্ঠ! এ কি ভোলবার! এ যে প্রাণে প্রাণে গাঁথা—

ধড়ী। নামাবলীর হরফের মত তোমার মুখও আমার এই বুকের ভেতর ছাপা আছে, প্রেয়সি...

চঞ্চ। তাইতো, এ যে অবাক করে দিলে! তবে কি দুজনেই ঠিক? না, দুজনের আগে থেকেই যড় ছিল? তা, ভগ্না ভুজঙ্গিনী, একটা কথা বলছিলুম—

ভুজ। আর কথা নয়, কথা নয়! আমি পেয়েচি, আমার তাকে পেয়েচি—

চঞ্চ। ও তো সেবারও বলেছিলে।

ভুজ। ভুল, ভুল—

চঞ্চ। আর এবারে ঠিক, ঠিক···?

ভুজ। একেবারে ঠিক।

চঞ্চ। আহা, পতি-পাগলিনী বিরহিণী—

ভুজ। আর তা নয়,—এখন পতি-পায়িনী, সম্মিলনী!

বেয়া। তা এ বাক্স কি মাথায় করেই দাঁড়িয়ে থাকবো বৌদি? দোতলায় সেই পাশের ঘরে রাখি গে?

চঞ্চ। না, না, দোতলায় কেন! এই এর ঘরে, তোমাদের এই নতুন বৌদির ঘরে রাখো গে—এর আবার জিজ্ঞেস-পড়া কি!

বেয়া। না, সে নক্কাদাদাবাবু, এলে দোতলায় পাশের ঘরে রাখতে বলেছিলে কি না, তাই শুধুচ্ছিনু, সে-ও নক্কাদাদাবাবু, এ-ও নক্কাদাদাবাবু তো!

চঞ্চ। আরে মর্, এ আবার তর্ক করে!—একবার ঠকেচি, ঠকে শিখেচি, আবার ঠক্‌বো!

বেয়া। না গো, এবারে আর ঠকা নয়, এবারে পাকা! চিনতে পারচো না, সেই বাঁশীর মত নাক···

ভুজ। সেই কাঁশির মত গলা···

ধড়ী। আর এই ফাঁসির মত স্ত্রী···

চঞ্চ। এখনো তবু মাসী বাকী!

ভুজ। (সুরে) এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর, হে সুন্দর,
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর!
সুন্দর হে সুন্দর!

বেয়া। (ধড়ীকে নিরীক্ষণান্তে) এ কি রকমটা হলো! এ নক্কাদাদাবাবুর চালচলনে কথায়-বার্ত্তায় যেন ধড়ী-ধড়ী আদল আসচে না! ব্যাপার কি? একটু পরখ করে দেখি।—(কাছে আসিয়া জামা ধরিয়া টানিল; ধড়ী তাহা লক্ষ্য না করিয়া ভুজঙ্গিনীর পানে চাহিয়া তার গানে তাল দিতেছিল; বেয়াকেলে তাকে মৃদু ধাক্কা দিল)

ধড়ী। চোপরাও (বলিয়া বেয়াক্কেলের গালে চড় দিল)

বেয়া। না, সে নয়। সে হলে কি আমার গালে এমন করে চড় মারতে পারে!

চঞ্চ। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে! যা না ওগুলো নিয়ে—

বেয়া। এই যে যাই! (প্রস্থান)

ভুজ। এবারে খাঁটী স্বামী পেয়েচি—আর তো ছাড়বো না, চোখের আড়ও করবো না আর—

ধড়ী। আমিও নড়বো না। মাথায় চাঁটিই পড়ুক আর লাঠিই ঝাড়ুক, এই মাটী আঁকড়ে থাক্‌বো—

ভুজ। গান

আর তো তোমায় ছাড়বো নাকো
ওগো প্রিয়, কান্ত হে—
অনেক আশার ধন তুমি যে,
পেয়েচি! প্রাণ শান্ত হে!
পথের পানে চেয়ে-চেয়ে
কেটেচে রাত, কতই দিন!
আমার মনের হাহাকারে
জীর্ণ তনু, শরীর ক্ষীণ!
সবার পানেই চেয়েছি গো,
পথের যত পান্থ সে!
তাকিয়ে বটে গেছে তারা,—
থম্‌কে হা, কেউ থামেনি!
আমার আঁখি পলক্-হারা—
এক নিমেষও নামেনি!
তবু সে যে তোমায় পাবো—
মন এ কথা মান্‌তো হে!

[ধড়ীবাজ গানের সময় হাসিয়া মাঝে মাঝে সায় দিতেছিল]

ভুজ। নাথ···(আদর কাড়াইবার প্রত্যাশায় চাহিল)

চঞ্চ। (তাকে টানিয়া সরাইয়া) একটু সরো দিকি—দু-একটা কথা কইতে দাও আমায়। কে এলো কোথা থেকে, জানি আগে···

ভুজ। জানবার দরকার নেই আমার—

চঞ্চ। ভালো জ্বালা! তা, হ্যাঁ ঠাকুরপো, খপর সব ভালো তো?

ভুজ। নিষ্ঠুর, একখানি চিঠিও লিখতে নেই? ছোট একখানি চিঠি?

চঞ্চ। অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে? আসচো কোথা থেকে?

ভুজ। আমায় ভুলে কি করে ছিলে নাথ···!

চঞ্চ। একেবারে এমন বদলে গেছ! চেনা যায় না মোটে!

ভুজ। কিন্তু আমি তোমায় চিনেছি নাথ···পলকে! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, সেই কণ্ঠ!

চঞ্চ। জবাব দিচ্ছ না কেন?

ধড়ী। (পূর্ব্বোক্ত বিবিধ প্রশ্ন-কালে নানা ভঙ্গী প্রকাশ করিতেছিল) ফুরসৎ মিলচে কৈ! যে-রকম তোড়ে দু'জনে জিজ্ঞেস করছেন, সামলাতে পারচি না!

চঞ্চ। আচ্ছা, আগে আমার কথার জবাব দাও...

ভুজ। আমার আগে...

চঞ্চ। আমি বড় ভাজ···

ভুজ। আর আমি স্ত্রী, অর্দ্ধাঙ্গিনী···

চঞ্চ। বেশ তো, তোমার জিনিষ তোমারই থাকবে ভাই—চিরদিন রাখো···আমি তো ক্ষণেকের অতিথি!

ভুজ। হ্যাঁ, আর-বারে একটু দখল নিতে দাওনি!

তা পেলে কি সে যেতে পারে কখনো, আমার হাত পিছলে···!

চঞ্চ। (হাসিয়া) কিন্তু সে তো জাল—তার জন্যে আর ব্যথা কিসের! এই তো খাঁটী!

ভুজ। বুঝি দিদি, সব। তুমি বিধবা, একা, পতি-পাগলিনী, বিরহিণী···কিন্তু সে তো এই ক'দিন—তার আগে···? আমি যে আগে থেকেই এই···পতি-পাগলিনী, বিরহিণী! এখন একটু সুখের আশা হয়েছে, তাতে কেন এমন বাদ সাধচো, দিদি!

চঞ্চ। বাদও সাধিনি, হিংসেও করিনি! এই ছাখো, দূরে দাঁড়িয়ে আছি, তোমাদের কাছেও ঘেঁষিনি! দুটো কথা কইতে দাও শুধু···আপন-জন আমারো তো—

ধড়ী। নিশ্চয়!

চঞ্চ। তাও এই দূরে থেকেই কথা কবো! আমার যেমন, তেমনি তোমারো তো একবার বাজিয়ে নেওয়া দরকার—বিশেষ যখন একটা অমন হয়ে গেল! শেষে এ'ও যদি জাল হয়ে চলে যায়, তুমিই ঘাল হবে, আমি না।··· তা হ্যাঁ ঠাকুরপো; তবে যে শুনেছিলুম, তুমি আসামী স্ত্রী বিয়ে করেচো!

ধড়ী। (বিস্ময়ে) আসামী! না, আসামী কি! তবে ···ওঃ, বুঝচো না বৌদি···সে এক সময় বলবো'খন! হ্যাঁ!··· তা বিয়ে করেচি বটে!

ভুজ। নাথ···(বিষণ্ণ)

ধড়ী। এই যে! এ কি আসামী! ইনি কি আসামী? হয়েছিলেন কখনো···?

চঞ্চ। বছর পাঁচেক হলো, তোমার মাথায় সে লাঠি মারে···

ধড়ী। বছর পাঁচেক! লাঠি! যা বলেচো বৌদি···! তুমি দেখচি, সব জেনে ফেলেচো!

চঞ্চ। হ্যাঁ!

ধড়ী। বছর পাঁচেক আগে···হ্যাঁ, আমি তো তখন জেলে, লাঠি মারায় নয়, একটা cheating caseএ! (জিভ্ কাটিয়া) থুড়ি, কি বলচি! রেলে, রেলে, রেলে চড়ে আসামে যাচ্ছি তখন!

খোন্তা মাসীর প্রবেশ

খোন্তা। এই যে নক্কা, বাবা আমার, এলি রে—ভেজাল্ নোর্স্—খাঁটী নক্কা আমার! গরিব মাসীকে মনে পড়লো বাবা?! (কান্না ও নাকঝাড়া)

ধড়ী। আঃ! (সরিয়া গেল)

চঞ্চ। মাসী। নমস্কার কর···(ধড়ী প্রণাম করিল)

ধড়ী। (প্রণামান্তে) এ্যাঁ, মাসী! তাইতো, তারপর মাসী···

চঞ্চ। যে-সে মাসী নয়, খোন্তা মাসী।

ধড়ী। খোন্তা মাসীই তো বটে! তা, খোন্তা মাসী, আমার নোড়া মামা ভালো আছে তো? গাম্‌লা দিদি? শীল দাদা? দাঁতের ব্যথা সেরেচে তার? জাঁতা মাসী··· এখনো তেমনি ঘুরতে পারে? কাৎলা দিদির কান্‌কো ফুলে জ্বর হয়েছিল, সেরেচে?···বাঁটলো মামার সেই কাণ-চটা? আর হাতা মাসীর হাতের বাত?

খোন্তা। (অবাক হইয়া শুনিল; পরে অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া) এ্যাঁ, এ্যাঁ, তা, হ্যাঁ বাবা, সব ভালো, বাবা, সব ভালো—

ধড়ী। তোমার জন্যে কি মন কেমনই করতো, মাসী! আহা, তোমার হাতের সেই নারকোল নাড়ু! ওঃ, নারকোল গাছ দেখেচি, আর কেঁদেচি যে আহা, মাসী আমার কাছে থাকলে ঐ গাছ কি রাখতো! তার আগাপাস্তলা একেবারে নাড়ুর মুণ্ডুমালা ঝুলিয়ে দিত।

খোন্তা। মনে আছে বাবা, মনে আছে রে নক্কামণি?

ধড়ী। মনে আর নেই! বলে, তোমার সেই আদরে বপুখানি কেমন আছে, দেখচো, একটু টস্কায় নি! এই দ্যাখো, জামার বোতাম আঁটে না!

খোন্তা। আহা, বাছা আমার, বেঁচে থাক্—মোটা হাতী হয়ে থোড়-মোচার বংশ নির্ব্বংশ করে গরাণের খুঁটী হয়ে বসে থাক্ বাবা! তোর ভাবনা কি! কত খাবি, খা'না! তোর নাখ টাকা ঘরে এসেচে, তোর সে মাসী বেঁচে আছে, তোর খাবার ভাবনা, বাবা! বলে, মার্ বোন্ মাসী,—খাওয়ায় তৃপ্ত-বাসী!

চঞ্চ। এরা তো বেশ জমিয়ে তুললে, দেখচি! সব ষড় ছিল, না, এরা সব সত্যি? এ যে অবাক করে তুললে!

[প্রস্থান

ভুজ। এসো নাথ···(ধড়ীকে ধরিয়া আকর্ষণ)

খোন্তা। আঃ, ছাড়ো না বাছা! একালে কি সবই

উল্টোচ্ছিরি! আমি বলে, মাসী রয়েচি যত্ন করতে! না, উনি এলেন দু'দিনের বৌ, আদর জানাতে!—(টানিল)

ভুজ। নাথ···(টানিল)

খোন্তা। এমন বেহায়াপনাও তো দেখিনি, বাছা—! বৌ-মানুষ...স্বোয়ামী নিয়ে মাস্‌শাশুড়ীর সঙ্গে নড়াই করতে লজ্জা করে না! ওমা, ছি ছি আমি যেন সতীন!... গলায় দড়ি! এসো বাবা নক্কা! (টানিল)

ভুজ। কখনো না। (টানিল)

ধড়ী। ওরে বাবা, আমি যে যাই এদিকে!

খোন্তা। ছাড়ো বৌমা, বাছাকে জিরুতে দাও! এলো, দুদণ্ড বাছা আমার জিরুক! দরদ ওঁর উথলে উঠলো! আজ দিদি বেঁচে থাকলে আর এমন হয়! ওগো দিদিগো, কোথায় গেলে গো···!

ধড়ী। আঃ, জামা সামলে নাক ঝেড়ো...মাসী কি যে-ই হও···

খোন্তা। আয় বাবা...(টানিল)

ভুজ। এসো নাথ···(টানিল)

(উভয়ের টানাটানিতে ধড়ীর বিব্রত আধ-ঝুলন্ত অবস্থা ; এবং এইভাবেই ধড়ীবাজ, ভুজঙ্গিনী ও খোন্তা মাসীর প্রস্থান)

বিষ্কম্ভক

গান

যদি কেল্লা ফতে করতে হয়!
যাও বাজিয়ে তুড়ি, হুমকি চালে—
কাঁচু-মাচু মোটেই নয়! (ওগো)
সকল কাজে ধেয়ে যাওয়া,
কীর্ত্তি নিজের কেবল গাওয়া,
কারো পানে নয়কো চাওয়া—
নিজেই মস্ত সর্ব্বময়!
জানোনা যা, তাতেও জোরে
বাজাও গলা,—সাহস কোরে!
তাক্ লাগিয়ে হক্‌চকিয়ে
চল্‌বে,···কারে নাইকো ভয়!
সকলকে গো বানিয়ে বোকা,
কথার ঝড়ে লাগিয়ে ধোঁকা···
চলবে তোফা কথা নিয়েই···
কথায় হবে বিশ্ব জয়!

চঞ্চলা ও বস্ত্রাবৃত ফক্কারামের প্রবেশ

চঞ্চ। আমি কিছু বুঝতে পারচি না। এর চালচলন ভারী জোরের। সত্যিই তবে এলো! কি হবে?

ফক্কা। আমি কি করি, বল! আমি যে এক দফায় মরেচি, ফিরে দফায় ভেগেচি!

চঞ্চ। তার মানে?

ফক্কা। নয়? ফক্কা-আমি মরেচি, আর লক্কা-আমি জাল সাব্যস্ত হয়ে সরে পড়েচি।

চঞ্চ। তবে উপায়? কি করে বোঝা যায়? তুমি নাহলে হবেও না যে! আমি হাজার হোক, মেয়েমানুষ তো···

ফক্কা। সে কথা কি আমি অস্বীকার করচি!

চঞ্চ। ছাখো, ঐ লক্কা হয়েই এসো আবার। এসে বলো, এক বন্ধুর সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা হলো, সে ধরে নিয়ে গেছলো, কাজেই আসতে পারো নি!

ফক্কা। তারপর? যে এসেচে, এ যদি সত্যি লক্কাই হয়? ধরে পুলিশে দিলেই তো লক্কা আবার ফক্কা হবে, আর ফক্কা হয়ে একেবারে ছাঁকা অক্কা, পাকা অক্কা! ভূত হয়ে বাঁচবারো উপায় থাকবে না।

চঞ্চ। ও বললেই হলো যে, তুমি জাল লক্কা? তুমি জোর গলায় বলবে, তুমি লক্কা···! আমি তোমার দিকে।

ফক্কা। আর ওর দিকে ভুজঙ্গিনী-প্রিয়া, খোন্তা মাসী—

চঞ্চ। তা বটে! কিন্তু তা বলে ওকেই ভালো করে না দেখে-শুনে একেবারে লক্কা বলে মেনে নিতে হবে! যে লাখ টাকার জন্যে তুমি মলে, তা পাবে না! মাঝে থেকে বেঁচে-মরে একটা বিদিকিচ্ছি কাণ্ড হয়ে থাকবে···এই বা কি, বাপু!

ফক্কা। এ তো নতুন নয়, প্রিয়ে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে স্বামী চলেচে, সেই তো এমনি বেঁচে মরে আছে!

চঞ্চ। এখন ন্যাক্‌রার সময় নয়, সত্যি...

ফক্কা। একে ন্যাক্‌রা বল? নিজের বাড়ীতে নিজে ভূত, না, চোর হয়ে থাকা!···তুমিই তো ফ্যাসাদ বাধালে! লাখ টাকার সুদ পেয়ে একরকমে চলে যেতো। লাখ টাকার লোভে পড়ে আমিও মলুম, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীটাও মুসাফির-খানা হয়ে উঠলো!

চঞ্চ। না বাপু, আমার কিছু ভালো লাগচে না! ও জাল, নির্ঘাৎ জাল!

ফক্কা। এক কাজ করা যাক্ প্রিয়ে···

চঞ্চ। কি?

ফক্কা। তাকে নয় একবার ডাকাও। এই ভূত হয়েই একবার আলাপ করে দেখি। তেমন বুঝি, চেপে ধরবো!

চঞ্চ। কি করবে, শুনি?

ফক্কা। তুমি তাকে ডেকে এনে জেরা সুরু কর না! তারপর দেখো, কি করি।

চঞ্চ। বেশ, তুমি তাহলে একটু আড়াল হও! আমি তাকে আনচি··· [প্রস্থান

ফক্কা। মেয়েমানুষের বুদ্ধিতে ফস্ করে মরে ভালো করিনি! দু'দিন সবুর করে দেখলে হতো!···সবুর করতে দিলে না আরো ঐ পাওনাদারগুলো! যেমনি শুনেচে, কার উইলে কি টাকা পাবো, অমনি একেবারে এই বাড়ীতেই বসতি করে তুললে!—এ-রকম অভদ্রতায় মানুষ বাঁচতে পারে কখনো! যাই, কি হয় দেখি। একটু গা ঢাকা দি···

[বস্ত্রাবৃত অবস্থায় সন্তর্পণে প্রস্থান

লক্কাবেশী ধড়ীবাজকে লইয়া চঞ্চলার প্রবেশ ; ধড়ীবাজের পিছনে ভুজঙ্গিনী, চিন্তায় কাতর, উদাস তার মূর্ত্তি।

চঞ্চ। শোনো, তুমি যে লক্কা ঠাকুরপো হয়ে এলে, আর বাড়ীর মধ্যে চলেও বেশ গেলে, বিশেষ তোমার এই বৌয়ের কাছে। তা ও যেন তোমার বৌ, ও যেন তোমায় মেনে নিলে, কিন্তু আমরা অত চট্ করে তোমায় মানবো কি করে, বল! বিশেষ যখন লক্কা হলে লাখ মিলবে!

ধড়ী। তা মিলবেই তো···

চঞ্চ। তা আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন কর আগে... (ভুজঙ্গিনীর ভাবাভিনয়)

ধড়ী। বেশ, কি প্রমাণ চাই?

চঞ্চ। তোমার মার নাম, বল?

ধড়ী। ওঃ, এই! ৺বঙ্গসুন্দরী দেবী···বকাসুর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা···

চঞ্চ। আচ্ছা, এ কথা উইলেই লেখা আছে। উইলের লাখ টাকার খপর যে জানতে পারে, এ জানাও তার কাছে সহজ। বাপের নাম?

ধড়ী। কোন্ বাপ্!

চঞ্চ। কোন্ বাপ আবার কি!

ধড়ী। শাস্ত্রমতে বাপ যে অনেকগুলি হয় মানুষের... অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, যস্ত কন্যা বিবাহিতা···তা আমায় অন্ন জুগিয়েচে বরাবর নিধে উড়ে, কেননা, তার হোটেলেই আমার পাত পড়েছে বিশ বছর!···তারপর ভয়ত্রাতা···? সে বাপ আমার পুলিশ কোর্টের তিন উকিল,—সিনিয়ার উকিল রায় বাহাদুর দীননাথ সাঁতরা, মাঝারি ষড়ানন পাঁজা, আর জুনিয়ার বাঞ্ছারাম পরামাণিক! আর যস্ত কন্যা বিবাহিতা? সে তো এই সামনেই একজিবিট্ রয়েচে।

চঞ্চ। বেশ, এর বাপের নামই বল!···ভুজঙ্গিনী, তুমি মিলিয়ে নাও—বল।

ভুজ। না, বলো না, বলতে হবে না!—স্বামী, নাথ··· তাঁকে আবার প্রমাণ দিতে হবে চেনাবার জন্য! আমার মন বলে দেবে না যে, ওরে, এই সে...তোর চির-জীবনের ওগো!

ধড়ী। ঠিক তো! এর ওপর আবার প্রমাণ? মিথ্যে সাক্ষী না হলে বুঝি প্রমাণ হয় না? বাপ ব্যাচারী কবে মারা গেছে—প্রমাণ চাইলে তাকে আন্‌বো কি করে! সে মুল্লুকে আবার সফিনেও পাঠানো যায় না!

চঞ্চ। আচ্ছা—বেশ, বল, একে বিয়ে করেচো তো—বিয়ে কোথায় হয়েছে, আর বিয়ে করে বৌ নিয়ে উঠলে কোথায়? কদ্দিন আগেই বা বিয়ে হয়েছে?

ভুজ। আবার!—না নাথ, তুমি জবাব দিয়ো না! এ যে প্রেমের অপমান!

ধড়ী। দস্তুরমত!—একটু ভুল হলেই,—বুঝলে কি না, (ভুজঙ্গিনীর প্রতি) তুমিও গেছ, আমিও গেছি!—হুঁ, কত দিনের কথা—বলে, মাথার ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, তাতে বিয়েই ভুলে যেতে হয়, তায় এ তো সেই বিয়ের সাল-তারিখ খুঁটী-নাটী!

চঞ্চ। কিন্তু আমি যে আমাদের বিয়ের সব কথা বলতে পারি, প্রত্যেক খুঁটী-নাটীটি—

ধড়ী। তবে আর মেয়ে-মানুষে পুরুষ-মানুষে তফাৎটা কি রইলো, দিদি! আমরা কাছা-কোঁচা দিয়ে কাপড় পরি—আপনারা—তোমরা তা পরো? তবে—? ও কথা বরং এই আমার ইস্তিরীকে জিজ্ঞাসা কর, ও একেবারে নাম্‌তা মুখস্থ বলে যাবে'খন।

চঞ্চ। বটে!

ভুজ। এ-সব কথা কেন আর তুলচো দিদি?—আমি তো স্বীকার করচি যে, ইনিই—ইনিই—

চঞ্চ। থামো। ইনিই!—তুমি তো আরো-একজনকে দেখে মেতে উঠেছিলে, ইনিই, ইনিই! তারপর আজ একে পেয়ে ইনি-ইনি করে ধিন্‌ধিন্‌ নাচছো! আবার আজ রাত্রে ইনি যদি সরে পড়েন, আর কাল আর-একজন আসে, তখন তাকে ধরেও এই রকম ইনিই-ইনিই করবে!

ভুজ। আমার বেদনা বোঝো না তো। আমি যে পতি-পাগলিনী, বিরহিণী—

চঞ্চ। তা বলে, অমনি যাকে দেখবে! শোনো বাপু, আমার সাদা কথা—আমার কেমন সন্দ হচ্ছে—

ধড়ী। কেন! সন্দ কোন্‌খানটায়?

চঞ্চ। শুধু তোমায় কি! তোমাদের গুষ্ঠী-বর্গকে—ঐ মাসী, এই বাঁশী, এই তুমি—

ধড়ী। বাঃ, সন্দ অমনি করলেই হলো!

চঞ্চ। হ্যাঁ। এ্যাদ্দিন সব কোথায় ছিলে? যেই উইল বেরিয়েছে অমনি—

ধড়ী। তাই তো কথায় বলে, বরাত যখন ফেরে, তখন সব দিকেই ফেরে। খোদা যখন ছায়, তখন এমনি ছপ্পর ফুঁড়েই ছায়!

চঞ্চ। আচ্ছা, তুমি তো চেরাপঞ্জিতে থাকতে?

ধড়ী। হ্যাঁ—

চঞ্চ। তোমার লেবুর চাষের খাতা দেখাতে পারো? হিসেব?

ধড়ী। হ্যাঁ, কতক খাতা চেরাপঞ্জির হাইকোর্টে জমা আছে, আর কতক গোলায় আছে। সেখানে গেলেই দেখাবো।

ভুজ। প্রমাণ! এখনো প্রমাণ! আমি বলচি, ইনিই আমার প্রিয়তম, নাথ—তবু প্রশ্ন? না, এ অসহ্য!

খোন্তা মাসীর প্রবেশ

খোন্তা। ও বাবা নক্কা—

ধড়ী। মাসী গো—(ভুজঙ্গিনী ধড়ীকে আগলাইয়া দাঁড়াইল)

খোন্তা। ওরে, চোখের আড় একটু সইছে না যে রে! (ধড়ীকে ধরিল)

ধড়ী। এবারেই গেছি।

বস্ত্রাবৃত-মূর্ত্তি ফক্কারামের প্রবেশ

(তার কথা নাকি-সুরে)

ফক্কা। নেহি মান্‌তা!—আমি এসেচি!

চঞ্চ। ওমা, এ কে?

খোন্তা। ও বৌমা—

ধড়ী। কে বাবা, ভূত?

ফক্কা। আমি ফক্কা। বড় খিদে পেয়েচে—আমি সব খাবো। এরা কারা? এত লোক?

খোন্তা। (কাঁপিতে-কাঁপিতে) ও বাবা, আমি মাসী হই বাবা, খোন্তা মাসী যে—

ফক্কা। মাসী! আমি মাসীর মাংস বড় ভালোবাসি! মার বোন্‌ মাসী, গাওয়া-ঘীয়ে-ভাজা-লুচি-খাওয়া মাসী!

খোন্তা। (ভীত সন্ত্রস্ত হইল)

ফক্কা। আমি মাসী খাবো, মাসী!

খোন্তা। ও বাবা, এ বলে কি! ও বৌমা—মাসী খাবে কি!

ফক্কা। হ্যাঁ, খাবো, খাবো। শুধু গঙ্গাজল খেয়ে আছি, তাতে পেট ভরে না। কেমন মাসী—gram-fed mutton যেন! মোটা হাত, মোটা পা—নাদুস-নুদুস্‌ মাসী!

খোন্তা। ও বৌমা, বাঁচাও বৌমা!—আমি যে এতকাল ধরে বুড়ো হাড় কখানা মাষে ঢেকে রেখেচি, কোনমতে অন্ত্যকালে গঙ্গা পাবো বলে—

ফক্কা। আমার পেটেও গঙ্গা বইচে…অঢেল জল!

খোন্তা। ওরে বাবা! রক্ষে কর বৌমা, কোথায় গঙ্গা পাবো, না, কড়মড় করে আমার ন্যাজা-মুড়ো-হাড়গোড়-শুদ্ধ চিবিয়ে খাবে!—একে বেতো শরীর, তাতে দাঁত বসালে মরে যাবো গো, বড্ড নাগবে, বাছা—

ফক্কা। আমি মাসী খাবো, খাবোই আমি!—বড় খিদে!

খোন্তা। তুমিই এ ফ্যাসাদ বাধালে বৌমা! তোমার নোকজন দেখে ভস্ম পেতে নাগলো—তুমি গঙ্গা করলে না! ও বাবা ফক্কাধন, একটু চেপে থাকো সোনা, কেউ না করে, আমি তোমার গয়া করে আসবো মাণিক, গতি হবে তোমার তাতে—

ফক্কা। গতি নয়, গতি নয়—খিদে, বড় খিদে—মাসী খাবো।

খোন্তা। ও বৌমা, মানা কর না মা! ও বাছা, এই সত্যি বলচি গো, কাল ভোর হলেই আমি তোমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো মা! কাজ নেই আমার এ ঐশ্বয্যিতে!

চঞ্চ। তাই করো। এখন শীগগির পালাও মাসী—

খোন্তা। ওরে বাবা, কি করে পালাবো গো, সামনে দিয়ে!

চঞ্চ। আমি আড়াল করচি এই! তুমি রাম-নাম বলে পালাও—

খোন্তা। ওরে বাবা, ও মূর্ত্তি দেখলে সে-নাম মুখেও আসে না যে ছাই! ওরে বাবা—রাম-রাম-রাম-রাম-রাম—(সতর্কভাবে কম্পিত কলেবরে প্রস্থান)

ফক্কা। এবার তোমার পালা! তুমি…?

ধড়ী। আমি লক্কা,—

ফক্কা। আবার বলে, লক্কা!

ধড়ী। হ্যাঁ বাবা, প্রমাণ ঐ স্ত্রী ভুজঙ্গিনী দেবী, আর ঐ খোন্তা মাসী!

ফক্কা। দুত্তোর প্রমাণের নিকুচি করেচে! আমি বলচি, তুমি জাল!

ধড়ী। কিন্তু তার আগে ভূতেরও নিকুচি করেচে! তুমি কে বট হে? (আচরণে বস্ত্র টানিয়া দিল)

ফক্কা। আমি! (সহজ স্বাভাবিক স্বরে) আমি ফক্কা… তোর মাথা ভাংবো।

ধড়ী। কেন বাবা?

ফক্কা। তবে সরে পড়্‌।

ধড়ী। লাখ টাকা, বাবা—সরছি না।

ফক্কা। লাখ টাকা…?

ধড়ী। হ্যাঁ বাবা, লাখ টাকা, সরা যায় না।

ফক্কা। তবে সইয়ে রাজী আছো?

ধড়ী। কি সই?

ফক্কা। আধা-আধি বখরা…পঞ্চাশ-পঞ্চাশ…কেমন?

ধড়ী। বহুৎ আচ্ছা!…কিন্তু মরা লোকের সঙ্গে দলিল, আদালতে গ্রাহ্য হবে কি! তুমি তো মরেচো!

ফক্কা। বাঁচতে কতক্ষণ! বাঁচবো…

ধড়ী। কিন্তু লোকে শুনবে কেন? তুমি যে গঙ্গায় ডুবে মরেছ, শ্রাদ্ধ হয়ে গেছে…

ফক্কা। সে ভাবনা আমার। না হয় তুমিও ডুববে। এমনি না ডোবো, আমি চুবিয়ে ডোবাবো।

ধড়ী। কেন, বাবা? কি করেছি বাবা?

ফক্কা। যেহেতু, যতদিন আমি বেঁচে আছি, লাখ টাকার ত্রিসীমাও তুমি মাড়াতে পারবে না, উইলে লেখা আছে। আমি মলে তোমার লাখ—

ধড়ী। হ্যাঁ বাবা।

ফক্কা। আর তুমি মলে লাখ টাকা পাবে আমার স্ত্রী চঞ্চলা। দু'দিক ঠিক আছে, কেবল তুমি মাঝে থেকেই যত গোল পাকিয়েছ!

ধড়ী। তা পাকিয়েচি, বাবা!

ফক্কা। সে গোলটুকু ডাণ্ডায় চ্যাপ্‌টা করে দিলেই আমাদের পোয়া বারো।

ধড়ী। তা ঠিক, বাবা।

ফক্কা। কাজেই। তা ছাখো, ডাণ্ডায় রাজী? না, ঐ অর্দ্ধেক বখরায় রাজী?

ধড়ী। অর্দ্ধেকই ভালো, বাবা! আমি ও ডাণ্ডা-ফ্যাসাদ ভালো বাসি না।

ফক্কা। তবে সই দাও। (কাগজ ও ফাউণ্টেন পেন বাহির করিল)

ধড়ী। সাদা কাগজে?

ফক্কা। আলবৎ! নাহলে (মুষ্টি দেখাইল)—

ধড়ী। বেশ বাবা,—সাদা, সাদাই সই!

ফক্কা। আমিও সাদাসিধে মানুষ,—সাদা কাগজে সই নি। সই কর।

(ধড়ীর কথাবৎ কার্য্য)

নেপথ্যে জমাদার্ণী। ওরে ও বেয়াক্কেলে, ডাকওলা কি চিঠি এনেচে, বলচে যে!

চঞ্চ। (ফক্কারামের প্রতি ইঙ্গিত)

ফক্কা। বেশ, আমি এখন—(বস্ত্রাবৃত হইল)

(জমাদার্ণীর চিঠি লইয়া প্রবেশ; ফক্কারামকে দেখিয়া শিহরিয়া চিঠিখানা ফেলিয়া দিয়াই তার কম্পিত কলেবরে পলায়ন)

ফক্কা। পোষ্টকার্ড! কার চিঠি? (চিঠি লইয়া) বৌদি-ঠাকুরাণী! তাখো, আবার কে আসে!

চঞ্চ। (পত্র লইয়া পাঠ; পাঠান্তে ভ্রূভঙ্গী-সহকারে ধড়ীবাজের পানে চাহিল)

ফক্কা। কি গো, কার চিঠি?

চঞ্চ। এই শোনো···(পত্র পাঠ) "পরে বৌদি, ফক্কা-দাদার অকাল-মৃত্যুতে বড়ই দুঃখ হইল। কি করিবে, সবই ভগবানের হাত! আমি সোমবার সকালে পৌঁছিব। ইতি স্নেহের দেবর শ্রীলক্কাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

ফক্কা। আবার লক্কা! (ধড়ীবাজের প্রতি) কি হে, শুনচো তো?

ধড়ী। আজ্ঞে শুনলুম। তা বলুন, আমায় কি করতে হবে?

ফক্কা। তুমি যে একেবারে সবিনয় নিবেদন হয়ে গেলে হে! তা হলে তুমি জালই?

ধড়ী। আজ্ঞে, বলেচি তো! ভদ্দর লোকের এক কথা!

ফক্কা। তোমায় তাহলে পুলিশে দেবো?

ধড়ী। ঐটি করবেন না শুধু! পুলিশকে আমি কেমন সহ্য করতে পারি না। তা-ছাড়া তাতে আপনারো কিছু মুস্কিল হবে।

ফক্কা। আমার আবার মুস্কিল কি!

ধড়ী। আজ্ঞে, আধাআধি বখরা নিতে রাজী হয়েচেন কি না!

ফক্কা। তাতে কি?

ধড়ী। আমার যদি ছ'মাস জেল হয়—তা হলে আধা-আধি বখরায় আমার তিন মাস, আপনার তিন মাস। তা ছাড়া—

ফক্কা। তা ছাড়া আবার কি!

ধড়ী। পুলিশ-কোর্টে সাক্ষী দিতে যেতে হবে তো!

ফক্কা। হুঁ! তা হলে কি করবে, বল দিকি···

ধড়ী। আজ্ঞে, অনুমতি করেন যদি তো আপাতত বিদায় নি।

ফক্কা। তার পর?

ধড়ী। আজ্ঞে, যিনি আসচেন, তাঁকেও দেখুন, বুঝুন। তাঁকে সরাতে পারলে খপ্পর দেবেন,—সই-মাফিক বখরা নিতে আসবো তখন!

ফক্কা। বটে! আর যদি তিনি···

ধড়ী। না সরেন, অভদ্রতা কোরে! তা হলে এই পর্য্যন্ত। বিষয়ান্তরে মন দিতে হবে। তবে একটা কথা বলে যাই মশায়, যিনি আসচেন, তাঁর পিছনে যদি এই খোন্তা মাসী আর নোন্তা স্ত্রীকে এমনি লেলিয়ে তুলতে পারেন, তা হলে তিনি দু'দিন টেঁকতে পারবেন না। লাখ টাকা বেশ লোভনীয়, কিন্তু তার দোরে এই দুই মূর্ত্তি! থানার পুলিশ কোথায় লাগে! আমি নেহাৎ ধড়ীবাজ, তাই ওদের নিয়ে খেলছিলুম! তা আপাততঃ চললুম,—দেখবেন, বেইমানী করবেন না···আধা-আধির বখরাদার! তা হলে, নমস্কার! (প্রস্থান)

চঞ্চ। দেখলে, সরলো। গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ হচ্ছিল, এ জাল!

ফক্কা। তা তো দেখলুম। মোদ্দা আবার চিঠি! আবার লক্কা! কথায় বলে, বারে-বার তিনবার। তা দু'বার ফক্কা হলো, এবারের লক্কা যদি টক্কা হয়ে ওঠে?

চঞ্চ। বেশ তো, তার সঙ্গেও এই আধাআধি বখরার সর্ত্ত কর! সেও যখন দেখবে, তুমি বেঁচে আছ, মরোনি, তখন কবে সেই লাখ টাকা পাবো বলে বসে না থেকে সদ্য অর্দ্ধেকে রাজী হতে পারে তো! আর যদি জাল হয়···

ফক্কা। কিন্তু আমি তো বেঁচে নেই, প্রিয়ে···

চঞ্চ। কি রকম?

ফক্কা। তার পর বাঁচাও শক্ত এখন। জলজ্যান্ত জলে ডুবে মরেচি, পাঁচজনে শ্রাদ্ধয় লুচি ছোলার ডাল খেয়ে গেছে, তারা তো আর জাল নয়, তারা আমার আবার বাঁচা মেনে বেইমানী করবে কি করে, বল?

চঞ্চ। তাইতো (চিন্তা)! তা এক কাজ করলে হয় না? না—তা—আচ্ছা, ভেবে দেখি।···যেমন ফস্ করে মরে ছিলে, তেমনি ফস্ করে বাঁচা চাই! পরামর্শ করা যাবে এখনি।···এখন এ চিঠির কথা পিসেমশায়কে একবার জানাই। এবারকার লক্কার সঙ্গে তিনি এসে বোঝাপড়া করুন।

ফক্কা। বেশ। তা হলে ভূতেরও এবার গয়া!

চঞ্চ। হ্যাঁ, এখন সর, কারা আসচে।

(উভয়ের প্রস্থান

লাক্কবেশী ধড়ীবাজ ও ভুজঙ্গিনীর প্রবেশ

গান

ধড়ী। ছাড়ো, আমায় ছাড়ো!
লাখের ওপর বাহুর এ পাক—সইতে ভাঙ্গে হাড়ও!
(প্রিয়ে, বইতে ভাঙ্গে ঘাড়ও)
তার ওপরে ভূতের বাসা·····

ভুজ। ··· ··· ··· ··· এই বুকে হে রাখবো খাসা!
নিদয় হয়ে কেমন করে এমন কথা পাড়ো!
বঁধু কেমন করে পাড়ো!

ধড়ী। তোমায় নিয়ে? ওরে বাবা!···আঁৎকে জীবন যাওয়া!

ভুজ। ভয় কি হে নাথ, আমার প্রেম এ, কোমল মধু হাওয়া!

ধড়ী। যাও না চলে মধুপুরে···প্রেমের তাঁবু গাড়ো···
সেথা ও প্রেমের তাঁবু গাড়ো!

খোন্তা মাসীর প্রবেশ

খোন্তা। আমায় ছেড়ে যাবি কোথায়, ওরে বাবা নক্কা রে—
ভেঙ্গে বাদাড় এলুম হেথা···এসে দেখি মক্কা এ!
(নাক ঝাড়া)

ধড়ী। মক্কা-কাশী, যাও না মাসী,···সরে গে নাক ঝাড়ো!
মোদ্দা, সরে গে নাক ঝাড়ো!
(সকলের প্রস্থান)

চঞ্চলা ও লক্কাচন্দ্রের প্রবেশ

লক্কা। ক্ষেপেচো বৌদি, লেবুর চাষ! বাইরে থাকলেই দেখি, লম্বা গল্প রটে এখানে! কে যে রটালে এ কথা! চেরাপঞ্জিতে লেবুর চাষ! হুঁঃ, বলে, ঘুরে ঘুরেই জীবনটা কাটলো, কিছু করতে পারলুম না! যেমন লক্ষ্মীছাড়া, তেমনি লক্ষ্মীছাড়াই আছি।...দেশে এককাঁড়ি দেনা রেখে গেছি, ফেরার উপায় রাখিনি, তাই ফেরার!

চঞ্চ। দেনা! এঁর সঙ্গে বেশ মিলচে যে! কথায় বলে, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই! তা—

লক্কা। হ্যাঁ। মোদ্দা আমি শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি, এর মধ্যে দু'জন লক্কা এসে আসরে দেখা দিয়ে গেছে···

চঞ্চ। বল কেন! ঐ যে উইলে আছে, লাখ টাকা পাবে লক্কা।

লক্কা। আমি কি ছাই জানতে পেরেছিলুম! চাটগাঁয় এক ব্যাটা পাহারাওলাকে ঠেঙিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলুম! একদিন ক্ষিদের জ্বালায় এক পয়সার মুড়ি কিনি। তা মুড়ি দিলে তারা একটা কাগজের বগলিতে। মুড়ি খেয়ে সেই কাগজখানা হঠাৎ পড়ে দেখি, একটা বিজ্ঞাপন! ফক্কা দাদা জলে ডুবে মারা গেছে, আর তার মাসতুতো ভাই লক্কাচন্দ্র লাখ টাকা পাবে—কি না কি কার উইল বেরিয়েছে! পড়ে আমি তো অবাক! তাই তোমার একটা পোষ্টকার্ড লিখে বেরিয়ে পড়লুম।

বেয়াক্কেলের প্রবেশ

চঞ্চ। তোমায় চিনতেও কষ্ট হলো না তো! কিছু বদলাও নি!...আপনার লোক, সত্যি! না হলে ক্রমাগত এই লক্কার পর লক্কা এসে এমন হাঁফ ধরিয়ে দিয়েছিল যে, আমারো অক্কা পাবার জো হয়েছিল!

লক্কা। এটর্ণিকে একখানা পোষ্ট কার্ড আমি লিখে দিয়েছি। কাগজটায় এটর্ণির নাম-ঠিকানা দেওয়া ছিল কি না! মোদ্দা, সুখ হচ্ছে না, বৌদি। ফক্কা দাদা নেই? আচ্ছা, তা জলে যে ডুবলো মানুষ···অনেক সময় এমন পাওয়াও তো যায়! কতদূরে ভেসে গিয়ে চড়ায়, কি কারো নৌকোয় ওঠে!···যদি কোনো চড়াতেই উঠে থাকে?

চঞ্চ। (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার বরাতে তা কি হবে, ভাই! যাক্, এবার বৌয়ের সঙ্গে দেখা কর!

লক্কা। বৌ!

চঞ্চ। হ্যাঁ, বৌ! তোমার আসার আগেই এদিকে মাসী এসেছিলেন, বৌ এসেছে। তা মাসী চলে গেছে, বৌটি এখনো আছে! ভুজঙ্গিনী গো···

লক্কা। ভুজঙ্গিনী! বৌ! তুমি যে অবাক করলে বৌদি! আমি বিয়েই করিনি মোটে···

চঞ্চ। আর ভাই, অবাক কি! বিশ্বাস না হয়, ঐ ছাখো···

বেয়া। ছাও! এই বারে ঠিক বোঝা যাবে।

ভুজঙ্গিনীর প্রবেশ

ভুজ। (প্রথমে দূর হইতে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া, পরে) এলে···! নাথ···(আগাইয়া আসিয়া লক্কার হাত ধরিল)

লক্কা। (লাফাইয়া সরিয়া) এ্যাঁ···

ভুজ। (সহাস্য ভঙ্গীতে) প্রাণেশ্বর···

লক্কা। আপনি ভুল করচেন, সরও নই, ননীও নই, আমি জলো দুধ!

ভুজ। প্রাণনাথ···

লক্কা। ...না, এবারে কাৎ!

ভুজ। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, সেই কণ্ঠ!

চঞ্চ। দু'বার ঐ বলে ঠকেচো বোন্! এবারে যাত্রা বদলাও!

ভুজ। বারে-বার তিনবার! এবার আর ভুল নয়, মোহ নয়···

চঞ্চ। এবারে খাঁটী···না?

ভুজ। নির্ম্মম, নিষ্ঠুর···

লঙ্কা। আরে দূর, কি এ! শুনুন তবে, সুন্দরী, আমি কস্মিনকালেও বিয়ে করিনি।

ভুজ। কমলা লেবুর তীব্র গন্ধে এ কি বিস্মৃতি, নাথ!

লঙ্কা। শব্দশাস্ত্রে ভুল হচ্ছে। বিস্মৃতি নয়, বিস্ময়, বেবাক বিস্ময়! কমলালেবুর চাষ যিনি করেচেন, তাঁকে চান্ যদি তো আসামের ক্ষেতে সন্ধান করুন গে।

ভুজ। সেই পরিহাস, সেই ব্যঙ্গ!

লঙ্কা। ব্যঙ্গ নয়! আপনার রঙ্গ দেখে, অঙ্গ আমার ভয়ে শিউরে উঠচে!

ভুজ। নাথ···

লঙ্কা। আবার! আচ্ছা, ফিরিস্তি দি, শুনুন! দশ বছর তো আমি দেশ-ছাড়া। প্রথম বছরে ঘুগনিদানার ব্যবসা করে দু'শো সাতান্ন টাকা লোকসান, আর বাজারে তিনশো বারো টাকা দেনা করে সরে গেলুম শিবপুর। সেখানে বাইসিক্ল-সারাবার দোকান ফাঁদি, এগারোটি টাকা মূলধন নিয়ে। দু'খানা চোরাই সাইকলের গন্ধে পুলিশ এলো, ভাঙা বেড়া টপকে আমি লম্বা দিলুম·· হুগলিতে। পকেটে ছিল, এক টাকা সাত আনা তিন পয়সা। তাতেই ষ্টেশনারীর দোকান খুললুম। একদিন চুরি হলো। দোকানের পাপোষের তলায় সাড়ে তিনটে পয়সা পড়ে ছিল, চোর-ব্যাটাদের নজর পড়েনি! তাই ট্যাঁকস্থ করে গেলুম সহর বর্দ্ধমান। সেখানে পুরোনো বইয়ের দোকান খুললুম। সেখানেও এক চোরাই হাঙ্গামে পড়লুম! মবলগ তিন টাকা সাড়ে সাত পয়সা নিয়ে বর্দ্ধমান ছাড়লুম। ছেড়ে চলে এলুম টালায়···

চঞ্চ। টালায়!

লঙ্কা। টালায় এসে কয়লার দোকান খুললুম, এক অংশীদার নিয়ে। বনছিল না। মাল আনবো বলে দোকানের চারশো টাকা নিয়ে লম্বা দিলুম। দিয়ে উঠলুম গিয়ে যশোর। সেখানে এক স্বদেশী ইনসিওরেন্সের এজেণ্ট হয়ে নানা দেশ-ভুঁই ঘুরে পয়সা-কড়ি আদায় করে খেয়ে বেড়াচ্ছিলুম। এই ঘুরতে-ঘুরতেই শেষ আসি চাটগাঁয়। সেখানে পুলিশ ঠেঙিয়ে অজ্ঞাতবাস করার সময় ঐ মুড়ির ঠোঙায় এটর্ণির নোটীশ দেখলুম!···বল তো বাপু, এর মধ্যে বিয়ের ফুরসুৎ পেলুম কখন্!

চঞ্চ। সত্যি, তাহলে তোমার তো আর এখানে কোনো আশা দেখচি নে!

ভুজ। ওঃ! (দীর্ঘশ্বাস)

চঞ্চ। আর ত্যাখো ঠাকুরপো, আর-কিছুতেও যদি তোমায় এঁর মাসতুতো ভাই বলে না চিনতুম, তোমার এই ব্যবসার বাতিকে ঠিক চিনে ফেলতুম যে, হ্যাঁ, এ আর নতুন নয়, এঁরি চিরকেলে পুরোনো সুযোগ্য মাসতুতো ভাই!

লঙ্কা। বটেই তো! (ভুজঙ্গিনীর প্রতি) তাহলে আর মিছে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন! বিশাল সহর কলকাতা··· আর কেউ না হোক্—মাসিক-পত্রে কবিতা-লেখা কবির অভাব নেই···চেষ্টা করুন···তারা লুফে নেবে'খন! আমার দ্বারা কোনো সাহায্য হবে না। মাপ করবেন।

ভুজ। হা রে হতভাগিনী, পতি-পাগলিনী বিরহিণী! কি যে বেদনা বক্ষে···

চঞ্চ। জমাদার্ণীকে বলে একটু চুণ আর একটু হলুদ চেয়ে নাও গে—দুটোয় মিশিয়ে প্রলেপ দাও...সেরে যাবে।

ভুজ। ওঃ তায় পরিহাস! দরদ নাই?···যাই। ওঃ!··· তা আমায় একটা গাড়ী আনিয়ে দেবেন তাহলে, আর ভাড়াটা···

লঙ্কা। এই যে ভাড়া আমি দিচ্ছি। (দুইটি টাকা ফেলিয়া দিল) আর গাড়ী? (বেয়াক্কেলেকে দেখিয়া) এই যে—কে রয়েচে! যা তো বাবা, চটপট্ একটা গাড়ী দেখে দে।

বেয়া। (ফন্দী-ভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া ঘাড় নাড়িল)

ভুজ। ওঃ! আঃ! (সুরে)

মাধব, পরিণাম নিরাশা!
বিফল এ রূপ হারে, তন্-মন্-যৌবন,
বিফল, বিফল ভালোবাসা! [প্রস্থান

[বেয়াক্কেলের তৎসঙ্গে প্রস্থান।

জমাদার্ণীর প্রবেশ

জমা। পিসেমশায় গো দিদিমণি—সেই জালা পিশির···

চঞ্চ। এইখানে পাঠিয়ে দে। (জমাদার্ণীর প্রস্থান) সেই এটাণ। আমার আবার পিসেমশায় হন্! এই যে···

এক বাণ্ডিল কাগজ হাতে রক্তবীজের প্রবেশ

রক্ত। একখানা চেয়ার রে, খেঁদি—মোটা মানুষ, দাঁড়াতে পারি না, কেমন হাঁফ ধরে!

চঞ্চ। (চেয়ার আগাইয়া দিল; রক্তবীজ বসিল) এই আমার লঙ্কা ঠাকুরপো, পিসেমশায়। আর জাল নয়, আদি, অকৃত্রিম লঙ্কা একেবারে!

রক্ত। প্রমাণ?

লঙ্কা। ওঃ, ইনি আবার প্রমাণ চান্! আইনের ব্যবসা করেন কি না!—তা কি প্রমাণ চান্, বলুন? ব্যবসার বাতিক, দেনা, ফেরার···আরো চান্?

রক্ত। (নিরীক্ষণ করিয়া) নাঃ, ফক্কারামের মাসতুতো ভাই তুমি ঠিক! বকাসুরের বংশ, ঘুঘুরামেরই নাতি বটে! ৺গ্যাঁড়ারামের পুত্র ঘুঘুরাম

চঞ্চ। আরো সেরা প্রমাণ আছে, পিসেমশায়···সেই গায়ে-ত্যাপ্টানো ভুজঙ্গিনী বৌটি একে দেখে ছিটকে সরে গেছে!

রক্ত। ভালো, ভালো। তা উইলের খপর সব জানো?

লঙ্কা। এসে বৌদির কাছে শুনেচি সব।

রক্ত। বেশ কথা! তবু সে শোনা কথা! শোনা কথার আইনে কোনো দাম নেই! এই উইল, নিজেই পড়··· (উইল দিল)

লঙ্কা। দিন্! (উইল পাঠ)

নেপথ্যে গান

হরি বল মন-রসনা!
পয়সা-কড়ি পায়ের দড়ি, বাঁধা পড়ার ধিক বাসনা!

চঞ্চ। (সচকিত ভাবে) ঠাকুরপো···পিসেমশায়... (রক্তবীজকে ধরিল; রক্তবীজ চমকিয়া চেয়ার হইতে উল্টাইয়া পড়িয়া গেল) আহা-হা, ওঠো পিসেমশায়, এখন পড়বার সময় নয়! (তুলিল; রক্তবীজ চেয়ারে বসিল)

রক্ত। কি হয়েচে রে খেঁদি?

চঞ্চ। ঐ—ঐ—ঐ—(নেপথ্যে উক্ত গান; চঞ্চলার চঞ্চল-ভাব) ডাকো, ডাকো—

লঙ্কা। কাকে? কাকে বৌদি?

রক্ত। কাকে রে, খেঁদি?

চঞ্চ। ঐ—ধিক্-ধিক্ ধিক্-ধিক্—ধিক্ বাসনাকে! আমার প্রাণ ধিক্-ধিক্ করচে! ঠাকুরপো, পিসেমশায়—

লঙ্কা। ধিক-বাসনা!

রক্ত। সে আবার কি রে!

চঞ্চ। ওগো, ঐ যে গো—ওগো, সেই ভীষণ গলা, সেই বীভৎস সুর যে গো—

লঙ্কা। কার?

নেপথ্যে গান

ওরে, বাঁধা পড়ার ধিক বাসনা!

চঞ্চ। ঐ যে গো, ঐ—ডাকো ডাকো—

ছিন্নবস্ত্রে মলিন বেশে ফক্কারামের প্রবেশ

ফক্কা। দুটী ভিক্ষে পাই বাবু—

চঞ্চ। এ্যাঁ,—সেই মুখ, সেই চোখ, সেই গলা, সেই চলা—ওঃ! তুমি, তুমি, তুমি—(রক্তবীজকে জাপ্টাইয়া ধরিল)

ফক্কা। হ্যাঁ—সেই খোঁপা, সেই শাড়ী, সেই বপু,—সেই-সেই-সেই···তুমি, তুমি, তুমি···

(লাফাইয়া লঙ্কাকে জাপ্টাইয়া ধরিল)

[রক্তবীজ ও লঙ্কাচন্দ্র বিস্ময়ে হতভম্ব! চঞ্চলা ও ফক্কা উভয়েই খাড়া হইল]

ফক্কা। আমি···আমার সব মনে পড়েচে। সেই বাড়ী, সেই পাওনাদারের নিত্যি আসা তারপর এই এটর্ণি পিসেমশায়, রক্তবীজ, উইল—এই প্রিয়ে চঞ্চলে—আর এই আমি ফক্কা!

রক্ত। ফক্কা! এঃ, তাইতো হে!—তা এ্যাদ্দিন ছিলে কোথায়?

চঞ্চ। হ্যাঁ, ত্যাখো দিকি—শ্রাদ্ধশান্তি সেরে, পাঁচ ভূত খাইয়ে খরচের ছরকোট—

রক্ত। তাহলে অক্কা নও তুমি?

ফক্কা। না, অক্কা নই,—ফক্কা···ফক্কা···

লঙ্কা। আর আমি তোমার সেই মাসতুতো ভাই, দাদা, জাল নই, আদি ও অকৃত্রিম লঙ্কা, লঙ্কা···

রক্ত। তাই তো! তা তোমার প্রমাণ? এ্যাদ্দিন...

ফক্কা। তবে শুনুন সকলে—আমি তো ডুবটি দিলুম, অমনি টুপ করে তলিয়ে গেলুম! তারপর গড়াতে গড়াতে গড়াতে গড়াতে গিয়ে ঠেকলুম একেবারে সেই হুগলির পোলের থামে! মাঝ গঙ্গার সেই মোটা থাম্! বেয়ে ওপরেও উঠতে পারি না, ভেসে পারেও লাগতে জানি না। এমনি ভাবে থেকে থেকে ভিরমি গেলুম। জ্ঞান হলে দেখি, একটি ঢেউয়ের উল্টো ঠ্যালায় একেবারে নৈহাটীর ঘাট! কাদা মেখে উঠলুম,—অমনি সব ভুলে গেলুম! ভিক্ষে করে দিন চালাতে চালাতে চালাতে চালাতে আজ এই এখানে হাজির! তারপর যেই দেখলুম সেই বাড়ী, তার ওপর সেই প্রিয়ে-চঞ্চলে, আর সেই এটর্ণি পিসেমশায়—সেই কাগজের বাণ্ডিল···অমনি সব মনে পড়লো!

রক্ত। ওঃ, ভাগ্যিস সব একত্তর ছিলুম!

ফক্কা। না হলেই গেছলুম আর কি!—তারপর, লঙ্কা ভাই, উইল পড়েচো ভাই?

লঙ্কা। পড়েচি, দাদা—

ফক্কা। ছাখো, রাজী আছো? বখরা আধাআধি? না হলে কতদিন এখন বাঁচবো। বিশেষ একবার মরার পর—রাজী?

লক্কা। রাজা। ভাইরে, ব্যবসায় আমি ফতুর—

ফক্কা। এ্যাঁ, ফতুর···! তুমিও—

লক্কা। দেনায় আতুর—

ফক্কা। তুমিও?

লক্কা। পাওনাদারের তাগাদায় হাড়-চুর!

ফক্কা। তুমিও!—উঃ, ভাইরে আমার, এ যে আগা-গোড়া মিলে যাচ্ছে। এত মিলের পর মাসতুতো ভাই ছাড়া তুমি যে আর কেউ হতে পারো না ভাই!

লক্কা। তোমার মাসতুতো ভাইই তো আমি। দাদা আমার—

ফক্কা। ভাই লক্কা! (উভয়ের আলিঙ্গন)

বেয়াক্কেলের প্রবেশ

বেয়া। এ্যাঁ—বাবুই তো। বাঁচলুম! যে রকম লক্কার পর লক্কা আসছিল, প্রাণটা গেছলো সকলের!

চঞ্চ। তাহলে পিসেমশায় গো—সব যখন সুরাহা হয়ে গেল, তখন উইলের টাকাটা আর পড়ে থাকে কেন!

রক্ত। না—ও এবার পাকা! তাই তো এসেচি আমি!···অনেক হাঙ্গাম পোয়াতে হয়েছে! আদালতের ব্যাপার কি না! সেই পাঞ্জাবের চীফকোর্ট, আর কাবুলের কাজীখানা। টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দরখাস্ত, লোকের পর লোক লাগানো—ওঃ, সমারোহ ব্যাপার! তারপর এ নিয়ে লাট-সাহেবের সঙ্গে আমীরের অবধি চিঠি-চাপাটি! হুলস্থুল বাধিয়ে দিছলুম। টাকার কতক ছিল আমাদের রাজা মার্কা, আর কতক কাবুলের আমারের মুখ-ছাপা। কাবুলের কারেন্সির সঙ্গে লাহোরের কারেন্সির লড়াই যা চলেছিল···ওঃ, এ একেবারে Testamentary Jurisdiction-এ ভারী Ruling হয়ে রৈল—তোমাদের দু'ভাইয়ের নামও সেই সঙ্গে অমর!

ফক্কা। কাজের কথা কও—পিসেমশায়!

রক্ত। এর একটি কথা বাজে নয় রে, বাবা! খরচ যেমন হয়েচে, তেমনি ভবিষ্যতের জন্যে আইনের রাস্তা পাকা বাঁধিয়ে দেছ একেবারে! পরে আর কাকেও বেগ পেতে হবে না—সিধে পথে চলে যাবে।—তা, এই নাও, সে-সবের নকল···এই একটা বস্তা—তাহলেও সব মিলিয়ে পাবে! এই আমার বিল—ও আউট-পকেট, ফীজ—আগাম যা দিয়েচি, সব আছে এতে, সুদ-সমেত।···সব খতিয়ে দেখা যাচ্ছে, ও লাখ টাকাটা ঠিকই পুরোপুরি প্লাওয়া গেছে। তা থেকে খরচ-খরচা বাদ গেলে, এই ছাখো, তোমাদের হিসেবে পাওনা থাকে···থোক্ এই—(কাগজ দেখাইয়া) নগদ, তেরো আনা সাড়ে দশ পাই।

চঞ্চ। এ্যাঁ,—পুরোপুরি চোদ্দ আনাও নয়?

রক্ত। না—এ আবার এটর্ণির আপিসের বিল, ট্যাক্স করা। এর এক পাই এদিক-ওদিক হবার জো নেই!

(ফক্কা ও লক্কা পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল)

ফক্কা। লক্কা—ভাই!

লক্কা। দাদা—(উভয়ের হতাশভাব ও এক সঙ্গে মূর্চ্ছা)

রক্ত। শোনো, এখন মূর্চ্ছার সময় নয়—ওঠো—(উভয়ে খাড়া উঠিয়া দাঁড়াইল) তা, এই তেরো আনা সাড়ে দশ পাই—তোমাদের মধ্যে আধাআধি বখরা হচ্ছে না? তা, তার একটা দলিল লেখাপড়া হওয়া দরকার তো! তা তার খরচা—

চঞ্চ। পিসেমশায়—

রক্ত। থাম্‌রে খেঁদি—Professional man আমি, প্রোফেসন আগে,—তারপর আর সব।···attorneyর cost

চঞ্চ। তাই তো বলচি পিসেমশায়,—সে কষ্ট থাক্ আর। আপনার পান-চুরুটের মূল্য বাবদ ওটা আপনিই নিন্।

রক্ত। বেশ, বেশ! তাহলে চুকে গেল হিসেব। লাখ টাকা পেলে? তার এই রসিদটা তবে সই করে দাও। আমিও এই বিলটা সই করে দি—ব্যস্! এই যে ফাউণ্টেন পেন্ আছে! (সকলের তথাকরণ) তাহলে এখন চললুম রে খেঁদি। আপিসে আবার মক্কেল খাটমল্ এসে বসে আছে! কঞ্জুষরামের সঙ্গে তার একটা পার্টনারশিপের দলিল লেখাপড়া হচ্ছে কি না! কি করবো, professional man, ভারী busy! (প্রস্থান)

বেয়া। যা বাবা—সব ফর্শা। আবার সেই পুরানো চাকরি···পাওনাদার তাড়াই···

চঞ্চ। হ্যাঁ গা ওগো,—ও ঠাকুরপো—(লক্কা ও ফক্কার নিরুপায় হতাশভাব)

লক্কা। দাদারে, এই লাখ টাকা?

ফক্কা। লক্কারে, এই লাখ টাকা!

[দুইজনে হাত-ধরাধরি করিয়া বেকুবের মত পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল; চঞ্চলা দুইজনের পানে দুইবার চাহিয়া চোখে আঁচল চাপিল]

ভরত-বাক্য—গান

দেখো গো, দোষ ধরো না, রোষ করো না···আর কিছু না,···একটু হাসি!
দিইনে কারো মানে কালি, নয় এ গালি, রং-তামাসা···তার পিয়াসী!
জীবনে দুঃখ আছে, মানিগো তা...তাই বলে কি
দীর্ঘশ্বাস, হা-হুতাশে কাটাবে দিন নিরবধি!
বাঁচো তো সত্যি বাঁচো! বাজিয়ে চল প্রাণের বাঁশি!
তাগাদা পাওনাদারের, আপিসে বকুনিটে···
আছে তো···বয়ে গেল!···সে তো ঐ একটু ছিটে,—
এত বড় জীবনটা এ···ফুর্ত্তি রাশি-রাশি!
ফেলে সব গোমড়া-মুখে বসে থাকা ঘরের কোণে···
বোকামি মস্ত যে সে···হাঁদারাম গাধা বনে'!
হবে কি? কাল হবে সে!···আজ কেন বেঘোরে ভাসি!

যবনিকা

বর্ণাশ্রমধর্ম এবং ভারতবর্ষের অধোগতি

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

(আলোচনা)

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সমাদ্দার মহাশয় শ্রাবণ মাসের 'ভারতবর্ষে' যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন তাহা পড়িলাম। তিনি যে কষ্ট করিয়া আমার প্রবন্ধটি পড়িয়াছেন এবং আমার ভুল দেখাইতে যত্ন করিয়াছেন, এজন্য আমার কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তর্ক দ্বারা তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্য আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লিখিতেছি না। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে আমাদের উভয়েরই সত্য নির্ণয়ে কিছু সাহায্য হইতে পারে, এই ধারণায় আমি আরও কিছু বলিতে উদ্যত হইতেছি।

যাঁহারা কিছুই মানেন না, তাঁহাদের সহিত তর্ক করা কঠিন। সৌভাগ্যক্রমে প্রসন্নবাবু সেরূপ নহেন দেখিলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে যে সকল অমূল্য উপদেশ দিয়াছেন, তিনি তাহা শিরোধার্য্য করেন বলিয়া বোধ হইল। অপরিসীম জ্ঞানের আধার এবং সর্বভূতহিতেরত মহর্ষি মনুর প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট আস্থা আছে দেখা যায়। কিন্তু মনুসংহিতা পড়িলে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, মনু জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিবার বিধান দিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩০ শ্লোকে মনু বলিয়াছেন যে, জন্মের পর দশম বা দ্বাদশ দিবসে সন্তানের নামকরণ করিতে হয়। কিরূপ নাম রাখা উচিত, এ বিষয়ে পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিয়াছেন,

মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতং।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্ ॥২।৩১

ব্রাহ্মণের নাম মঙ্গলসূচক, ক্ষত্রিয়ের নাম বলসূচক ইত্যাদি হইবে। যদি জন্মের দ্বারা বর্ণ নির্ণয় না করিয়া স্বভাব চরিত্র দ্বারা বর্ণ নির্ণয় করা হয়, তাহা হইলে জন্মের পর দশম বা দ্বাদশ দিনে কিরূপ নাম রাখা যাইবে? পরবর্ত্তী শ্লোকে মনু বলিয়াছেন,

শর্মবদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতম্ ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণের নামের শেষে শর্মা থাকিবে ইত্যাদি। জন্মের দ্বারা বর্ণ নির্ণয় না হইলে এই নিয়ম কি করিয়া অনুসরণ করা যাইবে?

উপনয়ন সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন,

গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নম্।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ ॥২।৩৬

গর্ভের বর্ষ হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইবে, একাদশে ক্ষত্রিয়ের, দ্বাদশে বৈশ্যের। জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্ণয় না করিলে অষ্টম বৎসর বয়সে বালকের স্বভাব চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া সে ব্রাহ্মণোচিত গুণযুক্ত হইবে কি না নির্ণয় করা সম্ভব হয় কি? ক্ষেত্রবিশেষে মনু আরও অল্প বয়সে উপনয়নের বিধান দিয়াছেন।

ব্রহ্মবর্চস কামস্য কার্য্যং বিপ্রস্য পঞ্চমে।
রাজ্ঞো বলার্থিনঃ ষষ্ঠে বৈশ্যস্যেহার্থিনোঽষ্টমে ॥২।৩৭

যদি ব্রহ্মতেজ ইচ্ছা করা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের পঞ্চম বৎসর বয়সে উপনয়ন দিবে ইত্যাদি। জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্ণয় না করিলে ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়?

বিবাহ প্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন,

সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।৩।১২

ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির বিবাহে সমান বর্ণের স্ত্রী গ্রহণ করা প্রশস্ত। স্ত্রীর বর্ণ যদি জন্ম দ্বারা নির্দ্ধারণ করা না হয়, তাহা হইলে কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে? এরূপ নিয়ম ত হওয়া অসম্ভব—যে স্ত্রী বেদ পাঠ করিবে তাহার বর্ণ ব্রাহ্মণ হইবে, যে যুদ্ধ করিবে তাহার বর্ণ ক্ষত্রিয় হইবে; বিশেষতঃ যখন মনু অষ্টম বা দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা কন্যার বিবাহের বিধি দিয়াছেন (মনু ৯ অধ্যায় ৯৪ শ্লোক)। এই সকল দেখিয়া বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, মনু জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিবার বিধান দিয়াছেন। যদি তথাপি কোন সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে দশম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক দেখিলে আর কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। সে শ্লোক এইরূপ—

সব বর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষ্ব ক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সংভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥১০।৫

সকল বর্ণ সমান বর্ণের স্ত্রীতে যে সকল সন্তান উৎপাদন করে তাহারা পিতামাতার বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্ণয় না করিয়া স্বভাব চরিত্র দ্বারা বর্ণ নির্ণয় করিতে হইলে, অনেকগুলি প্রশ্ন উঠে—কে এই ভাবে বর্ণ নির্ণয় করিবে? রাজা, না, কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি, না, কোন সমিতি? কত বয়সে এইরূপে বর্ণ নির্ণয় করা হইবে? এই ভাবে বর্ণ নির্ণয় করিবার কথা কোথাও শোনা যায় না। প্রত্যুত মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে আপদ্ধর্মের ব্যবস্থা দেখিয়া বোঝা যায় যে, কোন বর্ণ অপর বর্ণের কর্ম করিলেও তাহার বর্ণ পরিবর্ত্তন হইত না।

প্রসন্নবাবু বলিয়াছেন, "জন্ম মাত্রেই কেহ কোনও বর্ণবিশেষ লাভ কর্ত্তে পারে না। মহর্ষি মনুও বলে গিয়েচেন "জন্মনা জায়তে শূদ্র" ইত্যাদি।" আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে জন্মমাত্রই মানুষ একটা বিশেষ বর্ণলাভ করে—মহর্ষি মনু এ কথা খুব স্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ" এই শ্লোকটি মনুসংহিতাতে খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রকৃতিবাদ অভিধানে "দ্বিজ" শব্দের নীচে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত দেখিলাম ঃ

জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় উচ্যতে ॥

এ শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণের পুত্র জন্মমাত্রই ব্রাহ্মণ হয়; কিন্তু উপনয়ন সংস্কারের পূর্বে দ্বিজ হয় না। সুতরাং এই শ্লোক প্রসন্নবাবুর মত সমর্থন করে না।

অতঃপর দেখা যাউক, বর্ণাশ্রমধর্ম সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কিরূপ অভিমত। শ্রীকৃষ্ণের মতে কি মনুষ্যের বর্ণ তাহার জন্ম দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং সেই বর্ণের বিহিত কর্ম অনুষ্ঠান করিবে? না, তিনি বলেন যে, মনুষ্যের প্রবৃত্তি এবং যোগ্যতার দ্বারা তাহার বর্ণ নির্দিষ্ট হইবে। মহাভারতের সময় এবং তাহার পূর্বে রামায়ণের সময় যে জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই প্রথা যে নিন্দনীয়, শ্রীকৃষ্ণ কোথাও এ কথা বলেন নাই। ভগবদ্গীতার মূল কথা এই—অর্জুন ক্ষত্রিয়, ধর্মযুদ্ধ করাই তাহার কর্ত্তব্য,—ক্ষত্রিয়ের কর্ম যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের কর্ম ভিক্ষাবৃত্তি তাহার গ্রহণ করা উচিত নহে। শাস্ত্রবিহিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা দূরের কথা, শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রবিহিত ধর্মের রক্ষাকর্ত্তা রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধর্মশাস্ত্রের উপর তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। গীতার নিম্নলিখিত দুইটি শ্লোক হইতে তাহা বোঝা যায়।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধি মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং ॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥

১৬ অধ্যায় ২৩, ২৪ শ্লোক

"যে শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া নিজের ইচ্ছা অনুসারে কর্ম করে সে সিদ্ধিলাভ করে না, সুখ পায় না, এবং মোক্ষলাভ করে না। কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য এবং কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য নহে, এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। শাস্ত্রের বিধান জানিয়া তোমার কর্ম করা উচিত।"

সকল শাস্ত্রেই আছে যে জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্দিষ্ট হয়। সকল স্মৃতিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ মনুসংহিতা হইতে শ্লোক তুলিয়া আমরা দেখাইয়াছি যে, মনু এ কথা স্পষ্ট ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গীতাতে বলিয়াছেন—

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতা।১৮।৪৮

"হে অর্জুন, জন্মের সহিত যে কর্ম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা দোষযুক্ত হইলেও ত্যাগ করিবে না। অগ্নি যেরূপ ধূম দ্বারা আবৃত থাকে সেইরূপ সকল কর্ম দোষ দ্বারা আবৃত থাকে।"

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মনুষ্যের জন্ম দ্বারা তাহার বর্ণ নির্দিষ্ট হইবে ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিমত। কারণ, এই শ্লোকে তিনি বলিলেন যে, প্রত্যেক মানুষের যে কর্ম কর্ত্তব্য, তাহা তাহার জন্মের সময়ই ঠিক হইয়া যায়। কর্ত্তব্য কর্ম কি, তাহা তিনি পূর্ববর্ত্তী শ্লোকগুলিতে বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণের কর্ম শম দম তপস্যা ইত্যাদি, ক্ষত্রিয়ের কর্ম যুদ্ধ, বৈশ্যের কর্ম কৃষিবাণিজ্য এবং শূদ্রের কর্ম দ্বিজাতি সেবা। এখন এই সকল কর্ম যদি মানুষের জন্মের সময়ই নির্দ্ধারিত হইয়া যায়, তাহা হইলে মানুষের বর্ণও জন্মের সহিত নির্দ্ধারিত হয় বলিতে হইবে। জন্ম দ্বারা যদি বর্ণ নির্দ্দেশ করা না হয়, তাহা হইলে কে প্রত্যেক মানবের স্বভাব বিচার করিয়া তাহার বর্ণ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে,—রাজা, না কোন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ?—

এ কথা শ্রীকৃষ্ণ কোথাও কিছু বলেন নাই। দ্রোণাচার্য্য এবং তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা যুদ্ধ-ব্যবসায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব জন্ম দ্বারা যদি তাঁহাদের বর্ণ নির্দেশ না করিয়া স্বভাবের দ্বারা বর্ণ নির্দেশ করা হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া ক্ষত্রিয় বলা উচিত। কিন্তু অশ্বত্থামা যখন গুপ্তভাবে শিবিরে প্রবেশ করিয়া দ্রৌপদীর পুত্রদিগকে হত্যা করেন এবং অর্জুন যখন তাঁহাকে কি শাস্তি দিবেন এ কথা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণকে কখনও বধ করা উচিত নয়। উহার মাথার মণি কাটিয়া উহাকে ছাড়িয়া দাও।" শ্রীকৃষ্ণ ত এমন কথা বলিলেন না যে অশ্বত্থামা প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়, তাহাকে বধ করিতে পার। গীতার ৩য় অধ্যায় ২৪ শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যা ইমা প্রজাঃ ॥

"আমি যদি কর্ম না করি তাহা হইলে পৃথিবী উৎসন্ন যাইবে; বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইবে এবং প্রজারা নষ্ট হইবে।" জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্দেশ না করিলে বর্ণসঙ্করের কথাই উঠিতে পারে না। স্বামী ও স্ত্রীর বর্ণ ভিন্ন হইলে সন্তানকে বর্ণসঙ্কর বলা যায়। স্বামীর বর্ণ জন্ম দ্বারা নির্দেশ না করিয়া তাঁহার কর্ম দ্বারা নির্দেশ যেন করা গেল; কিন্তু স্ত্রীর বর্ণ কর্ম দ্বারা নির্দেশ করা যায় না ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্দেশ না করিলে ইহা বলা যায় না—অমুক লোকের ইহা নির্দিষ্ট এবং কর্ত্তব্য কর্ম। প্রসন্নবাবু বলিয়াছেন, যাহার যা ইচ্ছা কর্ম করুক; সেই কর্ম দ্বারা প্রত্যেকের বর্ণ নির্দেশ করা যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু বলিয়াছেন, যাহার যে বর্ণ সেইরূপ কর্ম করা তাহার উচিত। এজন্য চারি বর্ণের কর্ম নির্দেশ করিয়া ভগবান বলিয়াছেন,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাব নিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং ॥ ১৮।৮৭

"পরের ধর্ম (বা কর্ত্তব্য কর্ম) ভাল করিয়া করা অপেক্ষা, নিজের ধর্ম খারাপ করিয়া করাও ভাল। নিজের স্বভাব দ্বারা যে কর্ম নির্দিষ্ট হইয়াছে সে কর্ম করিলে পাপ হয় না।"

তাহার পরেই ভগবান বলিয়াছেন—

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমে নাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥

(অনুবাদ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে)

জন্ম আকস্মিক ঘটনা নহে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কর্ম এবং প্রবৃত্তি অনুসারে জন্মলাভ করে, ইহা বিশ্বাস করিলে জন্ম দ্বারা বর্ণ নির্দেশ হওয়া অনুচিত মনে হইবে না।

এই সকল কথা যদি মনে রাখা যায়, তাহা হইলে প্রসন্নবাবু গীতার যে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ সহজেই গ্রহণ করা যায়।

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।" গুণ এবং কর্মের বিভাগ দ্বারা ভগবান চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণ প্রধান; তাহার কর্ম শম দম তপ আদি। ক্ষত্রিয়ের সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণ প্রধান; তাহার কর্ম যুদ্ধ। বৈশ্যের তমোমিশ্রিত রজোগুণ প্রধান; তাহার কর্ম কৃষি, বাণিজ্য। শূদ্রের রজোমিশ্রিত তমোগুণ প্রধান; তাহার কর্ম শুশ্রূষা। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম কোনও মনুষ্যের কীর্ত্তি নহে। স্বয়ং ভগবান এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। অনাদিকাল হইতে ইহা চলিয়া আসিয়াছে। এখানে ভগবান স্পষ্ট করিয়া বলিলেন না বটে যে, যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করে, যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি সে সেইরূপ জন্মলাভ করে, এবং সেই জন্ম দ্বারা তাহার বর্ণ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু ভগবান অন্যত্র যে সকল কথা বলিয়াছেন এবং যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অন্য কোনরূপ অর্থ করা যায় না। ফলতঃ, প্রসন্নবাবু বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং জাতিভেদের মধ্যে যে পার্থক্য কল্পনা করিয়াছেন, বাস্তবিকপক্ষে সেরূপ কোন পার্থক্য নাই। ভারতবর্ষে কখনও কোনও কালে যে বর্ণ জন্ম দ্বারা নির্দিষ্ট হইত না, জন্মের কথা বিবেচনা না করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাব এবং কর্ম দ্বারা বর্ণ নির্ধারিত হইত, ইহা আমাদের জানা নাই। প্রসন্নবাবু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ দেখাইলে বিশেষ বাধিত হইব।

প্রসন্নবাবু বলেন, জাতিভেদ প্রথার ফলে সমাজের উচ্চ জাতি নিম্ন জাতিকে ঘৃণা করে। কিন্তু ঘৃণার কথা জাতিভেদের মধ্যে কোথাও নাই। নিষ্ঠাবতী বিধবা রমণী আহার করিবার সময় আত্মীয় বালককেও স্পর্শ করেন না; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বালককে ঘৃণা করেন না। কোন

কোন ইংরেজ জাতিভেদ মানেন না ; নিম্ন জাতীয় কুলির হাতে জল খাইতে কাহারও আপত্তি নাই ; কিন্তু কুলি পাখা টানিতে শৈথিল্য করিলে পদাঘাতে প্লীহা ফাটাইতে ইতস্ততঃ করেন না এমন ইংরেজ প্রভুও দেখা যায়। রায়বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন সিংহের লেখায় এই যুক্তিটি পড়িয়াছিলাম। তিনি দেখাইয়াছিলেন, 'আহার বিষয়ে সংযমবিধি ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। যথেচ্ছ আহার বিহার না করিয়া সকল বিষয়ে বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিলে চরিত্রবল দৃঢ় হয়। অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা আহার বিষয়ে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সংযত করা বেশী প্রয়োজনীয়। জাতিভেদের দোহাই দিয়া যেখানে ঘৃণা এবং অত্যাচার প্রচলিত হইয়াছে, সেখানে সেই ঘৃণা এবং অত্যাচার উঠাইয়া দেওয়াই সমীচীন ; কিন্তু এ কারণে জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত নহে। মহাত্মা গান্ধীও এইরূপ পন্থাই গ্রহণ করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতে নিম্নশ্রেণীর উপর যে অত্যাচার হয়, তাহার জন্য জাতিভেদ দায়ী নহে। জাতিভেদ প্রথার মূল কথা এই যে, চারি বর্ণ ভগবানের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই মূল কথা মানিলে কোন বর্ণকে ঘৃণা করা চলে না। মনুও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, চারি বর্ণ ছাড়া পঞ্চম বর্ণ নাই। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এই চারি বর্ণ ছাড়া এক "পঞ্চম" বর্ণের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের উপর সামাজিক অত্যাচার হইয়া থাকে। শাস্ত্র অনুসারে শূদ্রের উপর অত্যাচার করা যায় না ; এই জন্যই দক্ষিণ ভারতে অশাস্ত্রীয় পঞ্চম বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব দক্ষিণ ভারতে নিম্নজাতির উপর যে অত্যাচার হয়, তাহার জন্য জাতিভেদকে দায়ী করা যায় না। যে দেশে জাতিভেদ নাই, সেখানেও এরূপ অত্যাচার হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাতে জাতিভেদ নাই, কিন্তু সেখানেও কৃষ্ণবর্ণের উপর অত্যাচার হয়, এবং সে অত্যাচার দক্ষিণ ভারতে নিম্নশ্রেণীর উপর যে অত্যাচার হয় তাহা অপেক্ষা বেশী গর্হিত এ কথা মহাত্মাজি বলিয়াছেন।

প্রসন্নবাবু লিখিয়াছেন যে, জাতিভেদের ফলে "আমাদের সমাজের ভিতর জাতীয় শক্তিক্ষয়কারী অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েচে।" কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যে প্রবন্ধ আমরা আলোচনা করিতেছি, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, জাতিভেদের ফলে আমাদের সমাজে শান্তি আছে এবং জাতিভেদ নাই বলিয়া পাশ্চাত্য সমাজে সর্বদা অন্তর্বিপ্লবের চেষ্টা চলিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, সমাজে কতকগুলি লোকের হীনবৃত্তি অবলম্বন না করিলে চলে না, এবং কে হীনবৃত্তি অবলম্বন করিবে তা' "রাজ-শাসনে যদি পাকা করা হ'ত তা হ'লেও তার মধ্যে দাসত্বের অবমাননা থাকৃত এবং ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের চেষ্টা কখনই থামৃত না", "আমাদের দেশে বৃত্তিভেদকে ধর্ম শাসনের অন্তর্গত ক'রে দেওয়াতে এ রকম অসন্তোষ এবং বিপ্লব চেষ্টার গোড়া নষ্ট ক'রে দেওয়া হয়েছে" "তা'তে মানুষকে শান্ত করে "

জার্ম্মাণী

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(৩)

উৎসব ও পার্ব্বণ উপলক্ষে জার্ম্মাণীর স্ত্রীপুরুষেরা সবাই বেশ সুরঙ্গীন বেশভূষায় সুসজ্জিত হ'য়ে আমোদ প্রমোদে যোগদান করে। এ বিষয়ে সহরের লোকদের সঙ্গে গ্রামের লোকদের বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই,—তারতম্য যা কিছু সে কেবল প্রমোদ-সূচীর তালিকা ও রঙ্গরসের সরেশ বা নিরেশ 'রকমের' উপর নির্ভর করে। গীতবাদ্য ও নৃত্য তাদের আনন্দ-উৎসবের একটা প্রধান অঙ্গ। রাজপ্রাসাদ ও ধনীর অট্টালিকা থেকে আরম্ভ ক'রে গ্রামের কুঁড়ে ঘর ও গ্রামপ্রান্তের নির্জ্জন ক্ষেত্র বাড়ীটিতেও যে-কোনও একটা কিছু উপলক্ষে নাচের আসর বসতে দেখা যায়। নাচের প্রতি এ জাতটারই এমন একটা প্রবল অনুরাগ যে অনেক সময় প্রভু ভৃত্য বা দাসী ও কর্ত্রীর সম্বন্ধের ব্যবধান পর্য্যন্ত দূরে ঠেলে রেখে এরা একত্রে নৃত্যানন্দ উপভোগ করতে একটুও ইতস্ততঃ করে না। বিশেষ 'নবান্ন' বা

'নোতুন ধানের উৎসবের দিন' ত মজুর মনিব, উচ্চ নীচ বা ধনী দরিদ্রের কোনও পার্থক্য রাখা এদের নাচের আসরে একেবারেই নিষেধ!

জন্ম, শুদ্ধি (Baptism) নামকরণ (Christenings) বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি—এর কোনও অনুষ্ঠানটা থেকেই নাচটা বাদ পড়ে না। বিবাহ উপলক্ষে ত' একেবারে সপ্তাহকাল ধ'রেই নৃত্য চলে। জার্ম্মাণীর গ্রাম্যসমাজে এখনও এমন কতকগুলি প্রাচীন নিয়ম প্রচলিত আছে, যা সহর থেকে বর্ত্তমানে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। যেমন আগে নিয়ম ছিল প্রত্যেককেই পত্নী ক্রয় ক'রতে হবে! এ যুগে আর কোনও পিতাই কন্যা বিক্রয় করেন না বটে, কিন্তু সেই চিরাচরিত প্রথাটি একেবারে লোপ পায়নি। গ্রামের মধ্যে এখনও নিয়ম আছে—বরকে বিবাহের দিন বধূর হাতে কিঞ্চিৎ অর্থ উপহার দিতে হবে! বর্ব্বর যুগে প্রথা ছিল যে মৃত ব্যক্তিকে কবর দেবার সময় তার নিজের ব্যবহার্য্য সমস্ত দ্রব্যাদি তার সঙ্গে সমাধিস্থ ক'রতে হবে! আজ আর সে প্রথা নেই বটে, কিন্তু তার কঙ্কালসার অস্তিত্বটুকু এখনও চোখে পড়ে! এখন দেখা যায় যে, মৃতের কোনও না কোনও একটি প্রিয় সামগ্রী তার সঙ্গে আজও শবাধারে স্থাপন করা হচ্ছে! কোথাও বই, কোথাও

রুগ্ন ছাত্রদের পাঠশালা। (পাইন কুঞ্জের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে অসুস্থ ছেলে মেয়েদের পড়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছে জার্ম্মাণীর শিক্ষা বিভাগ।)

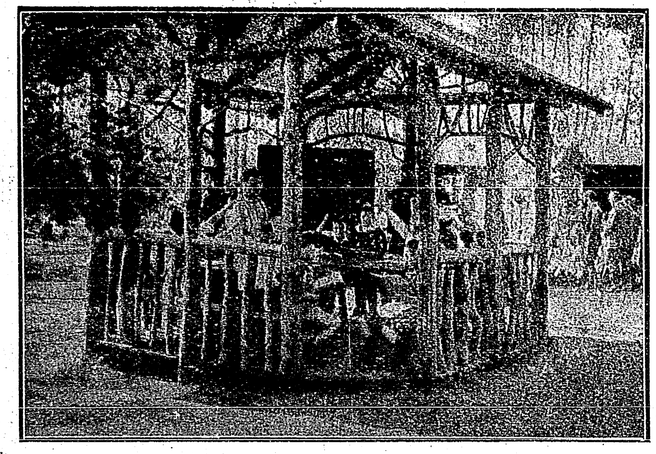

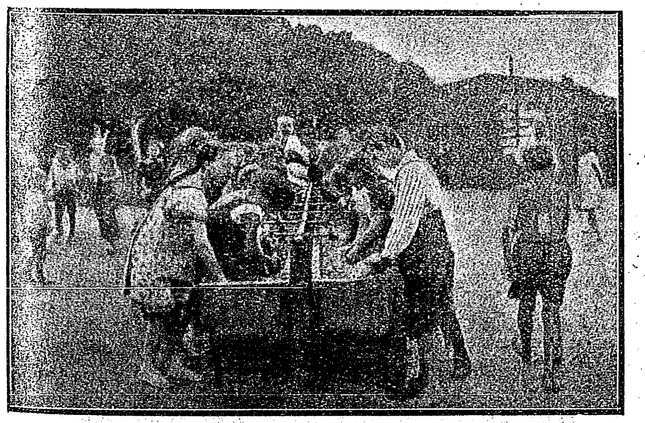

ভোজনের পর।

(মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে যে ছেলেরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হ'চ্ছে তারা নিজেদের কাজ নিজেরাই ক'রতে শেখে। আহারের পর ছেলেমেয়েরা তাদের ভোজন-পাত্র পরিষ্কার করছে।)

তাশ, কোথাও খেলবার ব্যাট ; কোথাও লেখবার কলমটি বা আঁকবার তুলিটি—এইরকম।

কোন কোন অঞ্চলে আবার প্রত্যেক মৃতের সঙ্গে আশা চিরুণী সাবান ও তোয়ালে দেওয়া একেবারে একটা অপরিহার্য্য নিয়মের মধ্যে গণ্য হয়। মৃত স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর লিখিত প্রেমপত্রগুলি কবরে দেওয়া এবং মৃত স্ত্রীর সঙ্গে তার বিবাহরাত্রের পুষ্পমাল্য ও অলঙ্কার প্রভৃতি সমাধিস্থ করাও স্থানে স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও বা মৃতের পরকালকে সৌভাগ্য-মণ্ডিত করবার কল্পনায় তার মুখের মধ্যে একখণ্ড স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা রেখে দেওয়া হয়। অনেক স্থলে আসন্ন-

মৃত্যু রোগীর ঘরের জানালা দরজা সমস্ত দিনরাত খুলে রেখে দেওয়া হয় এই বিশ্বাসে যে, রোগীর আত্মা-বিহঙ্গ দেহপিঞ্জর ছেড়ে যাতে গন্তব্য লোকে বেশ অবাধে ও অনায়াসে যেতে পারে।

খৃষ্টের জন্মদিনের উৎসব সর্ব্বত্রই প্রায় মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। তাছাড়া অন্যান্য প্রত্যেক ছোটখাটো ধর্ম্ম-পার্ব্বণেও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত আছে। যেমন 'সেণ্ট জনে'র পর্ব্বদিন উপলক্ষে পাড়ায় পাড়ায় সন্ধ্যার

গির্জ্জার পথে। (গ্রাম্য চাষার মেয়েরাও প্রতি রবিবার দল বেঁধে ভাল পোষাক পরে নিয়মিতভাবে গির্জ্জায় যায়।)

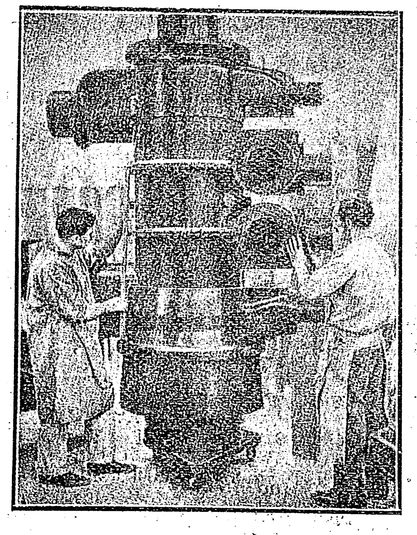

লোহা ঢালাই করবার জন্য ছাঁচ তৈরী হচ্ছে।

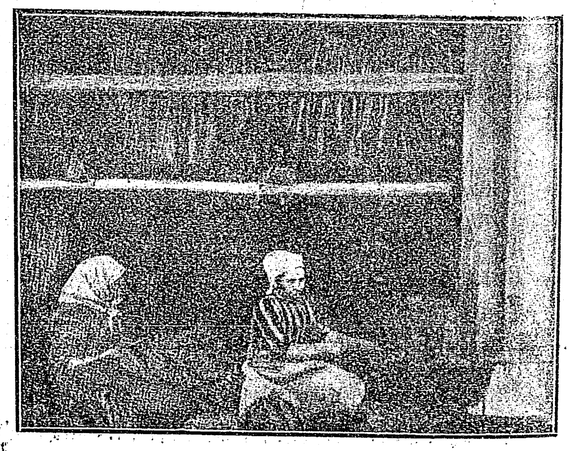

চুরুটের কারখানায় তামাক পাতার পাট।

পর এক একটা অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করা হয়; এবং সেই সেই পাড়ার আসন্ন বিবাহোন্মুখ যুবক যুবতী বা প্রণয়ী ও প্রণয়িনীদের যুগলে মিলে সেই অগ্নিকুণ্ড উল্লঙ্ঘন করে যেতে হয়! এই তামাসা দেখবার জন্য পাড়ার ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সবাই এসে সেই উৎসব-মণ্ডপে সমবেত হয়।

এই দুরন্ত সভ্যতার যুগেও জার্ম্মাণী থেকে কুসংস্কার এখনও একেবারে বিদূরিত হয়নি। তুক্‌তাক্ প্রভৃতি ভৌতিক ও

বার্লিনের পথে বেতের তৈরী জিনিসের ফেরি।

অলৌকিক ব্যাপারের উপর আজও তাদের সম্পূর্ণ আস্থা দেখতে পাওয়া যায়। আজগুবী গল্প-গাথা ও নানা বিচিত্র বিস্ময়কর রূপকথার প্রচলন জার্ম্মাণীতে যেমন আছে, তেমনটি আর য়ুরোপের কোথাও নেই। বিশ্ববিশ্রুত জার্ম্মাণ গীতিনাট্যকার 'ওয়াগ্‌নারের' একাধিক রচনার ভিত্তি-উপাদান এই সকল প্রাচীন উপকথার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। এই সকল গল্পের অধিকাংশেরই মূলে কিছু না কিছু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে,—সবগুলি একেবারেই নিছক কাল্পনিক

বেতের চেয়ার তৈরি হচ্ছে।

কাহিনী নয়। এছাড়া জার্ম্মাণীর আর একটা বিশেষত্ব হচ্চে তার 'কবির গান'! এ অনেকটা আমাদের দেশের বাউল গানের মতো! এই গানগুলি থেকে এদের জীবনযাত্রা, চিন্তার ধারা, ভাব ও কল্পনা, আনন্দ ও বেদনার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এ গানের অধিকাংশই যুদ্ধ-বিগ্রহের বীরত্ব-গাথা, রণজয়ের কীর্ত্তিকাহিনী, জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক বহু বিখ্যাত ইতিকথা, মৃগয়া, অরণ্য, পর্ব্বত, উপত্যকা, নদনদী, দ্রাক্ষাকুঞ্জ, সুরা ও

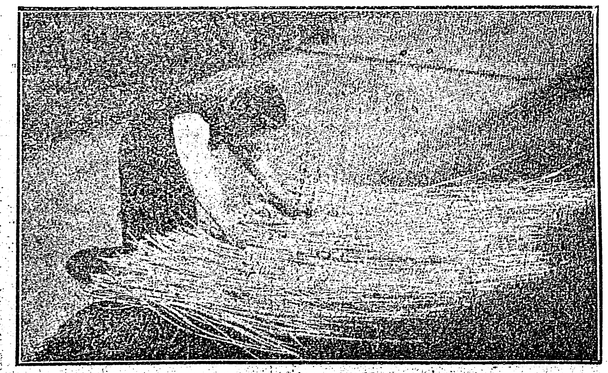

দেত শুকিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

সুন্দরী, পারিবারিক রহস্য, পাপ পুণ্য প্রেম, প্রতিহিংসা, পশু, পক্ষী, সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

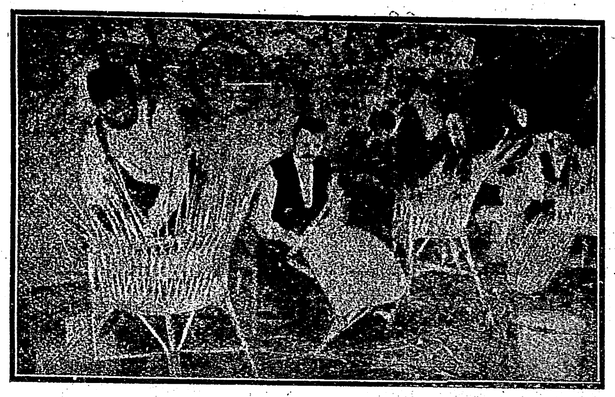

বেতের চেয়ারের কারখানা।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, গণতন্ত্রমূলক শাসনের অধীনে এলেও জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক বিভাগ অনেকটা সেই পূর্ব্বের বিভাগই মেনে নিয়েছে। জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান প্রদেশগুলির মধ্যে পাঁচটিই সর্ব্বপ্রধান। কি লোক-সংখ্যার অনুপাতে, কি ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-সমৃদ্ধির হিসাবে প্রাশীয়া, বাভেরীয়া, স্যাক্সনী, ঊর্টেম্বার্গ ও বেডেনই হ'চ্ছে জার্ম্মাণীর গর্ব্ব করবার মতো পাঁচটি প্রদেশ। জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রীয় উচ্চ মন্ত্রণা-পরিষদে ৬৬ জন সভ্যের মধ্যে পঞ্চাশজন প্রতিনিধি আছেন কেবল এই পঞ্চ প্রদেশের। এই পাঁচটি প্রদেশ সম্বন্ধে একটু পৃথক পৃথক পরিচয় দিলেই বোধ হয় জার্ম্মাণী সম্বন্ধে সব কথা বলা হ'তে পারে।

বেডেন—বেডেনকে অনেকে বলে কৃষ্ণারণ্য ভূমি (the land of the black forest)। বেডেন আকারে প্রায় ইংলণ্ডের ওয়েল্‌স্ প্রদেশের সঙ্গে সমান। অধিবাসীদের মধ্যে একটা ধর্ম্মগত পার্থক্য খুব বেশী পরিমাণে থাকলেও রাজনীতি-ক্ষেত্রে বা ধর্ম্ম নিয়ে এই দুই বিভিন্ন সম্প্রদায় কোনও দিনই দাঙ্গা ক'রে রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত করেনি। পরস্পর

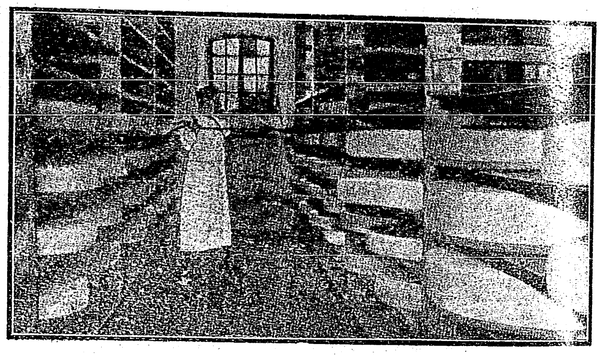

সদ্য-প্রস্তুত 'পণীর' পাকাবার জন্যে 'ছাঁচ' থেকে তুলে তাকের উপর সাজিয়ে রাখা হচ্ছে।

শিক্ষানবীশদের 'পণীর' প্রস্তুতপ্রণালী শেখানো হচ্ছে।

উভয় সম্প্রদায়কে সম্মান করে এসেছে, খাতির করে এসেছে, এবং সব চেয়ে দ্রষ্টব্য ব্যাপার হচ্ছে—তারা পরস্পরের দুর্ব্বলতা পর্য্যন্ত সহ্য করে এসেছে।

চাষের কাজ এখানে খুব বিস্তৃতভাবে কেউ না করলেও, ছোটখাটো ক্ষেতের মালিক এখানে অনেক আছে। তাদের চাষের কাজ অল্প-স্বল্প ও যৎসামান্য হ'লেও,

তারা কিন্তু নানান রকমের ফসল উৎপাদন করে! অবশ্য তার মধ্যে প্রধান হ'চ্ছে ধান ও আলু। আঙুরের চাষও এখানে প্রচুর; কারণ এইখানেই আঙুর থেকে অতি সুমিষ্ট ও সুপেয় সুরা প্রস্তুতের কারখানাও আছে। তামাকের চাষও এখানে নিতান্ত অল্প নয়।

বেডেনের মতো একটি ছোট প্রদেশেও কিন্তু এমন একাধিক শহর আছে, যার নাম পৃথিবীর লোক জানে! 'কার্লশ্রু' এখানকার প্রধান শহর। এই শহরের রাজপ্রাসাদটি একটি দর্শনীয় বস্তু। নিন্দুকেরা প্রায়ই বলে বটে

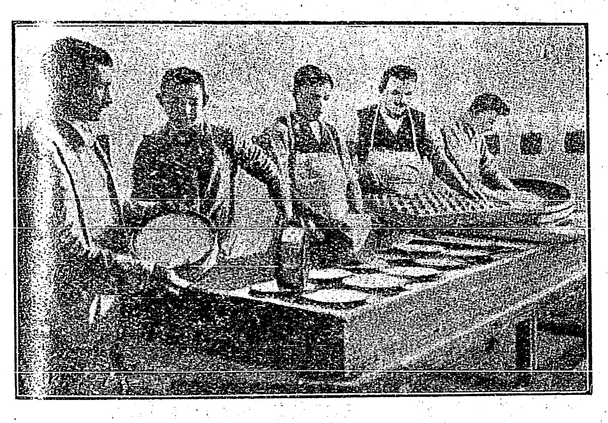

দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকবে বলে 'পণীর' ছাঁচের মধ্যে লবণাক্ত করা হচ্ছে।

যে শিক্ষিত লোকদের পক্ষে এ শহর একেবারে বাসের অযোগ্য! কিন্তু সেটা সত্য কথা নয়।

আরও উত্তরে রাইণের তীরে এর দ্বিতীয় প্রধান শহর 'ম্যানহিম্' পৃথিবীর লোকের পরিচিত, কারণ এটি একটি শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায়-প্রধান স্থান। এই শহরটি প্রথমে নির্ম্মিত হ'য়েছিল 'শত্রঞ্জ' খেলার ছকের মতো আকারে। সোজা সোজা রাস্তা চলে গেছে আড়া-আড়ী ভাবে পরস্পরকে অতিক্রম করে এবং তারই মাঝে মাঝে ছকের ঘরের মতো চৌকো ভূখণ্ডে একই ছাঁচের ভবন-শ্রেণী

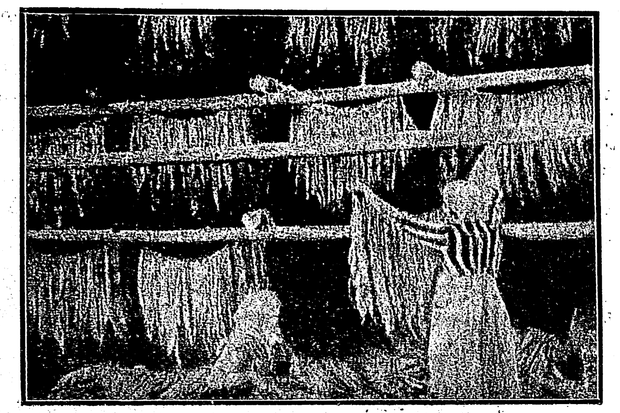

তামাক পাতা শুকিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

নির্ম্মিত হ'য়েছিল, নগর-চত্বর আকারে। পথ-নির্দ্দেশের ব্যবস্থা হয়েছিল বর্ণমালার হিসাব অনুসারে। কিন্তু আজ আর 'ম্যানহিম্' সেইটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ নেই, আজ সে তার সেই 'শত্রঞ্জ' নক্সা ছাড়িয়ে আরও চারিদিকে বিস্তৃত হ'য়ে ছড়িয়ে পড়েছে! ম্যানহিমের একাধিক গৃহের স্থাপত্য-শিল্পও অতি সুন্দর।

রাইণ ও নেকার নদীর সংযোগস্থলের সন্নিকটে স্থাপিত 'হাইডেল্‌বার্গ' শহর তার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিশ্ববিখ্যাত হ'য়ে পড়েছে। শিক্ষার্থী ছাত্রের দল এই শহরটিকে খুবই

পাঁচটি মেয়ে নিয়ে চাষী-বউ বেড়াতে বেরিয়েছে।

ভালবাসে। বহুকালের একটি প্রাচীন দুর্গ এই শহরের একটা মস্ত সম্পদ। দূর অতীতে কোন্ এক ফরাসী রাজা নাকি এই দুর্গ আক্রমণ ক'রেছিল, তার কামানের আঘাত-চিহ্ন এর অঙ্গে এখনও বর্ত্তমান! বিক্ষত-দেহ হলেও এ দুর্গের শোভা ও সৌন্দর্য্য মনোহর। কৃষ্ণারণ্যের পাদমূলে আর একটি শহর গড়ে উঠেছে 'ফ্রাইবার্গ'। এটিকেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন শহরই বলা যেতে পারে। এই অঞ্চলে ধাতুঘটিত রাসায়নিক গুণসম্পন্ন বহু ঝর্ণার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়!

বেডেনের প্রধান বিশেষত্ব হ'চ্ছে যে উর্টেম্বার্গ শহরের সঙ্গে এও শ্বোয়ার্জওয়াল্ড বা কৃষ্ণারণ্যের (Black Forest) অংশীদার! কার্লশ্রুর দক্ষিণ থেকে আরম্ভ করে বরাবর একেবারে ফ্রাইবার্গের সীমান্ত পর্য্যন্ত এই বিশাল বন বিস্তৃত হয়ে আছে!

বাভেরীয়া—বাভেরীয়া স্কট্‌ল্যাণ্ডের চেয়ে আকারে ঈষৎ ছোট হ'লেও লোকসংখ্যায় সে স্কট্‌ল্যাণ্ড ও ওয়েলস্‌কে ছাড়িয়ে গেছে। বাভেরীয়ার অধিকাংশ অধিবাসীই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের

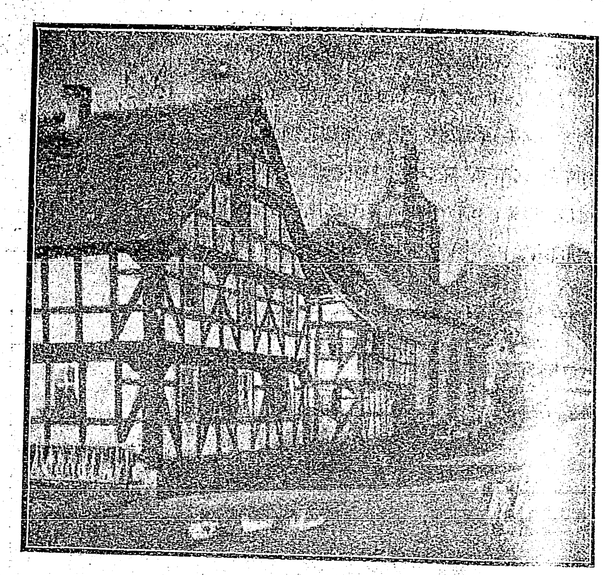

জার্ম্মাণ চাষী মজুরদের চমৎকার বাড়ী।

তৈরী 'পনীর' ছাঁচে ফেলা হচ্ছে।

মধ্যে সব চেয়ে স্বার্থপর, আত্ম-সুখ-সমৃদ্ধি ও উন্নতি-প্রয়াসী প্রদেশ হচ্ছে এই বাভেরীয়া। নিজের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের অধিকার—কি সামাজিক—কি রাষ্ট্রীয় দুই রক্ষা করে চলবার একটা সতর্ক চেষ্টা ও আগ্রহ দেখা যায় এই বাভেরীয়ার অধিবাসীদের সকলেরই। বাভেরীয়া ও প্রাশীয়ার মধ্যে একটা বিষম রেষারেষির ভাব দেখতে পাওয়া যায়। পরস্পর কেউ কাউকেই দুচ'ক্ষে দেখতে পারেন না। বাভেরীয়া প্রাশীয়াকে হিংসা করে তার বৃহত্তর আকারের জন্য, তার অমিত শক্তির জন্য, ও তার বিপুল সম্পদের জন্য; এবং প্রাশীয়া বাভেরীয়াকে দেখতে পারে না তার ক্ষুদ্র আকৃতির জন্য, তার গ্রাম্য রূঢ়তার জন্য ও সহজ সচ্ছলতার জন্য। উভয় প্রদেশেরই যথেষ্ট ঔদ্ধত্য দেখতে পাওয়া যায়। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে এক দল প্রাচুর্য্যের গর্ব্বে স্ফীত, অন্য দল অভাবের অহঙ্কারে উদ্ধত!

বড় বড় প্রদেশগুলির মধ্যে এক মেক্‌লেনবার্গ শোয়েরীন্ ছাড়া বাভেরীয়ার অধিকাংশকেই কৃষিজীবী বলা যেতে পারে। প্রচুর শস্য উৎপাদন করা ছাড়া এখানকার

প্রধান ব্যবসায় হ'চ্ছে জার্ম্মাণীর বিখ্যাত "বিয়ার মদ" প্রস্তুত করা। এই বাভেরীয়াই সমস্ত জার্ম্মাণীকে "হপ্‌লতা" সরবরাহ করে। এই 'হপ্‌লতা' অনেকটা আমাদের দেশের চিরতার মতো, এবং 'বিয়ার' মদের উহাই সর্ব্বপ্রধান উপাদান। পুরাকালে এদেশের ঋষিরা এরই নাম সোমলতা রেখেছিলেন কি না, তা ঠিক বলা যায় না। বীয়ারের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ও সুস্বাদু মদও বাভেরীয়া দিতে পারে, কারণ এখানে আঙুর ক্ষেতেরও অভাব নেই।

বৈদ্যুতিক উপায়ে ধাতব দ্রব্যাদি কলাই করা হ'চ্ছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য। পর্ব্বত হ্রদ তড়াগ ও নদী কাননাদি পরিবেষ্টিত স্বভাব-শোভায় বাভেরীয়া সুন্দরতম প্রদেশ। এর সর্ব্বপ্রধান শহর মিউনিক্ একটি জগদ্বিখ্যাত নগর। এই নগরের সংস্থাপক নৃপতি ম্যাক্স্ পণ করেছিলেন যে তিনি এমন শহর নির্ম্মাণ করাবেন যে কেবল সেই শহরটি দেখবার জন্য দেশ-দেশান্তর থেকে জার্ম্মাণীতে লোক আসবে! তাঁর সে আশা অনেকটা সফল হয়েছে বটে,—জার্ম্মাণীতে গিয়ে মিউনিক্ না বেড়িয়ে এলে জার্ম্মাণী দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

নূরেম্বার্গও বাভেরীয়ার একটি উল্লেখযোগ্য শহর। স্কুলের ছেলেরা এই শহরের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত; কারণ তাদের লেখবার লেড্ পেন্সিল বা উড্‌পেন্সিল এইখানেই তৈরী হয়। এ শহরটিও দেখতে অতি সুন্দর।

বাভেরীয়ার ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলন ও তৎসংক্রান্ত ইতি-কথার সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত ব'লে এখানকার প্রাচীন শহর 'হাম্বার্গ' বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

গেঁয়ো বাভেরীয়া বহির্জগতের গতি ও উন্নতির প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে আপনার সঙ্কীর্ণ চতুঃসীমানার মধ্যে আপনার প্রাচীন রীতি নীতি ও দৈনন্দিন জীবন-যাপন-প্রথার ইচ্ছানুরূপ অনুসরণ করে চলেছে। এখানকার বড় বড় কৃষিব্যবসায়ীরা বৈজ্ঞানিক চাষবাসের আধুনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেও বেশ উন্নত সুসমৃদ্ধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা হ'য়ে উঠেছে!

বিবিধ-প্রসঙ্গ

(১)

ভারতের লোকসংখ্যা বনাম দারিদ্র্য

অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম-এ, বি-এল্

আমার কোনও শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মুখে অনেক দিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহার বিলাত-যাত্রার পথে তাঁহার কোনও সহযাত্রী ইংরাজ সিভিলিয়ান ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের কথার আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহাকে না কি বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের প্রজাসংখ্যা-বৃদ্ধিই তাহার এই বর্ত্তমান দারিদ্র্যের প্রধানতম কারণ। বন্ধুবর না কি এই অপবাদ ইতঃপূর্ব্বে স্থানে স্থানে শুনিয়াছিলেন। তাঁহার হাতে এমন কোনও প্রমাণ ছিল না, যাহা দ্বারা তিনি এই অপবাদ হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে পারেন। কাজেই তিনি নিরুত্তর রহিয়া গেলেন এবং সিভিলিয়ানপ্রবর মুক্তির উপায় বলিয়া দিতে লাগিলেন—"প্রজা-বৃদ্ধি রহিত করিবার চেষ্টা কর।" এ স্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে,তাঁহার সহযাত্রী ইংরাজ সিভিলিয়ানটী বয়সে প্রবীণ হইয়াও অবিবাহিত ছিলেন।

কথাটা এতই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং আতঙ্কের সৃষ্টি করিতেছে যে, এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা হইয়া সত্যমিথ্যা নির্দ্ধারিত হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা হুহু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে; অথচ তাহাদের অন্ন-সংস্থানের জন্য তাহাদের নিজেদের কোনও চেষ্টা নাই। এ অবস্থায় দারিদ্র্যের পীড়ন অবশ্যম্ভাবী। এই লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে ভারতের বর্ত্তমান দারিদ্র্যের কতখানি সম্পর্ক এবং কতখানিই বা অসম্পর্ক, তাহারই আলোচনা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গ-ক্রমে এতৎ সম্পর্কীয় অন্যান্য কথাও কিঞ্চিৎ আলোচিত হইবে।

"দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্যদ্রব্য বাড়ে না" এই নিয়মটী ম্যালথাস্ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ইংরাজ অর্থনীতিবিৎ আবিষ্কার করিয়াছেন। অর্থনীতিতে ইহাকে ম্যালথাসের নিয়ম বলে। কথাটী খুবই খাঁটী। তিনি দেখাইয়াছেন যে বিধাতার সৃষ্টি ও সংহার-লীলা আশ্চর্য্য রকমে সামঞ্জস্য রাখিয়া পৃথিবীস্থ মানবগণের মরণ-বাঁচন প্রশ্নের অনেকটা সমাধান করিয়া দিতেছে। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধ, জাহাজডুবি, নৌকাডুবি, রেলওয়ে-সঙ্ঘর্ষণ ইত্যাদি সবই এই মরণ-বাঁচন-রহস্য লইয়া। তবু এই দারিদ্র্যের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মানবসমূহকে সর্ব্বদাই নিজের চেষ্টার দ্বারা নানা উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। এই উপলক্ষে নানা পন্থা খুঁজিতে যাইয়া তিনি বাল্যবিবাহ বন্ধ করিতে এবং জীবনের দায়িত্ব বুঝিয়া সংসারী লোকের পক্ষে সংযম অভ্যাস করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। পরিপূর্ণ জীবন এবং পরিপূর্ণ সমাজ লইয়া বাঁচাই প্রকৃত বাঁচিয়া থাকা। এই ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জীবনের পূর্ণতার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দেহ এবং মন উভয়কেই শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। সোণার পাতে মোড়া জিনিষ ও খাঁটি নিরেট সোণার জিনিষ উভয়েরই বহিরবয়ব এক প্রকারের; কিন্তু ওজন করিলেই উভয়ের প্রকৃত মূল্য ধরা পড়ে। সেইরূপ মানব-সমাজ "প্রকৃত মানুষের সমাজ" হইলেই তাহার যথার্থ সার্থকতা হয়। ধনে, সম্পদে, মনের শক্তিতে—সকল দিক দিয়াই সে যথার্থ ক্ষমতাশালী হইয়া ওঠে। কথাটী চিরন্তন সত্য। সকল দেশ ও সকল জাতির পক্ষেই এই সত্যটী তুল্য মূল্যবান; কিন্তু আক্ষেপ এই যে, ভারতবর্ষ লইয়াই যত কথা উঠিতেছে, অন্য দেশ লইয়া তত নয়। এ জাতের যেন কোনও দায়িত্ববোধ নাই—এই হইতেছে যত বিদেশীয় পণ্ডিতগণের দুঃখ।

এখন এই সম্বন্ধে একটু হিসাব নিকাশ করিয়া দেখা যাক্। ১৯১১ সালে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ৩১৫,১৫৬,০০০ ছিল। ১৯২১ সালে এই লোক-সংখ্যা বাড়িয়া ৩১৮,৯৪২,০০০ তে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং গত দশ বৎসরে মাত্র ৪,০০০,০০০, লোক অথবা লোক-সংখ্যা শতকরা ১.১ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় এই বাড়তি যে একান্তই নগণ্য তাহা একটু হিসাব করিলেই দেখা যাইতে পারে। ঠিক ঐ সময় মধ্যে ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌সে শতকরা ৪.৮ এবং আমেরিকাতে ১৪.৯ করিয়া বাড়িয়াছে। জাপানে ১৮৯৬—১৯২০, এই ২৪ বৎসরে শতকরা ৮৩ জন এবং রুসিয়াতে ১৮৯০—১৯১৪ এই ২৪ বৎসরে শতকরা ৫০ জন লোক বাড়িয়াছে। ১৯০১—১৯১১ এই দশ বৎসরে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ১৯১১—১৯২১ এই পরবর্ত্তী দশ বৎসরে তাহার এক ষষ্ঠাংশ মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের এই লোক সংখ্যা-বৃদ্ধির হার এত অস্বাভাবিক রকমে কম যে, এই সামান্য বৃদ্ধির হারের জন্য আশঙ্কান্বিত না হইয়া বরং এই ক্রমঃক্ষয়ের জন্য প্রত্যেক ভারত-হিতার্থীর চিন্তিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক বর্গ-মাইল প্রতি বেলজিয়ামে ৬৫৮, ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে ৬৪৯, হলাণ্ডে ৫৩৬, ইটালীতে ৩১৬, জার্ম্মেণীতে ৩১১, জাপানে ৩২০, সুইজারল্যাণ্ডে ২৩৬ এবং ভারতবর্ষে ১৭৭ জন লোকের বাস। দেশের আয়তন, লোক-সংখ্যা এবং উৎপন্ন খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণের তুলনা করিলে এক ভারতবর্ষ ব্যতীত ইহাদের প্রত্যেক দেশকে লোক-সংখ্যা-ভার-প্রপীড়িত দেশ বলা যাইতে পারে। ইংলণ্ড এবং ওয়েল্‌স নিজেদের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য যোগাড় করিতে পারে, তাহার তুলনায় তাহাদের লোকসংখ্যা অসম্ভব রকম বেশী। এক রকম সম্পূর্ণ ভাবেই

বিদেশ হইতে খাদ্য দ্রব্য আমদানী করিয়া তাহাদের এই লোকদের প্রতিপালন করিতে হয়। এই সব সত্ত্বেও কোন কোনও বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধির পরিমাণ দেখিয়া নিতান্তই ভীত হইয়া পড়িয়াছেন।

কলকারখানার প্রবর্ত্তনে জগতের অন্যান্য জাতি যখন ধীরে ধীরে তাহাদের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিয়া যুগের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল, ভারতবর্ষ তখন বিদেশজাত সুলভ পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রতি পদে ব্যাহত হইয়া নিতান্ত অসহায়ের মত সাহায্য খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। এই সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত বাণিজ্য-নীতি অসহায় ভারতীয় বাণিজ্যকে আরও অসহায় অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তৈয়ারী মাল রপ্তানি হওয়ার পরিবর্ত্তে ভারতবর্ষ শুধু কাঁচামাল রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। হাজার হাজার কারিকর অভ্যস্ত কাজ ছাড়িয়া পেটের দায়ে গ্রামে গ্রামে অন্ন-সংস্থানের জন্য নানা পন্থা অবলম্বনের চেষ্টায় ঘূরিতে লাগিল। দেশের সর্ব্বত্র আয়-ব্যয়ের হিসাবে একটা অসম্ভব গোলমাল হইয়া গেল। মহামতি রাণাড়ে দেশের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই ভারতে ইংরাজ-বাণিজ্য-নীতির ব্যভিচারের কথার উল্লেখ করিয়া দুঃখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে শতকরা ৯.৫ জন, ইংলণ্ডে ৭৮ জন, আমেরিকাতে ৫১.৪, ফ্রান্সে ৪২.২ এবং জার্ম্মেণীতে শতকরা ৪৫.৬ জন লোক সহরে বাস করে। ইহা হইতেই ভারতবর্ষের লোক যে প্রায় সবই গ্রামে বাস করে, তাহা বেশ বোঝা যায়। ভারতবর্ষে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৩০,০০০ হাজার গ্রাম আছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হয়ত ক্রমে ক্রমে দেশে সহরবাসী লোকের সংখ্যা বাড়িতে পারে; কিন্তু তাহা এত মন্থর গতিতে চলিয়াছে যে, ভারতবর্ষকে গ্রামপ্রধান বা কৃষিপ্রধান দেশ বলিলে একটুও অতিরিক্ত বলা হয় না। এ দেশের লোকের ভিতর শতকরা প্রায় ৭২ জন লোক শুধু জোত-জমির উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে। ফ্রান্সে, আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডে যথাক্রমে ঐ স্থলে শতকরা ৪২, ৪৪ এবং ১০ জন লোক শুধু চাষবাস করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া শতকরা ১৮.৫৬ জন, ফ্রান্সে ৪৪, আমেরিকায় ৩৬ এবং ইংলণ্ডে ৭৪ জন লোক নিযুক্ত আছে। চাকুরী এবং অন্যান্য ব্যবসায় ইত্যাদি লইয়া ভারতবর্ষে শতকরা ৯, ফ্রান্সে ১৪, আমেরিকাতে ২০ এবং ইংলণ্ডে ১৬ জন লোক পড়িয়া আছে। অবশ্য কার্য্যোপযুক্ত লোকদের হিসাবই শুধু উপরিউক্ত তালিকায় ধরা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতবর্ষ শুধু কৃষি লইয়াই বাঁচিয়া আছে এবং কৃষিকার্য্য এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপজীবিকার পন্থার উন্নতি-অবনতির উপর ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি ও অবনতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

ভারতবর্ষের আয়তন ১,৭৭৩,০০০ বর্গ মাইল। আয়তনে ইহাকে একটী মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯১৯—২০ সালের সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, এই বিস্তৃত আয়তনের মধ্যে শতকরা ২৮ ভাগ বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ, ২৩ ভাগ চাষ-আবাদের যোগ্য হইলেও নানা কারণে পরিত্যক্ত; ১৮ ভাগ চাষ আবাদের উপযুক্ত অথচ পতিত, ৯ ভাগ আবাদ হইয়াও পড়িয়া আছে' এবং অবশিষ্ট শতকরা ৩৬ ভাগ জমিতে মাত্র চাষ-আবাদ হইয়া ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। বন-জঙ্গলাবৃত স্থানসমূহ এবং চাষ-আবাদের যোগ্য অথচ নানা কারণে পরিত্যক্ত স্থানসমূহ বাদ দিলেও, আরও শতকরা ২৭ ভাগ জমিতে অনায়াসে ফসলাদি উৎপন্ন করা যায়। তাহা হইলে ফসলী জমি শতকরা ৩৬ ভাগ হইতে বাড়িয়া ৬৩ ভাগে আসিয়া দাঁড়ায়। ভারত-বর্ষকে খাওয়াইয়া বাঁচাইবার পক্ষে এই পরিমাণ জমি অত্যন্ত অতিরিক্ত। ইহার উপর ভারতবর্ষের কৃষক সম্প্রদায় সার ইত্যাদি দ্বারা জমিতে বেশী ফসল উৎপাদন ব্যাপারে নিতান্ত উদাসীন এবং অনভিজ্ঞ। তাহারা শুধু জমির পর জমি চাষ করিয়া যাইতেছে; কিন্তু পরিশ্রম হিসাবে অর্থলাভ করিতে পারিতেছে না। ভারতবর্ষের এক একর জমিতে যে পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হয়, জাপানে সেই পরিমাণ জমিতে তাহার দ্বিগুণ ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। বম্বে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রতি একরে ১২৫০ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হয়, তৎস্থলে ঠিক ঐ পরিমাণ জমিতে ইংলণ্ডে ১৯৭৩, সুইজারল্যাণ্ডের মত পাহাড়ের দেশে ১৮৫৪ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হয়। বার্লি আমাদের প্রতি একরে ১৩০০ পাউণ্ড মাত্র উৎপন্ন হয়, ইংলণ্ডে সেই স্থলে ২১০৫, বেলজিয়মে ২৯৩৫ এবং সুইজারল্যাণ্ডে ২১৯৮ পাউণ্ড বার্লি উৎপন্ন হয়। আমাদের এক একরে ১ টন, জাভায় ৪ টন এবং হাউইতে ৪½ টন চিনি প্রস্তুত হয়। ঐ সব দেশের মৃত্তিকার অবস্থা এবং ফসল উৎপন্ন করিতে কৃষকদের যে কি পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হয়—ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এতৎসঙ্গে আমাদের দেশের জমির অস্বাভাবিক উর্ব্বরতা এবং কৃষকদের কৃষি-বিজ্ঞানে বিপুল অজ্ঞতা মনে পড়িয়া অত্যন্ত দুঃখ হয়। রাজা ও প্রজার সমবেত চেষ্টায় ভারতবর্ষের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যাদি বিশেষ কষ্ট না করিয়া বর্ত্তমান পরিমাণের দ্বিগুণ ত্রিগুণ উৎপন্ন করা যায়। জাপান ১৭০ লক্ষ একর জমি চাষ করিয়া ৫৬০ লক্ষ লোককে খাওয়াইয়া বাঁচাইতেছে; আর ভারতবর্ষ ২২২০ লক্ষ একর জমি চাষ করিয়াও ৩০০০ লক্ষ লোককে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেছে না! আমাদের দেশে এক একর জমির উৎপন্ন ফসলের মূল্য গড়ে ২৫৲ এবং জাপানের ১৫০৲, ঠিক ছয় গুণ তফাৎ! যেটুকু জমি এখনও বিনা চাষে পড়িয়া আছে অথচ যেখানে চাষের কোনই বাধা বিঘ্ন নাই, শুধু সেই জমি টুকু চাষে আনিলে ভারতবর্ষ তাহার বর্ত্তমান লোক সংখ্যার ত্রিগুণ লোককে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারে।

জমির কৃষিকার্য্য ব্যতীত মাছের ব্যবসা, কাঠের ব্যবসা, খনির কাজ ইত্যাদিতে এখনও যথেষ্ট লোকের স্থান আছে। রয়েল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল কমিশন এই সব আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, "দেশে জমি-জমার চাষ-আবাদ ছাড়া আরও অসংখ্য লাভবান ব্যবসা পড়িয়া আছে। দেশের মহাজন সম্প্রদায় এ সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। বিদেশীয় মহাজনদের অর্থে এই সব ব্যবসা পরিপুষ্টি লাভ করিতেছে। ভারতবর্ষ শুধু কাঁচা মাল সরবরাহ লইয়াই পড়িয়া আছে। সেই সব মালে তৈয়ারী জিনিষই

আবার উচ্চমূল্যে এদেশে বিক্রীত হইবার জন্য চলিয়া আসে।" ব্যবসায় ও চাকুরীতে মোট শতকরা ৫ জন ভারতবাসী নিযুক্ত আছে। এ স্থলেও আরও অধিক সংখ্যক ভারতবাসীর এখনও সংস্থান হইতে পারে। এই রকম ভাবে একটু তলাইয়া দেখিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে, ভারতের বর্ত্তমান লোকসংখ্যার তুলনায় তাহার লোক প্রতিপালনের সংস্থান প্রচুর পরিমাণে আছে।

১৯২২ সালের ভারতীয় ফিস্কাল কমিশন তদন্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণে ধান্য ও গম রপ্তানি হইয়া থাকে। বিদেশীয় বণিকগণ বৎসর বৎসর এই সব মাল কিনিয়া লইয়া যায়। দেশে খাদ্য দ্রব্যের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য আছে; কিন্তু ভারতের লোকে দরিদ্র বলিয়া অন্ন-সংস্থান করিতে পারে না। যদি দেশে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু দারিদ্র্য বশতঃ লোকে তাহা ক্রয় করিতে অসমর্থ হয়, তবে তাহাকে লোক-ভার-প্রপীড়িত দেশ কোন মতেই বলা যাইতে পারে না। কেন না লোকসংখ্যা কমাইয়া দিলেও যদি দেশের দারিদ্র্য না ঘুচান যায়, তাহা হইলে দেশের অবস্থা ঐ একই ভাবে আসিয়া দাঁড়ায়। ইংলণ্ডে লোকসংখ্যার তুলনায় উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের একান্ত অভাব। তাহার উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যে ৩ ভাগের এক ভাগ মাত্র লোকের অন্ন-সংস্থান হয়। কিন্তু সেখানের অধিবাসীবৃন্দ যথেষ্ট সঙ্গতিপন্ন। বিদেশ হইতে খাবার কিনিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে; কিন্তু তাহাতে ইংলণ্ডকে কোন সুধী ব্যক্তি লোক-ভার-নিপীড়িত দেশ বলিবে না। দেশে যথেষ্ট খাবার আছে, কিন্তু কিনিয়া খাইবার মত অর্থ নাই, এ বড় ক্ষোভের বিষয়। এই বিরাট ভারতীয় দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধান এবং তাহা মোচনের চেষ্টা না করিয়া তাহার লোক বাঁচাইবার জন্য তাহাকে লোকসংখ্যা কমাইবার যুক্তি দেওয়া যেমন ধৃষ্টতা-পরিপূর্ণ তেমন নির্ব্বোধের সরলতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ব্রিটিশ ভারতের বাৎসরিক আয় ১৯১৩-১৪ সালের রিপোর্ট অনুসারে মোট ১,২১০,২৭,৯১,০১০ টাকা। ইহা হইতে প্রতি বৎসর নানাভাবে ১২৩,০০,০০,০০০, টাকা বিদেশে চলিয়া যায়, যাহার পরিবর্ত্তে আমরা একরকম কোনই উপকার পাইতেছি না। আয় হইতে ব্যয় বাদ দিলে ৯১,০৮৭,২৭,৯১,০১০ আমাদের 'নিট' বাৎসরিক আয়। ১৯১১ সালে যে লোকসংখ্যা ছিল, তাহাদের মধ্যে এই আয় ভাগ করিয়া দিলে মাথাপিছু বৎসরে ৪৪৲ অথবা মাসে ৩৷৶৮ পাই করিয়া পড়ে (২ পা ১৯শি ১ পে)। অন্যান্য দেশের তুলনায় দেখা যায়, আমেরিকা মাথাপিছু বৎসরে ৭২, ইংলণ্ড ৫০, অষ্ট্রেলিয়া ৫৪, কানাডা ৪০, ফ্রান্স ৩৮, জার্ম্মেণী ৩০, ইটালী ২৩, স্পেন ১১ এবং জাপান ৬ পাউণ্ড আয় করে। এইখানে দেখিতে পাই আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের লোকের বাৎসরিক আয় আমাদের দেশের আয় অপেক্ষা যথাক্রমে ২২ ও ১৬ গুণ বেশী। ইহা দ্বারাই আমাদের দেশের বিপুল দারিদ্র্য অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রত্যেক ভারতবাসীর গড়পড়তা মাথাপিছু যাহা আয়, তাহা দ্বারা যদি শুধু খাদ্য দ্রব্যই কেনা হয়, তবে তাহাতে জেলের কয়েদীদের যাহা খাইতে দেওয়া হয় তাহারও ৮১ ভাগ মাত্র খাদ্য ঐ আয়ে ক্রয় করা যায়। বাড়ী ভাড়া, কাপড়, জামা এবং অন্যান্য আবশ্যক জিনিষ কিনিবার মত অর্থ তাহার থাকে না। এ অবস্থায় প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ খাটাইয়া আয় বৃদ্ধি না করার অপবাদ বিদ্রূপের মতই প্রাণে আঘাত করে।

আমাদের জন্ম ও মৃত্যুর হারের সহিত ইংলণ্ড এবং আমেরিকার জন্ম ও মৃত্যুর হার তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হাজারে আমেরিকায় মৃত্যুর উপর জন্ম-সংখ্যা ১৭.৭ এবং ইংলণ্ডে ১০ বেশী। সে স্থলে ভারতবর্ষে মাত্র ৫.৪ বেশী। এইরূপে যত রকম ভাবে আলোচনা করা যাউক না কেন, লোক-সংখ্যা প্রপীড়িত ভারত বলিয়া যে অখ্যাতি রটিয়াছে, তাহার কোনও ভিত্তি পাওয়া যায় না।

দেশব্যাপী এই দারিদ্র্যের সহিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সম্পর্ক যে আদৌ নাই, এ কথা বোধ হয় আমরা এখন নিঃশঙ্ক চিত্তে বলিতে পারি। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বড় বড় ব্যাঙ্ক সবই বিদেশী মূল ধনে পরিচালিত। লাভের টাকা সবই প্রায় বৎসর বৎসর বিদেশে চলিয়া যায়। ইহার যেমন প্রতীকার আবশ্যক, গবর্ণমেণ্টের শাসন ও বাণিজ্য-নীতিরও তেমনি পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের ক্ষেত্রোৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কম বলিয়া যে জমির উৎপাদিকা-শক্তি কম, তাহা নহে। উপযুক্ত শিক্ষা, অর্থ, পরিশ্রম, সার, ভাল বীজ, কৃষি যন্ত্রাদি ইত্যাদির অভাবে আমরা জমির উৎপাদিকা-শক্তির পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিতেছি না। তার পর যতখানি জমি অনায়াসে ইচ্ছামত চাষে আনা যাইতে পারে, তাহার অর্দ্ধেকে মাত্র চাষ ও ফসল উৎপন্ন হইতেছে। যাহা উৎপন্ন হইতেছে তাহাও দেশে রাখিবার মত অর্থ নাই। এই অতিরিক্ত লোক-সংখ্যার অপবাদ সম্বন্ধে পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ মিঃ দাদাভাই নৌরজীর তদানীন্তন ভারতীয় সেক্রেটারী অব ষ্টেটের সহিত ব্যবহৃত পত্রাবলী বেশ যুক্তিপূর্ণ এবং প্রণিধানযোগ্য। বস্তুতঃ দেশের অর্থ সুযোগ ও সুবিধার পূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিবার পরই শুধু এই অপবাদ বিচারযোগ্য, অন্যথা নহে।

রক্তকরবী

অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা এম-এ

(২)

ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া রাখিলেও, একটু আলোর রেখা, একটু হাওয়ার স্পর্শ কেমন করিয়া কোন ফাঁকে যেন প্রবেশ করে। বিষয়ীর মনের মধ্যেও তেমনি করিয়া কদাচিৎ একটু আধটু ভাবের আলো, রসের হাওয়া প্রবেশ করে। ক্ষণেকের জন্য ভাব জিনিষটা কখন কি ভাবে প্রাণে আসে, বলা যায় না। একটু আলোকে, একটু বাতাসে, একটু সুরে, একটু পাখীর গানে, একটু কথায়, একটু চাহনিতে, একটু

অচেনা মুখের মুহূর্ত্তের দেখায়, কখনো না কখনো কঠিন প্রাণের উপরও পলকের পুলক-স্পন্দন আনিয়া দিয়া যায়। এই একটা কথা এখানে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। আর ভাবের একটা মোহিনী শক্তি আছে। বিষয়ের তামস-তপস্যায় রত যারা, সময়ে সময়ে তাহাদের উপরও ভাবের প্রভাব বর্ত্তে এবং তাহাদিগকেও আকর্ষণ করে। কিন্তু তাহারা এই ভাব লাভ করিবার উপায় জানে না, আর এই লাভই যে সকল লাভের সেরা—'যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—ইহা তাহারা জানে না। সাধারণ জীবনেও দেখা যায়—মিস্ত্রী মশায় একটু দাশরথির 'কবিতা' পড়িতেছেন, মুদির বেটা দুপুরবেলা একখানা বটতলার নভেল খুলিয়াছেন, মোক্তার বাবু রবিবারের দিন একখানা ছেঁড়া জ্ঞানদাস বাহির করিয়াছেন, রামধনী চাকর সন্ধ্যাবেলা রামা-হো বলিয়া রাগিণী টানিতেছেন। এই সব সাময়িক ভাবের প্রভাব—নন্দিনীর রূপের আভাসের মোহ। বাহির হইতে এই যে আলোর কণা, রসের ছিটা ঘরে ঢোকে,—এই আলো, এই রস ঘরের দুয়ার খুলিয়া কেহ ঘরে নেয় না। লাভের ধন বুকে বাঁধিয়া একটু ভাব দেখা মন্দ নয়। কিন্তু লাভ ফেলিয়া দিয়া কেহই ভাব বুকে ধরিতে চায় না। একটু আধটু রস রসনায় দিতে কাহারো আপত্তি নাই—কিন্তু জীবনে তাহা কেহ প্রতিষ্ঠা করিতে চায় না। ঘর-ভরা তপ্ত কাঞ্চন,—নন্দিনী নাম্নী স্নিগ্ধ রমণীকে বসাইবার স্থান নাই। মোহরগুলি, টাকাগুলি, লোহার সিন্দুকটী, খাট-পালঙ্, দেরাজ-আলমারী, ইঁট কাঠের বাড়ী—এসব সত্যকার জিনিষ—প্রত্যক্ষ বাস্তব—Solid Substantial। কিন্তু এই ভাবটা যে শুধু হাওয়া! না হয় আলোই হইল,—উহা ত মুঠার মধ্যে পাওয়া যায় না! দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়। ছায়া-ছায়া কুহেলিকা! ওই জিনিষের ভরসায় একেবারে বাস্তব পদার্থগুলি কি করিয়া ত্যাগ করা যায়! ভাবটা এম্‌নে বেশ একটু ভালই লাগে। কিন্তু চাঁদের আলোয় ত পেট ভরে না! পেট ভরাতে হইলে টাকা দিয়া চাল-ডাল কিনিতে হয়। ভাবের প্রতি মানুষের ভাবটা এই প্রকার। এই কথাগুলি মনে রাখিলে রক্তকরবীর কতকগুলি বিষয় বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

(১) নন্দিনী বলিতেছে—'তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।'

রাজা বলিতেছে—'না, ঘরের মধ্যে না; যা বল্‌তে হয় বাহিরে থেকে বল।'

বিষয়ী ভাবিনীর সহিত দূর থেকে দুটী কথা বলিতে পারে; তার রূপের একটু তারিপও করিতে পারে; কিন্তু তাহাকে ঘরের ঘরণী করিতে পারে না। ঘরণী তার সোনা-রাণী। সোনা-রাণীর হাত-পাগুলি একেবারে লোহার চেয়েও শক্ত; বুকখানি নিরেট; অন্তরে বাহিরে কোথাও রস নাই। কিন্তু তবু তাহাকে বাস্তবিক রূপে বুকের মধ্যে পাওয়া যায়। সে যে বুকে বসিয়া বুক পিষিয়া দেয়—তবু ঐ হেম-বরণীর রূপের মোহ টুটে না। এ যেন দ্রৌপদী-রূপী ভীমের প্রতি কীচকের মোহ!

(২) নন্দিনী রাজাকে কুঁদ ফুলের মালা পরাতে চায়। বল্‌ছে 'কুঁদ ফুলের মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে এনেছি'। রাজা বল্‌ছে—'নিজে পরো।'

রাজার গলায় সোনার শৃঙ্খল। মণিমুক্তার মালার জাল। তার কাছে কি ফুলের মালা? সোনার হার এক রাজ্যের জিনিষ—ফুলের মালা অন্য রাজ্যের। এক স্থূল ধনৈশ্বর্য্য—আর সুকুমার রূপ-মাধুর্য্য। একটী বিষয়ের কঠিন বিলাস—আর একটী রসের কোমল লীলা। মুক্তা-ফলে যাহার লোভ, শিশির-বিন্দু তাহার কাছে অতি তুচ্ছ! রাজার কাছে ফুলের মালার কোনো মূল্য নাই। ভাবুকের ও রসিকের বিচার স্বতন্ত্র। অন্য এক রাজা কবির 'কাব্য আলোচনায়' মুগ্ধ হইয়া যখন কবিকে কহিল—'যাহা কিছু আছে রাজ-ভাণ্ডারে, সব দিতে পারি আনি,'—কবি ধনরত্ন, মণিমুক্তা কিছুই চাহিল না—শুধু কহিল, 'কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে অই ফুলমালাখানি।' আর আমাদের রাজা নন্দিনীর প্রীতির দান—ফুলের মালা প্রত্যাখ্যান করিল। ইহাই বিষয়ীর আর রসিকের প্রাণের পার্থক্য।

(৩) নন্দিনী রাজাকে দেখিতে বলে—'রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটীর আঁচলে।' শুনিতে বলে—'মাঠের বাঁশী শুনে' শুনে' আকাশ খুসি হ'ল।' কিন্তু রাজা ভাবে এ সব যে অলীক কল্পনা। এরি জন্য কি সে নিজেকে মণি-কাঞ্চন হইতে বঞ্চিত করিবে? কিন্তু নন্দিনী-রূপী ভাব যাহার হৃদয়ে জাগিয়াছে, তাহার কাছে নিত্য নিত্য রোদের সাথে সত্য সত্যই সোনার প্লাবন আসে, আর জ্যোৎস্নার সাথে আসে, রূপার বান। সে দেখে—

বিশ্বদেবীর দ্বারের কাছে
কোন্ সে ভিখারী
ভোরের বেলা দাঁড়িয়েছিল
দু'হাত বিথারি?
আঁচল ভরে' সোনা দিতে
ছাপিয়ে পড়ে পৃথিবীতে
একি নেহারি। রবীন্দ্রনাথ)

(৪) 'যাও, যাও, আর কথা কোয়ো না, সময় নেই।' রস কখনো কখনো বিষয়ীর মন প্রাণ অধিকার করিয়া বসিতে চায়। তখন বিষয়ীর মন তাড়াতাড়ি উহা ঝেড়ে-ঝুড়ে ফেলে-দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। রস যে তাহার সময় নষ্ট করে। রসে ত অর্থ আসে না। এই জন্যই আমাদের গ্রামের কোটীশ্বর প্রামাণিক মহাশয় কখনো আসরে বসিয়া কীর্ত্তন শোনেন না। একটু দূরে দাঁড়াইয়া শোনেন। যখন ভাবখানি বেশ ঘনীভূত হইয়া আসিতে থাকে—তখন আস্তে আস্তে কখন সরিয়া পড়েন, কেহ টের পায় না।

(৫) 'নন্দিনী, তুমি কি জানো, বিধাতা তোমাকে রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ করে' রেখেছেন। তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর মধ্যে পেতে চাচ্ছি। কিছুতেই ধরতে পারছি নে। আমি তোমাকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখ্‌তে চাই। না পারি ত ভেঙ্গে চুরে ফেল্‌তে চাই।'

নন্দিনী হইল ভাব, রস, আনন্দ, সৌন্দর্য্য। এ-সব বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। এ-সব অতীন্দ্রিয়। তবে যে সৌন্দর্য্য দেখি? যাহা দেখি তাহা শুধু জড়-পদার্থ। ঐ পদার্থে যাহা সুন্দর তাহা নয়ন দেখে না। তাহা প্রাণের মধ্যে যায়। প্রাণ তাহার মধ্যে যায়। উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করে। ঐ মেয়েটী গৌরবর্ণা। উহাকে কখনো শ্যামবর্ণা দেখি না। ও পাতলা ছিপ্‌ছিপে। উহাকে কখনো মোটা-সোটা দেখি না। কিন্তু একদিন উহাকে আশ্চর্য্য সুন্দর দেখিয়াছিলাম। এখন দেখি বিশ্রী। কিন্তু উহার সবই তেমনি আছে। কিন্তু যে 'রূপের মায়ার আড়াল' উহাকে 'অপরূপ' করিয়া রাখিয়াছিল, সেই মায়াটি আর নাই। কাজেই উহার অপরূপতা চলিয়া গিয়াছে। সুন্দর বস্তু এবং আনন্দকর বস্তু মাত্রেরই এক অপরূপ রূপের মায়া আছে। সাধারণতঃ উহা ক্ষণিক বা সাময়িক। কিন্তু নন্দিনী যে সুন্দর বস্তু, যে আনন্দকর বস্তু তাহার মন-মাতানিয়া মায়ার এবং তাহার অপরূপত্বের শেষ নাই।

নন্দিনীকে রাজা করামলকবৎ করের মধ্যে পাইতে চায়। তাহাকে ধরিতে চায়। উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দেখিতে চায়। কিন্তু নন্দিনী আকাশের আলোকের মত ব্যাপক বস্তু—কখনো সীমার মধ্যে আসে না। তাহার পরিমাণ হয় না। গণনা হয় না। রাজা তাহাকে মুঠোর মধ্যে কি করিয়া পাইবে? তাহাকে ধরা যায় না। তাহার মধ্যে ধরা পড়িতে হয়। তাহাকে উল্টে পাল্টে দেখা যায় না। তাহার মধ্যে ডুবিয়া উলোট-পালোট করিয়া সাঁতার দেওয়া যায়। তাহাকে ভেঙ্গে চুরে ফেলানো যায় না। সে আনন্দঘন অখণ্ড বস্তু। সৌন্দর্য্য প্রাণ দিয়া অনুভবের জিনিষ, জ্ঞান দ্বারা বুঝিবার নয়। প্রাণ দিয়া—অর্থাৎ দান করিয়া। ধরিয়া পাইয়া নয়। বুঝিতে গেলে সৌন্দর্য্য মিলাইয়া যায়—কোথায় লীন হইয়া যায়। সৌন্দর্য্য বোঝা মানে সৌন্দর্য্যকে ধ্বংস করা। কীট্‌স্ ল্যামিয়া কাব্যখানিতে ইহা দেখিয়াছেন। ওয়ার্ড্‌সোয়ার্থ্ বলেন—We murder to dissect—অর্থাৎ we spoil to understand। ঐ যে রাজার মুখে 'মুঠোর ভেতর' ধরার কথা শুনিয়াই নন্দিনী তাড়াতাড়ি বলিতেছে—'আজ যাই।' ঐ যে 'আমি জান্‌তে চাই' শুনিয়া সে বলিতেছে—'তুমি যখন জানবার কথা বল, কেমন ভয় করে।' কারণ নন্দিনীকে জানা মানেই নন্দিনীকে বিনাশ করা। নন্দিনী তা বোঝে। তাই ভয়। নন্দিনী যখন রাজাকে তাহার খুসির কথা বলিতে আসিল তখন রাজা বলিল—'আমার সময় নাই, একটুও না।' রাজা যখন নন্দিনীকে ধরিতে চাহিল তখন নন্দিনী পলাইতে চায়। জ্ঞান ও সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধের ইহাই ইঙ্গিত।

এইখানে তত্ত্বের রূপকের সঙ্গে নাটকের রূপের একটু গরমিল হইয়া গিয়াছে। নন্দিনী নিজেই রাজার ঘরে ঢুকিতে চায়। রাজা বলিল—'না, ঘরের মধ্যে না। যা বল্‌তে হয়, বাইরে থেকে বল।' ইহার ভাবার্থ আমরা দেখিলাম। নন্দিনীকে ঘরে ঢুকিতে দিবে না, অথচ—'ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর মধ্যে পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি না।' তত্ত্বের দিক দিয়া ইহার বেশ মানে হয়। জ্ঞান দিয়া ধরা মানেই প্রাণের ঘরে প্রবেশ করিতে না দেওয়া। কিন্তু বাস্তব জগতে তুমি আমার ঘরে আসিতে চাও, আমি তোমাকে বাহিরে রাখিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকি—অথচ তোমাকে ধরিবার জন্য ছট্‌ফট্ করি—ইহা অস্বাভাবিক এবং অসঙ্গত—absurd। এইখানে রূপকের একটিবার পতন হইয়াছে। 'আমার অনবকাশের উজান ঠেলে' তোমাকে ঘরে আনতে চাই না।'—ইহাতে বোধ হয় পতন রক্ষা হয় না।

(৬) 'কতবার বলেছি, তোমাকে মনে করি আশ্চর্য্য। প্রকাণ্ড হাতে প্রচণ্ড জোর ফুলে' ফুলে' উঠ্‌ছে। ঝড়ের আগেকার মেঘের মত, দেখে' আমার মন নাচে।'—(নন্দিনীর কথা—রাজার প্রতি।)

এই যে অমন বৈচিত্র্যময় অসীম জটিলতাপূর্ণ সুবিশাল সাংসারিক বাস্তবিক জগৎটা এবং ইহার মধ্যে যে একটা দুর্দ্দমনীয় দানবিক শক্তি অহোরাত্র ক্রিয়া ও ক্রীড়া করিতেছে, ইহা এমনি এক বিস্ময়কর বিষয় যে ইহা আলোকন করিয়া ভাবের প্রাণও চমৎকৃত হয়। ইহার বিচিত্রতা, বিশালতা, জটিলতা এবং অসীমশক্তিমত্তা এক অদ্ভুত-রসাত্মক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। এই জন্য ইহা দেখিয়া ভাবময়ী নন্দিনীর 'মন নাচে।' যক্ষরাজকে দেখিয়া নন্দিনীর মন নাচে বলিয়াই রসাত্মক ও ভাবাত্মক কাব্য নাটক ও উপন্যাস-সাহিত্যে যক্ষপুরীর—অর্থাৎ এই পার্থিব বৈভবময় সংসারের রাশি রাশি বর্ণনা। নন্দিনীর এই আনন্দ আছে বলিয়াই—সেক্‌স্‌পীয়ারের নাট্য-কাব্য, কার্লাইলের ফরাসীবিদ্রোহ, ভিক্‌টার হিউগোর লা-মিজারেব্‌ল্, ডুমার মণ্টি-কৃষ্ট আর টলষ্টয়ের সমর ও শান্তি প্রভৃতির উদ্ভব হইয়াছে। আর নন্দিনীর এই আনন্দ হইতেই রবীন্দ্রনাথের এই রক্তকরবীরও সৃষ্টি হইয়াছে।

(৭) 'রাজা। রঞ্জনকে দেখে তোমার মন যে নাচে, সেও কি—'
'নন্দিনী। সে কথা থাক্। তোমার ত সময় নেই।'

নন্দিনী রাজার কাছে রঞ্জনের কথা বলিতে চায় না। বিষয়ীর প্রাণে কোনো ক্ষণে রসের উদয় হয়। কিন্তু তাহা তাহাকে ভগবচ্চেতনার দিকে লইয়া যায় না। কারণ এই রস বুঝিতে পারে যে এই ব্যক্তির চিত্ত বিষয়ে ব্যাপৃত। ইহাতে রসময়ের বসিবার স্থান নাই।

(৮) 'আমার মধ্যে জোরই আছে। রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু।' বিষয়ের সেবক এইটুকু বুঝিতে পারে যে, তাহার প্রাণের মধ্যে কখনো কখনো যে মধুর ভাব জাগিয়া উঠে, তাহার স্থূল-বিষয়-নিষ্ঠ স্বরূপের সঙ্গে সেই ভাবের সম্পূর্ণ অমিল—একেবারে বিরোধ। সেই ভাব এই বিষয়-কলুষিত স্বরূপকে একটুও পছন্দ করে না। সে আরো এইটুকু বুঝিতে পারে যে বিষয় পরিহার করিলে তাহার যাহা থাকিবে, সেই ভাবময়ী তাহাই চায়, এবং তাহারি গলে বর-মাল্য দিতে পারে। বিষয়-ত্যাগী মানুষের হৃদয় মাধুরী-ভরা। সে বল-প্রয়োগ জানে না। এই মাধুর্য্য তাহার জাদু। সেই জাদুই নন্দিনীকে বাঁধে—জোর নয়। রাজার কেবলি জোর—মাধুরীর জাদু নাই।

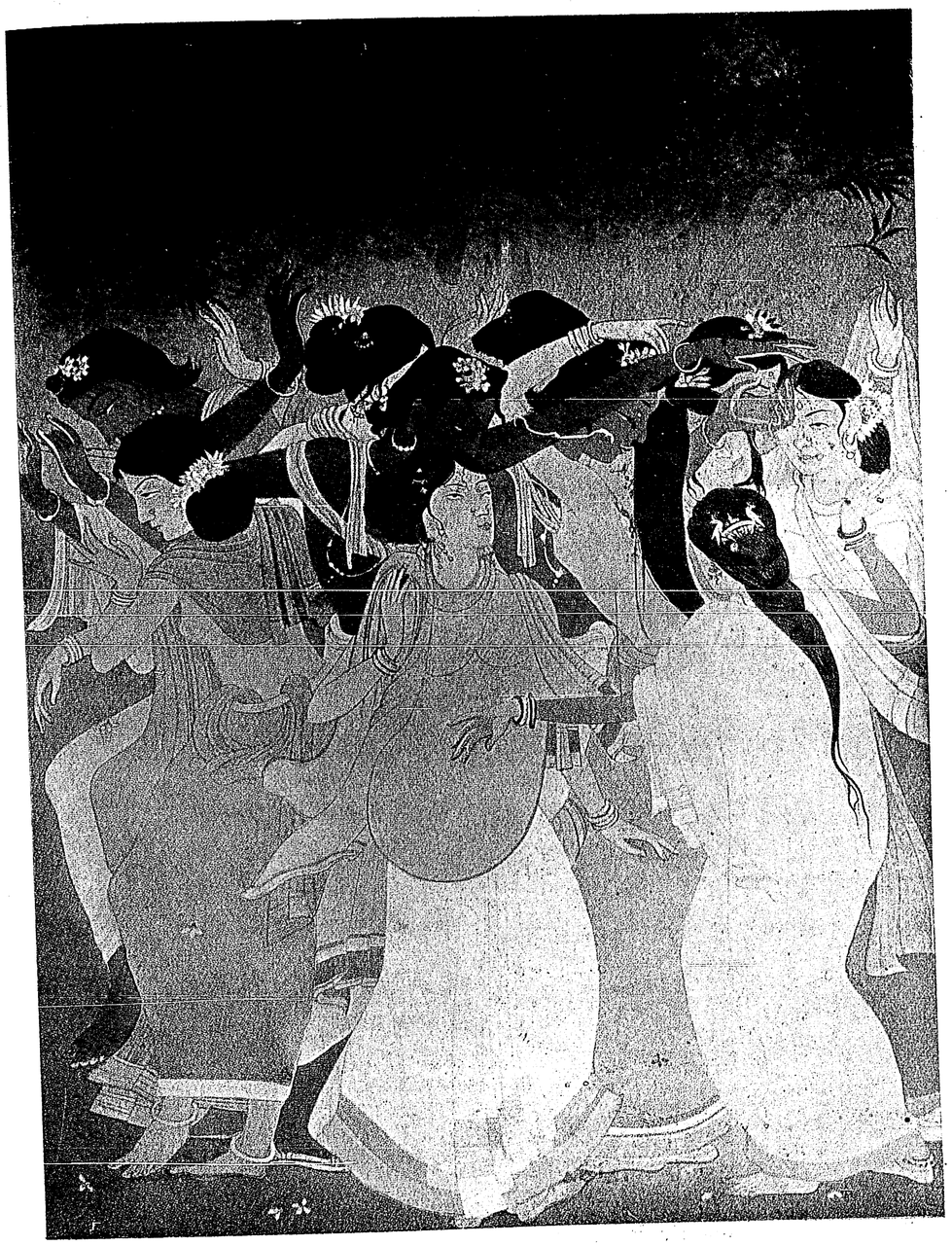

রাস

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

[Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

(৯) 'নন্দিনী। আমার মধ্যে কি দেখেছ?'

'নেপথ্যে। বিশ্বের বাঁশীতে নাচের যে ছন্দ বাজে, সেই ছন্দ।'

এইখানে নন্দিনীর অন্তরতম স্বরূপটী প্রকাশিত হইয়াছে। Matter বা পদার্থ জিনিষটী হইতে স্থাবর—ভারী—inert পাহাড় পদার্থের উদাহরণ। হাওয়াও অবশ্য পদার্থ। কিন্তু মানুষের সংসার যে-সব পদার্থে গঠিত—বাঁশ-কাঠ, ইঁট-পাথর; সোনা-রূপা-লোহা—তাহা স্থাবর কঠোর কঠিন। ঠেলিয়া অতি কষ্টে সরাইতে হয়। হর্ষ, আনন্দ, আহ্লাদ, প্রভৃতি যে-সব ভাব-বস্তু তাহা এই পদার্থের ঠিক বিপরীত। তাহা 'চঞ্চল'—অর্থাৎ কেবলি চলে। ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিয়া চলে। তাহা প্রবহমান—বহিয়া ঢেউ তুলিয়া চলে। মহাপ্রভু কখনো কোনো ওস্তাদের কাছে নাচ শেখেন নাই। মহাপ্রভুর নৃত্য স্বচক্ষে দেখিয়া বহুলোকে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মনে হয়—অমন সম্মোহন নৃত্য পৃথিবীর কোনো নৃত্য-নিপুণা নর্ত্তকী কখনো দেখাইতে পারে নাই। ইহার প্রধান সাক্ষী প্রকাশানন্দ সরস্বতী। প্রভুর নাচ দেখিয়া তাঁহার শুষ্ক সন্ন্যাসীর প্রাণ ব্রজগোপীর ভাব-রসে মত্ত হইয়া গেল। কেন এমন হয়? মহাপ্রভুতে মহাভাবের বিকাশ হইয়াছিল। তিনি 'বিশ্বের' প্রাণ যিনি তাঁহারি 'বাঁশী' শুনিয়াছিলেন, তাই তাঁহার রাতুল চরণে মনোমোহন 'নাচের ছন্দ' বাজিয়াছিল। কবি মধুর-ভাবাবেগে মাতোয়ারা হইয়া যাওয়াতেই তাহার ভাষা ছন্দোময়ী নৃত্যশীলা।

সংসারেও দেখি, আমি এক মাইল পথ হাঁটিতে পারি না। আবার সাত মাইল পথ পরমানন্দে হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে অতিবাহন করিলাম। কারণ আমার একটী বাঞ্ছিত বস্তু আমার সঙ্গে চলিয়াছে। সে-ই, এই যে স্থবির প্রায় আমি, আমাকেও তরঙ্গায়িত করিয়া নাচের ছন্দে চালাইয়া দিয়াছে। তুমি 'কুটাগাছ ছিঁড়িয়া দুই খান' কর না। আজ সারাদিন ভরিয়া উল্লাস করিয়া কাজ করিলে। কারণ আজ এক ব্যক্তি এক বৎসর পরে তোমার সহিত হাসিয়া কথা কহিয়াছে। কাজেই তুমি আজ ছন্দোবদ্ধ। ভাব-রস নৃত্যশীল তরঙ্গায়মান। উহা যাহার উপর 'ভর' করে তাহাকে নাচাইয়া তরঙ্গাইয়া দেয়। তাহার জড়ত্ব দূর করিয়া চিন্ময়ত্ব আনিয়া দেয়। ভগবান বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে এক সুবিপুল ভাব-ছন্দে বাঁধিয়া চিরন্তন-গতি-শক্তি সঞ্চালিত করিয়া দিয়াছেন। তাই —'গ্রহ-নক্ষত্রের দল ভিখারী নট বালকের মত আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে।' বিজ্ঞান Gravitationএর কল্পনা দ্বারা এই বিশ্ব-ছন্দ বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই সম্পর্কে কবির 'বিশ্ব-নৃত্য' কবিতাটী পাঠ করা কর্ত্তব্য। শেলীর ভাষায় নন্দিনী—

Blithe light and music
Vanquishing dissonance and gloom
এবং Indeed
With love and live and light and deity
And motion which may change but cannot die
আবার An antelope
In the suspended impulse of its lightness
were less ethereally light.

শেলীও যাহার সম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখিয়াছেন, সেও এক নন্দিনী। আমাদের নন্দিনীও তাই।—'সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী তুমি এত সহজ হয়েছ।'

(১০) 'রঞ্জন যে ছুটি বয়ে' নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্ত-করবীর মধু দিয়ে ভরে' রাখে কে আমি কি জানি না?'

রঞ্জনের যে সবই ছুটি। তার ত কোনো কাজ নাই! সে কাজ করবে কিসের দুঃখে? সে যে পূর্ণ। 'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।' তবে সে খেলাটা ভালবাসে। আর পূর্ণতার মধ্যেও একটা অভাব সে সৃষ্টি করিয়াছে। সে প্রেম চায়। এইটা তার নেশা। ভক্তির চেয়েও প্রেমে বেশী সন্তুষ্ট।

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎ সন
দেব-স্তুতি হইতে হরে সেই মোর মন।

তবে নন্দিনীর মত প্রেম দিতে কেউ জানে না। কাজেই—

কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে।

নন্দিনীর প্রেম ঐ রক্তকরবীর মধু। অর্থাৎ হরিপ্রিয়-মধু। করবীর একটি নাম হরিপ্রিয়—পূর্ব্বে বলিয়াছি। অনু'রাগ' আর 'মাধুর্য্য' নন্দিনীর ভাণ্ডারে অফুরন্ত।

And from her lips, and from a hyacinth full
Of honey-dew, a liquid murmur Drops.
—Shelley.

ইহাই রক্তকরবীর মধু। * এই মধু না হইলে রঞ্জনের ছুটি কাটে না। এই মধু পান করিয়া ছুটি কাটাইবার জন্যই ত রাধিকা-রঞ্জনের গোলোক আর বৃন্দাবন।—প্রকৃতির অতীত—বিরজার পারে।

(১১) 'আমার অনবকাশের উজান ঠেলে' তোমাকে ঘরে আন্‌তে চাই না।' 'এখনো সময় হয় নি।'

আনন্দ-রস-রূপিনী যে নন্দিনী তাকে ঘরে আনিবার সময় মানুষ পায় না। রোজকার রোজগারের কাজটা আগে কি না? সে কাজ যে ফুরোয় না। অবসর-সময়ে একটু ভাবাবেশ আসে ক্ষতি কি? কিন্তু ভাবের অর্থাৎ কাজের জন্য বাজের ক্ষতিটা অবৈধ। যুগ-যুগান্তেও এ অবসর আসে না। নন্দিনী বাহিরেই থাকিয়া যায়। জালের ফাঁক দিয়া নন্দিনীর সঙ্গে দেখা-শোনা একটু হয় এই মাত্র।

---

* রক্তকরবীকে red oleander না বলিয়া যদি hyacinth বলি তবে Botanyর হিসাবে যতই দোষ হোক্—সাহিত্যের হিসাবে অনেক বেশী সুন্দর হয়। গ্রীক-পুরাণানুসারে সঙ্গীত-সৌন্দর্য্যের দেবতা এপলোর অতি প্রিয় হায়েসিন্থ নামক একটি বালকের শোণিত হইতে এই ফুলের উদ্ভব।

মাল-গুদামের বস্তায় স্তূপের মধ্যে বসিয়া অন্য-মনে কখনো কখনো একটু সুর দিয়া বলা—'অপরূপ পেখনু বালা !'

(১২) 'ছুটি কি করে' মধুতে ভরে, তার জবাব রঞ্জনকে চোখে দেখলেই পাবে। সে বড় সুন্দর।'

রঞ্জনের যে অমৃত-ঘন রস-রাজ রূপ। 'লাবণ্য-সারমসমোর্দ্ধ-মনন্যসিদ্ধং—দৃগ্ভিঃ পিবন্তি নার্য্যো নরাশ্চ।'

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং। (শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত)

এই রূপ-মধুর আস্বাদনের উল্লাসেই ত ঋষি গাইয়াছেন—

মধুবাতা ঋতায়ন্তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

আর এই মধুময় রূপানুভূতির আবেশেই কবিও গাহিয়াছেন—

মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব !
মধুর মধু আলো, মধুর মধু বায়।
মধুর মধু-গানে তটিনী বয়ে' যায় !

সে বড় সুন্দর—বড় সুন্দর ! অনন্তদেব সহস্র মুখে তার সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়া শোধ করিতে পারেন না। এক দিকে—'কিং বর্ণয়া মস্তব রূপমচিন্ত্যমেতৎ।'

'ঈষৎ-সহাসমমলং পরিপূর্ণচন্দ্র
বিম্বানুকারি কনকোত্তমকান্তি-কান্তং।' (চণ্ডী)

আর এক দিকে—'প্রসন্ন-বক্ত্রং নলিয়াতেক্ষণং।' তাহাকে যে একবার দেখিয়াছে—'ত্রুটি যুগায়তে তমপশ্যতঃ।' অন্যের কা কথা ?

বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণাঙ্গম। ভাগবত।

কাহো স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে
সব লোক করে আপ্যায়িত। চরিতামৃত।

সুতরাং সে রঞ্জন।

(১৩) 'যক্ষপুরীতে ঢুকে অবধি এত কাল মনে হ'ত জীবন হইতে আমার আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি।'

Matter and space—পদার্থ আর আকাশ। আকাশকে বদ্ধ করিয়াই পদার্থ থাকে। পদার্থ বন্ধন—অবরোধক এবং অবরোধ—অত্যন্ত স্থাবর। সাংখ্যের গুণ-তত্ত্ব দ্বারা এই বিষয়টী বেশ বোঝা যাইবে। যক্ষপুরীতে আকাশ দুর্লভ। অতি সত্য কথা। সত্ত্ব রজ তম—এই তিন গুণের মধ্যে যক্ষাগারে সত্ত্ব নাই। এখানে শুধু তম-র আচরণের মধ্যে রজ-র অন্ধ ক্রিয়া। ইহাই জড়াত্মক বিষয়-রাজ্যের বিশেষত্ব।

সত্ত্ব=প্রকাশ। রজ=প্রবৃত্তি। তম=স্থিতি—inertia অর্থে।
সত্ত্ব=প্রীতি। রজ=অপ্রীতি। তম=বিষাদ।

সত্ত্ব—লঘু উজ্জ্বল ও প্রিয় ভাব। রজ—অনিয়ত ক্রিয়াশীল ভাব। তম—গুরু আবরক ও অচলভার।—অর্থাৎ একটা ভারি-ভারী অন্ধকার-অন্ধকার ভাব।

সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টম্।—উপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ। সাংখ্যকারিকা। ১৩।

ইহাদের আর একটী বিশেষত্ব হইল—ইহা পরস্পরকে অভিভূত করিয়া অর্থাৎ প্রক্ষীণ করিয়া প্রবৃত্ত হয়।

অন্যোন্যাভিভববৃত্তয়ঃ গুণাঃ।

সত্ত্ব মানে প্রকাশ। প্রকাশ মানে আলো। আলো মানে আকাশ। কারণ আকাশের তরঙ্গ ব্যতিরেকে আলোকের আবির্ভাব হয় না। এই আলোক-ভরা আকাশের অধিষ্ঠাত্রী—আনন্দ-কিরণ-ঘন-মূর্ত্তি আমাদের নন্দিনী। অবকাশ—অর্থাৎ আকাশ—না হইলে নন্দিনীকে প্রকাশ করা অসম্ভব। তাই ত রাজা বলিতেছে—'আমার অনবকাশের উজান ঠেলে তোমাকে ঘরে আন্‌তে চাই না।'—চায়ও না, পারেও না। যক্ষ-নগরে 'আকাশ' পাওয়া যায় না—কাজেই আলোকও পাওয়া যায় না। কারণ তমোময় যক্ষপুর। তম মানে অন্ধকার। কিন্তু অবিশ্রান্ত কাজ চলিতেছে। কারণ সেখানে রজ প্রবল। সত্ত্ব ও তম অন্যোন্যাভিভব-বৃত্তী। সেই জন্যই ত নন্দিনীর প্রতি যক্ষদের—বিশেষতঃ যক্ষ-বালা চন্দ্রার এত বিদ্বেষ। চন্দ্রা যে তমোময়ী। নন্দিনী সত্ত্বময়ী। তাই বিশু বলিতেছে-'এমন সময় তুমি এসে আমার মুখের পানে এমন করে' চাইলে, আমি বুঝতে পারলুম, আমার মধ্যে এখনো আলো আছে।'

(১৪) 'ওগো দুখ জাগানিয়া।'

এই পৃথিবীতে যে আনন্দ দুঃখ জাগায় না—সে আনন্দ আনন্দই নয়। একটা ক্ষণিকের মত্ততা মাত্র। কারণ আনন্দের প্রত্যেকটী তরঙ্গ আলোক-তরঙ্গের মত আমাকে দেখাইয়া দিবে—আমি কি দুঃখের পাথারের মধ্যে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি। কি অমৃত হারাইয়া কি বিষ লইয়া মাতিয়া রহিয়াছি। ছাই খাইতে খাইতে হঠাৎ একবার একটু চিনি মুখে গেলে কি ছাই-খাওয়ার দুঃখটা জাগিবে না ? চির-অন্ধকারে বাস করিয়া একটু আলোর রেখা দেখিলে অন্ধকার কি পীড়া দিবে না ?

মানুষের দুঃখ-কষ্টের অন্ত নাই। ক্ষণেকের আনন্দলাভে দুঃখের নিবিড় অনুভূতি হয়। কখনো আবার চির-কাল দুঃখের ঘর করিতে করিতে দুঃখের সহিত এমনি মিল হইয়া যায় যে, আমারা আনন্দের কথা ভুলিয়াই যাই ; এবং যাহা আনন্দ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা আদৌ আনন্দ নয়। সুখ,—দুঃখের যমজ ভাই। এই মিথ্যা সুখের মধ্যে খানিক আনন্দ প্রবেশ করিয়া দুঃখ জাগাইয়া দিয়া যায়। তাই বিশুর নন্দিনী দুখ জাগানিয়া।

শেলীর—Our sweetest songs are those that tell
Of saddest thought—এর ইহাই প্রকৃত অর্থ।

(ক্রমশঃ)

জয়দেব

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

(৪)

প্রথম শ্লোক

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দ নিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্ব কুঞ্জ দ্রুমং
রাধা মাধবয়োর্জয়ন্তী যমুনাকুলে রহঃ কেলয়ঃ॥

কবি জয়দেব এই রহস্যময় শ্লোকে তাঁহার অপার্থিব প্রেম-গীতি-কাব্য শ্রীগীতগোবিন্দের অবতারণা করিয়াছেন। কাব্যে তিনি রাসন্ত-রাসের বর্ণনা করিতেছেন,—সরস বসন্তে ব্রজ-বনভূমি নন্দন-নিন্দিত কান্ত-সৌন্দর্য্যে মধুময় শ্রী ধারণ করিয়াছে। যমুনাস্নাত সুরভি মলয়ের মন্দ আন্দোলন, বিটপীকুঞ্জে ব্রততী-বিতানে পুষ্পিত সোহাগের পুলকোল্লাস, কুসুমে কুসুমে মধুকরনিকরের ঝঙ্কার-কোলাহল, শাখায়-শাখায় কোকিল-কোকিলার কল-কাকলী, আকাশে-বাতাসে মাধুরীর মেলা, স্বর্গে-মর্ত্তে মিলনের লীলা,—প্রকৃতির এই উৎসব-সমারোহের মধ্যে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমের অভিসার, বিরহ, মান, মিলনের সুমধুর রঙ্গাভিনয় নিত্য নবভাবে অভিনীত হইতেছে। ইহাই হইল তাঁহার কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু প্রথম শ্লোকে কবি বর্ণনা করিতেছেন—আকাশ মেঘে ঢাকা, বনভূমি শ্যামল-তমালে আচ্ছন্ন, তাহার উপর আবার রাত্রিকাল, অপরাধ-ভীত শ্রীকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া—হে রাধে, তুমি গৃহে যাও। এইরূপে নন্দ-নিদেশে কুঞ্জতরুতলে-প্রস্থিত শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যমুনা-কূলের বিজন কেলী জয়যুক্ত হউক।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, যে-কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত-লীলা, বর্ষায় তাহার সূচনা হইল কি প্রকারে ? অনেকেই এ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। আধুনিক কেহ কেহ কাব্যের সঙ্গে এই শ্লোকের কোনো সামঞ্জস্য খুঁজিয়া না পাইয়া শ্লোকটীকে প্রক্ষিপ্তও বলিয়াছেন। প্রশ্ন আজিকার নহে, হয় তো কবির সম-সময়েই এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। টীকাকারগণ প্রত্যেকেই প্রশ্নটী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন ; এবং একজনের পর আর একজন আপন আপন মতানুযায়ী ইহার সমাধানেরও চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু মানব-মনকে কে কবে সংশয়হীন করিতে পারিয়াছে ? অগণিত হৃদয় আজিও জিজ্ঞাসা করিতেছে—কেন ? কেন কবি এই শ্লোকে তাঁহার কাব্যের মুখবন্ধ করিয়াছিলেন ? কে এই জিজ্ঞাসার নিরসন করিবে ? কে বলিতে পারে, অতীতের কোন্ স্মরণাতীত দিবসে নব বরষার প্রথম আষাঢ়ে জলভারাবনত বারিধরের স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি উজ্জয়িনীর শীপ্রা-শীকর-চুম্বিত কাব্যোদ্যানে কবি-হৃদয়ে কোন্ বেদনার মূর্চ্ছনা জাগাইয়াছিল ? কে বলিতে পারে—কেন সেই নবজলকণসিক্ত কূটজ-কুসুম-গন্ধবাহী মন্দ সমীরণে মন্দাক্রান্তার মধুচ্ছন্দে লীলায়িত বিরহ-সঙ্গীতের তরঙ্গ বহিয়াছিল ? তেমনি, কে জানে—তাহার বহুশত বর্ষ পরে সেই বরষার মায়াময় চিত্র, এক স্নিগ্ধ সজল মেঘকজ্জল রাত্রি, অজয়ের কূলে কেন্দুবিল্বের বিজন কুঞ্জ-কুটীরে কবিরাজ গোস্বামী জয়দেবের মন কি নবভাবে ব্যাকুল করিয়াছিল ? কবির অভিপ্রায় কি ছিল জানি না, কোনোরূপ সিদ্ধান্ত রচনাও আমাদের অভিপ্রেত নহে ; আমরা এখানে কয়েকটী বিভিন্ন মতবাদের (সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মত মাত্র) উল্লেখ করিয়া এই বক্তব্য শেষ করিব। সহৃদয় পাঠকগণ সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিচার করিবেন।

শ্রীগীতগোবিন্দের একটী সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। এই সম্প্রদায়ের কোনো লিখিত গ্রন্থ আমি দেখি নাই, কিন্তু ব্যাখ্যা যাহা শুনিয়াছি, সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। ব্যাখ্যাকারের মতে শ্রীগীত-গোবিন্দে দুইটী সঙ্কেত-বাণী পাওয়া যায়—একটী শ্রীমতীর উদ্দেশে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিরূপে কথিত শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক। অপরটী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে প্রেরিত শ্রীমতীর সঙ্কেত-বাক্য—কাব্যের দৃষ্ট বৈকুণ্ঠ নামক ষষ্ঠ সর্গের সমাপ্তি ভাগে উল্লিখিত—

"কিং বিশ্রাম্যসিকৃষ্ণ ভোগীভবনে ভাণ্ডীর ভূমিরুহে
ভ্রাতর্বাহি ন দৃষ্টিগোচরমিতঃ সানন্দ নন্দাপদম্।
রাধায়া বচনং তদধ্বগ মুখান্নন্দান্তিকে গোপ-
গোবিন্দস্য জয়ন্তি সায়মতিথি প্রাশস্ত্য গর্ভাগিরঃ॥

প্রথমটীর ব্যাখ্যা এইরূপ—

"মেঘমেদুর অম্বর, তমালে আচ্ছন্ন বনভূমি এবং রাত্রি একত্র মিলিত হইয়া নিখিল দৃশ্য শ্যামময় করিয়া তুলিয়াছে। হে রাধে, কেন ভীতা হইতেছ ? এই তো তোমার অভিসারের উপযুক্ত সময়, এস গতিবেগ বাড়াও. কুঞ্জগৃহে তোমার মিলন-মন্দিরে প্রবেশ কর। এই (নন্দ-নিদেশ) মুরলী-সঙ্কেত-চালিতা অভিসারিকা শ্রীমতী পথিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিলেন। যমুনা-কূলের প্রতি কুঞ্জে এই সম্মিলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিজন-ক্রীড়া জয়যুক্ত হউক।" ব্যাখ্যাকার বলেন—ইহা সেই চিরন্তন আহ্বান-বাণী, যাহা অনাদি কাল ব্যাপিয়া অমৃতের সন্তানকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, অনন্ত মুহূর্ত্ত ধরিয়া ধ্বনিত হইতেছে। যাহা সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে—হর্ষামর্ষ ভয়োদ্বেগ সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সেই বিশ্বশরণেরই শরণ গ্রহণে ইঙ্গিত করিতেছে। ইহাই ব্রজের কানুর বেণুর গান, ইহাই শ্রীমতী রাধিকার—তথা নিখিল জীব-জগতের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী মন্ত্র—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা—

"ভাই পথিক, কালসর্পের আবাসস্থল এই ভাণ্ডীর তরুতলে কেন দাঁড়াইয়া আছ ? অদূরে ঐ আনন্দময় নন্দালয় দেখিতেছ, ওখানে কেন যাও না ? এ সংসার কুটিল কালের ক্রীড়াক্ষেত্র,—এখানে কেন দাঁড়াইও না, কালের খেলায় মজিও না। ঐ দেখ আনন্দধাম, একমাত্র গন্তব্যস্থল,—যাও, অগ্রসর হও। অথবা এ সংসার সেই শ্রীকৃষ্ণেরই লীলাভূমি। এখানে তিনিই একমাত্র ভোক্তা। এখানকার যাহা কিছু সব, তাঁহারই জন্য। এই কর্ম্মভূমি তোমার বিশ্রামের স্থান নহে,—আলস্য-বিলাসে মজিয়া মোহের আঁধারে ডুবিয়া এখানে পড়িয়া

থাকিও না। যাও, তাঁহার লীলারহস্যের মর্ম্মাবধারণ করিয়া মনুষ্যত্বের পথে জয়যাত্রা কর। এ প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া লীলাময়ের নিত্য-লীলাভূমি আনন্দ-নিকেতন নন্দব্রজে যাও। শ্রীকৃষ্ণ পথিকের মুখে শ্রীমতীর এই সঙ্কেত-বাণী শুনিয়া নন্দের নিকট প্রকৃত অর্থ গোপন পূর্ব্বক পথিকের উদ্দেশে যে প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল-গাথা জয়যুক্ত হউক।" ব্যাখ্যাকার বলেন, ইহাই শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণের সঙ্কেত-বাণী—তথা নিখিল জীব-জগতের মাঝে শ্রীভগবৎ অবতারণের অমৃত-মন্ত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা। তবে ব্যাখ্যাতা এই শ্লোক দুইটীর প্রতি শব্দের অর্থ লইয়া যেরূপ সুকৌশলে ইহার বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহার এতটুকুও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় নাই। বাহুল্য ভয়ে এখানে সেই বিবৃতি বিস্তারের লোভ সম্বরণ করিলাম। আশা করি, এই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম হইতেই পাঠক শ্রীগীতগোবিন্দ সম্বন্ধে বাঙ্গালার এক অতি প্রাচীন সম্প্রদায়ের অভিপ্রায়ের আভাষ পাইবেন।

টীকাকারগণের মত কিন্তু অন্যরূপ। উদাহরণস্বরূপ, এ দেশে প্রচলিত টীকা হইতে সুপ্রসিদ্ধ পূজারী গোস্বামীর এবং মেবারের রাণা কুম্ভের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। পূজারী গোস্বামী বলেন, নন্দ অর্থে আনন্দজনক সখী-বাক্য—"নন্দয়তীতি নন্দ।" ভীরু অর্থে "*** ত্বৎ কৃত বহু নায়িকা বল্লভতো রোপনাশঙ্কা।" গৃহং প্রাপয় অর্থে "মঞ্জুতরেত্যাদি বক্ষমানং কেলীসদনং প্রাপয়।" অথবা "ত্বয়ৈবায়ং গৃহিণী মানস্তিত্যর্থ।" ইহাঁর মতে লীলা-বিলাসের অনুকূল সময়ের জন্য মেঘমেদুর অম্বর এবং রাত্রির অবতারণা করা হইয়াছে। এই শ্লোকটী একাধারে নমস্কার এবং বস্তুনির্দ্দেশবাচক। জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে, শ্রীরাধা মাধবয়ো রহঃ—কেলয়োইএ প্রতিপাদ্যাঃ, ত্যতো বস্তু নির্দ্দেশোহপি। "রসিকপ্রিয়া"কার রাণা কুম্ভ শ্লোকের প্রথম দুই চরণকে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি রূপে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি "নন্দ নিদেশতঃ" পদের অর্থ করিয়াছেন "নন্দের নিকট হইতে"। "ভীরু" অর্থে তাঁহার মতে "এভির্ভয় হেতুভি স্মরাহতীঃ সোঢ়ুমসমর্থঃ"। তিনি মেঘাদিকে উদ্দীপন বিভাব, শ্রীরাধাকে আলম্বন বিভাব, এবং শ্রীকৃষ্ণের ভীরুতাকে অনুভাব রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীগীতগোবিন্দের পদ্যানুবাদক বৈষ্ণব কবি রসময় দাস শ্লোকের প্রথম দুই চরণকে নন্দবাক্য ও সখী বাক্য উভয় প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণের পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে বর্ণিত বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন। ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে বর্ণিত আছে—

"একদা গোপরাজ নন্দ শিশু শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া বৎস-গাভী সহ গোষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ভাণ্ডীর বনে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ নিবিড় মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। মেঘ-গর্জ্জন, করকাপাত, ঝঞ্ঝা-প্রবাহ বনমধ্যে দারুণ দুর্য্যোগের সৃষ্টি করিল। গোপরাজ শ্রীকৃষ্ণের জন্য অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মেঘ ও বৃষ্টি যেমন অন্তর্হিত হইয়া গেল, অমনি দুর্য্যোগ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির প্রসন্ন হাস্যের ন্যায় অপরূপ রূপময়ী কিশোরী শ্রীমতী রাধিকা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নন্দ—

"আদ্যা শক্তিস্ত্বং দেবী ত্বমেব বিশ্বরূপিণী।
গোলকবাসিনী ত্বংহি ত্বমেব শ্রীহরিপ্রিয়ে॥"

ইত্যাদি রূপ স্তব করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার কোলে অর্পণ করিলেন। তখন—

"ক্রোড়ে কৃত্বা তু শ্রীকৃষ্ণং শ্রীমতী রাধিকেশ্বরী
জগাম গুপ্ত ভাবেন নিবিড় গহনং বনং।"

সেখানে রাসমণ্ডলের আবির্ভাব হইল, শ্রীকৃষ্ণ কিশোর নটবর বেশ ধারণ করিলেন, ইত্যবসরে ব্রহ্মা আসিয়া কিশোর কিশোরীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন।" রসময় দাসের মতে এই বিবাহ ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়াই জয়দেব তাঁহার কাব্যের ঐ সূচনা-শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্রে এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

এইবার আমাদের কথা বলিব। আমরা কি ভাবে শ্লোকটী বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, সেই কথাই বলিব। কোনোরূপ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, এবং বলা বাহুল্য, লেখকের সামর্থ্যের অভাবও তাহার একতম কারণ। মাত্র আলোচনার সুবিধার জন্যই, অর্ব্বাচীন হইলেও, এই সঙ্গে আমাদের মতেরও উল্লেখ করিলাম। আমাদের মতে এই বিবাহ ব্যাপার শ্রীগীতগোবিন্দের পক্ষে বিশেষ প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে হয় না। কবি শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন —তাহার মধ্যে বিবাহাদি লৌকিকতার বর্ণ-বিন্যাসের অবকাশ না থাকিবারই কথা। শ্রীরাধাকৃষ্ণের পুরাণ-প্রসিদ্ধ লীলা-বিলাসের কোনো প্রসঙ্গ না রাখিয়া—এমন কি শ্রীবৃন্দাবন-লীলারও অপর সমস্ত অংশ পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র শুদ্ধ মাধুর্য্যকেই তিনি মুখ্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই শ্রীগীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত ব্রজের মধুর ভাবেই ওতোপ্রোতঃ। শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যবস্তু, তাঁহাদের লীলা নিত্যলীলা, অনাদি কাল হইতে শাশ্বত আনন্দধামে এই মহারাস-লীলার নিত্য উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাই কবি অপর কোনো প্রসঙ্গেরই অবতারণা না করিয়া, সেই লীলারই জয়গান করিয়াছেন "জয়ন্তি যমুনা কূলে রহঃ কেলয়ঃ"।

শ্রীগীতগোবিন্দের বৃন্দাবন—কবি-মানসের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি,—সত্যই সেই চিরন্তন আনন্দ-লোকের—কবি-হৃদয়ে প্রতিফলিত এক অপরূপ প্রতিচ্ছবি। তুলনা করিব না,—বিষয় বস্তু পৃথক বলিয়া, পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মের বলিয়া, তুলনা করা সমীচীনও হইবে না; তথাপি এই সৃষ্টি-গৌরবে আদি কবির গৌরব-স্পর্দ্ধী মহাকবি কালিদাসের নাম কবি জয়দেবের সঙ্গে প্রায় সমান মর্য্যাদায় উচ্চারিত হইতে পারে। "মেঘদূতে" কবি যেমন এক অপূর্ব্ব জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন,—যথায় ঈর্ষা দ্বেষ দ্বন্দ্ব কলহ জরা মৃত্যু নাই, রজত-শুভ্র শিব-নিবাস কৈলাসাচলের এক প্রান্তে সেই সুখ-নিকেতন কুবের-পুরী মহানগরী অলকা! কবি অলকার বর্ণনা করিতেছেন—

১

বিদ্যুদ্বন্তং ললিত বনিতা সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহৃত মুরজাঃ স্নিগ্ধ গম্ভীর ঘোষম্
অন্তস্তোয়ং মণিময় ভুবস্তুঙ্গমভ্রং লিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতু মলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ।

* * * * *

৩

যত্রোন্মত্ত ভ্রমর মুখরাঃ পাদপা নিত্য পুষ্পা
হংসশ্রেণী রচিত রসনা নিত্য পদ্মা নলিন্যাঃ
কোকোৎকণ্ঠা ভবন শিখিনো নিত্য ভাস্বৎ কলাপা
নিত্য জ্যোৎস্না প্রতিহত তমোবৃত্তি রম্যা প্রদোষাঃ।

৪

আনন্দোত্থং নয়ন সলিলং যত্র নান্যৈ র্নিমিত্তৈঃ
নান্যস্তাপো কুসুম শরজাদিষ্ট সংযোগ সাধ্যাৎ
নান্যা নস্মাৎ প্রণয় কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তিঃ
বিত্তেশানাং নচ খলু বয়ো যৌবনাদল্যদস্তি।

* * * * *

৬

মন্দাকিন্যা সলিল শিকরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভিঃ
মন্দারানা মনুতরুরহাং ছায়য়া বারি তোষাঃ
অন্বেষ্টব্যৈঃ কণক সিকতামুষ্টি নিক্ষেপগুঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মনিভি রমর প্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ

(মেঘদূত—উত্তর মেঘ)

এ-নেই সে দেশ, যেখানে যৌবন ভিন্ন বয়স নাই, আনন্দাশ্রু ভিন্ন অশ্রু নাই, প্রণয়-কলহ ভিন্ন কলহ নাই। তাপ একটু আছে, তাহাও মদনশরজ এবং "ইষ্ট সংযোগ সাধ্যাৎ"—বেশী প্রখর হইবার উপায় নাই; কারণ, শিবধাম বলিয়া সেখানে মদনও খুব সন্তর্পণেই যাতায়াত করেন। আশ্চর্য্য দেশ, কিন্তু দেশের লোকে দিনযাপন করে কিরূপে? অন্য কবি হইলে কি করিতেন জানি না, তবে কালিদাস পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন—তিনি সে দেশের লোকেরও কার্য্যের তালিকা দিয়াছেন। সে দেশের লোকেও কাজ করে—কেহই বসিয়া থাকে না। সে দেশের নর নারী স্বর্গ-গঙ্গার মনোহর সৈকতে মণি লুকাইয়া রাখিয়া তাহারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে—এই কাজ! ক্লান্তিবোধ হইলে—পার্শ্বেই পুষ্পস্তবক-ভূষিত মন্দার-তরু—তাহারা তাহারই ছায়ায় গিয়া খেলা করে, আর মন্দাকিনী-স্নাত সুরভি পবনে তাহাদের সকল ক্লান্তি দূর হইয়া যায়—এই কাজ! কখনো কখনো পুরুষেরা বরাঙ্গনাগণ সহ বৈভ্রাজ পুরীর বহিরোদ্যানে গিয়া কিন্নরদিগের সঙ্গীত শ্রবণ করে—এই কাজ! কবি জয়দেবেরও এইরূপ একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি-মাধুর্য্যের দেশ—শ্রীবৃন্দাবন। দেশের নায়ক চির-কিশোর, নায়িকা চির-কিশোরী, সখা-সখিগণও তাঁহাদেরই অনুরূপ। এদেশের লোকও ঈর্ষা-দ্বেষ জানে না—অধিকন্তু সুখ-দুঃখাদি নিজেদের ইন্দ্রিয়-ধর্ম্ম বলিতেও তাহাদের কিছু নাই—ইহাই শ্রীবৃন্দাবনের বিশেষত্ব। এ বনের একমাত্র নায়ক শ্রীকৃষ্ণ; ব্রজবাসী কৃষ্ণেন্দ্রিয়-বাঞ্ছা পূরণের জন্যই সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছে, বনবাসী হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের রসস্বরূপ, শ্রীমতী তাহাদের মহাভাবময়ী,—এই রসরাজ মহাভাবের খেলাতেই তাহারা ভোর হইয়া আছে। সখা-সখিগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়াই চির সুখী, কৃষ্ণ সেবার জন্যই তাহারা বাঁচিয়া আছে, কৃষ্ণদর্শনই তাহাদের জীবন, কৃষ্ণ-বিরহই তাহাদের মরণাধিক। শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া রসভাবের বিভূতি-বিলাসই তাহাদের জীবনী-শক্তির অফুরন্ত প্রস্রবণ। তাই এ দেশেও কলহ আছে—প্রণয়-কলহ, কিন্তু বড় গুরুতর, আরম্ভ হইলে সে কলহ শীঘ্র শেষ হইতে চাহে না—"দেহি পদ পল্লব মুদারম" শ্রীবৃন্দাবনে এমন কিছু বেশী কথা নহে! এ দেশের নায়ক-নায়িকার নিত্য কার্য্য মধুর বিলাস।

সে লীলা নিত্য-নূতন, কখনো পুরাতন হয় না, লীলার শ্রান্তি ক্লান্তি নাই, লীলারস পান করিয়া দেশ চির-নবীনতা লাভ করিয়াছে—অমর হইয়া গিয়াছে,—দেশবাসী তাই মোক্ষ পর্য্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করে। কেবল মিলনে রসের বিকাশ হয় না, পুষ্টি-সাধন হয় না,—তাই কবি তাঁহার নায়কনায়িকানুগত ব্রজবাসিগণের দিন যাপনের একটী চিত্র দিয়াছেন। তাই কবি বর্ণনা করিয়াছেন—অভিসারে, বাসক-সজ্জায়, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধায়, খণ্ডিতায়, মানে, কলহান্তরিতায় দিন রাত্রি অবিচ্ছেদে এই লীলা চলিতেছে। আমাদের মনে হয়, লীলার এই নিত্যতা রক্ষার জন্যই কবিকে বর্ষার অবতারণা করিতে হইয়াছে।

লৌকিক জগতে প্রচলিত কতকগুলি লীলা-পর্ব্বের মধ্যে শয়ন, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন ও উত্থান-যাত্রা অন্যতম। ভবিষ্যৎ পুরাণ বলেন—"নিশি স্বপ্নো দিবোত্থানাং সন্ধ্যায়াং পরিবর্ত্তনং"। নিশিতে শয়ন দিবাতে উত্থান, ও সন্ধ্যায় পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন-যাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু নিত্য-লীলার দেশে তো এ-সব থাকিবার কথা নহে। শ্রীগীতগোবিন্দের আখ্যান-বস্তু ভারতের বহুজনসম্মানিত হিন্দুর চিরপূজ্য পুণ্য গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে গৃহীত, সুতরাং ভক্ত কবি পুরাণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া—লৌকিক জগতের ঐ সমস্ত শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বাধা নিরসন জন্যই সূচনা শ্লোকে বর্ষার আভাষ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনেকেই জানেন—আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশীতে শয়ন-যাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়, এবং শারদীয় মহা-রাস-পূর্ণিমার পূর্ব্ববর্ত্তী একাদশীতে উত্থান-যাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই কয় মাস সাধারণতঃ "হরি-শয়নের" কাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। হরি-শয়ন স্বীকার করিয়া লইলে নিত্য-লীলা বাধা প্রাপ্ত হয়, অথচ পৌরাণিক বিধিনিষেধ উপেক্ষা করিবারও উপায় নাই। যদিও শ্রীমদ্ভাগবতই কবির প্রধান অবলম্বন, তথাপি অন্যান্য পুরাণ হইতেও কবি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীরাধার প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। সুতরাং কবিকে পুরাণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া এক্ষেত্রে সুকৌশলে নিরঙ্কুশ কবি-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশীতে স্মৃতি যখন নিবেদন করিতেছেন—

"পশ্যন্তু মেঘাস্ত্যপি মেঘশ্যামং।
হ্যুপাগতং সিচ্যমানাং মহীমিমাং॥
নিদ্রাং ভগবান গৃহ্নাতু লোকনাথ।
বর্ষা মিমাং পশ্যতু মেঘবৃন্দং॥"

কবি তখন বলিতেছেন—

* * প্রত্যধ্ব কুঞ্জদ্রুমং—
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তী যমুনা কূলে রহঃ কেলয়ঃ

কবি-বাক্যের প্রতিধ্বনি তুলিয়া আমরাও বলি—হে শ্রীরাধামাধব, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের হৃদয়-বৃন্দাবনে তোমাদেরই নিত্যলীলা চির জয়যুক্ত হউক।

রোঁদ*

শ্রীঅমলচন্দ্র সেন

কুমার বাহাদুর! মহারাজ প্রতাপ সিংএর পক্ষ হ'তে আমাদের এই প্রাচীন দুর্গে আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা করছি। আপনি এখানে কয়েক দিন থাকবেন জেনে আমরা বাস্তবিকই নিজেদের অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। মহারাজা বাহাদুর নিজে এসে আপনাকে অভ্যর্থনা করতে না পারায় বড়ই দুঃখিত ও লজ্জিত। কিন্তু আপনি ত জানেন যে, মহারাজা বাহাদুর নির্জ্জনে থাকতেই ভালবাসেন এবং সেই জন্য আপনার ন্যায় মাননীয় অতিথির সম্বর্দ্ধনার ভার আমাদের উপরেই দিয়েছেন।

আমি ভাল বাংলা বলতে পারি না সেজন্য—আপনি হিন্দুস্থানি জানেন?—তা হো'ক কুমার বাহাদুর! আপনি যখন আমাদের অতিথি, তখন আপনার মাতৃভাষাতেই যথাসাধ্য আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চেষ্টা করব। এঁরা কারা জিজ্ঞেস করছেন? ইনি হচ্ছেন বলবন্ত সিং, মহারাজা বাহাদুরের কোষাধ্যক্ষ; আর ইনি মহাতপ সিং, কার্য্যাধ্যক্ষ। আপনি তা হ'লে প্রতাপগড়ে যাচ্ছিলেন, আমাদের বিজয়-গড়ের নাম শুনে কয়েক দিনের জন্য এসেছেন? বেশ, আপনার ন্যায় মাননীয় অতিথিকে এ রকম অযাচিতভাবে পেয়ে আমরা যে কত আনন্দিত হয়েছি, তা আমার এ ভাঙা বাংলায় প্রকাশ করতে পারছি না। একটী সিগার ইচ্ছা করুন! এবং আপনারই বাড়ী বলে মনে করবেন, কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করলে মহারাজা বাহাদুর বড়ই দুঃখিত হবেন।

আপনি এই রাজ-প্রাসাদের স্থাপত্য-কলা দেখে খুসী হয়েছেন? আপনি মনে করেন যে, ইহা অন্ততঃ হাজার বৎসর আগেকার তৈরী? সম্ভব, কিন্তু এ বিষয়ে আমরা একমত নই। ওহে মহাতপ! গড়গড়ার নলটা কুমার বাহাদুরকে এগিয়ে দাও। হাঁ, আমাদের এই রাজপ্রাসাদ যে এক কালে কি রকম গম্‌গমে ছিল, তা আপনি এখনকার এই অবস্থা দেখে ধারণাও করতে পারবেন না। হায় কি কুক্ষণেই,—ভয় নেই বলবন্ত, আমি কোন পারিবারিক কথা বেফাঁস করব না, এটুকু বুদ্ধি এখনও আমার আছে। আমার দিকে চোখ ইসারা না ক'রে, তুমি বড় আতরদানটা কুমার বাহাদুরকে এগিয়ে দাও। এটা একেবারে খাঁটি পারস্য দেশের আতর, কুমার বাহাদুর,—আপনি বরং পরীক্ষা ক'রে দেখুন। হাঁ, আমি কি বলছিলাম? ঠিক! এক শত বৎসর আগে বিজয়গড়ের রাজপ্রাসাদ যে দেখে নি, তা'র জীবনটাই বৃথা গেছে। আপনি নিশ্চয় প্রতাপগড়ের ঐশ্বর্য্য ও দিলদারনগরের সৌন্দর্য্যের কথা শুনেছেন। বিজয়গড়ের তুলনায় এ'দের নিতান্তই অসার বলে মনে হয়।

আপনি আজ যে ঘরে শয়ন করবেন, এক দিন ঐ ঘরে স্বয়ং সম্রাট আকবর শাহ শয়ন করেছেন। আমি যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে ৫০০ নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এই প্রাসাদে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতেন। আমাদেরই বাল্যকালে যখন মহানুভব সম্রাট সাজাহান এখানে আসেন, তখন ৩০০ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে এই প্রাসাদে থাকতে দেখেছি। আহা! সম্রাট সাজাহান পুত্রের হাতে বন্দী হ'য়ে যখন প্রাণ হারালেন, তখন আমাদের তখনকার মহারাজা কি শোকটাই প্রকাশ করেছিলেন! তিনি তাঁর সমস্ত প্রজাকে শাদা পাগড়ী পরিয়ে একমাস কাল শোক প্রকাশ করিয়েছিলেন! এই জন্য তাঁর বাইশ লক্ষ পাগড়ী তৈয়ার করতে হয়েছিল।

বুঝেছেন কুমার বাহাদুর! আমাদের এই রাজ্য তখন এই রকমই সমৃদ্ধিশালী ছিল। আপনি বোধ হয় আপনার সামনে ঐ জানালার মধ্য দিয়ে শুধু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু আপনার সামনে এই প্রকাণ্ড প্রাসাদের অর্দ্ধেকেরও বেশী পড়ে রয়েছে। আমি আপনাকে শপথ ক'রে বলতে পারি যে, আমি যে সময়কার কথা বলছি, তখন এমন একটা দিনও যেত না, যেদিন সন্ধ্যা হ'তে সকাল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাসাদখানি আলোয় না ঝলমল করত। আর মহারাজা বাহাদুরের ঘোড়াশালা! সেও একটা দেখবার জিনিস ছিল। এ বিষয়ে অবশ্য আমার চাইতে আমার বন্ধু মহাতপ ভাল বলতে পারেন। তবে আমি এ কথা জোর করে বলতে পারি যে, বিলাতে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছেলেরা যে আদর-যত্নে পালিত হয়, মহারাজা বাহাদুরের ঘোড়াদের তার চাইতে কম যত্ন নেওয়া হ'ত না।

খাওয়ার আয়োজন বেশী করা হয়েছে? ও কথা বলে আমাদের লজ্জা দেবেন না। আপনার মতন সম্ভ্রান্ত অতিথি ও এই প্রাচীন রাজবংশের উপযুক্ত কিছুই হয় নাই। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বিশেষ কোন কারণে মহারাজা বাহাদুর,—ভয় নেই বলবন্ত আমি সে কথা বলছি না। * * * আপনি ঠিকই বলেছেন যে গুরু-ভোজনের পরই শয়ন করতে যাওয়া ঠিক নয়। কি খেলবেন, তাস? বেশ। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে যে, এখন তাস খেলার জন্য চার জন লোক পাওয়া যাবে না। * * ঠিক, আপনি ঠিকই ঠাওরেছেন! বাস্তবিকই বাঙ্গালীদের মত বুদ্ধিমান জাতি আর কোথাও দেখা যায় না। আজ্ঞা হাঁ, কুমার বাহাদুর, রাত প্রায় নটা হ'ল,—বলবন্ত ও মহাতপের এখন মহারাজা বাহাদুরের কাছে যেতে হ'বে। রাত নটা হচ্ছে রোঁদে বেরোবার সময়। বুঝলেন না? তবে বলি শুনুন,—ওহে বলবন্ত, তুমি চোখ পাকিয়ে ও ভুরু কুঁচ্‌কে আমাকে ভয় দেখিও না। পারিবারিক রহস্য যে গোপন করা উচিত, তা আমার জানা আছে। ঐ দেখ, মহারাজা বাহাদুরের খাস খানসামা তোমাদের ডাকতে এসেছে। মহারাজা বাহাদুরকে বোলো যে কুমার বাহাদুর বলছেন যে, তিনি বেশ আরামেই আছেন এবং তাঁর কোনই অসুবিধা হচ্ছে না। আর দেখ, একটু সকাল সকাল ফিরতে চেষ্টা কোরো। যদি দশটার মধ্যে তোমাদের রোঁদ হয়ে যায়, তা'হলে হয়ত কুমার বাহাদুর একটু তাস খেলতে ইচ্ছা করবেন।

আঃ কি ঠাণ্ডা,—এরা আবার দরজাটা খুলেই রেখে গেল! না, না, আপনি উঠবেন না। যদিও আমার বয়স ষাট পেরিয়েছে, উঠে দরজাটা বন্ধ করবার শক্তি ভগবান এখনও আমার রেখেছেন। কি করা যায় বলুন ত? ওদের ফেরা পর্য্যন্ত একটু দাবা খেলবেন কি? আচ্ছা, আসুন তবে।

* * এই কিস্তী? বেশ মুস্কিলেই ফেললেন দেখছি! আচ্ছা এই ঘোঁড়া,—ও কি? আপনি ওদিকে কি দেখছেন? ওঃ! আমাদের সামনে প্রাসাদের জানালাগুলিতে আলোর খেলা দেখে আপনি একটু আশ্চর্য্য হয়েছেন দেখছি। একটু আগেই আমি আপনাকে যা বলছিলাম,—এই দৈনিক রোঁদ আরম্ভ হয়েছে। আজ বিশ বৎসর ধরে আমি রোজ ঠিক এই সময়ে এই রোঁদ দেখে আসছি।

আচ্ছা, এই জানালার কাছে আসুন। একটু পরেই না হয় আমাদের খেলা ফের আরম্ভ করা যাবে। ঐ দেখুন, সবার আগে লণ্ঠন হাতে একটী লোকের ছায়া,—ইনি হচ্ছেন বলবন্ত; তার পরেই মহাতপ, আর সবার পিছনে ঐ যে দীর্ঘ মূর্ত্তির ছায়া দেখছেন, একটু যেন নুয়ে পড়েছে,—উনিই হচ্ছেন আমাদের মহারাজা বাহাদুর! মহারাজা বাহাদুরের চেহারা ভাল করে দেখে নিন, কারণ আর ত দেখতে পাবেন না! কেন দেখতে পাবেন না? বেই ত মুস্কিলে ফেললেন দেখছি! আপনি পরশু প্রতাপ-গড়ে যাবেন বলছিলেন না? সেখানে আমার বন্ধু ডাক্তার বিক্রম সিং বোধ হয় এ বিষয়ে আমার মত দ্বিধাগ্রস্ত হবেন না। আপনি তাঁর কাছেই সব শুনতে পাবেন। কিন্তু, দ্বিধাই বা কেন? মহারাজা বাহাদুর সম্বন্ধে কোন গোপন কথা অপরের কাছ থেকে শোনার চাইতে আমার মতন তাঁর আজীবন ভৃত্যের কাছে শোনা ভাল নয় কি? ক'টা বাজল? সাড়ে ন'টা? ওদের ফেরবার এখনও দেরী আছে, এর মধ্যেই আমি বলতে পারব। কিন্তু বলবন্ত সিং ভয়ানক চটে যাবে; আপনি কথা দিন যে,—না, না, আপনার কথাই যথেষ্ট, আর শপথ করতে হবে না। হাঁ, কথাটা হচ্ছে এই যে, আপনি মহারাজা বাহাদুরের দেখা পাবেন না, কারণ,—কারণ,—আঃ, কি বলি, ঠিক কথাটা যে মনেই হচ্ছে না,—যাকগে, কারণ, মহারাজা বাহাদুর পাগল।

পাগল ঝটে, কিন্তু তিনি চিরকাল এ রকম ছিলেন না।

* একটী ফরাসী গল্পের অনুসরণে।

আমি যে সময়কার কথা বলছি, তখন মহারাজা বাহাদুরের মত বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী লোক এ অঞ্চলে আর একটিও ছিল না। সে প্রায় পঁচিশ বৎসর আগেকার কথা। আমাদের মহারাণী পদ্মিনী দেবী ঠিক পদ্মিনীরই মত সুন্দরী ছিলেন। উঁহাদের তিন বছরের একটী মেয়ে ছিল, নাম ছিল তার মীরা। সে ছিল ঠিক তার মায়ের মতই সুন্দরী। ঐ যে দূরে ছোট্ট নদীটি দেখছেন,—সবুজ মাঠের মধ্য দিয়া এঁকে বেঁকে চলেছে,—এক দিন হোল কি, তার পরিচারিকা ঐ নদীর ধারে মীরাকে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়েছে, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ওই অলক্ষণা নদী মীরাকে গ্রাস করল। খানিকক্ষণ পরে অবশ্য নদী মীরাকে ফিরিয়ে দিলে,—কিন্তু অসাড়, নিস্পন্দ।

আমাদের এই বিজয়গড়ের আগেকার অবস্থা যে দেখেছে এবং এখনকার এই শোচনীয় অবস্থা যে অনুভব করতে পেরেছে, সেই কেবল বুঝতে পারবে এই দুর্ঘটনার জের কতদূর পর্য্যন্ত গিয়েছে। বেশী কথা বলবার সময় নেই,—তিন মাসের মধ্যেই দারুণ মনোকষ্টে মহারাণী মারা গেলেন। আর মহারাজা বাহাদুর! তাঁরও বোধ হয় ঐ শোকে মৃত্যু হ'লেই ভাল ছিল। আজীবন মহারাজা বাহাদুরের নিমক খেয়েছি,—কি দুঃখেই যে কথা বলছি, সহজেই বুঝতে পারেন। মহারাণীর শোকে মহারাজা বাহাদুর উন্মাদ হয়ে গেলেন। এখন পর্য্যন্ত সেই উন্মত্ত অবস্থাই আছে,—তবে তার গতিটা অন্য পথে চালিত হয়েছে। কি রকম করে হল শুনুন।

কুমার বাহাদুর, আমি অবশ্য নিশ্চয় বুঝি যে, নিজের কথা নিজের মুখে বলা শোভা পায় না; কিন্তু দুই একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি,—আশা করি, এজন্য আমাকে দাম্ভিক মনে করবেন না। একজন হোমরা-চোমরা না হলেও, ডাক্তারী-শাস্ত্রটা আমি ভাল করেই অধ্যয়ন করেছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার গুপ্তকে জানেন! আমি তাঁরই ছাত্র। তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন এবং খুব যত্নের সহিত আমাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আঃ, কি দিনই গিয়েছে! যাক্, আপনি কি আর একটী সিগার নেবেন? আমি কিন্তু সিগারের চাইতে সিগারেটই বেশী ভালবাসি।

হাঁ, কি বলছিলাম? মহারাজা বাহাদুরের পাগলামীর কথা! আপনি বোধ হয় স্বীকার করবেন কুমার বাহাদুর, যে সব পাগলামীর মধ্যেই কিছু না কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। বুঝতে পারলেন না? অর্থাৎ আমরা তার যে পথে চলা উচিত বা যা করা উচিত মনে করি, অনেক সময় সে ঠিক তার উল্টা করে বসে। এর মধ্যে আশ্চর্য্য কিছুই নেই? ঠিকই ত,—কারণ এর মধ্যে পাগলামী নেই। আমাদের মহারাজা বাহাদুরের পাগলামীর মধ্যে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই ছিল যে, যে ঘটনার দরুণ তিনি পাগল হলেন, তাঁর পাগলামীর মধ্যে সে ঘটনার একটু গন্ধও ছিল না। মহারাজা বাহাদুর তাঁর তিন বছরের মেয়ে মীরাকে অবশ্য খুবই ভালবাসতেন, কিন্তু এটাও ঠিক যে তিনি মহারাণী পদ্মিনীকে তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ সমর্পণ করেছিলেন। আর মহারাণীর মৃত্যুর কয়েক দিন পর থেকেই মহারাজা বাহাদুরের উন্মাদের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু, আপনি শুনে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হবেন যে, তাঁর উন্মত্ত প্রলাপের মধ্যে কেবলমাত্র তাঁর আদরিণী কন্যা মীরার স্মৃতিই তাঁকে কষ্ট দেয়। মহারাণীর জন্য তাঁকে শোক করতে এ পর্য্যন্ত আমরা কেউ দেখিনি। মহারাণীর মৃত্যুর কথা তিনি খুব ভাল করেই জানেন,—এমন কি তাঁর মৃত্যুকালীন ভোরার বর্ণনা ও মহারাণীর মুখের শেষ কথা মহারাজা বাহাদুরের মুখে অনেকবার শুনেছি। তাঁর মেয়ে মীরার মৃত্যুর কথা মহারাজা বাহাদুরের কাছে বলবার উপায় নেই, তাঁর ধারণা যে, মীরা এখনও বেঁচে আছে,—কেবল আমি, বলবন্ত ও মহাতপ ষড়যন্ত্র করে তাঁকে কষ্ট দেবার জন্য মীরাকে লুকিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বেচারা তাঁর কন্যার মৃতদেহ শ্মশানে যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত তাঁর বুকে চেপে রেখেছিলেন এবং মহারাণীর মৃত্যুর আগের দিন পর্য্যন্ত এমন একটা দিনও যায় নাই, যেদিন না মহারাজা বাহাদুর নিজের হাতে তাঁর মেয়ের চিতাশয্যার উপর একগাছি যুঁই ফুলের মালা চোখের জলে ধুয়ে রেখে এসেছেন। এখন এ সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে,—এখন মহারাজা বাহাদুরের ধারণা যে, মহারাণী সত্যই মৃত, কিন্তু মীরা এখনও বেঁচে আছে, আর আমরা তাকে লুকিয়ে রেখেছি। এ অবস্থায় আপনি কি করতেন? বোধ হয় আমি যা করেছি আপনিও তাই করতেন। আমি দেখলাম যে, এ রকম ঘোর উন্মত্ত

অবস্থা থেকে একেবারে রোগ-মুক্তির চেষ্টা করা বৃথা; কিন্তু পাগলামীর প্রকোপটা বোধ হয় চেষ্টা করলে কমান যেতে পারে। * * বাঃ, আপনি ঠিক আন্দাজ করেছেন। মহারাজা বাহাদুরের পাগলামীর প্রকোপ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখে, আমি এক দিন আমার মতলব বলবন্তকে খুলে বল্লাম। অবশ্য বলাই বাহুল্য, বলবন্ত খুব আনন্দের সহিতই রাজি হ'ল, এবং আমরা দুজনে আমাদের মতলব কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টায় থাকলাম। আচ্ছা কুমার বাহাদুর! আপনি বলতে পারেন মতলব আঁটার চাইতে কাজ করা এত শক্ত কেন?

আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে, আমাদের মতলব ছিল—একটী তিন চার বছরের সুন্দরী মেয়ে খুঁজে এনে মহারাজ বাহাদুরের কাছে তাঁর মেয়ে মীরা বলে দাঁড় করান। এতে অবশ্য আমাদের ভয়ের কিছুই ছিলনা, কারণ এ সময়ে মহারাজা বাহাদুরের পাগলামীর প্রকোপটা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, তার আরও বৃদ্ধির কোন আশঙ্কা ছিল না। অপর পক্ষে, আমাদের আশা ছিল যে, আমাদের মতলব মত কাজ করলে হয়ত একটু উপকার হতে পারে। বাস্তবিকই উপকার হয়েও ছিল, আর সেটা এত বেশী পরিমাণে যে, আমরা তাহা স্বপ্নেও মনে করতে পারিনি। কিন্তু আমরা যে নিজেদের জালে কি রকম জড়িয়ে পড়েছি, তা আপনি বোধ হয় ধারণাও করতে পারবেন না। এটা যে আমার বন্ধু বলবন্তের নির্ব্বুদ্ধিতার ফল, সে বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই; আর এই নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেকবার ঝগড়াও হয়ে গিয়েছে।

ঘটনাটা দাঁড়াল এই যে, একটী তিন চার বছরের ছোট্ট মেয়ের দরকার এবং সেজন্য বলবন্ত ও মহাতপকে খোঁজে গাঠান হল। কয়েক দিন পরে তারা একটী মেয়েকে নিয়ে এসে হাজির হল। * * চুরি করে? না, না, চুরি করে নয়, ক্রয় করে! আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন; কিন্তু এ কথা শুনলে আরও আশ্চর্য্য হবেন যে, যখন বলবন্ত মেয়েটীর বাপের কাছে প্রস্তাব করলে যে মেয়েটী পছন্দ না হ'লে তা'কে অর্দ্ধমূল্যে ফেরৎ দিবে, এ প্রস্তাবে কিছুতেই তাকে রাজি করান গেল না। মেয়েটী ছিল বেদের মেয়ে। হাঁ, কুমার বাহাদুর, বেদের মেয়ে, এবং এইটেই হ'ল বলবন্তের নির্ব্বুদ্ধিতার ফল। নকল মীরা বাস্তবিকই খুব সুন্দরী ছিল; এবং আসল মীরার সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্যও ছিল,—কেবল তার চুলগুলি ছিল একটু কটা। বুঝেছেন কুমার বাহাদুর! আমরা যেদিন এই নকল মীরাকে বেচারা কন্যাহারা পিতার নিকটে উপস্থিত করলাম, সেদিনকার সেই দৃশ্য বর্ণনা করবার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের অবশ্য একটা মিথ্যার রচনা করতে হ'ল,—আমরা বললাম যে, মীরাকে বেদেরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, আর এক বৎসরের চেষ্টার ফলে আমরা তাকে খুঁজে বার করেছি। মহারাজা বাহাদুর খুব দরাজ হাতেই আমাদের পুরস্কার দিলেন, কিন্তু চকচকে সেই মোহরগুলি ঠিক তপ্ত অঙ্গারের মতই আমাদের হাত পুড়িয়ে দিল।

আপনি বোধ হয় বুঝতে পারছেন কুমার বাহাদুর, যে একটা বেদের মেয়ে না এনে যদি বলবন্ত একটী ভদ্রঘরের মেয়ে খুঁজে আনত, তা'হলে আমাদের আজ এ দুর্ভোগ ভুগতে হ'ত না। এই নকল মীরাকে আসল বলে চালাতে গিয়ে, আমরা যে কি কষ্ট পেয়েছি, তা আপনাকে বলতে পারি না। কত উৎপাতই যে তার আমরা সহ্য করেছি। একদিন ত সভার মাঝে রাজগুরুর টিকি ধরে টেনে তাঁকে ফেলে দিলে,—এক দিন গোয়াল-ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে; আর একদিন,—যাক্, আর কত বলব?

মহারাজা বাহাদুরের কিন্তু আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হল; আমাদের মতলব সফল হল, তাঁর পাগলামী সেরে গেল। কিন্তু বিশ বৎসর ধরে তাঁকে এই মিথ্যার আবরণে ঢেকে রাখা যে আমাদের কাছে কতদূর কষ্টসাধ্য হয়েছিল, তা আপনি সহজেই বুঝতে পারেন। আমাদের সর্ব্বদাই ভয় হ'ত, কবে বা এই তাসের ঘর কোন অদৃশ্য অদৃষ্টের নির্ম্মম ফুৎকারে ভাঙ্গিয়া যায়। ঠিক এই সময়ে আমাদের মহারাজা বাহাদুরের দৈনিক রোঁদ,—যা আপনি একটু আগেই দেখলেন,—আরম্ভ হল। আপনার বোধ হয় মনে আছে, কুমার বাহাদুর, যে আমরা মহারাজা বাহাদুরকে বুঝিয়েছিলাম যে, মীরাকে বেদেরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। পাছে বেদেরা তাঁর আদরিণী কন্যাকে আবার চুরি করে, এই ভয়ে মহারাজা বাহাদুরের ঘুম হ'ত না। এই চিন্তা ছাড়া তাঁর মনে অন্য কোন চিন্তা ছিল না। সন্ধ্যা হতে না হ'তেই রাজপ্রাসাদের ফটক বন্ধ হ'য়ে যেত, এবং মহারাজা বাহাদুর নিজে ও আমরা তিনজনে মুক্ত তরবারি হস্তে সমস্ত প্রাসাদ

ঘুরে পাহারা দিতাম। ঐ দেখুন, মহারাজা বাহাদুর নিজে লণ্ঠন-হস্তে পাহারা দিচ্ছেন। ঐ দেখুন, কেমন তিনি প্রত্যেক ঘরের প্রত্যেক কোণটি পর্য্যন্ত পরখ করে দেখছেন। এখন তিনি মীরার ঘরের সামনে যাবেন, এবং দরজায় কাণ লাগিয়ে, হয়ত বা সন্তর্পণে দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে দেখবেন যে, ঘরের মধ্যে সব ঠিক আছে কি না।

বাস্তবিকই কুমার বাহাদুর, এর চাইতে মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার আমি কখনও দেখিনি বা শুনিনি। কিন্তু আরও আছে,—ঐ ঘর, মীরার ওই ঘর এখন আবার শূন্য। কেমন করে হ'ল? তা শুনে আর কি হ'বে? * * কা'র দোষে? বলবন্ত বলবে মহাতপের, মহাতপ বলবে আমার, আমি বলব বলবন্তের। পাজি নচ্ছার বেটী বোধ হয় কোন রকমে আমাদের গোপন কথাটী টের পেয়েছিল। যাই বলুন না কেন, কুমার বাহাদুর, মানুষের কাজ ত? যতই ভাল হোক না কেন, তা'তে কিছু না কিছু গলদ থাকবেই।

বলবন্ত ও মহাতপের ফেরবার সময় হ'ল, আসুন আমাদের খেলাটা শেষ করা যাক্। দেখবেন, আপনাকে যা বললাম—ওরা যেন টের না পায়। আর আপনি ত পরশুদিন প্রতাপগড়ে সবই শুনতে পাবেন। * * হাঁ, এবার এই নৌকার কিস্তি সামলান ত? আপনি আর কি শুনতে চান? মেয়েটীর কি হ'ল? এক দিন এই প্রাসাদের কাছে একদল বেদে এসে তাঁবু ফেলেছিল। আমরা অবশ্য তাদের তৎক্ষণাৎ চ'লে যাবার হুকুম দিলাম। তারা চলেও গেল; কিন্তু তার পরদিন থেকেই নকল মীরার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

আর মহারাজ বাহাদুর? যেদিন তিনি নকল মীরার অন্তর্ধানের সংবাদ পেলেন, সেদিন থেকেই তাঁর পাগলামী আবার ফিরে এল। কিন্তু এবারকার পাগলামী বড়ই করুণ! তিনি মনে করেন, মীরা এখনও আগেকার মতন এখানেই আছে। যখন আমরা রোঁদে বেরিয়ে তার দরজার সামনে দিয়ে যাই, তখন মহারাজা বাহাদুরের হুকুম অনুসারে সকলকেই অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে যেতে হয়,—পাছে মীরার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

এই যে, এঁরা আসছেন। এবার আপনার চাল কুমার বাহাদুর —।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

চার্লস হফ্

বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ইয়োরোপে বোধ হয় চার্লস হফের মত দৌড়-লাফ, ঝাঁপ ইত্যাদি সকল প্রকার খেলাতে সুনিপুণ খেলোয়াড় আর নাই। "পোল-জাম্পে" ইনি পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমেরিকাতে এক খেলা-প্রদর্শনীতে হফ্ ১৩ ফিট ৯¾ ইঞ্চি পোল জাম্প করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত এত উঁচু লাফ আর কেহ দিতে পারে নাই। তাঁহার সঙ্গে আর যে সকল আমেরিকান এবং অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়েরা লাফ দিতেছিল, তাহারা প্রায় সকলেই ১২ ফিটের ঘরে আসিয়াই থামিয়া যায়। চার্লস হফ যে কেবল পাকা খেলোয়াড় তাহা নহে,—বাদ্য, লেখাপড়া, সঙ্গীত ইত্যাদি বিদ্যাতেও ইনি কাহারো অপেক্ষা কম যান না। নরওয়ের এক বিখ্যাত কাগজের ইনি ক্রীড়া-বিভাগের সম্পাদক। নানা প্রকার চমৎকার প্রবন্ধ তিনি ঐ কাগজে লিখিয়া থাকেন।

বাল্যকালে হফের শরীর অত্যন্ত কৃশ ছিল। কিন্তু তিনি কেবল মনের জোরে এবং অধ্যবসায়ের ফলে নিজের শরীরের উন্নতি করিয়াছেন। যে পোল-জাম্পের জন্য চার্লস হফের পৃথিবী ব্যাপিয়া নাম—তাহা এক সময় তিনি একপ্রকার অসাধ্য বলিয়াই মনে করিতেন। তিনি কেমন করিয়া পোল-জাম্পার হইলেন, তাহার সম্বন্ধে তিনি বলেন:—

"আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলি গরীব, সেইজন্য সকল বিদ্যালয় ক্রীড়া-শিক্ষক রাখিতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় একজন করিয়া খুব ভাল ক্রীড়া-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তিনি সকল বিদ্যালয়ে সময়মত গমন করেন এবং ছাত্রদের নানা প্রকার ক্রীড়া শিক্ষা দেন। আমাদের ওস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ক্রীড়া-শিক্ষক ছিলেন। ইঁহাকে পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া-শিক্ষক বলা যায়।

চার্লস হফ্

আমি গ্রাজুয়েট্ হইবার পর এক দিন তিনি আমাকে বলিলেন, চার্লস, তুমি খুব ভাল পোল-জাম্প দিতে পার। আমি কথাটা শুনিয়া অবাক হইয়া যাই। পূর্ব্বে কখনও পোল-জাম্প দি নাই। সেই সময় হইতে পোল-জাম্প অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলাম। এখন দশ মাস পরে ১৯২২ সালে ১৩ ফিট ৬ ইঞ্চি লাফ দিয়া পৃথিবীর রেকর্ড ভাঙ্গিলাম।"

চার্লস হফ তাঁহার নিজের দেশে ১৯২৩ সালে ১১ ফিট ৫ ইঞ্চি উঁচু পোল-জাম্প করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, তিনি শেষ পর্য্যন্ত প্রায় ১৫ ফিট লাফ দিবেন—এবং ইহাই পৃথিবীর রেকর্ড-জাম্প হইয়া থাকিবে।

ব্যায়াম এবং ক্রীড়া আয়ু বৃদ্ধি করে

একদল লোকের ধারণা আছে যে যাহারা অতিরিক্ত খেলা, লাফ, দৌড় ইত্যাদি করে, তাহাদের আয়ু কমিয়া যায়। এই ধারণা অত্যন্ত ভুল। কতকগুলি অতি বৃদ্ধ, অর্থাৎ ৭০ বছরের বেশী বয়সের লোকের বাল্য এবং যুবক বয়সের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, তাহারা প্রায় সকলেই ফুটবল ইত্যাদি খেলা খুব বেশী রকমই খেলিত। ফুটবল খেলাই বোধ হয় মানুষের শরীর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দৃঢ় করে। লম্বা দৌড়ে যাহারা খুব দক্ষ, তাহাদের আয়ুও খুব লম্বা হয়—ইহাও পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে।

রোগা হইবার সহজ উপায়

প্যারিসের বিখ্যাত ডাঃ জি, লেভেন মোটা মানুষদের রোগা হইবার এক সহজ উপায় অনেক পরীক্ষাদি করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। এই উপায় অতি সহজ,—ইহাতে কোন ঔষধাদি খাইতে হয় না। এমন কি বিছানায় শুইয়া শুইয়া এই উপায়ে শরীর পাতলা করা যাইতে পারে। উপায়টি এই:—নিশ্বাসের সঙ্গে খুব কম হাওয়া ভিতরে লইয়া তাহা খুব জোরের সঙ্গে বাহির করিয়া দিতে হয়। প্রতি আধ ঘণ্টায় এইরূপ নিশ্বাস-প্রশ্বাস পাঁচবার করিয়া করিতে হইবে। দিনে পনের হইতে কুড়িবার এইপ্রকার করা দরকার। চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যদ্রব্য একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে।

এই উপায়ে একজন অতি মোটা ব্যক্তি ২০ দিনে ১৫ পাউণ্ড ওজন কমাইয়াছে। আর একজন ৬ মাসে ৬০ পাউণ্ড কমাইয়াছে। আমাদের দেশে অতি কদাকার দেখিতে মোটা লোক প্রচুর আছে,—তাহারা এই প্রথায় চিকিৎসা করিলে ফললাভ করিতে পারে। অন্ততঃ একবার চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পারে।

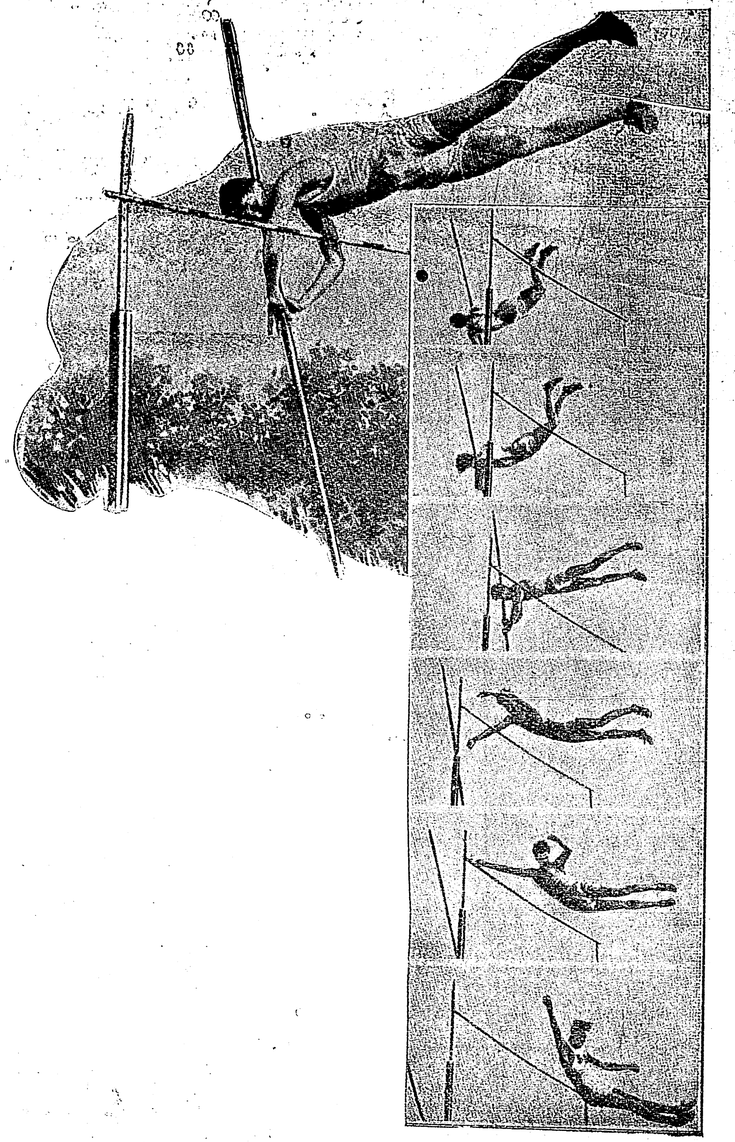

ব্যায়াম এবং ক্রীড়া আয়ু বৃদ্ধি করে।

মোটর-বাড়ী

বার্লিন সহরে এক দিন সকলে দেখিল—একখানা ছোটখাট বাড়ী সহরের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। বাড়ীখানি একটি মোটরকারের উপর তৈরী। দূর হইতে দেখিলে মোটরকার বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই। গাড়ীখানি যদি কোথাও দু-একদিন থাকে, তবে তাহার পাশে অয়েলক্লথ ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। অয়েলক্লথ এমন-ভাবে রং করা,—ঠিক ইট বলিয়া ভ্রম হয়।

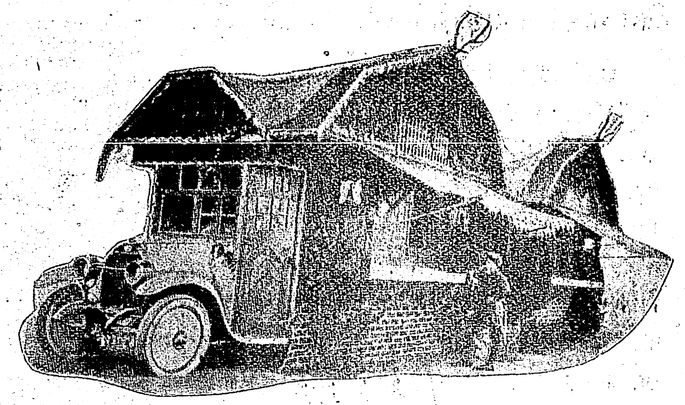

মোটর-বাড়ী

অভিনব বেশ

"ফ্যান্‌সি-ড্রেস" নাচের সময় সাহেবরা নানা প্রকার অদ্ভুত এবং কিম্ভুত বিমাকার পোষাক পরে। ছবিতে একটি অদ্ভুত মুখ দেখুন। দাবার বোর্ডের মতন মনে হইতেছে। ইহা

অভিনব বেশ

মুখোস নয়। মুখে রং লাগাইয়া এই প্রকার দাগ কাটা হইয়াছে। পোষাক, টুপী ইত্যাদি সবই এইপ্রকার চৌকা ঘর-কাটা ছিল। এই অপরূপ বেশ দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া যায়।

ক্ষুদ্রতম বাঁদর

ছবিতে দেখুন ছোট ছেলেটির মাথায় একটি জন্তু বসিয়া আছে। উহা একটি বাঁদর। ইহা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা

ক্ষুদ্রতম বাঁদর

ক্ষুদ্র বাঁদর। ইহা ব্রেজিল দেশ হইতে আনীত এবং লণ্ডন চিড়িয়াখানাতে আছে। বাঁদরটি ছোট ছেলের মাথার অর্দ্ধেকের সমানও নয়।

রেল লাইন এবং গাড়ী ইত্যাদির ছোট মডেল

স্যার এড্ওয়ার্ড তাঁহার নাতি-নাতনিদের আনন্দ এবং আমোদ দিবার জন্য তাঁহার কামরাতে একটি ছোটখাট রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই রেলওয়ের সবই আছে। রেলগাড়ী, ইঞ্জিন, ষ্টেশন, ব্রিজ, পাওয়ার হাউস, সিগ্ন্যাল-ঘর, সিগ্ন্যাল ইত্যাদি সবই আছে। প্রায় ৫০০ ফিট রেল লাইন আছে। ইঞ্জিনগুলি ষ্টিম্ বা বিদ্যুৎ-শক্তিতে চলে। কোনোটি বা ঘড়ির কলের মত দমে চলে। এই রেলওয়ে দেখিয়া বড় যে কোনো রেলওয়ের সম্বন্ধে ভালরূপ ধারণা করা যাইতে পারে।

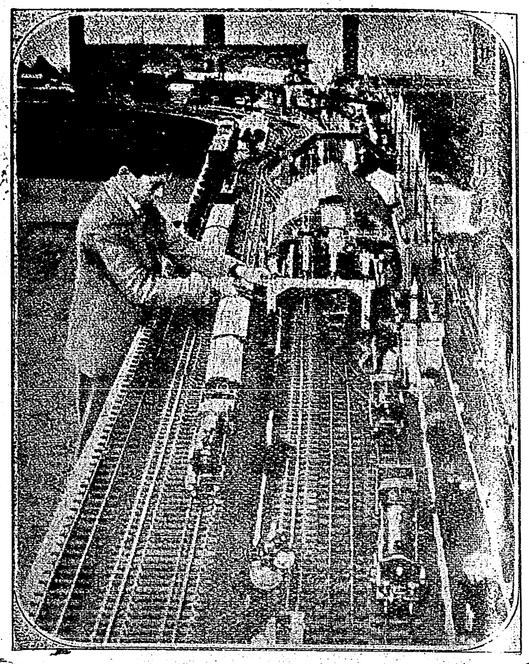

এক্সিডেন্ট বাঁচাইবার উপায়

আজকালকার দিনে মোটরকারের জন্য কোনো রাস্তাই সাইকেল-চালকের পক্ষে নিরাপদ নহে। দিনের বেলাতেই ভয়ের অন্ত নাই, রাত্রিবেলার কথা স্বতন্ত্র। সাইকেলের পিছনের বাতিতে বিশেষ লাভ হয় না। মোটরকারের জোর আলোতে তাহা এত ম্লান হইয়া যায় যে, মোটর-চালকের চোখে তাহা পড়ে না বলিলেই হয়। সাইকেলকে পিছন হইতে

এক্সিডেন্ট বাঁচাইবার উপায়

মোটরকারের ঠোক্কর হইতে বাঁচাইবার এক সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। পিছনের মাড্-গার্ডটিকে

রেল লাইন এবং গাড়ী ইত্যাদির ছোট মডেল

যদি শাদা রং লাগাইয়া শাদা করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহা কম জোর এবং বেশী জোর, উভয় প্রকার আলোতেই মোটর চালকের চোখে পড়িবে এবং সাইকেলের ঘাড়ে না পড়িয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার সময় পাইবে। একটু দূর হইতেই ইহা চোখে পড়িবে।

লম্বা জিরাফ

নিউ ইয়র্কের চিড়িয়াখানায় জিরাফ এবং অন্যান্য বড় বড় জন্তুদের মাপ লওয়া হয়। ছবিতে দেখুন—একটি জিরাফের মাপ লওয়া হইতেছে। একজন রক্ষক একটি মইএর উপর দাঁড়াইয়া জিরাফটিকে খাবার দেখাইতেছে—জিরাফটি খাবার মুখে লইবার জন্য যতদূর সম্ভব গলা বাড়াইয়া আছে। মইএর এক একটি ধাপ এক ফুট অন্তর আছে। মইএর কোন্ ধাপ পর্য্যন্ত জন্তুর গলা উঠিল তাহা দেখিলেই তাহার

উচ্চতা বা লম্বত্বের পরিমাণ সহজেই পাওয়া যায়। ছবির জিরাফটি আসলে পায়ের ক্ষুর হইতে নাকের ডগা পর্য্যন্ত মাত্র সতের ফিট লম্বা!

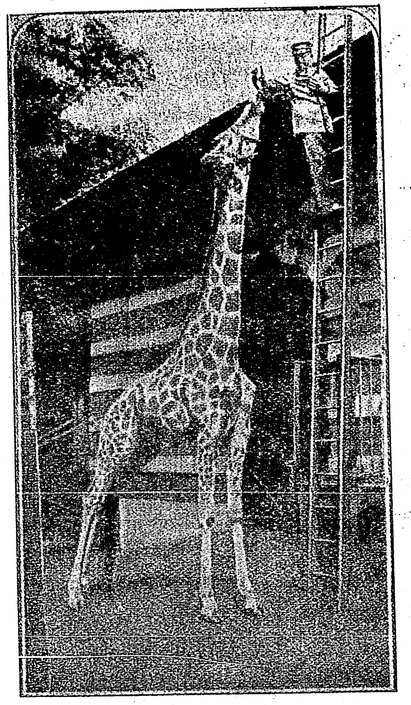

লম্বা জিরাফ

স্বহস্ত-নির্ম্মিত নৌকায় পৃথিবী ভ্রমণ

হ্যরি পিজিয়ন (Harry Pidgeon) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লোক। তাঁহার বয়স ৫৭ বছরেরও বেশী। কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার নৌকায় করিয়া পৃথিবী-ভ্রমণ করিবার সখ হয়; এবং তিনি সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য স্বহস্তে মনের মত করিয়া একটি নৌকা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর নৌকা নির্ম্মাণ শেষ হইল। নৌকার নাম রাখা হইল "আইল্যাণ্ডার"। ৩৫ ফিট লম্বা। মাস্তুল, পাল, হাল ইত্যাদি সব নির্ম্মাণ শেষ হইবার পর তিনি নৌকাটির কার্য্যক্ষমতা পরীক্ষা করিবার জন্য হাওয়াই দ্বীপ পর্য্যন্ত নৌকাতে যান এবং প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরীক্ষায় নৌকার কার্য্যক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। তখন হ্যারি সাহেব পৃথিবী-ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। নৌকাতে একটিমাত্র কামরা ছিল, তাহাতে খাওয়া, শোয়া, ভাঁড়ার ইত্যাদি সকল রকম কাজই চলিত। হ্যারি সাহেবের পক্ষে এই প্রকারে পৃথিবী-ভ্রমণ করিবার চেষ্টাকে অসমসাহসের কাজ বলা যাইতে পারে; কারণ, তিনি পূর্ব্বে কোনো দিন সমুদ্র-ভ্রমণ করেন নাই, এবং তাঁহাকে নেহাৎ ডাঙ্গার মানুষ বলা যাইতে পারে। নৌকায় করিয়া পৃথিবী-ভ্রমণ হ্যারি সাহেবের পূর্ব্বে আর একজন লোক করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কাপ্তান যসুয়া স্লোকাম্, কিন্তু কাপ্তান স্লোকাম্

স্বহস্ত-নির্ম্মিত নৌকা

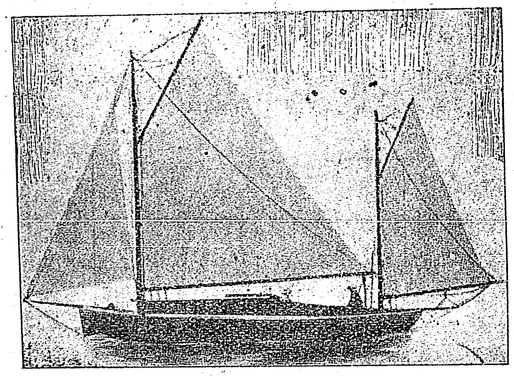

পাকা নাবিক ছিলেন এবং তাঁহার নৌকাটি হ্যারি সাহেবের নৌকা অপেক্ষা অনেক বড় ছিল।

অবশেষে হ্যারি সাহেব ১৯২১ খৃঃ অব্দের ২১এ নভেম্বর পৃথিবী-ভ্রমণে বাহির হইলেন। নানা প্রকার বিপদ আপদের ভিতর দিয়া তিনি প্রায় ৩৫,০০০ মাইল সমুদ্র-ভ্রমণ করেন। অনেক সময় ঝড়ের এবং ঢেউএর দাপটে তাঁহার নৌকাখানি যাঁয় যায় হইয়াছে, কোনো রকমে রক্ষা পাইয়াছে। নানা প্রকার ভীষণ ভীষণ জলজন্তুও কম উৎপাত করে নাই। অনেক সময় হ্যারি সাহেব হাঙ্গরের হাত হইতে সামান্য এক ইঞ্চির জন্য বাঁচিয়া গিয়াছেন। বড় বড় জাহাজের ঠোক্কর হইতে তাঁহার সামান্য ভেলার মত নৌকাখানিকে বাঁচাইতে তাঁহাকে বড় কম বেগ পাইতে হয় নাই। বিশেষ করিয়া একজন বৃদ্ধের পক্ষে এই প্রকার কার্য্য যে কতখানি মনের

জোরের পরিচয় দেয়, তাহা বলা যায় না। হ্যারি সাহেবকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেন যে, "নতুন কিছু করিবার এবং দেখিবার ইচ্ছাই আমাকে এই কার্য্য করায়।

সাত সমুদ্রের মানচিত্র

সেই ইচ্ছা এত প্রবল ছিল যে, আমি তাহাকে দমন করিতে পারি নাই। তাহা ছাড়া সংসারে আমার কোনো বন্ধন নাই, আমি বিবাহ করি নাই, কাজেই চুপচাপ এবং নিরাপদ ভাবে ঘরে এবং ডাঙ্গায় বসিয়া থাকিবার কোন হেতু আমি

একাকী সাত সমুদ্র ভ্রমণ

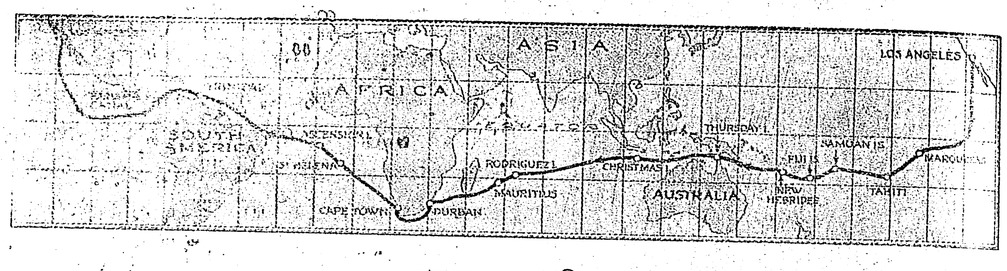

দেখিতে পাই নাই। আমার ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা হইল, আমি বাহির হইয়া পড়িলাম।"

হ্যারি সাহেবের কথাবার্ত্তায় মনে হয় যে তিনি আবার কোথাও বাহির হইয়া পড়িবার মতলব করিতেছেন। মতলব স্থির হইলেই যে তিনি বাহির হইয়া পড়িবেন, তাহাতে কোনো সন্দেহই নাই। হ্যারি সাহেবের এই নৌকায় করিয়া পৃথিবী-প্রদক্ষিণের সমস্ত বিবরণ এখনও আমাদের হাতে পড়ে নাই,—হাতে পাইলেই তাহা "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইবে।

এক হাতে ১৩টি বল

জর্জ্জ এগুটার নামক একজন পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় এক হাতে ১৩টি টেনিসবল রাখিতে বা ধরিতে

এক হাতে ১৩টি বল

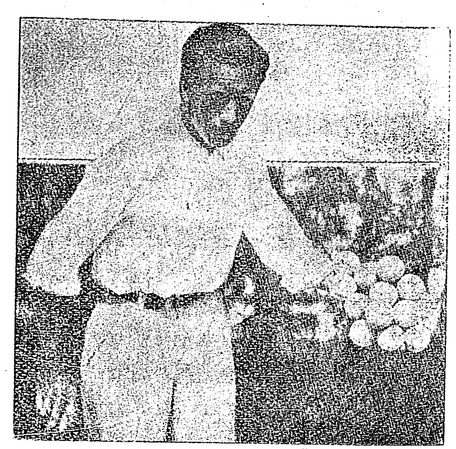

পারে। খেলিবার সময় ঐ পাকা খেলোয়াড় হাতে ৯টি বল রাখিতে পারে। হাতে বল রাখা বিষয়ে তাহার সমকক্ষ আর কেহ নাই।

সার্কাসওয়ালার কেরামতি

ছবিতে দেখুন—একজন লোক কেমন সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে। আমরা ওঠা নামা করি পা দিয়া, ছবির লোকটি করিতেছে মাথা দিয়া—সামান্য তফাৎ। লোকটি

সার্কাসওয়ালার কেরামতি

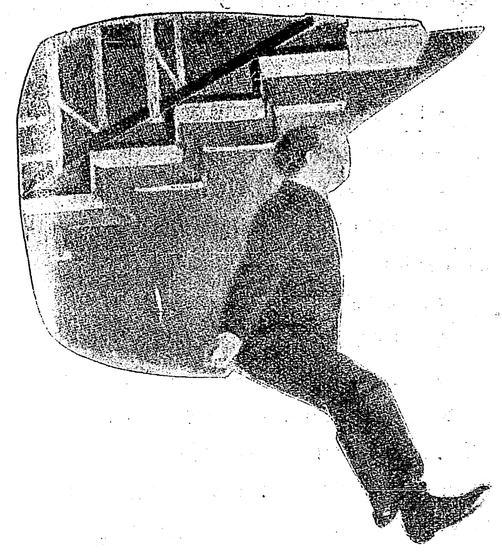

প্যারিসের একজন বিখ্যাত সার্কাসওয়ালা, নাম, আলেক্জাণ্ডার প্যাটি। পৃথিবীতে এমন অদ্ভুত খেলোয়াড় আর আছে বলিয়া শোনা যায় না।

গরম দিনে শরীর ঠাণ্ডা রাখিবার উপায়

গরম জলে স্নান করিয়া গরম কোন পানীয় পান করিলে দারুণ গরমে শরীর অনেক পরিমাণে ঠাণ্ডা হয়। ইহার কারণ গরম জলে স্নানের ফলে শরীরের লোমকূপগুলি পরিষ্কার হইয়া খুলিয়া যায়। এবং তাহার পর গরম পানীয়ের ফলে ঘাম হয়। ঘাম হইলে শরীর ঠাণ্ডা হয়, ইহা সকলেই জানেন। অবশ্য স্যাঁতসেঁতে হাওয়াতে ঘাম হইলে আরাম অপেক্ষা বে-আরাম ঢের বেশী হয়। গরমকালে অত্যন্ত ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে অনেক সময় লোমকূপগুলি সঙ্কুচিত হইয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং ঘাম উপযুক্ত পরিমাণে বাহির হইতে পারে না। সেই সঙ্গে শরীরের ভিতরের গরম অনেক পরিমাণে শরীরের ভিতরেই থাকিয়া যায়। ফলে এই হয় যে স্নানের পর গরম না কমিয়া আরো যেন বাড়িয়া যায়। শুকনো গরমে শরীর যত ঘামে ততই

উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ

ভাল, কারণ ঘামের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরও ঠাণ্ডা হইবে, শুকনো গরমে ঘামও তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়, গা পচ-পচ করে না। স্যাঁতসেঁতে গরমে অর্থাৎ ভাপ্‌সা বা পচা গরমে ঘাম হইলে ফল উল্টা হয়।

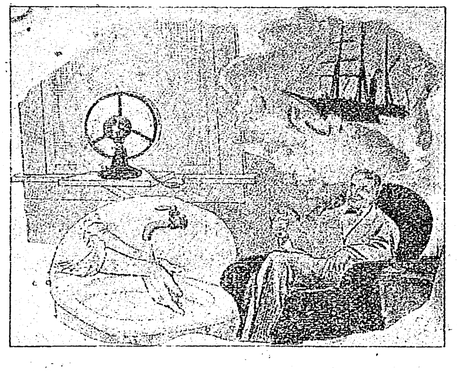

নির্জ্জনে চিন্তা করা

পোষাক পরিচ্ছদ এবং খাওয়ার উপর গরম অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। হালকা রংএর জামা কাপড় গরমকালে আরামদায়ক। ঘোর রংএর জামা কাপড়

শরীরকে অত্যন্ত গরম করে; কারণ ঘোর রং তাপ অতি সহজেই গ্রহণ করিয়া রক্ষা করিতে পারে।

ভিজা পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া ঘর ঠাণ্ডা রাখা

গরমকালে বেশী খাওয়া ঠিক নয়, তাহাতে শরীর কষ্ট পায় এবং গরম বৃদ্ধি পায়। শাকসব্জী এবং তাজা ফল গরম কালের পক্ষে খুব ভাল; কারণ, ইহারা শরীরের তাপ বৃদ্ধি করে না। মাংস এবং মিষ্টান্ন যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। ঠাণ্ডা যায়গায় ভ্রমণ বা দৃশ্যাদির চিন্তা গরমকালে মন এবং শরীর অনেক পরিমাণে ঠাণ্ডা করে। নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায় শরীর ঠাণ্ডা করিবার পক্ষে খুব ফলদায়ক।

১। লোমকূপ যাহাতে বন্ধ না থাকে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা।

২। শাকসব্জী এবং অন্যান্য ঠাণ্ডা ফলমূল ভক্ষণ।

৩। মিষ্ট পানীয় বর্জ্জন।

৪। হালকা রংএর ঢিলা পোষাক পরিধান।

৫। ভিজা পরদা বা খস্‌খস্ টাঙ্গাইয়া ঘরের হাওয়া ঠাণ্ডা রাখা।

৬। হাওয়ার চলাচল যেন বন্ধ না হয়।

৭। মন ঠাণ্ডা রাখা, এবং কোনো বিষয়ে উত্তেজিত না হওয়া, ঠাণ্ডা দেশ, দৃশ্য এবং বিষয়ের চিন্তা করা।

৮। অলস হইয়া না থাকা—সদা কোনো কাজে রত থাকিলে গরমের কথা মনে থাকিবে না।

৯। কব্জী পর্য্যন্ত দুটি হাতকে কলের তলায় চার পাঁচ মিনিট পাতিয়া রাখিলে শরীর বেশ ঠাণ্ডা হয়।

খায়্‌বার-কাহিনী

শ্রীরমাদাস হালদার বি-এস্‌সি

এবার কলেজের গরমের ছুটীতে পশ্চিম-ভারতের কিছু কিছু দেখতে বেরিয়েছিলাম্। এই বেড়ানোটা আমার মজ্জাগত বাই। যে কোন ছুটিই পাই না কেন, ছোট হোক আর বড়ই হোক, কোথাও ঘুরে আসা আমার চাই-ই চাই। তাই কলেজে দীর্ঘ ছুটির নোটীস ঝুলতে না ঝুলতেই, বাইরের ডাক আবার আমায় ডাকতে লাগল। ছুটি ত লম্বা—প্রোগ্রামটাও তাই মনের মতই লম্বা করে বাঁধলাম্। সমস্ত পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, আর কাশ্মীর এই ছুটির তিন মাসের ভেতরেই সেরে ফেলব,—আর বাকী ছুটিটায়, ভ্রমণ শেষে শিমলা শৈলে গ্রীষ্মবাস করব স্থির করি। সাথী জোটাবার চেষ্টা করলাম্। হয়ে উঠল না। তাই তল্পীতল্পা গুছিয়ে নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের শুভেচ্ছার ভেতর দিয়ে যাত্রা করলাম্ এলাহাবাদ থেকে ২৯এ মার্চ্চ তারিখে।

প্রথম আসা হল দিল্লীতে। এই দিল্লী থেকে সুরু করে সারা পাঞ্জাব ঘুরে ১লা মে তারিখে পেশোয়ার পৌঁছুলাম্। ছেলেবেলায় ইতিহাস-ভূগোলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হবার পর থেকেই—খায়্‌বার পাশকে দেখবার এবং চেনবার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল। এই পেশোয়ারে এসেই আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়। আজ তারই কাহিনী লিখতে বসেছি।

ভারতের ইতিহাসে খায়্‌বার চিরস্মরণীয়। পশ্চিম থেকে

কাবুলের ভেতর দিয়ে ভারতে আসবার এই-ই একমাত্র স্থলপথ। ভারতের বুকের ওপর দিয়ে যত বৈদেশিক ঝড়-ঝঞ্ঝাবাত স্মরণাতীত কাল থেকে চলে এসেছে, তাদের মূলে এই খায়্‌বার। হয়ত আজ খায়বার না থাকলে ভারতের ইতিহাস অন্য ভাবেই লেখা হ'ত।

খায়্‌বার পাশের ভৌগোলিক বিবরণ সবাকারই জানা। শ্রেণীবদ্ধ শৈলমালা আফগানিস্থান ও ভারতের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের মাঝের যে সংকীর্ণ পথ এই দেশ দুটোকে কোনও রকমে জুড়ে রেখেছে, তারই নাম খায়বার পাশ বা খায়বার গিরিসঙ্কট।

খায়্‌বারের দূরত্ব (লাণ্ডিখানা ক্যাম্প পর্য্যন্ত) পেশোয়ার থেকে মোট ৩৪ মাইল। এইখানেই আফগানিস্থানের সীমা। এখনও পর্য্যন্ত এ পথে যাবার দুটি মাত্র উপায় আছে—হয় মোটর, নয় টাঙ্গা। তবে টাঙ্গাতে কেউ বড় একটা যায় না। এটা যথেষ্ট বিপদজনক; কারণ, পথটা একেবারেই পাহাড়ের মাথায় মাথায় আর শুধু চড়াই আর উৎরাই। আর কিছুদিন পর থেকে সারা পথটাই রেলে যাওয়া যাবে; রেলের লাইন ফেলা হয়ে গেছে—অল্প দিনেই যাত্রী-চলাচল সুরু হবে।

খায়বার-যাত্রীর আর একটা কথা জানা দরকার। পাশ দেখতে যেতে হলে খায়বারের পলিটিকাল এজেণ্টের অনুমতি পত্র (permit) চাই—নচেৎ অনর্থক পয়সা নষ্ট করে এবং হাঙ্গামা পুইয়ে ফিরে আসতে হয়। আমার ভাগ্যে প্রথম দিন এই রকমই হয়েছিল; এ ব্যাপার জানা না থাকায়, পেশোয়ার থেকে ১০ মাইল দূরে জামরুদ টোল আপিসে আমার মোটর থেকে নামিয়ে নেয়; এবং অনেক হাঙ্গামা ও বিস্তর সওয়াল জবাবের পর পুলিস সঙ্গে দিয়ে, জামরুদ ষ্টেশন থেকে আমাকে রেলে চাপিয়ে পেশোয়ার ফেরত পাঠায়। পরদিন আবার অনুমতিপত্র সংগ্রহ করে আমায় পাশ দেখতে যেতে হয়।

এ অনুমতিপত্র সংগ্রহ করা বিশেষ কোনও হাঙ্গামার ব্যাপার বা কষ্টসাধ্য নয়। খায়বারের পলিটিক্যাল এজেণ্টের দপ্তরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে অনুমতি-পত্রের দরখস্ত পেশ করতে হয় এবং সাধারণতঃ তাইতেই 'পারমিট' পাওয়া যায়।

আগের দিন (৫ই মে) ফিরে এসেছি, আজ (৬ই মে) দেখতে যাওয়া স্থির। পাশও তৈরী - মোটরেরও বন্দোবস্ত করা আছে। চাকরে খুব ভোরেই ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে। উঠেই প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সেরে নিলাম। তারপর তাড়াতাড়ি করে প্রাতরাশ সেরে টিফিন বাস্কেটে কিছু রুটি, মাখন, কেক্, আর মিষ্টি খায়বারের রসদ (provision) স্বরূপ ভরে নিলাম্। থারমাস ফ্লাস্কে কিছু গরম চা নিতেও ভুলিনি। এগুলো এখানে জানান দেবার উদ্দেশ্য এই যে, অনুমতি-পত্রও যেমন দরকারী—খায়বার-যাত্রীর কাছে এগুলোও তার থেকে কিছু কম নয়। নচেৎ ক্ষুধায় সেখানে কষ্ট পাবার সম্ভাবনা। দোকান-পত্র যে সেখানে নেই বা চেষ্টা করলে যে কিছু মেলে না তা নয়, তবে তৈরী হয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ সঙ্গে আরও একটা কথা আছে। এখানে বাঙ্গালীর ধুতি-চাদর ছেড়ে বিলাতী পোষাকে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়; কারণ পোষাকের মাহাত্ম্যে অনেক রকম সুবিধা পাওয়া যায়। তাছাড়া বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য ধুতি-চাদরকে সবাই সন্দেহের চক্ষে দেখে থাকে।

এতো তাড়াতাড়ি করেও বেরুতে বেরুতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। যখন মোটর ছাড়ল—তখন ঘড়ীতে বাজছে ৮টা।

মোটর ছাড়ল—ক্রমশঃ সহরের রাস্তা পেছনে ফেলে খায়বারের দিকে এগুতে লাগল—আর আমার চোখের সামনে ছায়াচিত্রের মত একের পর এক যে ছবি ফুটে উঠতে লাগল—সে বিরাট, সে মহান—আমার ক্ষুদ্র ভাষা-ভাণ্ডারের বর্ণনার বাইরে। রাস্তার দুধারে দূরে দূরে পাহাড়ের শ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে; দূর থেকে আকাশেরই বুকে তাদের পাঁশুটে রংয়ের চেহারাগুলো যেন বিরাট জমাট বর্ষার চাপ মেঘেরই মত দেখাচ্ছে; পেঁজা তুলোর মত দু এক টুকরো পাতলা ছোট ছোট মেঘ পাহাড়ের দু একটা উঁচু চূড়োয় ভর করে ঝুলছে; প্রভাত-সূর্য্যের সোনালি আলো তাদের ওপর পড়ে চিক্‌চিক্ করছে—সে দৃশ্য বিরাট—সে দৃশ্য মহান!

এমনি ভাবে আমরা এগুতে লাগলাম্। ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধ "ইসলামিয়া কলেজ" আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। এটা পথের পাশেই পড়ে—পেশোয়ার থেকে ৮ মাইল দূরে। পেশোয়ার থেকে জামরুদ পর্য্যন্ত যে রেল লাইন আছে, তার একটা ষ্টেশন এখানে আছে। কলেজের নামানুসারে

ষ্টেশনেরও নাম-করণ হয়েছে "ইসলামিয়া কলেজ।" তবে ষ্টেশনটি আকারে ছোট এবং ওপর খোলা। ইসলামিয়া কলেজ পেশোয়ায়ে এসে একটা দেখবার জিনিস্। ইমারত বেশ সুন্দর তৈরী—ছাত্রাবাসও সংলগ্ন। এখানে পড়াশুনাও বেশ ভাল হয় শুনলাম্।

এ পর্য্যন্ত রাস্তার দুধারে যথেষ্ট গাছপালা আছে; বসতিও মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। রাস্তার দুধারে দিশী, বিলিতি সৈন্যেরা কুচ-কাওয়াজ কচ্ছে, দেখা যায়। এ পর্য্যন্ত পেশোয়ারের Suburbএর অন্তর্গত; কিন্তু এই ইসলামিয়া কলেজের পর থেকে পাথরের টুকরো (pebble) বিছান ন্যাড়া রাস্তা চলে গেছে—তাতে গাছ পালা নেই। এখান থেকে জামরুদের রেল লাইন প্রায়ই চোখে পড়ে। রাস্তার বেশ কাছ দিয়ে গিয়েছে—কখনও এপাশে, কখনও ওপাশে—কখনও বেশ কাছে, কখনও আবার একটু দূরে।

এমনি ভাবে রেল লাইনের সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে হঠাৎ রাস্তা রেল লাইন পার হয়ে বাঁ দিকে বেঁকে চলে গেছে জামরুদে। প্রথমে থামা হ'ল আমাদের এখানে—টোল আপিসের সামনে। আগের দিন এখান থেকে আমাকে নামিয়ে নিয়ে পুলিস সঙ্গে দিয়ে পেশোয়ারে ফেরত পাঠিয়েছিল।

এই জামরুদে টোল আপিসে সব গাড়ীকেই থামাতে হবে যাবার এবং ফিরবার বেলা। এখানকার 'পারমিট' দেখা এবং গাড়ী একজামিন শেষ হলে অনুমতি পেলে তবেই গাড়ী খায়বার যেতে পারে বা পেশোয়ার ফিরতে পারে।

আগের দিনের অফিসারের সঙ্গে দেখা হ'ল। একটু মুচকে হেসে বল্লে "তাহলে তুমি অনুমতি-পত্র পেয়েছ?" কাল তার ব্যবহারে ভয়ানক রাগ হয়েছিল—কতকটা রুক্ষ ভাবেই জবার দিলাম—"না পাবার মত কোন কারণ কি কাল ঘণ্টাখানেকের সওয়াল-জবাবেও তুমি আমার মধ্যে আবিষ্কার করতে পেরেছিলে?" ভদ্রলোক একটু থতমত খেয়ে বল্লে, "তুমি মিষ্টার আমার ওপর অনর্থক রাগ করছ। আমি আমার কর্ত্তব্য মাত্রই করেছিলাম্।"—আমিও একটু অপ্রস্তুত হলাম্। তবে দুজনের মধ্যে অল্পক্ষণেই আলাপ বেশ জমে উঠল। লোকটিকে বেশ ভদ্র বলেই মনে হ'ল।

যাক্। অনুমতিপত্র একজামিন হবার পর খেরোবাঁধান মান্ধাতার আমলের তৈরী একখানা লম্বা-চওড়া রেজিষ্টারে নাম-ধাম, বংশপরিচয়, জাতি, ঠিকানা, পেশা ইত্যাদি বিস্তারিত লিখে, তার পাশে তারিখ দিয়ে নাম দস্তখত করবার পর আমাদের মোটর খায়বারের ছাড়পত্র পেয়ে যাত্রা করল। অনুমতি-পত্রখানা ফেরত দিয়েছিল। তবে জানান দিলে, ফিরবার পথে এটা টোল আপিসে জমা দিতে হবে। মনে মনে বল্লাম—তথাস্তু।

আপাততঃ রেল লাইন এই জামরুদ পর্য্যন্তই আছে। এখান থেকে লাইন ফেলে, খায়বার রেলপথ তৈরী হয়েছে—আফগান-সীমান্ত লাণ্ডীখানা (Landikhana) পর্য্যন্ত। কিছুদিন পর থেকে মুসাফির লরীর ঝাঁকানির হাত থেকে বেঁচে যাবেন।*

জামরুদের চারিধার কাঁটাদার লোহার জাল (Barbed Wire Fencing) দিয়ে ঘেরা; এটা আফ্রিদিদের নৈশ আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। কারণ, এ সীমান্ত প্রদেশের ব্যাপার বড়ই গোলমেলে। এই লোহার জালের বাইরেই আফ্রিদি খাঁনদের (Afridi Chiefs) স্বাধীন খণ্ডরাজ্য—ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত নয় এবং এরা অনেক সময়ে গোলমাল পেলে সহজে ছাড়ে না।

জামরুদের টোল আপিসের ঠিক সামনেই জামরুদ কেল্লা। মাটীর তৈরী (mud built)—বিশেষ বড় নয় এবং দেখতেও বিশেষ মন্দ নয়। সব সময়েই এখানে এক আধটা সেনাপল্টন (Regiment) থাকে।

জামরুদ রেল ষ্টেশন থেকে খায়বার রোপ ট্রান্সপোর্ট লাইন (Khyber Rope Transport Line) সুরু হয়েছে। রেল লাইন ফেলার আগে পর্য্যন্ত খায়বারে মাল পাঠানর এইই একমাত্র উপায় ছিল। রেল লাইন ফেলা থেকে এই উপায়ে মাল চালান বন্ধ হয়ে গেছে। এখন থেকে মালগাড়ী ভর্ত্তী হয়েই মাল চালান যাবে।

এ একটা ভারী সুন্দর ব্যাপার। জামরুদ রেল ষ্টেশন থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লম্বা লোহার মজবুদ খুঁটি পাহাড়ের মাথায় মাথায় সোজা চলে গেছে খাইবারে লাণ্ডীখানা পর্য্যন্ত।—প্রত্যেক খুঁটির মাথার দুধারে ঘূর্ণ্যমান চাকার ওপর দিয়ে খুব মোটা আর মজবুদ তারের দড়া (Rope) চলে গেছে। এই সব দড়ার ওপর পুলি (pulley) দেওয়া মস্ত মস্ত মাল বোঝাই মালগাড়ী ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। তারপর

* সম্প্রতি এই রেল লাইন মহাসমারোহে খোলা হয়েছে। এবং লোক চলাচল করছে। অনেক সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি নিমন্ত্রিত হয়ে এই উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন।—ভাঃ সং।

তাড়িৎ শক্তি দ্বারা এই দড়া টানা হয়;—সঙ্গে সঙ্গে মাল বোঝাই গাড়ীও এই দড়ার ওপর দিয়ে চলতে থাকে। এমনি ভাবে মাল পাহাড়ের মাথায় মাথায় চলে। এ দেখতে ভারী সুন্দর।

এই জামরুদে প্রায় আধঘণ্টা দেরী করার পর গাড়ীতে জল ভরে নিয়ে গাড়ী আবার ছাড়ল। এখন থেকে একটু একটু করে গাড়ী চড়াই উঠতে লাগল এবং দূরের পাহাড় ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে কাছে আসতে লাগল। এখন থেকেই সাবধানে গাড়ী চালান সুরু হ'ল—যদিচ খায়বার পাশের প্রবেশ-পথ তখনও অনেক দূরে; তবে চড়াই উৎরাই সুরু হয়ে গিয়েছিল। গাড়ী চালানর সতর্কতাসূচক সাইনবোর্ড এখান থেকেই আঁটা সুরু। প্রথমে যেটা চোখে পড়ল সেটা অবিকল তুলে দিলাম। লেখা আছে বড় বড় ইংরিজি হরফে দিশী ভাষার পাশাপাশি—Stop, Look, Listen (থাম, দেখ, শোন)।

এখান থেকেই রাস্তা দুটো ভাগ হয়ে গেছে; তবে দুটোই অবশ্য সোজা গেছে একই লক্ষ্যের উদ্দেশে।

খায়বারের পুরোনো চেহারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হাতে গড়ে বদলে গেছে খুবই। ঠিক পাশ বা গিরিসঙ্কট বলতে যে ব্যাপারটা বোঝা যায়—ছেলেবেলায় ভূগোলে যা পড়া গেছে, তা আর এখন নেই। অনেক নতুন রাস্তা তৈরী হয়েছে। তাছাড়া পুরোনো রাস্তাও সব মোটর-চলাচলের জন্য চওড়া করা হয়েছে, যাতে বিপরীতগামী গাড়ী পাশ কাটাতে পারে। তাছাড়া খায়বার এখন সহজগম্যও হয়েছে খুবই। অবশ্য এ নতুন রেলপথ ফেলাতে পাশ হিসাবে এর সৌন্দর্য্য অনেকটা কমে গেছে। তবু একবার দেখলে মনের উপর এ যে ছায়া ফেলে যাবে তা মুছে যাবার নয়।

আরও কয়েক মাইল চড়াই উৎরাইয়ের পর আমরা পাহাড়ের পায়ের কাছে পৌছে গেলাম্। সামনে চেয়ে দেখলাম। যতদূর দৃষ্টি গেল দেখা গেল, পথের কোন চিহ্নমাত্র নেই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড় শুধু পথজুড়ে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে আফগান ও ভারত-সীমান্তের মাঝখানে। হঠাৎ ছোট একটা মোড় ফিরতেই চোখে পড়ল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে দড়ীর মত একটা রাস্তা এঁকে-বেঁকে সাপের মত চলে গেছে। কালকা-শিমলা রেলপথের মত এখানকার রাস্তাটা এঁকে বেঁকে পাহাড়ের পাশে পাশে ধীরে ধীরে উঠে গেছে। এক এক জায়গায় নীচের পানে চাইলেই মনের মাঝে যথেষ্ট ভয় হয়। এক দিকে সোজা খাড়া পাহাড়, অন্য দিকে পাহাড়ের গভীর 'খাদ'। রাস্তার ধারে খাদের দিকে কিছু কাঁকর ফেলা ছাড়া সব জায়গায় দেওয়াল বা লোহার রেলের বেড়া আছে; তবু চালকের একটু অসাবধানতা, পাহাড়ের একটু ধাক্কা বা ষ্টীয়ারিংয়ের একটু গোলমাল মানেই ৫০০ ফিট নীচের গভীর খাদ।

রাস্তাটা সব জায়গাতেই যে শুধু পাহাড়ের গা ঘেঁষে ঘেঁষে উঠেছে তা নয়; পুলও তৈরী করতে হয়েছে অনেক। আর খারাপ মোড় (Sharp Turning) খুবই বেশী। এই চড়াই বা Uphill work অতি ধীরে ধীরে এবং খুবই সাবধানে করতে হয় অনবরত গিয়ার বদলাতে বদলাতে। গাড়ী চালাবার লোক খুবই সুদক্ষ হওয়া দরকার। গাড়ী এ রাস্তায় অধিকাংশ সময়ই কাত হয়ে চলে।

দূর থেকে পাহাড় গাঢ় নীল রংয়ের দেখাচ্ছিল। তাদের কোলের মধ্যে প্রবেশ করে দেখা গেল—পাহাড়-গুলো একেবারে ন্যাড়া (barren) গাছপালাহীন। শুধু যতদূর চোখ যায়—নগ্ন পাথর। এর মাঝে মাঝে পাহাড়ের মাথায় মাথায় দু এক জায়গায় সান্ত্রী পাহারার ঘাঁটী (Sentry Picket Post) দেখা গেল।

এখানকার পাহাড়ের রাস্তা এত বেশী বেঁকে ঘুরে উঠেছে যে, দেখতে ভারী সুন্দর। মোটর থেকে দেখা যায় ওপরের ব্যাক্ ঘুরে, ওপর দিয়ে বা নীচের রাস্তা দিয়ে অন্য মোটর উঠছে বা নামছে। এরই মধ্যে গাড়ীতে আরও দুবার রাস্তা থেকে জল ভরতে হয়েছিল—তবু ইঞ্জিন মাঝে মাঝে অসহ্য গরম হয়ে উঠছিল।

এমনি ভাবে কখনও ৫০ হাত ঘুরে, দেড় চক্কোর (round) দিয়ে তিন হাত উঠি, কখনও আবার ৫ হাত নামি। এমনি করে ধীরে ধীরে গাড়ী এগুতে লাগল। মাঝে মাঝে প্রায়ই নতুন তৈরী খায়বার রেল-পথের দর্শন পাওয়া যাচ্ছিল। এ রেল লাইন না দেখলে বোঝান শক্ত। এটা অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়েছে। এ শুধু পুল করে আর টানেল কেটে মোটরের রাস্তার অনেক ওপর দিয়ে—পাহাড়ের প্রায় মাথা দিয়ে চলে গেছে। অনেকটা কালকা-শিমলা রেলপথের অনুরূপ—তবে তা

থেকে বেশী মাথা খাটিয়ে আর পয়সা খরচ করে একে তৈরি করতে হয়েছে। কি ভয়ানক সব টানেল্—না দেখলে বোঝান অসম্ভব। এ টানেলের শেষ নেই—একটার পর একটা চলেই চলেছে

এখানে এই রকম চড়াই ভেঙ্গে পাহাড়ের প্রায় মাথার কাছে পৌঁছে অনেকখানি উৎরাই পাওয়া গেল।—তারপর থেকে আবার সেই চড়াই আর উৎরাই—এর আর কমি নেই। এমনি ভাবে আমরা "আলী মস্‌জিদ্" পৌছুলাম্। তখন ১০টা বেজে গেছে। এখানে এসে মোটরের চাকা বিগড়াল। মেরামত হতে পূরো একটি ঘণ্টা লাগল; সুতরাং এক ঘণ্টা এখানে আটকা পড়ে থাকতে হ'ল।

এই "আলা মসজিদ্" প্রায় মাঝ-রাস্তায়। এও একটা সেনা-বারিক;—দু একটা পল্টন এখানে থাকে। যেখানে আমাদের মোটর বিগড়াল সেইটাই হ'ল সেখানকার বাজার মোট ৪।৫খানা ছোট দোকান মিলিয়ে। একখানি মণিহারীর দোকান, একখানা সবজী ও তরকারীর, একখানা মুদিখানা, ও একখানা কামারের দোকান এই নিয়েই বাজার। এই দোকানগুলোর ঠিক পেছনেই ছোট একটা হলদে-সবুজ মিশোনো রংয়ের মসজিদ আছে। এই মসজিদের নামই "আলী মসজিদ্"। আলী নামক একজন মুসলমান সাধক ফকির এইখানেই তাঁর আস্তানা গেড়েছিলেন;—তাঁর দেহ রাখবার পরে তাঁর চেলারা এই মসজিদ নির্ম্মাণ করে এবং এই মসজিদের নাম থেকেই জায়গারও "আলী মসজিদ" নামকরণ হয়েছে—এই কিম্বদন্তি শুনলাম্।

ঠিক দোকানগুলোর সামনেই রাস্তার পাশে একটা "রোপ্ ট্রানস্‌পোর্ট ষ্টেশন" (Rope Transport Station) আছে—কাঁটাদার জাল দিয়ে ঘেরা। এইখানে আলী মসজিদের লেবেল আঁটা মাল নামিয়ে নেওয়া হ'ত। ডান-দিকে উঁচু পাহাড়ের গায়ে পল্টনের ব্যারাক্-ঘর সব তৈরী দেখ্‌লাম। খায়বার রেল লাইন তার পাশ দিয়ে গেছে।

এখানে রাস্তা বেশ নীচু দিয়ে গেছে; আর দুধারে শুধু উঁচু পাহাড়। এখানে তবু অনেকটা পাশের আইডিয়া পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে মোটর মেরামত হয়ে গিয়েছিল। এক ঘণ্টা দেরীর পর ফের রওনা হওয়া গেল। এখানে তত বেশী চড়াই নেই, তবে রাস্তা ভারী ঘুরে ফিরে গেছে। খানিকটা এগিয়ে খায়বারের 'ওয়াটার ওয়ার্কস্' (Water Works) চোখে পড়ল। তার পাশ দিয়েই আমাদের যেতে হ'ল।

এখান থেকে ক্রমশঃ আমাদের নামতে হ'ল। ক্রমাগতঃ আমরা পাহাড়ের বুকচেরা ঢালু রাস্তা দিয়ে নেমে চলেছি এবং দুপাশের পাহাড় ক্রমশঃ অল্প অল্প করে সরে গেছে; এবং রাস্তাটা ক্রমশঃ অল্প অল্প চওড়া আর একটু একটু করে ঢালু হয়ে গেছে। এই রকমে আমরা ক্রমশঃ পাহাড়ের মাঝের উপত্যকায় নেমে এলাম্। এ উপত্যকা খুব চওড়া না হলেও মন্দ নয়। এবং দু'এক জায়গায়, দেখলাম, জমীতে চাষবাস সুরু হয়েছে। চাষীর ক্ষেত দেখতে ভারী সুন্দর লাগল; অনেকক্ষণ পরে একটু সবুজ দেখে চোখ জুড়াল।

এতক্ষণ গাড়ী ঢিমে তেতালা চালেই এগুচ্ছিল—এবার ফাঁকা উপত্যকার রাস্তা পেয়ে জোর পেয়ে বেশ জোরেই ছাড়ল। পথের মাঝে মাঝে কাঁধে রাইফেল ঝুলান স্বাধীন আফ্রিদিদের সঙ্গেও দেখা হ'ল! এদের দেখলেই মনে কেমন একটা আতঙ্ক হয়। ছোট ছোট ছেলেরাও বিনা রাইফেলে বেরোয় না এবং এদের সবাকারই লক্ষ্য অব্যর্থ। সামান্য সুযোগেও এরা বন্দুক চালাতে দ্বিধা করে না; এবং অনেক সময়েই এরা সুযোগ, বিনা-সুযোগের ভেতর থেকেই, তৈরী করে নেয়। এদের নিজেদের বন্দুকের কারখানা আছে শুনলাম্; এবং প্রত্যেক নবজাত আফ্রিদি শিশুর জন্য, শিশুর পিতা মাতা ও আত্মীয়-স্বজন তার ভবিষ্যৎ স্বাধীন জীবনের হাতিয়ার 'রাইফেল' প্রথমেই বাছাই করে রাখে।

শুধু খায়বারের রাস্তাটা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে আছে—তাই 'পারমিটে' লেখা আছে, এবং সবাই পুনঃ পুনঃ জানান দেয়, যেন কোনক্রমে রাস্তা ছেড়ে পাশের মাঠে পা না দেওয়া হয়।

গভর্ণমেণ্টের জলের বন্দোবস্ত রাস্তার পাশে পাশে দূরে দূরে আছে। তা থেকে আফ্রিদি মেয়েরা সব জল নিয়ে যাচ্ছে দেখা গেল। রাস্তা থেকে আফ্রিদিদের মাটীর বাড়ীও অনেক চোখে পড়ে—উঁচু উঁচু মাটির টাওয়ার (Watch Tower) দেওয়া।

এখানকার রাস্তা বেশ ভাল। এই উপত্যকার আরম্ভ ১৬।১৭ মাইল পর থেকে। কখনও একটু উঠি, কখনও একটু নামি,—এমনি করে এই বাকী ১২।১৩ মাইল রাস্তা

পার হয়ে, মোড় ফিরেই লাণ্ডিকোটাল (Landikotal) চোখে পড়ল অনেকখানি নীচে; দূর থেকে যেন কোন নিপুণ শিল্পীর হাতের আঁকা ছবি বলেই মনে হ'ল।

এই ১২।১৩ মাইল উপত্যকায় খায়বার রেল লাইন আর মোটরের রাস্তা প্রায় পাশাপাশি গেছে; কখনও এপাশে, কখনও ওপাশে, কখনও কাছে, কখনও দূরে।

সোজা ঢালু উৎরাই রাস্তাটা লাণ্ডিকোটালে নেমে গেছে। লাণ্ডিকোটালের লোহার ফাটক যখন পার হলুম্, ঘড়ীর ওপর চোখ বুলিয়ে দেখলাম,—দুটো কাঁটাই ১২টার ঘর পার হয়ে গেছে। এখানে যে ছবি আমার চোখের পর্দ্দায় পড়ল তাকে বিশদরূপে এ লেখ্য ভাষার ভিতর দিয়ে ধরে রাখা অসম্ভব। তা শুধু অনুভব করবার—প্রকাশ করবার নয়। চারিধার গগনস্পর্শী পাহাড়ে ঘেরা—মাঝে গোলাকার উপত্যকাভূমি চারিধারে কাঁটাদার তারের বেড়া ঘেরা—ব্যারাকের শাদাশাদা ঘরগুলি লাইন বেঁধে সোজা চলে গেছে—আর পরিষ্কার রাস্তাঘাট দূর থেকে দড়ার মত সোজা সোজা পড়ে আছে, আর দেখাচ্ছে—ভারী সুন্দর।

কাল জামরুদ আসবার পথে লাণ্ডিকোটালের একজন ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে মোটর থামল গিয়ে একেবারে তাঁর ডাক্তারখানার দরজায়। ডাক্তার সাহেব আমায় দেখতে পেয়ে খুবই খাতির করে বসালেন।

লাণ্ডিকোটাল প্রায় খায়বার পাশের আফগান-সীমান্তে। এখান থেকে ৫ মাইল দূরে লাণ্ডিখানায় আফগান-সীমান্ত—এদিকে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত—ওদিক আফগান অধিকার-ভুক্ত। আফগানিস্থানের পাশপোর্ট না থাকলে এ সীমানা পার হয়ে আফগান রাজ্যে পা ফেলতে দেয় না। এখানকার খুব বেশীরকম কড়াকড়ি। এ সীমার বাইরে যাওয়া আদতেই বারণ। মস্ত বড় সাইনবোর্ড দেওয়া আছে—"It is absolutely forbidden to cross this border into Afghan territory." (এই সীমা পার হয়ে আফগান রাজ্যে যাওয়া একদম বারণ।)

এখানে যাবার অনুমতি আমি বিস্তর লড়ালড়ি করেও পাইনি। সুতরাং আমায় ৫ মাইল দূরে লাণ্ডিকোটাল পর্য্যন্ত এসেই সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল। শুনলাম, এ রাস্তায় অনেক জায়গায় ছবি নেওয়াও বারণ। মস্ত মস্ত নোটিশ টাঙিয়ে এটা জানান দেওয়া আছে। চুরি করেও কেউ ছবি নিতে পারে না; কারণ, সান্ত্রীর ঘাঁটী সব এমন জায়গায় আছে, যেখান থেকে সবাকার গতিবিধি দেখতে পায়।

এবার লাণ্ডিকোটালের কথা। ডাক্তার সাহেবের দোকানে আধঘণ্টাটাক বিশ্রাম করে, টিফিন বাস্কেট ইত্যাদির বোঝা সেখানে নামিয়ে, বেড়াতে বেরুলাম্। প্রথমেই চোখে পড়ল—নাম হিসেবে এ জায়গাটাকে বিলেতের একটা ছোট খাট সংস্করণ করে তোলা হয়েছে। Victoria Street, (ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট), White Hall (হোয়াইট হল), Jermyn Street (জার্মিন ষ্ট্রীট) Pall Mall (পল মল্), Trafalgar Square (ট্রাফলেগার স্কয়ার) Strand (ষ্ট্রাণ্ড) ইত্যাদির ছড়াছড়ি—অভাব কোনটারই নেই। Charing Cross (চেয়ারিং ক্রশ) নামটা অবশ্য পাঞ্জাবের এদিকে অনেক জায়গায় পেয়েছি—যেমন লাহোর, রাওয়ালপিণ্ডি, চাক্‌লালা ইত্যাদি। কিন্তু এতো বেশী বিলেতের অনুকরণে অদ্ভুত নামের ছড়াছড়ি এই প্রথম চোখে পড়ল।

এটা থেকে সবাই যেন মনে না করেন যে, জায়গা হিসেবে এটা বড় একটা 'কেউ কেটা' নয়। বরঞ্চ ঠিক তার উলটো। জায়গাটি ছোট,—রাস্তাঘাট অবশ্য বিশেষ মন্দ নয়, তবে ছোট ছোট এবং ভয়ানক পাথর ওঠা, আর সরু সরু। চারিধারই শুধু সেনাবারিকে ঘেরা। জামরুদের মত লাণ্ডি-কোটাল ক্যাম্পও ফাটক থেকে চারিধার কাঁটাদার লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। ছোট খাট দোকান পশার মিলিয়ে একটা মাঝারি গোছের বাজার আছে। নিতান্ত দরকারী জিনিসপত্র পাওয়া যায়। সৈন্য সামন্তের জিনিসপত্রের আদতেই অভাব নেই। পেশোয়ারেরই অনেকগুলি দোকানের ছোট-খাট ব্রাঞ্চ আছে দেখলাম্। এখানে বিজলী বাতি জ্বলে এবং রাস্তাতে জলের কলের বন্দোবস্ত আছে।

সুইস্ উপত্যকার (Swiss Valley) ছোট ছোট গ্রামের চেহারা ছবিতে যেমন দেখা যায়, এ জায়গাটা দেখতে অনেকটা সেই রকমের। সৈন্য-সামন্তের আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্তও আছে। White Hallএর (হোয়াইট্ হলের) ওপর একটা বায়স্কোপের ঘর থেকে এটা বুঝতে পারা যায়। বায়স্কোপটির নাম দেওয়া হয়েছে "Frontier Cinema"। রেট দেখলাম লেখা আছে, দু'টাকা, একটাকা,

বার আনা আর ছ' আনা। ছ' আনার ওপর বড় বড় করে জানান দেওয়া আছে, "For Indians Only" (কেবল ভারতবাসীর জন্য)।

এখানে ভারতবাসীর সংখ্যা বিশেষ বেশী না। কারণ, এখানে যারা আছে, তাদের নিতান্তই বাধ্য হয়ে থাকতে হয়েছে। তারা বেশীর ভাগ সৈন্য-বিভাগের চাকুরে। আর বাকী যারা দুচার জন আছে, তারা ব্যবসায়ী এবং তারা কেউ মেয়ে ছেলে এখানে আনে না। বাঙ্গালী কেউ আছে কি না খবর নিলাম; শুনলাম, আজ-কাল কেউ নেই।

এখানে একটা ছোট কেল্লা আছে—গভর্ণমেণ্টের তৈরী। এখানে ঢুকতে হলে আবার নতুন পাশ চাই; সেটা শুনলাম্ লাণ্ডিকোটালের পলিটিক্যাল তসিলদারের কাছ থেকে পাওয়া যায়। আমার সময়ও ছিল না এবং সেটা আমি যোগাড় করেও উঠতে পারি নি। তাই ডাক্তার সাহেব বলে দিয়েছিলেন—বৃথা চেষ্টা, ঢুকতে পারবেন না। আমিও ভাবলাম হয়ত হবে না—তবু মনে করলাম্, চেষ্টা করে দেখি। যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।

দোকান-পশার ইত্যাদি দেখা সেরে কেল্লার দিকে যাত্রা করলাম। কেল্লাটা ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটের ওপর। দূর থেকে কেল্লার মাথা থেকে ব্রিটিশ ইউনিয়ান জ্যাক্ (British Union Jack) উড়ছে, দেখতে পেলাম্। কেল্লার ফটকে পৌঁছে দেখলাম্, ব্রিটিশ সান্ত্রীরা বন্দুক কাঁধে ফটক পাহারা দিচ্চে। মাথার টুপিটা একটু চোখের ওপর টেনে দিয়ে গম্ভীর ভাবে হনহন করে সোজা ফটক পার হলাম্—কারও মুখের পানে না তাকিয়ে বা ইতস্ততঃ না করে।

যাক্। দোকানে বসে ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকে কেল্লার খবর কিছু জেনে নিয়েছিলাম্; সেটা এখন আমায় সাহায্য করলে। ফটক নির্ব্বিবাদে পার হয়েই, বাঁ-হাত ঘুরে প্রথমেই কেল্লার ডাকখানায় ঢুকলাম্। ইতিমধ্যে ডাক্তার সাহেবের দোকানে বসে বাড়ীর এবং বন্ধু-বান্ধবের উদ্দেশে কিছু চিঠি-পত্র লিখেছিলাম। সেগুলো এই কেল্লার ডাকখানাতেই ছেড়ে দিলাম্। তারপর ডাকখানার পাশের রাস্তা দিয়ে কেল্লার এক কোণের দিকে চলে গেলাম্।

এবার মনের আনন্দে দেখতে সুরু করলাম্। কেল্লাটি ছোট—বিশেষ কিছু নেই। এটাকে হাসপাতাল বললেই চলে। দুটো নীচু বিনিতার টেলিগ্রাফের খুঁটিও ভেতরে আছে—তবে তারা কাজ দেয় না শুনলাম্। ভেতরেও যথেষ্ট ব্যারাকস্ও আছে। ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি, দেখব আর কি, এমন সময়ে কি জানি কেন সান্ত্রীদের কোনও রকমে সন্দেহ হয়েছে; তারা একজন সার্জ্জেণ্ট পাঠিয়েছে আমার খোঁজে। আমি মনের আনন্দে শিষ্ দিতে দিতে চলেছি—সার্জ্জেণ্ট এসে হাজির। আমার পাশ দেখতে চাইলে। দুষ্টুমি করবার এমন একটা সুযোগ আর ছাড়তে পারা গেল না। গম্ভীরভাবে খায়বারের অনুমতিপত্রখানা বার করে তার নাকের ডগার সামনে একবার ঘুরিয়ে পকেটে পুরতে গেলাম। সে তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে সেটা হাতে চাইলে। অগত্যা বাধ্য হয়ে সেটা তার হাতে দিলাম। সে তাতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফেরত দিয়ে বল্লে "এ নয়—; কেল্লার পাশ চাই।" কতকটা বে-অকুবের ভান করে তাকে আমিও জিজ্ঞাসা করলাম—"সে আবার কি বস্তু?" সে আমায় ব্যাখ্যা করে জানালে "ফোর্ট দেখবার জন্য আলাদা পাশ চাই।" আমি তাকে বললাম্ "আমি তো সেটা জানতাম না—আমি পরদেশী মুসাফির—জমাদার সাহেব।"—জমাদার সাহেবটা দুষ্টুমি করেই বল্লাম্। সার্জেণ্ট সাহেব ভয়ানক চটে গেল। বল্লে—"আমি জমাদার নই, কম্পানি সার্জ্জেণ্ট (Company Sergeant)। আমি কতকটা অপ্রস্তুত ভাবে বললাম—"ওঃ—তা-তা জমাদা—I mean—সার্জেণ্ট সাহেব—আমি দুঃখিত। কিন্তু বাপু আমার কাছে পাশ-টাশ নেই। তোমরা আমায় ফটকে আটকাও নি কেন?" সার্জেণ্ট সাহেব জবাব দিল,—"তোমার সাহসী চলন (Bold Steps) দেখে আমরা ভাবলাম, বোধ হয় পাশ আছে।" আমি বললাম্—"তোমাদের এরকম ভাবাটাই ভুল—আর প্রথমে যখন এরকম ভেবেছ তা এখনও ছাই তাই ভাব না কেন। তুমিও তোমার পথ দেখ—আমিও আমার দেখি।"

যাক—আরও ৫।৭ মিনিট এই রকম হাস্যকর বাদ-প্রতিবাদের পর, তাদের নিজেদের দোষ বুঝতে পেরে, আমাকে বাইরের রাস্তা দেখিয়ে দিলে।

কেল্লার বাইরে বেরিয়ে মনের আনন্দে একচোট প্রাণ-খোলা হাসি হেসে নেওয়া গেল। ৫।৭ দিনের মধ্যে এরকম দুষ্টুমি করা হয় নি। তারপর লাণ্ডিকোটালের

বাকী যদি কিছু দেখবার থাকে তারই সন্ধানে বেরুন গেল।

ফোর্টের পর পাহাড়ের নীচে একটা সরাই (Caravan Serai) আছে, সেটা একটা দেখবার জিনিস্। কাবুল থেকে পেশোয়ার যাত্রী মাল-বোঝাই উটের ক্যারাভান এখানে বিশ্রাম করে' পেশোয়ার যায়। শুনলাম, কাল একটা বিরাট ক্যারাভান চলে গেছে। কপাল খারাপ, কাল মাঝ রাস্তা থেকে না ফিরে যেতে হলে এটা দেখতে পাওয়া যেত। এ একটা দেখবার জিনিস্।

এখানে আর বিশেষ কিছু দেখবার নেই। ডাক্তার সাহেবের ডেরায় ফিরলাম। ঘুরে ঘুরে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং পাহাড়ী হাওয়ায় ক্ষুধা এত বেশী পেয়েছিল যে মনে হচ্ছিল সারা দিনই কিছু খাই নি। সুতরাং ফিরেই প্রথম এবং প্রধান কাজ হ'ল ডাক্তার সাহেবকে কেল্লার 'এডভেঞ্চার' (adventure)। বলতে বলতে, সঙ্গে আনা ও ডাক্তার সাহেবের সযত্নসংগৃহীত খাবার-গুলোর সদ্ব্যবহার করা।

তারপর খায়বারের অনুমতি-পত্রের একটা নকল তুলে নিলাম; কেন না, ফিরতি পথে জামরুদ টোল অফিসে এটাকে ফেরত দিতে হবে। অনুমতি-পত্রের নকল এখানে অবিকল তুলে দিলাম:—

No 376 Dated 5th May 1925

Permit to visit the KHYBER PASS.

Mr. R. Halder

Has permission to visit the Khyber Pass on the 6th May procceding as far as Landikotal and returning the same day. Visitors are not allowed to proceed beyond the Landikotal wire for very special reasons which must not be stated.

(Sd) R. Garrette.
Political Agent KHYBER

This permit is issued subject to the conditions noted on the reverse.

CONDITIONS.

1. This permit must be handed in at the Khyber Tolls Office at Jamrud on the return journey. Visitors must write their names in the Register at Jamrud on the way up the Pass.

2. Visitors must arrange to leave Jamrud on the outward journey not later than 11—30 A. M.

3. Visitors should leave LANDIKOTAL on the return journey not later than 3 P. M.

4 Visitors are not allowed to enter the Block houses or defence works or to leave the road.

5. This permit is current only for the date and persons specified.

6. Visitors should travel in Tum Tums or Motor Cars. They should not proceed on foot, horse back or cycles.

ডাক্তার সাহেবকে যথাসাধ্য ধন্যবাদ দিয়ে যখন ফিরতি মোটর নিলাম তখন ৩টা বাজছে। ফেরত যাত্রায় নতুন কিছু বলবার নেই। সারা দেহে গাড়ীর ঝাঁকানির ব্যথা নিয়ে, ক্লান্ত দেহটাকে যখন পেশোয়ারে টেনে নামালাম, তখন দূরের গির্জ্জার ঘড়িটায় ৬টার ঘণ্টা বেজে শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

দিকশূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[১৫]

বুধবার প্রাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া রমাপদ সমস্ত আয়োজন এবং প্রয়োজন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর ষ্টেশনে যাইবার জন্য বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সরমার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, "আমি চল্লাম সরমা।"

সরমা তখন রান্নাঘরে সন্দেশ প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত ছিল, স্বামীর প্রতি একবার ত্বরিত নেত্রে চাহিয়া দেখিয়া নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়া বলিল, "এরি মধ্যে চল্লে, সময় হয়েছে না কি?"

সময় তখনো বাস্তবিক হয় নাই, আরো অর্দ্ধঘণ্টা পরে বাহির হইলেও যথেষ্ট চলিত, কিন্তু পাছে নিজে ষ্টেশনে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই ট্রেন কোনো প্রকারে পঁহুছিয়া যায়, সেই অসম্ভাব্য দুর্ঘটনার অহেতুক আশঙ্কায় এত সময়ও রমাপদর বেশী সময় বলিয়া মনে হইতেছিল না। সে ব্যগ্র হইয়া বলিল, "সময় হয়েছে বই কি! পথখানিই কি কম? পাকা দু মাইল।" তাহার পর সন্দেশের পাক পাত্রে দৃষ্টি পড়ায় বলিল, "সন্দেশ করছ, নিমকি করছ না যে?"

স্বামীর অসঙ্গত ব্যগ্রতা দেখিয়া সরমা পুলকিত হইয়া বলিল, "করব পরে। বেশী আগে করলে মিইয়ে যাবে।" তাহার পর হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমার তাড়া দেখে মনে হচ্ছে বাড়ীতে যেন ছোটলাটই আসছে না বড়লাটই আসছে!"

একটু যে অনাবশ্যক উত্তেজনার প্রবাহে চলিয়াছে সরমার কথায় তাহা বুঝিতে পারিয়া রমাপদ মনে মনে ঈষৎ অপ্রতিভ হইল। প্রকাশ্যে সেটুকু ঢাকিয়া লইবার অভিপ্রায়ে নিজেকে যথাসম্ভব সহজ ধারার মধ্যে লইয়া আসিয়া হাসিমুখে বলিল, "ছোটলাট বড়লাট হলে এত তাড়া থাকত না; এ যে তারো বাড়া!"

"তাই দেখছি!" বলিয়া সরমা হাসিতে লাগিল।

রমাপদ যখন ষ্টেশনে পৌছিল তখনও ট্রেন আসিতে প্রায় এক ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত হইয়া ঘড়ী দেখিয়া সে বিরক্তি বোধ করিল। এত আগে পৌছিয়াছে! তাহা হইলে এত ব্যস্ত না হইলেও চলিত। কিন্তু উপায় কি? প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে পাদচারণা করিয়া করিয়া, ঘড়ী দেখিয়া দেখিয়া, আরোহিগণের চলা-ফেরা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, টিকিট ঘরের ক্রয় বিক্রয়ের নিকট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রমাপদ সময় কাটাইতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু যতই সে এই প্রকারে সময়ের পৃষ্ঠে চাবুক মারিতে লাগিল, সময়ের গতি ততই যেন অবাধ্য ঘোড়ার মত মন্থর হইয়া উঠিল। অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সশব্দে ট্রেন যখন কলরব-চকিত জনাকীর্ণ ষ্টেশনে প্রবেশ করিল রমাপদ তাড়াতাড়ি ষ্টেশনের মধ্যস্থলে আসিয়া এক জায়গায় উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইল। একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরার গবাক্ষ দিয়া মুখ বাড়াইয়া নরেশচন্দ্র এবং সুকুমারী উৎসুক নেত্রে জনমণ্ডলীকে নিরীক্ষণ করিতেছিল; নিশ্চয় তাহারা রমাপদকেই খুঁজিতেছিল। বিবাহের পরে মাত্র দুই তিন বার দেখা সাক্ষাত হওয়ার পর বহুকাল অদর্শন হেতু সুকুমারী এবং নরেশের আকৃতি রমাপদর স্পষ্ট মনে ছিল না; কিন্তু সেকেণ্ডক্লাস গাড়ীর ভিতর দুইজন স্ত্রীপুরুষকে এইরূপ পাশাপাশি অবস্থিত হইয়া অনুসন্ধিৎসু নেত্রে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া রমাপদর চিনিতে আর কোনও অসুবিধা হইল না। সে ব্যগ্রোৎফুল্ল মুখে তাড়াতাড়ি চলন্ত গাড়ীর হাতল চাপিয়া ধরিয়া পা-দানীর উপর উঠিয়া পড়িল, তাহার পর দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া নত হইয়া উভয়কে প্রণাম করিল।

বহু লোকের মধ্যে রমাপদকে নিঃসন্দেহরূপে চিনিয়া লইবার পক্ষে একটু যে অসুবিধা হইতে পারে বলিয়া নরেশ এবং সুকুমারী ভয় করিতেছিল অতঃপর তাহারও আর কোনও কারণ রহিল না। সবলে রমাপদর দুই হস্ত দুই হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া প্রফুল্লমুখে নরেশ বলিল, "ভাল আছ ভায়া?"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "আছি। আপনি?—আপনারা?"

"আমি ভাল আছি। কিন্তু আমরাও ভাল আছি কি না সে খবর ত' তুমি অন্যত্র নিতে পার। সব খবরই যে আমি দোব তার কি মানে আছে?" বলিয়া নরেশচন্দ্র হাসিতে লাগিল।

রমাপদর মুখে সলজ্জ হাস্য ফুটিয়া উঠিল। অপ্রতিভ নেত্রে সুকুমারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল আছেন দিদি?"

একজন চতুর এবং একজন লাজুক ভায়রা-ভাইয়ের বাক্যালাপ শুনিয়া সুকুমারী পুলকিত হইয়া নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; বলিল, "আছি। কিন্তু তুমি অমন কাজ করলে কেন ভাই? চলন্ত গাড়ীতে অমন করে উঠতে আছে কি? দৈবর কথা কিছু ত' বলা যায় না, হঠাৎ যদি হাত ফস্কে যেত!"

এই সুমিষ্ট ভ্রাতৃ-সম্বোধনে এবং স্নেহ-সুরভিত উদ্বেগ প্রকাশে রমাপদর চিত্ত এক অননুভূত-পূর্ব্ব মধুর রসে ভরিয়া উঠিল। সে হর্ষোজ্জ্বল নেত্রে সুকুমারীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমি যখন উঠেছিলাম গাড়ী তখন প্রায় থেমে এসেছিল।"

"এবার থেকে একেবারে থেমে গেলে উঠো। বুঝলে?"

সুবোধ ছেলের মত ঘাড় নাড়িয়া রমাপদ বলিল, "আচ্ছা।"

নরেশচন্দ্র হাসিতে লাগিল। বলিল, "সুকু, গাড়ী থেকে আগে নাম, তারপর যা করতে হয় কোরো। গাড়ী থেকে নামবার আগেই অমন করে শাসন আরম্ভ করলে বেচারা ঘাবড়ে যাবে!"

সুগঠিত ভ্রূযুগল অর্থময় ভাবে ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া

সুকুমারী নীরবে জানাইল রমাপদর সমক্ষে এমন করিয়া আদরের নামটি ধরিয়া এত শীঘ্র না ডাকিলেও চলিত। প্রকাশ্যে বলিল, "গাড়ীর বিষয়ে শাসন গাড়ীতে না করলে চলবে কেন?"

নরেশ হাসিয়া বলিল, "তাও ত' বটে! জুরিস্‌ডিক্‌শনের কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম!"

কথায়-বার্ত্তায় যে কথাটা রমাপদ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল সহসা তাহা মনে পড়িয়া সে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কুলি কুলি করিয়া ডাকিতে লাগিল।

নরেশ রমাপদকে বাহু ধরিয়া ভিতরে টানিয়া লইয়া বলিল, "ব্যস্ত হয়ো না ভায়া! ঈশ্বর যখন আমাদের সহায় আছেন তখন ও-কাজটা বাকী নেই, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।" বলিয়া নরেশ প্লাট্‌ফর্ম্মের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

রমাপদ চাহিয়া দেখিল তিন-চারিজন কুলির সাহায্যে একজন সুসজ্জিত আরদালী গাড়ী হইতে সুটকেস, ষ্টীল-ট্রঙ্ক, ক্যাসবাক্স, হোল্‌ডল, অ্যাটাসি কেস, টিফিন কেরিয়ার প্রভৃতি বিবিধ আসবাব-পত্র প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের উপর নামাইয়া রাখাইতেছে। তাহার মস্তকের সুসম্বদ্ধ শুভ্র শিরস্ত্রাণের মধ্যস্থলে রৌপ্য-নির্ম্মিত উজ্জ্বল B অক্ষর দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল তাহা নরেশচন্দ্রের ব্যানার্জ্জী পদবীর আদ্যক্ষর। নরেশ, সুকুমারী এবং রমাপদ তিনজনে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নামিয়া দাঁড়াইল।

ভৃত্যের পরিচ্ছদের বহর দেখিয়া রমাপদ প্রভুদের পরিচ্ছদের প্রতি মনোনিবেশ করিল। প্রভুর পরিচ্ছদ এমন কিছু বিচিত্র বলিয়া বোধ হইল না; সাধারণ ভদ্র বাঙ্গালীর যেমন হয় প্রায় সেইরূপই—তবে পায়ের জুতা হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ের আলোয়ান পর্য্যন্ত সমস্ত জিনিসের মধ্যেই স্বচ্ছলতার একটা ছাপ পরিস্ফুট। প্রভু-পত্নীর সৌখীন পরিচ্ছদ কিন্তু অনাড়ম্বর হইলেও প্রাচুর্য্যের পরিচয় সুস্পষ্টরূপে বহন করিতেছিল। শুভ্র কাশ্মীরী শালের মূল্যবান শাড়ী, কাশ্মীরী শালের টাইট্ ব্লাউস্, রেশমের সাদা ষ্টকিং, বক্‌স্কিনের সাদা জুতা এবং মুক্তা-খচিত সুদৃশ্য দুই চারিখানি অলঙ্কার সুকুমারীর দেহকে আশ্রয় করিয়া ছিল। ইহার তুলনায়—রেলপথে ব্যবহার্য্য সুকুমারীর পক্ষে সম্ভবতঃ এই সামান্য পরিচ্ছদের তুলনায়—রমাপদর মনে পড়িল সরমার দীন বেশের যৎকিঞ্চিৎ সম্বল! অথচ দুইজন সহোদরা ভগ্নী!

শুধু পরিচ্ছদই নয়! পরিচ্ছদ দেখিবার সময়ে রমাপদর চক্ষে পড়িল সুকুমারীর অপরিম্লান সুস্থ যৌবন-শ্রী। সাতাশ বৎসর বয়সে সে যেন সতেজ সবুজ ডাঁটার উপর একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম; আর আঠার বৎসর বয়সেই সরমা যেন ঈষৎ ঢলিয়া পড়িয়াছে! সরমার সৌন্দর্য্যের মধ্যে হয় ত' সন্ধ্যার নিবদ্ধ মাধুরী আছে, কিন্তু প্রত্যুষের এই প্রাণখোলা প্রসন্নতা তাহার মধ্যে কোথায়! টাকা! টাকা! ষ্টেশনের কল-কোলাহলের মধ্যে, নিজের উপস্থিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভুলিয়া, রমাপদ টাকার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কিছু টাকা হাতে আসে কেমন করিয়া! খুব বেশী নয়, অন্ততঃ—! রমাপদ ভাবিয়া পাইল না সে-অন্ততঃ কত যাহাতে এ দুঃখ যায়!

কিন্তু সুকুমারীর এই সুনিবদ্ধ স্বাস্থ্য-সম্পন্নতার মূলে শুধু অর্থের রস-সিঞ্চনই ছিল না। বিবাহের দুই তিন বৎসর পরে সন্তান প্রসব কালে তাহার জীবন সংশয় হয়, এবং তৎকালীন গুরুতর অস্ত্রোপচারের ফলে ভবিষ্যতে সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা হইতে চিরদিনের মত মুক্তিলাভ করে। ফুলগাছের ডাল কাটিয়া কাটা জায়গা গালা দিয়া বন্ধ করিয়া দিলে ডালের রস সহজে শুকাইতে না পারিয়া যেমন ডালটাকে বহুক্ষণ তাজা রাখে, ঠিক সেইরূপে মাতৃত্বের অনিবার্য্য অপচয় হইতে অব্যাহতি পাইয়া সুকুমারীর স্বাস্থ্য এবং যৌবন কিছুদিন হইতে প্রায় একই স্থানে বাধিয়া গিয়াছে। যৌবন-বন্যা সর্ব্বোচ্চ রেখায় উপনীত হইবার অব্যবহিত পরেই ভাঁটার মুখে পলি পড়িয়া গভীর জল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফল ফলিবার উপায় নাই বলিয়া প্রাণ-রসের অতি সঞ্চয়ে ফুল যেন চতুর্গুণ হইয়া ফুটিয়াছে।

"কি রমা, তন্ময় হয়ে এত কি ভাবছ বল দেখি? হঠাৎ বড় বেশী রকম হাঙ্গামায় পড়ে গিয়েছ; না?"

অসঙ্গত অন্যমনস্কতা হইতে সহসা জাগিয়া উঠিয়া সুকুমারীর প্রতি সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিয়া রমাপদ বলিল, "না, না, কি আশ্চর্য্য! হাঙ্গামা আবার কি? হাঙ্গামা কিছুই নয়। বরং খুবই—খুবই আনন্দের কথা!" তাহার পর নরেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "নরেশদা, আপনি

দিদিকে নিয়ে আসুন, আমি গিয়ে একখানা গাড়ী ভাড়া করে ফেলি।”

প্রস্থানোদ্যত রমাপদর বাম বাহু দক্ষিণ হস্তে চাপিয়া ধরিয়া নরেশ বলিল, “এ কাজটাও ঈশ্বরের উপর ছেড়ে দাও ভাই। এ-সব কাজ ও তোমার চেয়েও ভাল করবে আমার চেয়েও ভাল করবে। অতএব আমাদের দুজনের মধ্যে কারো অনর্থক ব্যস্ত হয়ে কাজ নেই।”

সবিস্ময়ে রমাপদ বলিল, “ও! ঈশ্বর তা হলে আপনার চাকরের নাম?”

নরেশ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, “তা নয়ত তুমি কি ভেবেছিলে আমি অপ্রামাণিক নিরাকার ঈশ্বরের কথা বলছিলাম?”

রমাপদ তাহাই ভাবিয়াছিল, এবং ঈশ্বরের প্রতি নরেশের এমন সহজ বিশ্বাস এবং ভক্তি দেখিয়া মনে মনে একটু বিস্মিত হইয়াছিল। মৃদু-স্মিত মুখে বলিল, “আমি তখন ঠিক বুঝতে পারিনি!”

নরেশ গম্ভীরমুখে বলিল, “কিছুই বুঝতে পার নি! আমি বলছিলাম আমাদের এই সাকার প্রামাণিক ঈশ্বরের কথা। এ ঈশ্বরের অস্তিত্ব আর কার্য্যকারিতার প্রমাণ আমি এত বেশী পাই যে অন্য ঈশ্বরকে ভাববারই সময় পাই নে। তোমার দিদি আশা করেন তাতেও আমি ফল পাব। তিনি বলেন অপ্রামাণিক ঈশ্বর অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের মত;—বিশ্বাস না করে খেলেও জ্বর ছাড়ে!”

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া বলিল, “শুনো না ওঁর কথা রমা! আমি ও-সব অ্যালোপ্যাথিক্ হোমিওপ্যাথিক কোনো কথা বলি নি! যত সব সৃষ্টিছাড়া কথা নিজে বানিয়ে বানিয়ে অপরের নাম দিয়ে বলবেন!”

নরেশ বলিল, “আমার ক্ষমতা আছে তাই আমি বানিয়ে বানিয়ে নি; তোমাদের ক্ষমতা নাই তাই তোমরা বানিয়ে বলতে পার না। কিন্তু আমার বানান কথা তোমাদের নাম দিয়ে যে বলি তার দ্বারা আমার সহৃদয়তাই প্রকাশ পায়! 'কি' বল ভায়া, ঠিক্ কি না?”

রমাপদ হাসিতে লাগিল।

প্ল্যাট্‌ফর্ম্ হইতে বাহিরে গাড়ীবারাণ্ডায় আসিয়া রমাপদ দেখিল ঈশ্বর একখানা গাড়ীতে দ্রব্যাদি উঠাইয়া আগাইয়া দিয়াছে—এবং অপর একখানা গাড়ী আরোহীগণের জন্য সম্মুখে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে।

নরেশ বলিল, “ওঠ রমাপদ।”

ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া রমাপদ বলিল, “আপনারা দুজনে না হয় এ গাড়ীতে আসুন। ও গাড়ীতে জিনিষপত্তর রয়েছে—আমি ও গাড়ীতে যাই।”

“এঃ—ঈশ্বরের শক্তির উপর তোমার এখনো একটুও বিশ্বাস হল না দেখছি! ওঠ! ওঠ!” বলিয়া নরেশ রমাপদকে ঠেলিয়া তুলিয়া দিল, তাহার পর সুকুমারীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া দিয়া নিজে উঠিয়া বসিল।

রমাপদর মনে সামান্য খট্‌কা বাধিল। সুকুমারী এবং নরেশচন্দ্রের প্রতি তাহার আচরণ ঠিক কিরূপ হইতেছে তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। অতিথির প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিতে গিয়া ধনশালীর প্রতি আর কিছু প্রকাশিত হইতেছে কি না সেই আশঙ্কায় সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। আর যাহাই হউক না কেন সে যে ঠিক সংযত শোভন ব্যবহার করিতে পারিতেছিল না তাহা তাহার নিঃসন্দেহে মনে হইতেছিল, অথচ নিজেকে সংযত করিতে গিয়া পাছে শিষ্টাচারে ব্যাঘাত পড়ে সে ভয়ও মনে-মনে কম ছিল না।

গৃহে পৌঁছিয়া সরমার আচরণ লক্ষ্য করিয়া রমাপদ পরিমিত আচরণের কতকটা আন্দাজ পাইল। নিজের প্রতি সরমার অবজ্ঞার লেশমাত্র ছিল না, অভ্যাগতেরও প্রতি তাহার সমাদরের অভাব ছিল না। সে তাহার সংসারের সুপ্রতিষ্ঠিত আসন হইতে নরেশ এবং সুকুমারীকে সযত্নে আহ্বান করিল এবং তদুপলক্ষে যাহা কিছু দীনতা এবং দৈন্য প্রকাশ করিল তাহার মধ্যে হীনতার কোনো সংস্পর্শ পাওয়া গেল না—মায় রমাপদ সকলেরই চক্ষে তাহা বিনয় এবং ভদ্রতার রংএ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। রমাপদ দেখিল অতি অল্প সময়ের মধ্যে সরমা তাহাকে অতিক্রম করিয়া সকলের নিকট প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; এমন কি ঈশ্বর পর্য্যন্ত নিরবসর 'মাসিমা' 'মাসিমা' সম্বোধনের দ্বারা যতটা মনোযোগ সরমার প্রতি প্রদর্শন করিতেছে—তাহার অর্দ্ধেক তাহার প্রতি প্রদর্শন করিতেছে না বলিয়া তাহার মনে হইল।

ইহাতে রমাপদ দুঃখিত হইল না—প্রসন্ন হইল।

(ক্রমশঃ)

কথা—শ্রীচারুবালা দত্তগুপ্তা

সুর—শ্রীসুরেন্দ্রলাল দাস

সুরট—ঢিমাত্রিতালী

নিশিদিন মোর অন্তর কোণে
জাগিয়া থাকে কার আঁখি রে?
সকরুণ গীত করে মুখরিত পবনে
অন্তর মাঝে নির্জ্জন গোপনে
উঠিতেছে সদা বাজি রে!

হৃদয়ের শত ক্ষতে
শান্তি-সুধা-স্রোতে
কে যেন নিতি দেয় ঢালি রে!

আপন মনে বসি বিজনে
বক্ষ গুমরি' উঠে কাঁদনে,
দ্বারে কাছে মোর কে যেন ডাকে
ঘন তিমিরে!

শূন্য মনে ব্যথা চাপিয়া
(থাকি) মলিন বসনে দেহ ঢাকিয়া
এ দীন অঙ্গে মম কে যেন পরায়
মুকুতা মণি রে!

সুরট—ঢিমাত্রিতালী।

ঠাট ণ ন, সম্পূর্ণ জাতি, বাদী র, সংবাদী প, সময় রাত্রি ২য় প্রহর।

০				১				+				৩			
রমা	রা	মা	পা	-া	না	র্সা	-া	নর্সা	র্রা	ধা	ণা	ধণা	র্সণা	ধা	পা
নি	—	শি	দি	—	ন	মো	র্	অ	ন্	ত	র	কো	—	—	ণে
-া	মা	গা-	রা	পধা	মধা	মগা	রা	সরা	মপা	ধণা	ধপা	মপা	মগা	মগা	রসা
—	জা	গি	য়া	ণা	ণা	ণধা	পা	মপা	ধা	মা	পা	ধমা	গমা	গরা	সা
				থা	কে	কা	র্	আঁ	—	—	-থি	রে	—	—	-II

রা	রা	পা	পা	ধমা	পা	মগা	মরা	-া	মমা	গা	রা	রগম-া	রা	সা	-া
স	ক	রু	ণ০০	গী	ত	ক	রে	—	মুখ	রি	ত	প	ব	নে	—
রা	ধা	ধা	ণা	ধণা	র্সণা	ধা	পা	মপধ-া	মপা	মা	গা	রা	পা	পা	-া
অ	ন্	ত	র	মা	—	—	ঝে	নি	র্	জ	ন	গো	প	নে	—
-া	র্রা	র্রা	র্সা	না	-া	র্সা	র্সা	নর্সা	র্রর্সা	ণধা	পধা	মধা	পমা	গরা	সা
—	উ	ঠি	তে	ছে	—	স	দা	বা	—	—	জি	রে	—	—	—॥

(র্মর্গা র্মা র্রর্সা না)

মা	পা	না	না	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	নর্সা	র্রা	ণা	মা	পা	র্রা	র্রা	র্রা
হৃ	দ	য়ে	র	শ	ত	ক্ষ	তে	শা	ন্	তি	সু	ধা	—	স্রো	তে
-া	ধা	ণা	মা	পা	র্সনা	র্সা	-া	র্মর্গা	র্রর্সা	নর্সা	র্রর্সা	ণধা	পধা	মগা	রসা
—	কে	যে	ন	নি	তি	দেয়	—	ঢা	—	—	-লি	রে	—	—	—॥

সা	রা	রা	পা	মপা	মগা	রা	রা	-া	গমা	পা	মা	গরা	গা	রসা	রা
আ	প	ন্	ম	নে	—	ব	সি	—	বি	—	জ	নে	—	—	—
শূ	—	ন্য	ম	নে	—	ব্য	থা	—	চা	—	পি	য়া	—	(থা	কি)
-া	সরা	মগা	রা	ণ্া	ণ্া	ধ্া	প্া	প্া	রা	মগা	রা	সা	-া	রা	-া
—	ব	ক্ষ	ণ্ড	ম	রি	উ	ঠে	কাঁ	—	—	দ	নে	—	—	—
—	মলি	ন	ব	স	নে	দে	হ	ঢা	—	—	কি	য়া	—	—	—
মা	পা	-া	না	-া	না	র্সা	-া	নর্সা	র্রা	ণধা	মা	পা	র্রা	র্রা	র্রা
দ্বা	রে	র্	কা	—	ছে	মো	র্	কে	—	যে	ন	ডা	—	কে	—
এ	দী	ন	অ	—	ঙ্গে	ম	ম	কে	—	যে	ন	প	—	রায়	—
র্সা	নর্সা	র্রা	ণা	ধপা	ধা	পমা	পা	মপা	নর্সা	র্রধা	ণধা	পমা	ধপা	গমা	রসা
ঘ	—	—	ন	তি	—	মি	—	রে	—	—	—	—	—	—	—
মু	কু	তা	—	ম	—	ণি	—	রে	—	—	—	—	—	—	—॥

গানটি জলদ্ লয়ে গাহিবার সময় ঠুংরীতে সঙ্গত্ করিতে হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

"হোমিওপ্যাথিক গৃহচিকিৎসক"। প্রবীণ অধ্যাপক ডাং রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

হোমিওপ্যাথিক ক্ষেত্রে ডাং রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষরূপে পরিচিত। তাঁহার "সরল ভৈষজ্যতত্ত্ব", "সদৃশ বিধান চিকিৎসা" প্রভৃতি পুস্তকে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার বিশেষ সমুন্নতি হইয়াছে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসরের বহুদর্শনের ফল এই 'গৃহচিকিৎসক' পুস্তকে সন্নিবেশিত হওয়ায়, ইহা একটী অমূল্য গ্রন্থ হইয়াছে। স্বর্গীয় ডাক্তার সরকার মহোদয়ের সঙ্গে বহুকাল রোগী দেখিয়া তাঁহার বহুদর্শন জন্মিয়াছে, তদুপরি তিনি প্রসিদ্ধ ডাং হেরিং সাহেবের অত্যুৎকৃষ্ট, "Domestic Physician" পুস্তকখানির সাহায্য লওয়াতে পাশ্চাত্য বহুদর্শনের ফল এতৎসহ সংযোগ করিতে ত্রুটী করেন নাই।

পুস্তকখানি প্রশ্নোত্তর ভাবে লিখিত হইয়াছে। ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ স্বর্গীয় যদুবাবুই প্রথমে এই পথ দেখান। শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর অধ্যাপক সুন্দর ভাবে মীমাংসা করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। পুস্তকখানির উপক্রমণিকা ভাগে,—হোমিওপ্যাথির মূল সত্যগুলি এবং রোগের কারণতত্ত্ব, রোগ কোথায় হয়, কাহার হয়, কেন সূক্ষ্মমাত্রায় আশ্চর্য্য ক্রিয়া হয়, ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, ঔষধ সমূহ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, মহাত্মা হানিমানের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং নূতন চিকিৎসা বা হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারে সমগ্র পৃথিবীর সকল চিকিৎসার পরিবর্ত্তন, বিশেষ করিয়া সমালোচিত হইয়াছে। কিরূপে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, কি করিয়া নিজে নিজে ঔষধ প্রস্তুত করা যায়, কিরূপ রোগে কিরূপ ঔষধের কিরূপ শক্তি দিতে হয় তাহা এই পুস্তকে বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। তৎপরে চিকিৎসাভাগের প্রথমেই কিরূপে রোগ পরীক্ষা করিতে হয়, নাড়ী-পরীক্ষা জিহ্বা পরীক্ষা, মলমূত্র পরীক্ষা, রক্ত পরীক্ষা নূতন যন্ত্র "ফনেন্‌ডোস্কোপ", শক্তি নির্ণয়ের "ইনামোমিটার" যন্ত্রের কথা বিশেষ করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানিতে সরল চিকিৎসার একটু বিশেষত্ব আছে অর্থাৎ প্রত্যেক পীড়ার ঔষধের মধ্যে যেগুলিতে অনেকস্থলে ফল দিয়াছে, সেইগুলিই সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে। "বেরি বেরি", "কালাজ্বর", প্রভৃতির নূতন নূতন ঔষধের কথা লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থের শেষভাগে—আকস্মিক দুর্ঘটনা, অগ্নিতে পোড়া, কাটা, পচা, বন্দুকের গুলি লাগা, অস্থিভাঙ্গা, সর্পদংশন এবং বিষ-ভক্ষণাদির আশু প্রতিকার বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে পরিশিষ্টে,—অত্যাবশ্যক ঔষধগুলির গুণসমূহ লিখিয়া দেওয়াতে, একাধারে—মেটেরিয়া মেডিকা ও প্রাক্‌টীশের কাজ হইয়াছে। আমরা যতদূর বুঝিলাম তাহাতে পুস্তকখানি যে কেবল ছাত্র ও চিকিৎসকগণের পক্ষে ভাল, তাহা নহে, ইহা প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে গৃহ-পঞ্জিকার মত কাজ করিবে। শিক্ষিতা মহিলাগণ নিজ নিজ সন্তানের পীড়া এবং তাঁহাদের নিজেদের অনেক পীড়া, যাহা আত্মীয়-স্বজনের নিকট বলিতে কুণ্ঠিতা হন, তাহাতে আপনারা নিজে নিজে ঔষধ ব্যবহার করিয়া ফল পাইবেন। অসহায় দরিদ্র প্রতিবেশীগণ সহসা কোনও বিপদে পড়িয়া তাঁহাদিগকে জানাইলে,—এতৎসাহায্যে তাঁহারা তাঁহাদের বিশেষ সাহায্য করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন।

গ্রন্থকারের সঙ্গে আমরাও একবাক্যে স্মরণ করিতেছি, যে ভূমিকায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বড়ই সত্য—"বর্ত্তমান সময়ে অর্থ-সামর্থ্যে, খাদ্যদ্রব্যে প্রভৃতি নানা অভাবে দিন দিন দুর্ব্বলদেহী বঙ্গবাসীর, পক্ষে তেজস্কর উগ্রবীর্য্য ঔষধের অপেক্ষা, সুখসেব্য স্বল্পমাত্রাযুক্ত অথচ সুখপ্রদ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই সম্পূর্ণ সময়োপযোগী।"

প্রসূতি-পরিচর্য্যা।—ডাক্তার শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। এই পুস্তকখানির বিষয়, প্রসূতি-পরিচর্য্যা বা পোয়াতি-রক্ষা। লেখক—প্রথিতযশা চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়—সুতরাং এই পুস্তকের পরিচয় প্রদানই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। যাঁহারা স্ত্রী-পুত্র পরিবার লইয়া বাস করেন, যাঁহাদের ঘরে পোয়াতির অসদ্ভাব নাই, তাঁহারা বিপদে পড়িলে যে বামনদাস বাবুর শরণাপন্ন হইয়া থাকেন, তিনিই এই পোয়াতি-রক্ষা বইখানি লিখিয়াছেন; সুতরাং এ কথা বলাই বাহুল্য যে, ইহাতে পুঁথিগত বিদ্যার স্থান হয় নাই, বহুদর্শী প্রসূতি-চিকিৎসক পোয়াতির বন্ধু বামনদাস বাবু সুদীর্ঘকাল পোয়াতির চিকিৎসা করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা সোজা ভাবে, সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার পূজনীয়া মাতৃদেবীর নামে উৎসর্গ করিয়া মাতৃজাতির প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বইখানি যে কেবল ডাক্তারদেরই কাজে লাগিবে তাহা নহে, যাঁরা চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁহারাও এই বইখানির সাহায্যে অনেক পোয়াতীর কষ্ট লাঘব করিতে পারিবেন এবং যাহাতে পোয়াতি কোন প্রকার কষ্ট না পান, পূর্ব্ব হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। এই বইখানি নূতন পঞ্জিকার মত প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে থাকা উচিত। সকলেই এই বইখানির পরিচয় নিজে গ্রহণ করিবেন, অন্তঃপুর-চারিণীদিগকে গ্রহণ করিতে বলিবেন।

মহাত্মা অশ্বিনী-কুমার।—শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। বাঙ্গালা দেশে, শুধু বাঙ্গালা দেশে কেন, ভারত-বর্ষে এমন কোন শিক্ষিত লোক নাই বলিলেও হয় যিনি বরি-শালের অশ্বিনী বাবুর নাম ও তাঁহার অতুলনীয় কার্য্যাবলী ও স্বদেশ-প্রাণতার কথা না জানেন। অশ্বিনী বাবু নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অবদান অবিনশ্বর হইয়া থাকিবে। অশ্বিনী বাবুর প্রিয়তম ছাত্র, শিষ্য ও সেবক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষা-গুরুর জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া শিষ্যের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। এই সুন্দর পুস্তকখানি পাঠ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, কি গুণে অশ্বিনী বাবু দেশের লোকের, বিশেষতঃ দেশের যুবক ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে উচ্চাসন লাভ করিয়াছিলেন। অশ্বিনী বাবু যেমন আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন না, একেবারে সাদাসিদে মানুষ ছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত শিষ্য শরৎ বাবুও তেমনি বিনা আড়ম্বরে, সরল ও সহজ ভাষায় অশ্বিনী বাবুর পবিত্র ও মহান জীবন-কাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা বইখানি পড়িতে বসিয়া শেষ না করিয়া উঠিতে পারি নাই, এমনই সুন্দর ভাবে এই জীবন-কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'মহাত্মা অশ্বিনী কুমার' যে জনাদর লাভ করিবে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই।

বিসর্জ্জন।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত; মূল্য বার আনা। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জ্জনে'র পরিচয় নূতন করিয়া দিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মনে করি; যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা করিবরের বিসর্জ্জনের নাম শুনিয়াছেন, অনেকে হয় ত নানা রঙ্গমঞ্চেও এই নাটকখানির অভিনয়ও দেখিয়াছেন। বহুকাল পূর্ব্বের কথা,—ভারত-সঙ্গীত-সমাজ যখন এই নাটকখানির অভিনয় করেন, তখন কবিবর স্বয়ং রঘুপতির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া যে অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা এখনও আমাদের মনে আছে। তেমন অভিনয় আর কখন দেখি নাই। সেই হইতে এই নাটকখানি যখনই হাতে আসিয়াছে, তখনই পড়িয়াছি, কোন বারই পুরাতন মনে হয় নাই। এক্ষণে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় এই সর্ব্বজন-প্রশংসিত নাটকখানির পুনর্মুদ্রণ করিয়া সাহিত্যসেবী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

শোধ-বোধ।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য বার আনা। এখানি কবিবরের রচিত নাটক; আমরা ইহাকে প্রহসন বা অন্য কোন নামে অভিহিত করিতে চাই না। উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ নাটকের যাহা উপাদান, তাহা এই ক্ষুদ্র নাটকখানির মধ্যে পূর্ণভাবে বিদ্যমান। আজকালকার ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের একখানি অত্যুজ্জ্বল আলোকচিত্র। এ চিত্রের অনেক মুখ আমাদের কাছে ধরা পড়ে। কবিবর কিন্তু কোথাও শ্লেষ করেন নাই, দীর্ঘ 'সারমণ' দেন নাই, হাসিতে হাসিতে রঙ্গ করিতে করিতে যে চিত্র দেখাইয়াছেন, তাহাতে অনেক ভাবিবার কথা আছে, বুঝিবার কথা আছে, উপদেশ আছে। রঙ্গালয়ে যাঁহারা এই বই খানির অভিনয় দেখিতেছেন, তাঁহারা কি মহাকবির কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন?

বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস।—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রণীত, মূল্য ৪৲ টাকা। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী মহোদয় 'ভারতবর্ষে'র পাঠকগণের অপরিচিত নহেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ দার্শনিক প্রবন্ধাবলী 'ভারতবর্ষে' অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার গুণগ্রাহী বন্ধুগণের চেষ্টায় তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত বরিশাল শঙ্কর-মঠ স্বামীজীর অমূল্য প্রবন্ধাবলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা দেশে দার্শনিক সাহিত্যের প্রচেষ্টার জন্য যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার্হ। বেদান্ত-দর্শনের এমন সুন্দর ব্যাখ্যা এবং প্রাঞ্জল আলোচনা আমরা ইদানীং দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান সময়ে অতুলনীয় বলিয়া মনে হয়; অবশ্য কালে হয় ত ইহা অপেক্ষাও গবেষণাপূর্ণ এ জাতীয় গ্রন্থ জন্মিবে; কিন্তু সরস্বতী মহাশয় যে ইহার পথ-প্রদর্শক তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে শাঙ্কর-দর্শনের যে বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বিশেষ গবেষণাপূর্ণ। অনেকে মনে করেন, শঙ্করাচার্য্যই অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু আমরা যতদূর জানি, তাহাতে শঙ্করকে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা ঠিক নহে; তাঁহার গুরু গোবিন্দপাদ ও গোবিন্দপাদের গুরু গৌরপাদাচার্য্য অদ্বৈত-বাদী ছিলেন। তবে শঙ্কর অদ্বৈতবাদের একজন প্রধান আচার্য্য, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। স্বামীজিও, দেখিলাম, এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। অল্প পরিসরের মধ্যে এমন সুন্দর গ্রন্থের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। আমরা জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি মাত্রকেই এই অমূল্য গ্রন্থখানি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

ব্যুৎপত্তি মালা।—শ্রীহরিনাথ তর্করত্ন সঙ্কলিত; মূল্য—একটাকা। এখানিকে সংস্কৃত অভিধানের ক্ষুদ্র-সংস্করণ বলা যাইতে পারে। সচরাচর যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, পণ্ডিত মহাশয় তাহাদের ব্যুৎপত্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সংস্কৃত-শিক্ষার্থীদিগের এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি বিশেষ কাজে লাগিবে।

কৃষ্ণকমল গীতিকাব্য।—শ্রীকামিনীকুমার গোস্বামী সম্পাদিত; মূল্য আড়াই টাকা। এক সময় ছিল যখন কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহোদয়ের 'স্বপ্ন বিলাস' 'রাই উন্মাদিনী' সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গকে প্লাবিত করিয়াছিল; আমরাও বাল্যকালে স্বপ্ন বিলাসের যাত্রা শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম; এখনও তাহার কত গান আমাদের কণ্ঠস্থ আছে। গোস্বামী মহাশয় নদীয়া জেলার লোক হইলেও ঢাকাতেই জীবনের অধিক কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন; সেই জন্য তাঁহার অতুলনীয় গীতাবলী পূর্ব্ববঙ্গেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঠিক কথাই বলিয়াছেন—"'কৃষ্ণকমল' বৈষ্ণব-গীতি-পুনরুত্থান কালের শ্রেষ্ঠ কবি।" আমরা বলি, বৈষ্ণবগীতি-সাহিত্যের পুনরুত্থান কালের তিনিই শীর্ষস্থানীয় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। গোস্বামী মহাশয়ের স্বপ্নবিলাস, রাই-উন্মাদিনীর পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। যখন লোকে ছাপা বই বড়-একটা পড়িত না, সেই সময় গোস্বামী মহাশয়ের "স্বপ্ন বিলাস" 'রাই উন্মাদিনী'র কুড়ি হাজার সংখ্যা দেখিতে দেখিতে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, ইহাই এই গ্রন্থের প্রকৃষ্ট পরিচয়। এক্ষণে গোস্বামী মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার গোস্বামী মহাশয় উক্ত গীতিকাব্যের একখানি সুন্দর সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস এই শোভন সংস্করণও দেখিতে দেখিতে বিক্রয় হইয়া যাইবে।

দূরের আলো।—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত এম-এ, ডি এল্, প্রণীত মূল্য; দুই টাকা।

সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত নরেশবাবুর এই উপন্যাসখানি আমরা বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছি। তিনি যে কয়েকটী চিত্র এই উপন্যাসে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে উপেন্দ্রের মত যুবকের পরিচয় আমরা সর্ব্বদা পাইয়া থাকি; কিন্তু স্বদেশ-নেতা নবীন চক্রবর্ত্তীর মত পাজী লোক যে স্বদেশ-সেবক-নামধারী ব্যক্তিগণের মধ্যে আছেন বা থাকিতে পারেন, তাহা আমরা জানিতাম না; অথচ নরেশবাবু যে ভাবে এই দেশ-নেতা জীবটীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সম্মুখে যে একটা জীবন্ত আদর্শ রহিয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কুমুদিনী ও চিত্রার চরিত্র লেখক মহাশয় তাঁহার আদর্শ অনুসারেই অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। বইখানি পড়িতে বিশেষ আগ্রহ জন্মে এবং পড়িয়া তৃপ্তিবোধও হয়। নরেশবাবু সুলেখক; তাঁহার রচনাভঙ্গী, সরস বর্ণনার পরিচয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না।

দেশের কথা

নাগপুরে লর্ড আরউইন—

গত ২২শে জুলাইয়ের নাগপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের ৫০ জন কৃষিবিদ বড়লাটকে একখানি অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন।

বেরার ও মধ্যপ্রদেশের কৃষিবিদগণ বড়লাটকে যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলেন:—"ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আমি বড়লাটরূপে আমার কর্ত্তব্য আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনাদিগের সহিত পরিচিত হইয়া ও প্রথমেই এইরূপ এক গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। কৃষি আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জিনিষ, এই বিষয়ে আমি বহু চিন্তা করিয়াছি এবং দেশের শত শত কৃষিজীবিগণের মত আমিও জানি, এই বিষয়ে কি আনন্দ, কি উত্তেজনা ও সময়ে সময়ে কি নৈরাশ্যই হইয়া থাকে! দেশের অধিবাসীগণের ন্যায় আমিও আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সময় যাপন করিয়াছি। প্রকৃতি অনেক সময়ে এই কৃষিজীবী-দিগের সহিত কত না বাদ সাধে! কিন্তু তবুও প্রকৃতির মাধুর্য্যে আমাদিগকে গ্রামের দিকেই টানে। সহরের অপেক্ষা প্রকৃতির কোলে পালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শুধু তাহাই নহে, গ্রামের এই কৃষককুলই দেশের আশা ভরসা, উন্নতির একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ। সহরের—তথা দেশের সর্ব্বমানবকেই জীবন, উন্নতি ও সর্ব্ববিষয়ে নির্ভর করিতে হয়—এই কৃষিজীবিগণের উপর।

আপনাদিগের এই কৃষিসম্বন্ধীয় সকল বক্তব্যই, সকল অসুবিধা ও বাধা প্রভৃতির কথাই আমি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছি এবং এই সকলের মধ্যে কয়েকটি বিষয় বেরার ও মধ্যপ্রদেশের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং বাকী সকল বিষয়ই যথাসময়ে ভারতীয় কৃষিবিষয়ক "রয়াল কমিশনে" আলোচিত ও বিবেচিত হইবে।

আপনাদিগের এই প্রদেশ কৃষিবিষয়ে বিখ্যাত। এইখানে ভারতের তিনটি প্রধান চাষের সমস্যা হইয়াছে—গম, চাউল ও তুলা; এবং এই স্থানের কৃষিপ্রণালী পূর্ব্ব নিয়ম হইতে বহু সমুন্নত ও বিজ্ঞানসম্মত। কৃষি-বিষয়ে উন্নতি-সাধন করিতে হইলে কৃষি বিদ্যা ও বিজ্ঞান জ্ঞান একান্তই প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বীজ নির্দ্ধারণ, উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদি, বৈজ্ঞানিক প্রকারে জমীকর্ষণ ও সারপ্রদান প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে কৃষির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী ও আধুনিক যুগে তাহা একান্তই আবশ্যক।

চাষবাস ও কৃষিকার্য্যে দুইটি বিষয় আবশ্যক। প্রথম—বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ও নূতন নূতন আবিষ্কার এবং দ্বিতীয়তঃ তৎসমুদায় পরীক্ষা করা ও কার্য্যে পরিণত করার জন্য উপযুক্ত কৃষকের প্রয়োজন। অর্থাৎ চাই এক জনের মস্তিষ্ক ও অপর জনের হাতেহেতেরে কার্য্য করা। আপনারা একটা বিষয় বলিয়াছেন যে, কর্ষণের জমী বৃদ্ধির সঙ্গে পশু-চারণার ক্ষেত্রসমূহ কমিয়া যাইতেছে। আমি জানি, আপনাদিগের সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টিপ্রদান করিয়াছেন।

গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে মহাত্মা—

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার নিমিত্ত আগামী আগষ্ট মাসে যে গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইবে, সেই সম্পর্কে "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে মহাত্মা গান্ধী লিখিয়াছেন:—

ভারতের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে এক কমিশন আসিবেন এবং উক্ত কমিশনে ডাক্তার ম্যালান এবং মিষ্টার ডানকান থাকিবেন. ইহা মঙ্গলের চিহ্ন। বৈঠকের অধিবেশন যে দক্ষিণ আফ্রিকায় হইবে, ইহাও শুভ। যাঁহারা উচ্চপদস্থ এবং যাঁহারা এই সমস্যা লইয়া চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা যে এই কমিশনের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহাও সুখের বিষয়। আমাদের দাবী ন্যায়-সঙ্গত। এ সম্বন্ধে যতই আলোচনা ও গবেষণা করা যায়, ততই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। আমাদের দাবীর বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইলে এবং সাধারণ্যে ইহা সুপ্রচারিত হইলে আমাদের কোন ক্ষতিই হইবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষিত এবং পদস্থ ব্যক্তিগণ ভারতের বিষয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বলিয়াই মিটমাটের পথে প্রবল অন্তরায় রহিয়াছে। স্বার্থপর শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা কি চাহেন, তাঁহারা কেবল তাহাই জানেন। ভারতীয়দের পক্ষের কোন কথাই তাঁহারা জানেন না; বলিলেই চলে। যদি এই বৈঠকে ভারতীয় সমস্যা বিশেষভাবে আলোচিত হয় তাহা হইলে ভারতীয়দের (উপনিবেশিক ভাবে) দক্ষিণ আফ্রিকা দখল করিয়া লইবার কথা অথবা ভারতীয়গণের উপনিবেশিক ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিয়া শ্বেতাঙ্গদের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাইবার কথা মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে ভুয়া এবং বাজে বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

জেনারল হার্টগের বক্তৃতা ও উক্তি গোলমেলে। যদি দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের প্রতি সুবিচার করা না হয়, তাহা হইলে ভারতীয় উপনিবেশিকদের প্রতি সুবিচার করা হইবে এরূপ ধারণা আমি করিতে পারি না। ভারতীয় উপনিবেশিকদের প্রতি শ্বেতকায়দের মনোভাব বিদ্বেষমূলক। সেই কারণে যদি আদিম অধিবাসীদের প্রতি সুবিচার করা না হয়, তাহা হইলে ভারতীয়দের প্রতি যে সুবিচার করা হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। আমরা যদি এ সম্বন্ধে আরও বিশেষভাবে চিন্তা করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে এক জনের প্রতি অবিচার করিয়া অন্যের সম্বন্ধে সুবিচার ক্রয় করা যায় না।

বীর হিন্দু নারী—

পার্কার জিলার সভর সহর হইতে ৩ জন হিন্দু রমণীর বীরত্ব-বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। রাত্রি ৩টার সময় তাহাদের বাড়ীতে কয়েক জন চোর প্রবেশ করে। চোরেরা মূল্যবান জিনিষপত্র লইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় রমণীত্রয়ের নিদ্রা ভাঙ্গে। প্রাচীর টপকাইয়া পলায়ন কালে একটি চোরকে তাহারা ধরিয়া ফেলে। অন্য এক চোর তাহার সঙ্গীর উদ্ধারার্থ আসে। তখন রমণীত্রয় ও চোর দুই জনের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হয়। এক জন চোরের নিকট ছোরা ও আর এক জনের নিকট লাঠী ছিল। একজন চোর পলায়ন করে, কিন্তু রমণীগণ অপর চোরটির সহিত প্রায় এক ঘণ্টাকাল মারামারি করিয়া তাহার হাত হইতে ছোরাটি কাড়িয়া লয় এবং শেষে তাহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলে। তৎপরে পুলিসে সংবাদ দেওয়া হয়। প্রকাশ, মোট তিন জন চোর আসিয়াছিল। বাড়ীটি সহরের নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত বলিয়া কোন লোক সাহায্যার্থ আসিতে পারে নাই,—রমণীগণকে তাহাদের নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। তাহাদের এই বীরত্বে সহরে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

কেনিয়ায় ভারতীয় কর্ম্মীর দেহত্যাগ—

কেনিয়ায় ভারতীয় কর্ম্মী এম, এ, দেশাই, বুকোবা সহরে হুরন্ত হৃদ্‌রোগে অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতবাসীদিগের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ও কেনিয়ার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ইহাঁর মৃত্যুতে আফ্রিকার এক জন প্রসিদ্ধ কর্ম্মীর অভাব ঘটিল। ঐ দিন ঐ অঞ্চলের ভারতবাসী সকলেই দোকানপাট বন্ধ করিয়াছিলেন।

নূতন মন্দির আবিষ্কার—

সম্প্রতি বাঙ্গালার পাহাড়পুরে ভূগর্ভে একটি নূতন ধরণের মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাহাড়পুর ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের জামালগঞ্জ ষ্টেশন হইতে প্রায় সাড়ে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। এই স্থান বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একযোগে খনন করিতেছিলেন। কিছুদিন এই খননকার্য্য স্থগিত ছিল। গত ডিসেম্বর মাসে ইষ্টার্ণ সার্কেলের আর্কেলজিকেল সার্ভের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করেন। সম্প্রতি তথায় একটি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে নির্ম্মিত এবং নবম শতাব্দীতে উহার বিশেষভাবে সংস্কারকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। এই মন্দিরটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে নির্ম্মিত এবং ইহার গাঁথুনি কাঁচা। এই কাঁচা গাঁথুনীর মন্দির ৬০ ফিট উচ্চ হইলেও আজ ১৩ শত বৎসর উহা অটুট রহিয়াছে, দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইতেছেন। ইহাতে পাতর অতি অল্পই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই মন্দিরটি একটি গর্ভচৈত্য। ইহাতে পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারা যাইবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন।

মালবীয়ার নমঃশূদ্র-প্রীতি—

নমঃশূদ্র ছাত্রদিগকে বৃত্তিদান।—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য অণিলঝারায় অবস্থানকালে বেণারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থী পাঁচটি নমঃশূদ্র বালককে মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে বৃত্তিদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। আরও নমঃশূদ্রদিগের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনে তিনি সাহায্য করিবেন বলিয়াছেন।

দ্বারভাঙ্গা হিন্দু সম্মেলন—

২২শে জুলাই দ্বারভাঙ্গা জিলা হিন্দু সম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুত বজরংদত্ত শর্ম্মা বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, হিন্দু অত্যন্ত ভীরু। তাহারা তাহাদের জননী, ভগিনী ও পত্নীদিগকে দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। তাহাদের ভীরুতা এখন সংক্রামক ও স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বানিয়ানীর কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ প্রস্তাব করেন—এই সভা মত প্রকাশ করিতেছেন যে, হিন্দু জাতিকে, হিন্দু ধর্ম্মকে এবং হিন্দুর মান সম্ভ্রমকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু সংগঠন বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক গ্রামে হিন্দুসভা পাঠশালা সংস্থাপন এবং ব্যায়ামচর্চ্চার জন্য মল্লক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

শ্রীযুত দামোদরনারায়ণ চৌধুরী প্রস্তাব করেন, অস্পৃশ্যদিগকে কূপ ও ইঁদারা হইতে জল লইবার, বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার এবং দেবালয়ে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হউক।

ইহার পর শ্রীযুত গঙ্গাধর মিশ্র শুদ্ধি সম্পর্কে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

ডাক্তার মুঞ্জে প্রস্তাব করেন, (১) হিন্দু মহিলাদের ভিতর হইতে পর্দ্দা প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হউক এবং আত্ম-সম্মান রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহিলাদিগকে অস্ত্রাদি দেওয়া হউক।

(২) মসজেদের সম্মুখে বাদ্যাদি বন্ধ করিবার জন্য মুসলমানগণ সম্প্রতি যে নূতন দাবী করিতেছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিবার জন্য এবং দেশে শান্তিসংস্থাপনের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হউক।

(৩) সম্প্রতি রাজরাজেশ্বরী নিরঞ্জন শোভাযাত্রা লইয়া মুসলমানগণ কলিকাতায় হিন্দুদের উপর যেরূপ অনাচার করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া এবং পাবনা ও কুষ্টিয়ার হিন্দুদের উপর মুসলমানগণ যেরূপ অনাচার করিয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিয়া ডাক্তার মুঞ্জে আর এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

প্রত্যেক প্রস্তাবই সভায় সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভার কার্য্য শেষ হয়।

পাটের চাষ—

গত ১৪ জুলাই বুধবারে কোম্পানী বারিকে সরকার এ বৎসরকার যে সংশোধিত বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে জানা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এবং আসাম এই তিন প্রদেশে আনুমানিক ৩,৬০৫,০০০ একর জমীতে পাটের চাষ হইয়াছে; অর্থাৎ গত বৎসরাপেক্ষা ৪৮৯,৮০০ একর অধিক জমীতে পাট বপন করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে এক বাঙ্গালা দেশে ৪,৪১,৪০০ একর অধিক জমীতে পাটের চাষ হইয়াছে। সেইরূপ আসামে ৩১,৬০০ একর এবং বিহার ও উড়িষ্যায় ১৬৮০০ একর অধিক জমীতে উহার আবাদ হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা দেশে যে বৃষ্টিপাত হইয়াছে, তাহা পাটের আবাদের পক্ষে অনুকূল এবং বর্ত্তমানে মোটের উপর পাটের অবস্থা ভালই বলিতে হইবে। বিহার ও উড়িষ্যায় পাটের জন্য এখনও বৃষ্টির আবশ্যক আছে বটে, তথাপি উহার বর্ত্তমান অবস্থা ভালই বলিতে হইবে। আসামে এরূপ সময়ে পাটের অবস্থা সচরাচর যেরূপ থাকে, সেইরূপই আছে।

বাঙ্গালা দেশে একমাত্র পাবনায় বৃষ্টির অভাব ও পোকা লাগাতে পাটের কিছু ক্ষতি হইয়াছে, সেইরূপ ময়মনসিংহে কতকটা অনিষ্ট হইয়াছে।

পাট সম্বন্ধে অভিজ্ঞের অভিমত—

আশুড়ি মুঞ্জরিত

এ বৎসর যে পরিমাণ জমীতে পাটের চাষ হইয়াছে, তাহাতে জনৈক অভিজ্ঞ ব্যক্তি অনুমান করেন যে, এ বৎসর প্রতি একরে (৩ বিঘায়) গড়ে তিন গাঁট বা ১৫ মণ পাট উৎপন্ন হইবে। তাহা হইলে মোটের উপর এক কোটি গাঁট বা পাঁচ কোটি মণ পাট উৎপন্ন হইবে। কিন্তু তিনি আশঙ্কা করেন, এই পাটের বার আনা অংশ কলিকাতা আসিবে কি না সন্দেহ। তিনি বলেন, উহার কারণ এই যে, মফঃস্বলে এতাধিক পাট স্থানান্তরে চালান দিবার সুযোগ নাই। গত বৎসর সমস্ত জিলায় ১ কোটি ৫ লক্ষ গাঁট পাট জন্মিয়াছিল, কিন্তু মাত্র ৮৩ লক্ষ গাঁট কলিকাতায় আসিয়াছিল। তাহার উপর এবার কোন জিলায় পুরাতন পাট মজুত নাই বলিলেই হয়। ইহাতে এ বৎসর যে পাট হইবে চাষীরা তাহা ধরিয়া রাখিতে পারে। গত মরসুমে চাষীরা প্রায় সর্ব্বত্রই পাটে বেশ লাভ করিয়াছে এবং সেই জন্য তাহারা মহাজনের নিকট ঋণী নহে। সুতরাং এখন পাটের বাজার যেরূপ নামিয়াছে, তাহাতে পাট ধরিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে।

ভারতের কয়লা—

গত ১৯২৫ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খনিসমূহ হইতে নিম্নলিখিত পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে:—আসাম ৩১৭৯৯৭ টন, বেলুচিস্থান ২২৭০৭, বাঙ্গালা ৪৯১৩৮৫২, বিহার ও উড়িষ্যা ১৩৯৩১২৪৪, ব্রহ্মদেশ ২৫, মধ্যপ্রদেশ ৭০৮৫৫৪, পঞ্জাব ৭৪৬৬২, মোট ১৯৯৬৯০৪১ টন।

কাবুলীর কবল—

বাঙ্গালাদেশে কাবুলী চেনেন না এমন লোক বোধ হয় বিরল; সুদূর মফস্বলের বালক বালিকারা পর্য্যন্ত এই লাঠিগাগড়াধারী মুণ্ডিগুলির সহিত পরিচিত। কিন্তু ইহারা দেশের কিরূপ সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহার সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা সুস্পষ্ট নহে। সম্প্রতি রঙ্গপুরের "বার্ত্তা" পত্রে 'কাবুলীর কবল' নামক প্রবন্ধে একটী তালিকা আছে তাহার কিছু অংশ নিম্নে দেওয়া গেল। ইহা হইতে কাবুলীদিগের কার্য্যাবলীর কতকটা ধারণা জন্মিবে।

খাতকের নাম	ঋণের পরিমাণ	সুদ যাহা দেওয়া হইয়াছে।
শিবচরণ হাড়ি	১৫৲	২২৫৲
বিরাশীয়া হাড়ি	৮৲	৮৭৲
মলহারী হাড়ি	১২৲	৭২৲
দারোগী হাড়ি	৪০৲	৭২০৲
অনেশ্বরী হাড়িনী	১০৲	১৫০৲
তিলেশ্বর ডোম	৬০৲	৯০০৲
যোগীয়া ডুমনী	১৮৲	২৮৲
কালু হেলা	৪০৲	৬০৲
পরমেশ্বর হাড়ি	১০০৲	১৫০০৲

জগতের উৎপন্ন চাউল—

১৯১৪ সালে ভারতে মোট ৮৯৩২৮০০০ একর জমিতে ধান্য উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্ববৎসর হইতে ইহাতে শতকরা ২ ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সালে মোট ৩৯০৯৭০০০ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৯২৫ সালে জগতের মোট ধান্য উৎপন্নের জমির এবং উৎপন্ন চাউলের দাম নিম্নে দেওয়া গেল।

দেশের নাম	জমি (হাজার একর)	চাউল (হাজার সেণ্টল) (১ সেণ্টল=১৮০ পাউণ্ড)
ইউরোপ	৪৯৪,২	২০১৪.৩৩
আমেরিকা যুক্ত রাজ্য	৯০৩.৯	১৫২৪১.৮
সিংহল	৮০৩,১	৫৫১৯.৬
ভারতবর্ষ	৮১৪৬১.০	১০৪৭১৯৯০৬
ইণ্ডোচীন	১২৫১৩.৪	১২৭০৩০৮
জাপান		
কোরিয়া গং	১২৭৫১.৬	৩২২৯৯৭.৫
ফিলিপাইন	৪২০০.৯	২৮২১৯,৩
শ্যামদেশ	৬৬৭১,৯	১০৯৬৯,৯
জাভা	৮৯৭২,৪	১০৫০৫৫,০
মাড়াগেচকার	১২৮৫,৬	২২৯২৮.২
	৯২৯১৭৮,৪	১৮০৪২৫৯,৭

ভারতে অহিফেন—

"ব্যবসা ও বাণিজ্য" বলেন, ভারত সচিবের দপ্তর হইতে বলা হইয়াছে যে ১০ বছরের মধ্যে ঔষধের প্রয়োজন ব্যতীত ভারতবর্ষ হইতে অহিফেন রপ্তানী বন্ধ করা হইবে। ইহা ক্রমে ক্রমে করা হইবে। ১৯২৭ খৃঃ হইতে এই কার্য্য আরম্ভ হইবে—এবং হিসাবমত ১৯৩৭ এর পর অহিফেন আর বাহিরে রপ্তানী হইবে না, এ আশা আমরা করিতে পারি। ইতিমধ্যেই কলিকাতায় অহিফেন নীলাম বন্ধ করা হইয়াছে।

দেশী লবণ—

বাঙ্গালা দেশে যে লবণ আসে তাহার বেশী ভাগ এডেন ও পোর্ট সৈয়দে জন্মিয়া থাকে। সম্প্রতি কাথিওয়ারে লবণ প্রস্তুতের কারখানা বসিয়াছে। কিন্তু পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় তাহা বঙ্গদেশে আসে না। বিশেষতঃ যে জাহাজে বোঝাই হইয়া লবণ চট্টগ্রাম ও কলিকাতা বন্দরে আসিবে, ফিরিবার সময় যদি মাল বোঝাই না পাওয়া যায়, তবে প্রতিযোগিতার কাথিওয়ার টিকিতে পারিবে না। বোম্বে চেম্বার সে জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য চাহিয়াছেন।

একজন বিশেষজ্ঞ বলিতেছেন যে বাঙ্গালা হইতে কয়লা নেওয়ার বন্দোবস্ত করিলে সরকারী সাহায্য ছাড়াও কাথিওয়ারের লবণ এই দেশে চালান দেওয়া যায়। এই সম্বন্ধে অনেক আলোচনা চলিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় লবণেই ভারতবর্ষ চলিবে. তজ্জন্য লিবারপুলে বা এডেনে যাইতে হইবে না। কিন্তু চট্টগ্রামে কয়লা পাওয়া যায় না। এখান হইতে পাট, কার্পাস, চা, কাঠ, বম্বের সওদাগরেরা গ্রহণ করিলে এই দেশের অসুবিধাও দূর হইতে পারে।—ব্যবসা ও বাণিজ্য

কচুরি-পানার ছাউনী—

কচুরী-পানা শুকাইয়া তাহার দ্বারা ঘর ছাওয়া যায়। মার্চ্চমাসে ঢাকায় যে শিল্প-প্রদর্শনী বসিয়াছিল তাহাতে কচুরী বা টাগইয়ের ঘর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কচুরীর ছাউনি না কি একসঙ্গে জলকেও কলা দেখায় আর আগুনেরও তোয়াক্কা রাখে না। "পঞ্চায়েৎ" (ঢাকা) বলিতেছেন:—"দেশে বর্ত্তমানে যেরূপ ছনের অভাব এবং টিনের মূল্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে গরীব লোকের মাথা বাঁচাইবার উপায় হইতেছে—কচুরি-পানা।—ব্যবসা ও বাণিজ্য।

প্রচ্ছদ-পট

ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের নাম এখন অনেকে না জানিলেও, যাঁহারা বাঙ্গালা-সাহিত্যে বঙ্কিম-যুগের সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন যে পরলোকগত সেন মহাশয় উক্ত যুগের একজন যশস্বী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ব-বিশারদ ছিলেন। যে কয়েকটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বঙ্কিমচন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ছিলেন, ডাক্তার রামদাস সেন তাঁহাদের অন্যতম। সেন মহাশয় মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুরে বঙ্গজ কায়স্থ বংশে ১২৫২ শালের ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৮৪৫ খৃঃ ১০ই ডিসেম্বর) জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺লালমোহন সেন। লালমোহন সেন মহাশয় ঐ অঞ্চলের একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন জমিদার ছিলেন। রামদাসবাবু তিন বৎসর বয়সের সময় পিতৃহীন হন। ইনি প্রথমে বাড়ীতেই গৃহশিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করেন; তাহার পর বহরমপুর কলেজে প্রবিষ্ট হন। বিষয়-কর্ম্মের তত্ত্বাবধানের ভার

অল্প বয়সেই ইহাঁর উপর ন্যস্ত হওয়ায় ইনি কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অধ্যয়নের সময় হইতেই ইনি ইতিহাস আলোচনায় নিবিষ্ট হন এবং কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ইহাঁর জ্ঞান সঞ্চয়ের বাসনা বিশেষ বলবতী হয়. এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বহুবিধ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ইনি নিজ গৃহে একটী প্রকাণ্ড পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুস্তকালয় দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, দেশের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য রামদাসবাবু কি বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। সে সময় বঙ্গদর্শনের আমল। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে রামদাসবাবু উক্ত পত্রে ঐতিহাসিক রহস্য, ভারত-রহস্য, রত্ন-রহস্য, বুদ্ধদেব প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখেন এবং পরে সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। এতদ্ব্যতীত কুসুমমালা, কবিতালহরী প্রভৃতি আরও কয়েকখানি কবিতা গ্রন্থও ইনি প্রণয়ন করেন। ইহাঁর প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ইটালীর ফ্লরেন্স নগরের ওরিয়েণ্টাল একাডেমি ইহাঁকে 'ডাক্তার' উপাধি ভূষিত করেন। সে সময় এ সম্মান-লাভ বড় সহজ ছিল না। ১২৯৪ শালের ৩রা ভাদ্র (১৮৮৭ খৃঃ ১৯শে আগষ্ট) ইহাঁর দেহান্তর হয়। আমরা এবার ভারতবর্ষের প্রচ্ছদপটে এই প্রথিতনামা ঐতিহাসিকের প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া তাঁহার স্মৃতির তর্পণ করিলাম এবং তাঁহার প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম।

সাহিত্য-সংবাদ

নব-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত "সচিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ," মূল্য ৩৲
ডাঃ রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্র .ত "হোমিওপ্যাথী গৃহচিকিৎসক" মূল্য ২৲
শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস "বেলমতিয়া" মূল্য ২৶০
ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত "দূরের আলো" মূল্য ২৲
শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত 'দাদার কথা'—"স্যার্ রাসবিহারী ঘোষের জীবন-কথা" মূল্য ২৲
শ্রীমতী পূর্ণশশী দাসী প্রণীত "মধুমিলন" মূল্য ১৲
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত "রক্তের সম্বন্ধ" মূল্য ১৲
স্বামী যোগানন্দ প্রণীত "শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" মূল্য ১।০
শ্রীযুক্ত গদাধর সিংহরায় প্রণীত নূতন নাটক "সমাজ শাসন" মূল্য ১৲
ডাঃ আশুতোষ পাল প্রণীত "হিতকথা" মূল্য ৸০
শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় প্রণীত "ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা" মূল্য ২৲
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত "রমলা" (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ১৸০
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত "নারীলিপি" (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য ১।০
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ মহাশয়ের নূতন উপন্যাস 'বিবি বউ' যন্ত্রস্থ; পূজার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইবে।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA

যশোদা দুলাল

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ,
মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রকাশিত।

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.